কূর্ম পুরাণ

পুরাণসংগ্রহ—২

কূর্ম পুরাণ

ভাষান্তর

দেবার্চনা সরকার

ন ব প ত্র প্র কা শ ন

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট, ১৯৫৯

প্রকাশক · প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক প্রসূন বসু
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রধান সম্পাদকের কথা

'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'—এ কথা মহাভারত সম্বন্ধে বলা হলেও তা পুরাণ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ মহাভারতও 'পুরাণ' পদবাচ্য। মহাভারত নিজেকে 'মহোত্তম ইতিহাস' আখ্যা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'পুরাণ' আখ্যাও দিয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণ সহচর শব্দ, কোথাও কোথাও সমার্থকও বটে। মনুসংহিতা অর্থশাস্ত্রাদি গ্রন্থে পুরাণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে এবং বেদের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে। শাস্ত্রাদি-বোধের জন্যে পুরাণ ছিল রাজাদের অবশ্য পাঠ্য, পুরাণবেত্তা বা পৌরাণিকেরাও ছিলেন রাজসভায় বহু-আদৃত। আধুনিক কালেও পুরাণের গুরুত্ব কমে নি। আমরা সাধারণতঃ পুরাণকে কল্পনাশ্রয়ী বলে মনে করলেও ইতিহাস রচনায় পুরাণে উঁকি না দিয়ে উপায় নেই। কারণ বহু স্থলেই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য দেখা যায় পুরাণে। সমাজতত্ত্ব, ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র—এ সব বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যেও আমাদের পুরাণের মুখাপেক্ষী হতে হবে। বহু-বিষয় সংবলিত বহু-লক্ষণ পুরাণকে ভারত-সংস্কৃতির বিশ্বকোষ বলাই সঙ্গত। সেদিক দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের সকলের পক্ষেই পুরাণপাঠ প্রয়োজনীয়। শুধু গবেষণা নয়, নাট্যাদি চর্চাতেও পুরাণ অবশ্য পঠনীয়, কারণ বহু ঘটনা ও চরিত্রের নব মূল্যায়নে নূতন নাট্য বা কাব্যাদি রচিত হতে পারে পুরাণ আখ্যান অবলম্বনে।

সকলের কাছে পুরাণকে সহজলভ্য করে তোলাই অষ্টাদশ মহাপুরাণের এই অনুবাদ-প্রকাশের উদ্দেশ্য। আশা করব 'নবপত্র' গৃহীত 'সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভার'াদি প্রকল্পের মতো এটিও সাফল্য লাভ করবে সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতায়।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
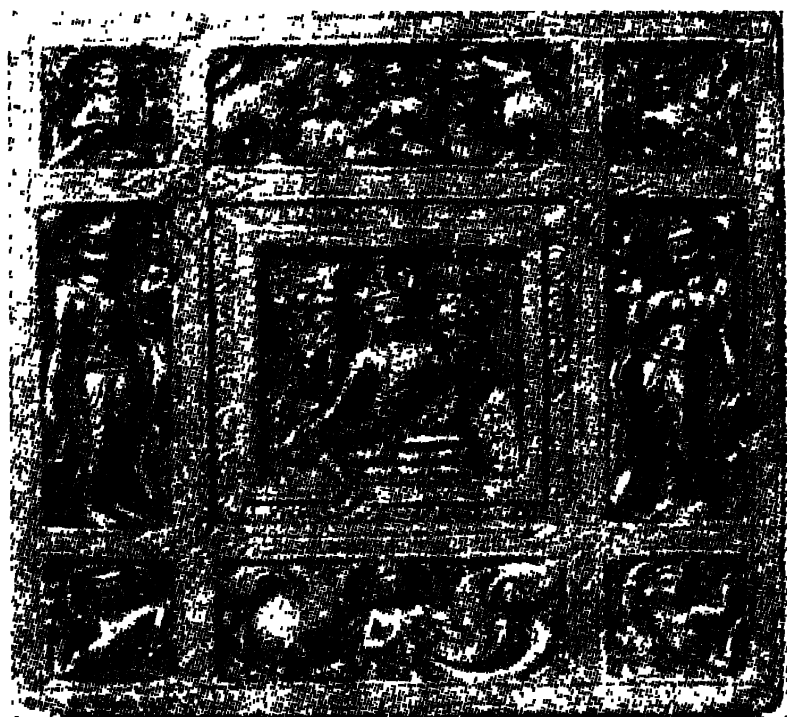
পূর্বভাগ

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে জয় অর্থাৎ পুরাণ শুরু করতে হয়। আমি জ্ঞানের অগোচর কূর্মরূপধারী বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার দ্বারা কথিত পুরাণের বিবরণ দেব।

যজ্ঞ-শেষে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিরা রোমহর্ষণ নামক পূতচরিত্র এক সূতস্তুতিপাঠককে পুরাণসংহিতার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন. হে মহাবুদ্ধি সূত, তুমি ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান ব্যাসদেবকে সুষ্ঠুভাবে সেবা করেছ। সেই দ্বৈপায়ন ঋষির বাক্য শুনে তোমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল, তাই লোকে তোমায় রোমহর্ষণ বলে। প্রাচীন কালে নাকি প্রভু ভগবান ব্যাস তোমাকে ঋষিদের কাছে পুরাণসংহিতা বলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ শেষ হলে পুরাণসংহিতা বলবার জন্যে তুমি নিজে পুরুষোত্তমের অংশে উৎপন্ন হয়েছ। তাই আমরা তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ কূর্মপুরাণের কথা জিজ্ঞাসা করছি। তুমি পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তুমি আমাদের সেই কথা বল।

মুনিদের কথা শুনে সেই শ্রেষ্ঠ পুরাণবিদ্ সূত সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেবকে মনে মনে প্রণাম করে বলতে শুরু করলেন ঃ

আমি জগৎ সৃষ্টির মূল কূর্মরূপী হরিকে নমস্কার করে পুরাণকথা আরম্ভ করব। এই দিব্য কথা সমস্ত পাপকে নষ্ট করে। এই কথা শুনলে পাপিষ্ঠও পরমা গতি লাভ করে। নাস্তিকের কাছে কিন্তু কখনও এই পবিত্র কথা বলতে নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, যাঁরা শান্ত ও ধার্মিক, তাঁদের কাছেই স্বয়ং নারায়ণের মুখনিঃসৃত এই পুরাণকথা বলতে হয়। সৃষ্টি, প্রলয়, বিভিন্ন রাজা ও ঋষির বংশাবলী, বিশিষ্ট কালগণনা এবং প্রসিদ্ধ রাজা ও ঋষির চরিত্রগাথা—এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। পুরাণ আঠারোটি—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। দ্বিজগণ, এই অষ্টাদশ পুরাণ শুনে মুনিরা সংক্ষেপে অন্য কতকগুলি উপ-পুরাণও লিখেছেন। প্রথমটি হল সনৎকুমার প্রোক্ত আদিপুরাণ, এরপর নরসিংহপুরাণ, তৃতীয়টি কুমার কথিত স্কন্দপুরাণ, চতুর্থটি স্বয়ং শিবের দ্বারা উক্ত শিবধর্মপুরাণ, পঞ্চমটি দুর্বাসা কথিত আশ্চর্যপুরাণ, ষষ্ঠটি নারদীয়পুরাণ। এরপর রয়েছে কপিল ও বামনপুরাণ। নবম পুরাণটি বলেছেন উশনা। আরও রয়েছে—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বরুণপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, শাম্বপুরাণ, সর্বার্থপ্রকাশক সৌরপুরাণ, পরাশরপুরাণ, মারীচপুরাণ এবং ভার্গব পুরাণ। অতএব উপপুরাণও আঠারোটি।

পুরাণশ্রেষ্ঠ পবিত্র কূর্মপুরাণ পঞ্চদশ পুরাণ। সংহিতার প্রভেদের ফলে এর চারটি

বিভাগ হয়েছে—ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী আর বৈষ্ণবী। এই চারটি পবিত্র সংহিতা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল দান করে। এটি ছয় হাজার শ্লোক সংবলিত চতুর্বেদসম্মত ব্রাহ্মী সংহিতা। এই সংহিতায় রয়েছে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা, রাজা ও ঋষিদের বংশাবলী, বিশিষ্ট কালগণনা, রাজা ও ঋষিদের চরিত্রগাথা এবং দিব্য পুণ্য প্রসঙ্গের কথা। এই পৌরাণিক কথাকে ধার্মিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরাই ধারণ করতে পারেন। ব্যাস পুরাকালে যে কথা বলেছিলেন, আমি সেই কথাই বলব।

প্রাচীনকালে অমৃত পাবার জন্যে দেবতারা দানবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে গ্রহণ করে ক্ষীরসাগর মথিত করেন। মন্থনকালে কূর্মরূপী জনার্দন দেবতাদের হিতার্থে মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন। পরমচেতন বিকাররহিত বিষ্ণুকে কূর্মরূপ ধারণ করতে দেখে দেবতারা ও নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা হৃষ্ট হলেন। এরপর যখন নারায়ণবল্লভা দেবী উত্থিত হলেন, তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁকে গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্র এবং নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিরা তাঁর রূপচ্ছটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা অব্যক্ত বিষ্ণুকে এই শ্রেয় বাক্য বললেন, হে দেবাধীশ, হে জগদ্ব্যাপী নারায়ণ, আমাদের সত্য করে বলুন, এই বিশালাক্ষী দেবীর পরিচয় কী। তাঁদের এই প্রশ্ন শুনে দৈত্যদলন বিষ্ণু দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে নিষ্পাপ নারদ প্রমুখকে বললেন, ইনি আমারই আর এক নিজ-রূপ। ইনি ব্রহ্মরূপিণী পরমা শক্তি। ইনি আমার মায়া, প্রিয়া এবং অন্তহীনা। ইনিই জগৎকে ধারণ করে আছেন। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, এই মায়ার সাহায্যেই দেবাসুর-মানবসহ সমস্ত জগৎকে মোহিত করে আমি সংহার ও সৃষ্টি করে থাকি। সৃষ্টি, প্রলয়, জীবের এই আসা-যাওয়া, এবং আত্মা—এই সমস্তকে জ্ঞানের দ্বারা জেনে তবেই এই বিপুল মায়াকে অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্মা, ঈশান প্রমুখ সমস্ত দেবতারা এই মায়ার অংশে অধিষ্ঠান করে শক্তিমান হয়েছেন। ইনিই আমার সর্বশক্তি। ইনিই সর্বজগৎপ্রসূতি। ইনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইনি পদ্মালয়া, চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-হস্তা, মাল্যশোভিতা, কোটি সূর্যের মতো এঁর দীপ্তি। ইনি সমস্ত প্রাণীর মোহ সৃষ্টি করেন। আমার পূর্বেই ইনি জাত হয়েছিলেন। দেবগণ, পিতৃগণ, মানবগণ, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও এঁর মায়া অতিক্রম করতে সমর্থ হন না। জগতের অন্যান্য জীবের কথা আর কী বলব।

বাসুদেবের এই কথা শুনে মুনিরা বিষ্ণুকে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, এবার আমাদের সেই কথা বলুন, যা কালক্ষয়ের পর ঘটবে।

তখন মুনিদের দ্বারা অর্চিত হৃষীকেশ বলতে শুরু করলেন, হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক বিখ্যাত দ্বিজপ্রবর আছেন। ইনি পূর্বজন্মে রাজা ছিলেন। মহাদেব প্রমুখ দেবতারাও এঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। আমার কূর্মরূপ দেখে এবং আমার মুখনিঃসৃত পৌরাণিক কথা শুনে, তিনি যখন জানলেন যে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব ও অন্যান্য দেবতারা নিজের নিজের শক্তি নিয়ে আমারই শক্তিতে সংস্থিত, তখন আমার শরণ নিলেন। সেই সময়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, তুমি ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত রাজা হয়ে তুমি পূর্বজন্মের এমন সব বৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারবে, যা সমস্ত প্রাণী, এমন কি শ্রোতাদেরও অজ্ঞেয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি নিষ্পাপ। আমি তোমাকে অতি গুহ্য তত্ত্ব প্রদান করব। আমার কাছ থেকে এই তত্ত্ব জেনে তুমি মৃত্যুর পরে আমাতেই বিলীন হয়ে যাবে। এখন তুমি পৃথিবীতে আমার অন্য অংশে অবস্থিত হয়ে সুখে বাস করবে। বৈবস্বত মনুর অধিকার শেষ হয়ে গেলে

তুমি কার্যের জন্যে আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। এরপর ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে জেনে কাল-ধর্ম প্রাপ্ত হলেন। যথাসময়ে তিনি আমার সঙ্গে শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুভক্তের যোগ্য দেব-দুর্লভ বিবিধ সামগ্রী ভোগ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। যে আমাতে বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে দুটি অক্ষর নিহিত, যে আমি গূঢ়রূপ পরমব্রহ্ম বলে বিদিত সেই বাসুদেবরূপী আমাকে জেনে আমারই আদেশে তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।

তিনি ব্রত, উপবাস, নিয়ম, হোম এবং ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে সকল জীবের আশ্রয় পরমেশ্বরের উপাসনা করতেন। মহাদেবেরই নাম জপ করে, তাঁকেই নমস্কার করে তাঁতেই সনিষ্ঠ ও সমর্পিত হয়ে তিনি যোগীগণের অন্তরস্থিত মহাদেবকে অর্চনা করতেন। তদবস্থায় একদিন পরমা কলা তাঁকে বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত দিব্য আত্মরূপ প্রদর্শন করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়াকে দেখে মাথা নত করে প্রণাম করলেন ও নানা স্তোত্রে তাঁর স্তুতি করলেন। তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, হে বিশালাক্ষি, হে বিষ্ণু-চিহ্নযুক্তা শুভময়ি দেবি, আপনি কে? আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমাকে বলুন। তাঁর কথা শুনে সুমঙ্গলা সুপ্রসন্না লক্ষ্মী প্রিয় বিষ্ণুকে স্মরণ করে সহাস্যে ব্রাহ্মণকে বললেন, মুনিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ আমাকে দেখতে পান না। আমি নারায়ণের সঙ্গে অভিন্না তাঁরই স্বরূপময়ী পরমা মায়া। বিচার করে দেখলে আমার সঙ্গে নারায়ণের কোনই প্রভেদ নেই। আমিই তিনি, আমিই সেই পরমব্রহ্ম, আমিই সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু। যাঁরা এই সংসারে জীবগণের আশ্রয় পুরুষোত্তমকে কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের পথে উপাসনা করেন, আমি তাঁদের উপর প্রভুত্ব করি না। তাই সেই অনাদি অনন্তকে কর্মযোগের পথ ধরে জ্ঞানের দ্বারা ভজনা কর—তাহলে মোক্ষলাভ করবে। হে দ্বিজবর, মহামতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা শুনে মাথা নত করে দেবীকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে বললেন, সেই নিত্য, নিষ্ফল, অচ্যুত ভগবান ঈশকে জানব কী উপায়ে? হে দেবি, পরমেশ্বরি, আপনিই আমাকে তা বলে দিন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে পদ্মালয়া দেবী বললেন, নারায়ণ স্বয়ং তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন। তারপর প্রণত সেই বিপ্রকে দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে পরাৎপর বিষ্ণুকে স্মরণপূর্বক সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন। শরণাগতের আর্তিনাশক, ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা সেই নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্যে ব্রাহ্মণ পরম সমাধি অবলম্বন করে বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন।

এর পর বহুকাল কেটে গেল। ব্রাহ্মণের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাযোগী পীতাম্বর জগন্ময় হরি দেখা দিলেন। পরমাত্মস্বরূপ, বিকাররহিত দেব বিষ্ণুকে দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূতলে জানুর সাহায্যে উপবিষ্ট হয়ে সেই গরুড়ধ্বজকে স্তব করতে লাগলেন, হে যজ্ঞেশ্বর, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, তুমি জগতের আত্মা। তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বমূর্তি সনাতন হরি। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তোমার শক্তির সীমা নেই। তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিগুণময়, অখণ্ডস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বরূপ, তুমি পুরুষ। তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব, হে বিষ্ণু তুমি জগতের কারণ; তোমার না আছে আদি, না আছে মধ্য, না আছে অন্ত। তোমাকে জ্ঞানের দ্বারা লাভ করতে হয়। তোমাকে নমস্কার। তোমার বিকার নেই, মায়া নেই, ভেদ নেই, অভেদ নেই, ; তুমি আনন্দস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি পরিত্রাতা, তুমি

শান্ত। তোমার আত্মা অপ্রতিহত। তোমার রূপের শেষ নেই, অথচ তুমি অরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমিই পরমার্থ, তুমি সমস্ত মায়ার অতীত, তুমিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি অণুর চেয়েও অণুতর, আবার তুমিই মহান দেবতা, তুমি মঙ্গলময় ও শুদ্ধ, তুমি পরমেষ্ঠী। তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, তুমিই সমস্ত সৃষ্টির মূল, তুমিই জীবের পরমাগতি। তুমি সর্বভূতের পিতামাতা। তুমি অক্ষর, পরম জ্যোতি, চিৎস্বরূপ, তুমি অখণ্ড আকাশ। সকলের তুমি আশ্রয়। তুমি অপ্রকাশ অন্ধকারের পরপারে তুমি থাকো। তোমার অন্ত নেই। কেবল যোগীরাই জ্ঞানের দীপ জেলে যে পরমাত্মা বিষ্ণুকে দর্শন করেন, তোমার সেই রূপই পরম পদ। সেই আমার আশ্রয়।

তখন সর্বজীবের আত্মা ভূতভাবন ভগবান ঈষৎ হেসে স্তুতিকারী ব্রাহ্মণকে দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ভগবান বিষ্ণুর সেই স্পর্শ পেয়েই ঐ মুনিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের অনুগ্রহে যথার্থভাবে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করলেন।

এরপর তিনি আনন্দিত চিত্তে বিকশিতকমলনয়ন পীতবাস অচ্যুত জনার্দনকে প্রণাম করে বললেন, হে পুরুষোত্তম, তোমার কৃপায়, তোমার অনুগ্রহে আমি নিঃসন্দিগ্ধরূপে সেই জ্ঞান লাভ করেছি যে জ্ঞানের একমাত্র বিষয় ব্রহ্ম, যে জ্ঞান লাভ করলে পরম আনন্দ আর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি ভগবান, বাসুদেব, বিধাতা। তোমাকে নমস্কার। হে যোগেশ, জগন্ময়, এখন আমি কী করব তা বলে দাও।

নারায়ণ মাধব ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা শুনে অল্প হেসে জগতের অশেষ কল্যাণকারী এই বাক্য বললেন, যে পুরুষেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তারা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের পথ ধরে মহাদেবকে অর্চনা করবেন। এর যেন অন্যথা না হয়। যে ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করতে চান, তিনি সেই পরম তত্ত্ব, বিভূতি, কার্যকারণ এবং আমার ইচ্ছাকে জেনে ঈশ্বরের আরাধনা করবেন। সমস্ত সংসর্গ পরিত্যাগ করে জগৎকে মায়াময় বলে জেনে অদ্বিতীয় আত্মাকেই ধ্যান কর। তাহলেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। হে ব্রাহ্মণ, আমি তিন প্রকার ভাবনার কথা বলছি, শোন। প্রথমটি হল আমার সম্বন্ধে ভাবনা, দ্বিতীয়টি ব্যক্তি সম্বন্ধে আর তৃতীয়টি ব্রহ্ম সম্বন্ধে। তৃতীয় ভাবনাটিকে সমস্ত গুণের অতীত বলে জানবে। জ্ঞানী ব্যক্তি এদের মধ্যে একটি ভাবনা অবলম্বন করে ধ্যান করবেন। আসক্তিশূন্য চিত্তে প্রথম ভাবনাটিকে আশ্রয় করতে হয়—বেদে এই রকম বলা হয়েছে। অতএব সমস্ত প্রযত্ন নিয়ে ঐ বিষয়ে নিষ্ঠাবান এবং মনোযোগী হয়ে বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা কর। তাহলেই মোক্ষলাভ করবে।

তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করলেন, হে জনার্দন, পরমতত্ত্ব কী? বিভূতিই বা কাকে বলে? কার্য এবং কারণই বা কী প্রকার? তোমার স্বরূপ কী আর তোমার ইচ্ছাই বা কী রকম?

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, এক অবিকার্য ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, তিনি নিত্যানন্দময়, অন্ধকারের অতীত এবং পরম জ্যোতিস্বরূপ। তাঁর যে নিত্য বৈভব, তাকেই বিভূতি বলে। জগৎ তার কার্য এবং শুদ্ধ, অক্ষর, অব্যক্তই তাঁর কারণ। আমি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী। আমি পরম ঈশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ে কর্তৃত্বই আমার ইচ্ছা বলে কথিত হয়। হে ব্রাহ্মণ, চিন্তার দ্বারা এই সমস্ত তত্ত্ব যথাযথ ভাবে জেনে কর্মযোগ অনুসরণে শাশ্বত ব্রহ্মকে সম্যক ভাবে উপাসনা কর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, যে উপায়ে পরমব্রহ্মকে উপাসনা করা যায়, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম কি
ার ? তিনটি ভাবনা যে জ্ঞানে রয়েছে তারই বা স্বরূপ কি ? পুরাকালে এই সৃষ্টি
ভাবে হয়েছিল ? কি ভাবেই বা আবার এর ধ্বংস হয়ে থাকে ? জগতে সৃষ্টি কত
মের ? বংশ কয়টি ? মন্বন্তরই বা কয়টি ? এদের বিস্তার কতখানি ? পবিত্র ব্রত, তীর্থ
চতি, সূর্য ইত্যাদি গ্রহের সন্নিবেশ এবং পৃথিবীর দৈর্ঘ ও বিস্তারেরই বা কি পরিমাণ ?
াপ, সমুদ্র, পর্বত, নদ, নদী—এ সবের সংখ্যা কত ? পুণ্ডরীকাক্ষ, আপনি এখন
মাকে এই সব কিছুর যথার্থ বিবরণ দিন।

কূর্ম তখন বললেন, হে মুনিগণ, সে আমাকে এই কথা বললে আমি ভক্তদের প্রতি
কম্পাবশত সমস্ত কিছুর যথাযথ বর্ণনা দিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে এই
ব্যাখ্যা করে আমি তাকে অনুগৃহীত করি এবং সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হই। হে
ষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তখন তিনি ভক্তিভরে পবিত্রভাবে সমাহিত চিত্তে আমার কথিত বিধান
ুসারে পরমেশ্বরের আরাধনা করেছিলেন. পুত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহ বিসর্জন দিয়ে,
ল দ্বন্দ্ব থেকে নির্মুক্ত হয়ে, পরিগ্রহ ত্যাগ করে সমস্ত কর্মকে তিনি সমর্পণ করে-
লেন। এই ভাবে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করেছিলেন। আপনাকে জেনে আর নিজের
্য সমস্ত জগৎকে অনুভব করে তাঁর অক্ষরপূর্বিকা ব্রহ্মবিষয়িণী চরম উপলব্ধি হল।
ফলে তিনি সেই পরম যোগকে প্রাপ্ত হলেন যার দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আস্বাদ করা
।। মুমুক্ষু যোগীরা আলস্য ত্যাগ করে কুম্ভক, পূরক প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-
বাসের উপর প্রভুত্ব লাভ করে যাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল হন, তিনি সেই ব্রহ্মকে
নার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তারপর একদিন সেই যোগীন্দ্র অব্যয় ব্রহ্মকে অনুভব করার জন্য আদিত্যের নির্দেশে
াস সরোবরের উত্তরে এক পর্বতে গমন করলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের যোগবিভূতির প্রভাবে
কাশে এক অনুপম বিমানের আবির্ভাব হল। সূর্যের মতো তার দীপ্তি। দেব, গন্ধর্ব,
সরা, সিদ্ধ আর ব্রহ্মর্ষিরা পথের মাঝে সেই যোগীন্দ্রকে দেখে তাঁকে অনুসরণ
লেন। এর পর তিনি পর্বতের মধ্যে গিয়ে দেববন্দিত এক স্থানে প্রবেশ করলেন।
থানে যোগীরা বাস করেন। সেখানে থাকেন পরমপুরুষ স্বয়ং। অযুত সূর্যের
্যাতিতে সেই স্থান উদ্ভাসিত। সেখানে গিয়ে তিনি দেবদুর্লভ অন্তর্ভবনে প্রবেশ
লেন ও সর্বজীবের পরম আশ্রয় আদি-অন্তহীন দেবদেব পিতামহকে ধ্যান করতে
গলেন।

তারপর সেই স্থানে এক পরম অদ্ভুত জ্যোতির আবির্ভাব হল। তারই মধ্যে তিনি
রাতন পরমপুরুষকে দর্শন করলেন। সেই দেবতা বিপুল তেজোরাশি স্বরূপ।
বিদ্বেষীরা তাঁকে পেতে পারেন না। তাঁর চারটি মুখ। অতি সুন্দর তাঁর শরীর।
রদিকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় তিনি প্রদীপ্ত। সেই বিশ্বাত্মা দেব প্রণত যোগীকে
খ এগিয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দেবতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ সেই দ্বিজবরের
ীর থেকে বিপুল জ্যোতি বেরিয়ে এসে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। ঐ জ্যোতির নাম
ঋক্, যজুঃ ও সাম। এই জ্যোতি পবিত্র নিষ্কলুষ পদস্বরূপ। বেদান্তে বলা হয়েছে
থানে হব্য এবং কব্য-সেবী হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মা রয়েছেন, সেটিই যোগীদের
দি দ্বার। ব্রহ্মতেজে তা দীপ্তিমান। তার শোভা মনোরম, তা মনীষীদের আশ্রয়স্থল।
াবান ব্রহ্মা ঐ তেজোময় মুনির দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেলেন সেই

ঐশ্বরিক তেজকে—যা শান্ত, সর্বত্রগামী, কল্যাণময়, আত্মস্বরূপ, অক্ষয়, শূন্যময়, যেখানে বিষ্ণুর পরম পদ বিদ্যমান, যা আনন্দময়, স্থির, যা পরমেশ্বর ব্রহ্মস্থান।

তিনি সমস্ত জীবের মধ্যস্থিত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম ঐশ্বর্য লাভ করে আত্মার পরম মুক্তিরূপে অক্ষয়লোকে গমন করলেন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি-সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে অন্তিম ভাবকে আশ্রয় করলে মায়ালক্ষ্মীকে অতিক্রম করতে পারবেন।

সূত বলতে লাগলেন, শ্রীহরির এই কথা শুনে ইন্দ্র ও নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা গরুড়ধ্বজ নারায়ণকে বললেন, হে দেবতাদের দেবতা, ইন্দ্রিয়বর্গের প্রভু, হে নাথ, হে অব্যয় নারায়ণ, আপনি পুরাকালে ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদ্যুম্নকে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের যে উপদেশ দিয়েছিলেন—সেই সব কথা আমাদের বলুন। হে জগন্ময়, আপনার সখা এই কথা শুনতে উৎসুক।

তখন পাতালবাসী কূর্মরূপী দেব জনার্দন বিষ্ণু নারদ প্রমুখ মহর্ষিদের জিজ্ঞাসায় দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট যে কূর্মপুরাণ বর্ণনা করেছিলেন, তার কথাই আপনাদের বলছি। হে ব্রাহ্মণগণ, পুরাণকথা শোনা এবং বিশেষত পাঠ করা অতি গৌরবের বিষয়। এর দ্বারা কীর্তিলাভ হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয়, পুণ্য হয় আর মানুষের মুক্তি আসে। এমন কি পুরাণের একটি অধ্যায় বা একটি মাত্র উপাখ্যান শুনলেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, ব্রহ্মলোকে পূজা পাওয়া যায়। কূর্মরূপী দেবাদিদেব এই পুরাণ বলেছেন—এই পরম গ্রন্থকে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ইন্দ্রদ্যুম্ন মোক্ষ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কূর্ম বললেন, হে ঋষিগণ, শুনুন, আপনারা যা জিজ্ঞাসা করেছেন আর আমি যা বলব, তা জগতের পক্ষে হিতকর। ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই কথা বলা হয়েছিল। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঘটনার দ্বারা স্ফীত এই পুরাণ মানুষের পুণ্যদায়ক। এতে মোক্ষধর্মের কথা বলা হয়েছে। আমি, স্বয়ং নারায়ণ, পুরাকালে বিপুল নিদ্রা অবলম্বন করে সর্পশয্যায় শয়ান ছিলাম। তখন আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাত্রিশেষে জেগে উঠে আমি সৃষ্টির কথা চিন্তা করছিলাম। সহসা পুলকিত হয়ে উঠলাম। আর তাতেই জন্ম নিলেন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা। তারপর কোন কারণে আমার ক্রোধ উৎপন্ন হল—তার থেকে জন্ম নিলেন রৌদ্রময়, ক্রোধময়, শূলহস্ত, ত্রিনেত্র, সূর্যের মতো দীপ্তিমান দেব মহেশ্বর—তিনি জন্ম নিলেন যেন ত্রিভুবনকে দগ্ধ করে, তারপর দেবী লক্ষ্মী রূপে জগৎ আলো করে আমার পাশে এসে বসলেন। পদ্মের মতো তাঁর চোখ দুটি, সুন্দর তাঁর কান্তি, মুখশ্রীটি শান্ত। সমস্ত জীব তাঁর মায়ায় মুগ্ধ। পবিত্রহাস এই দেবী সুপ্রসন্না, কল্যাণময়ী। কী তাঁর মহিমা! কী স্বর্গীয় তাঁর রূপ। দিব্যমাল্যশোভিতা এই দেবীই মহামায়া, অক্ষয়স্বরূপা নারায়ণী!

ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে দেখে জগতের প্রভু আমাকে বললেন, সমস্ত জীবের মোহ সৃষ্টির জন্য আত্মস্বরূপিণী এই দেবীকে নিযোগ করুন। মাধব, তা করলে আমার এই বিশাল সৃষ্টির বিস্তার ঘটবে। এ কথা শুনে একটু হেসে দেবী লক্ষ্মীকে বললাম, দেবি, তোমাকে আদেশ দিচ্ছি দেব-অসুর-মানবসহ এই সমস্ত জগৎকে মোহিত কর

যাতে তাদের পতন ঘটে। কিন্তু দেখো, যারা জ্ঞানযোগের চর্চা করেন, সেই সংযমী, ব্রহ্মপরায়ণ, অক্রোধী, সত্যধর্ম, ব্রহ্মবাদীদের দিকে দৃষ্টি দিও না। ধ্যানশীল, নির্মায়িক, শান্ত, ধর্মপরায়ণ, বেদজ্ঞ, যাগকারী আর তাপস ব্রাহ্মণদেরও বাদ দিও। আবার বেদ, বেদান্ত ও বিজ্ঞানের চর্চায় যাদের সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটেছে, মহাযজ্ঞই যাদের পরম আশ্রয়, সেই সব ব্রাহ্মণদের দিকেও তাকাবে না। যারা জপ, হোম বেদপাঠ আর পুজাদির দ্বারা দেবাদিদেব মহেশ্বরের উপাসনা করেন, তাদেরও স্পর্শ করো না। ভক্তিযোগের পথে যারা চলেছেন, যারা ঈশ্বরে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়া যারা অভ্যাস করেন, যাদের কোন পাপ নেই—সে-রকম মানুষদের প্রভাবিত করবে না। ওঙ্কারে যাদের নিষ্ঠা, যারা রুদ্রের নাম জপ করেন, যারা অথর্বশাখা জানেন আর ধর্ম জানেন তাদের কাছেও যাবে না। বেশী আর কী বলব—আমার আদেশে যারা স্বধর্মের সেবা করছেন, ঈশ্বরের আরাধনায় রত রয়েছেন, তাদের ওপর মোহজাল বিস্তার করো না।

এইভাবে আমি হরিপ্রিয়া মহামায়া লক্ষ্মীকে নিয়োগ করলে তিনি আমার আদেশমতোই কাজ করেছিলেন। লক্ষ্মীর পুজো করা উচিত। ভগবৎপত্নী লক্ষ্মীকে পুজো করলে তিনি অতুল বৈভব, ভোগসামগ্রী, মেধা, যশ ও বল প্রদান করেন। তাই লক্ষ্মীকে পুজো করবে।

তারপর লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার আজ্ঞায় আগের মতোই চরাচর আর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। যোগবলে তিনি জন্ম দিলেন মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠের। ব্রহ্মবাদী সাধক মরীচি প্রমুখ এই নয়জন ব্রহ্মার পুত্রই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রভু পিতামহ তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের দুটি উরু থেকে বৈশ্যদের আর দুটি পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদন আর সমস্ত দেবতাদের রক্ষার জন্যই শূদ্র ছাড়া অন্য তিনটি বর্ণ ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, তাদের জন্যই যজ্ঞ সম্পাদিত হতে পেরেছিল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব ব্রহ্মেরই সহজাত রূপ। নিত্য, অব্যয়শক্তিরূপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে অনাদি, অনন্ত, বেদময়ী দিব্য বাণী সৃষ্টি করেছিলেন। তা থেকেই সমস্ত প্রবৃত্তি উদ্ভূত হল। এটি ছাড়া আর যে সমস্ত শাস্ত্র পৃথিবীতে রয়েছে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাতে আসক্তি হয় না। কারণ তার অনুশীলন করলে পাষণ্ডী হতে হয়। বেদার্থজ্ঞ ঋষিরা পুরাকালে যা স্মরণ করেছিলেন, তাই অনুষ্ঠান করতে হয়। অন্য শাস্ত্রে মনোযোগী হওয়া উচিত নয়, বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি রয়েছে, যা কিছু কুতর্কপূর্ণ শাস্ত্র আছে, সে সবই পরকালে নিষ্ফল হয়। সে সবই অন্ধকারে ভরা বলে জেনো। পুরাকালে যে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের কোথাও কোন বাধা ছিল না, তাদের চিত্ত ছিল পবিত্র আর তারা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করত। হে মুনিবরগণ, এরপর কালের নিয়মে তাদের স্বধর্মে বাধাস্বরূপ আসক্তি, দ্বেষ প্রভৃতি অধর্ম উৎপন্ন হল। সেজন্য তারা আর অতি সহজ সিদ্ধি লাভ করতে পারল না। সেই সময়ে তাদের রজোগুণময়ী অন্য রকম এক সিদ্ধি হয়েছিল। পরে সেই সিদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আবার কালক্রমে বার্তোপায় এবং কর্মজনিত হস্তসিদ্ধির সৃষ্টি করে। এর পরে সর্বব্যাপী ব্রহ্মা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্মের কথা বললেন। প্রজাপতির প্রত্যক্ষ মূর্তিরূপে যে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ভৃগু প্রমুখ ঋষিরা মনুর মুখ থেকে তা শুনে ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ছয়টি কর্ম—যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও ও অধ্যয়ন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম হিসেবে যদিও দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞের কথা

বলা হয়েছে, তথাপি দণ্ডধারণ এবং যুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে আর কৃষিকার্য বৈশ্যদের পক্ষে প্রশস্ত। শূদ্ররা ধর্মলাভ করবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করে। এ ছাড়া কারুশিল্প আর পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কাজও তারা করতে পারে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, অগ্নিরক্ষা, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবপুজো গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম। বনবাসী বা বানপ্রস্থের ধর্ম হোম, ফলমূল ভক্ষণ, বেদপাঠ, তপস্যা এবং বিধি অনুসারে সংবিভাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভক্ষন, মৌনিত্ব, তপস্যা, ধ্যান, সম্যক জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভিক্ষুদের ধর্ম। ভিক্ষাচরণ, গুরুর সেবা করা, বেদ অধ্যয়ন, সন্ধ্যাহ্নিক ও অগ্নিকার্য ব্রহ্মচারীদের ধর্ম। পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা বলেছেন—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, ভিক্ষু—এই তিন আশ্রমাবলম্বীর সাধারণ ধর্মই ব্রহ্মচর্য। অন্য রমণীর সঙ্গ বর্জন করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই পর্বদিন ছাড়া অন্য দিন ঋতুকালে সহবাস করতে হয়। এও গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য। গর্ভসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত এই রকম করার বিধান রয়েছে। তাই সাবধানে এই কর্তব্য করতে হয়। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তা না করলে ভ্রূণহত্যার পাপ স্পর্শ করে। গৃহস্থের পরম ধর্ম প্রতিদিন বেদাভ্যাস, সামর্থ অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করা, অতিথির সেবা এবং দেবতার আরাধনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে বৈবাহিক অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করতে হয়। গৃহস্থ যদি অন্য দেশে যান, তাহলে তার পুত্র, স্ত্রী অথবা ঋত্বিক এই কাজ করবে।

তিনটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই প্রধান। যেহেতু অন্য আশ্রমাবলম্বীরা একেই উপজীব্য বলে মনে করেন, সেই কারণে গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। বেদেও চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তাই গৃহস্থাশ্রমকেই ধর্মসাধনের একমাত্র উপায় বলে জেনো। যে অর্থ ও কামের মধ্যে ধর্ম নেই, তা পরিত্যাগ করো। যে ধর্ম সর্বলোকের বিরুদ্ধ তাও আচরণ করো না। ধর্ম থেকেই অর্থলাভ হয়, ধর্মই ঈপ্সিত বস্তু দান করে, আর ধর্মই মোক্ষের কারণ। তাই ধর্মকেই আশ্রয় করো, ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ বলে কথিত হয়েছে। তাই ধর্মকেই আশ্রয় করবে। যে সমস্ত পুরুষ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করেন, তারা উর্ধলোকে গমন করেন, যারা রজোগুণকে আশ্রয় করেন, তারা মধ্যস্থানে থাকেন আর যারা তমোগুণের শরণ নেন, তারা মূঢ়, তাই অধোদেশে পতিত হন। যে ব্যক্তি অর্থ এবং কামকে ধর্মের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকেও যেমন সুখী হন, পরলোকেও তেমনি অনন্ত আনন্দ লাভ করেন। ধর্ম থেকে মোক্ষ লাভ হয়, অর্থ দেয় কাম্যবস্তু। চতুর্বর্গের বিষয়ে এই রকম সাধ্যসাধন ভাব প্রদর্শিত হয়। যে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের এই রকম মাহাত্ম্যের কথা জানেন এবং তার অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন। তাই অর্থ ও কামকে ত্যাগ করে ধর্মকে আশ্রয় করবে। ব্রহ্মবাদীরা বলেন—ধর্ম থেকেই সব কিছু পাওয়া যায়।

ধর্মই এই স্থাবর ও জঙ্গম চরাচরকে ধরে আছে। হে ব্রাহ্মণগণ, এই ধর্মই সেই অনাদি, অনন্ত ব্রাহ্মী শক্তি। এ বিষয়ে সংশয় নেই যে জ্ঞানমূলক কর্মের দ্বারাই ধর্মলাভ হয়। তাই জ্ঞানের সঙ্গেই কর্মকে অবলম্বন করবে। বৈদিক কর্মকে দু প্রকার বলা হয়েছে—প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। যে কর্ম জ্ঞানপূর্বক করা হয় তাকে নিবৃত্তিমূলক কর্ম বলে। এর বিরুদ্ধ যা কিছু তাই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম। যিনি নিবৃত্তিমূলক কর্মের আশ্রয় নেন, তিনি পরমলোক প্রাপ্ত হন। তাই নিবৃত্তিমূলক কর্মকেই অবলম্বন করো। না হলে আবার সংসারে প্রবেশ করতে হয়।

মনুর মতে চতুর্বর্ণের সাধারণ ধর্ম এইগুলি—ক্ষমা, সংযম, দয়া, দান, লোভশূন্যতা, ত্যাগ, সারল্য, ঈর্ষামুক্তি, তীর্থভ্রমণ, সত্যকথন, সন্তোষ, আস্তিক্য, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়দমন, দেবপূজা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উপর হিংসা না করা, প্রিয় কথা বলা, কপটাচার না করা এবং নিষ্পাপ থাকা। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যাগাদিক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাদের জন্য পরলোকে রাখা আছে প্রাজাপত্য স্থান, যে সমস্ত ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিমুখ হন না, তাদের জন্য রয়েছে ঐন্দ্র স্থান, যে সমস্ত বৈশ্য স্বধর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন, তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে মারুতস্থান আর যে সমস্ত শূদ্র সম্যকভাবে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের সেবা করে তাদের জন্য রয়েছে গান্ধর্ব স্থান। অষ্টআশি হাজার ঊর্ধ্বরেতা ঋষি যে স্থানে গমন করেন, গুরুকুলবাসীদের জন্য রাখা আছে সেই স্থান।

মনু বানপ্রস্থদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন সপ্তর্ষিস্থান ; গৃহস্থদের জন্য প্রাজাপত্য স্থান, সংযতাত্মা সর্বত্যাগী ঊর্ধ্বরেতা যতিরা সেই স্থানে গমন করেন—যেখানে একবার গেলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। যোগীরা লাভ করেন অমৃত ব্যোম নামে পরম অক্ষয় ঐশ্বরিক আনন্দময় এক লোক। সেটিই সকল স্থানের মধ্যে সর্বোত্তম, সেটিই পরমা গতি।

ঋষিরা বললেন, হে ভগবন দৈত্যদলন, হে হিরণ্যাক্ষরিপু, চারটি মাত্র আশ্রমের কথা বলা হল। আর যোগীদের জন্য পৃথক একটি আশ্রমের কথাও বলা হল। তাহলে সব মিলিয়ে কী করে চারটি আশ্রম হয় ?

কূর্ম উত্তর দিলেন, যিনি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে ধ্রুব সমাধি আশ্রয় করেন, তিনিই নিশ্চল যোগী, তিনি পঞ্চমাশ্রমী সন্ন্যাসী। সমস্ত আশ্রমই যে দু' প্রকার হয় তা বেদে বলা হয়েছে। ব্রহ্মচারী দু' প্রকার—উপকুর্বাণ ও ব্রহ্মপরায়ণ নৈষ্ঠিক। যিনি যথাযথ নিয়ম অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তিনি উপকুর্বান। আর যিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। সেই রকম গৃহস্থও দু' প্রকার—উদাসীন ও সাধক। যিনি আত্মীয় পরিজনদের পালন পোষণ করে থাকেন, তিনি সাধক গৃহী। আর যিনি তিনটি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি সব ত্যাগ করে মোক্ষলাভের জন্য একাকী বিচরণ করেন, তিনি উদাসীন গৃহী। যিনি অরণ্যে তপস্যা করেন, দেবপূজা ও হোম করেন, যিনি অধ্যয়নে নিরত, তিনি তাপস বানপ্রস্থ। আর যিনি তীব্র তপস্যায় শীর্ণকায় হয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হন, তিনি সান্ন্যাসিক বানপ্রস্থ। যিনি যোগাভ্যাসে নিরত, নিত্য ধ্যানের দ্বারা উত্তরণ লাভে প্রয়াসী, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি জ্ঞানমার্গ ধরে চলেন, তিনি পারমেষ্ঠিক ভিক্ষু। আর যে মহামুনি আপনাতে আপনি থাকতে ভালোবাসেন, যিনি সদা সন্তুষ্ট, অভ্রান্ত যার দর্শন, তিনি যোগী ভিক্ষু। পারমেষ্ঠিক ভিক্ষু তিন প্রকার। এদের মধ্যে কেউ জ্ঞানসন্ন্যাসী, কেউ বেদ সন্ন্যাসী, আবার কেউ বা কর্মসন্ন্যাসী। যোগীও তিন প্রকার—ভৌতিক, সাংখ্য ও অন্ত্যাশ্রমী। ভৌতিকেরা ভাবনা থেকে মুক্ত, সাংখ্যেরা অক্ষরের চিন্তাতেই নিমগ্ন, আর অন্ত্যাশ্রমীরা পরমেশ্বরের ভাবনা করেন। এই ভাবে, দেখ, সমস্ত বেদশাস্ত্রে চার প্রকারের আশ্রমের কথাই রয়েছে। পঞ্চম আশ্রম নেই।

বিশ্বাত্মা দেবদের নিরঞ্জন স্বরূপ এই রকম বর্ণ ও আশ্রম সৃষ্টি করে দক্ষ প্রমুখ ঋষিদের বললেন, তোমরা নানারকম জীবের জন্ম দাও। ব্রহ্মার কথায় তাঁর দক্ষ প্রমুখ মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ দেব, মানব প্রভৃতি নানা রকম জীব সৃষ্টি করলেন। এই ভাবে ভগবান

ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করে বললেন, আমি এদের পালন করব, আর শঙ্কর করবেন এদের সংহার।

পরমেশ্বরের তিনটি রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব। এই তিন মূর্তির উৎস পরব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ আর তমোগুণের সংযোগ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের লীলার কারণে এই তিন মূর্তি পরস্পরে অনুরক্ত, পরস্পরে আশ্রিত, আবার পরস্পরে প্রণত। হে দ্বিজগণ, রুদ্রের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী ও অক্ষরা—এই তিন প্রকার ভাবনা। আমাতে সর্বদা অক্ষর ভাবনা বর্তমান। দেব ব্রহ্মার মধ্যেও দ্বিতীয় অক্ষর ভাবনা রয়েছে। আমি আর মহাদেব তত্ত্বতঃ পৃথক নই, আমি অন্তর্যামী পরমেশ্বর। তাই আমি স্বেচ্ছায় আত্মাকে বিভক্ত করে অবস্থান করছি। দেব, অসুর ও মানব সমেত এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করার জন্য পরমপুরুষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই ব্রহ্মা, মহাদেব এবং বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু যদিও একই প্রভু, তবু কার্যবশত তাঁদেব তিনটি মূর্তির কথা বলা হয়। যদি মোক্ষরূপ পরম স্থান লাভ করতে চাও, তাহলে সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে এঁদের বন্দনা ও পূজা কর। যে বর্ণ ও যে আশ্রমে যেমন ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেই ধর্মকে ভালোবেসে ভক্তির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আজীবন এঁদের পূজা করবে। হে দ্বিজগণ, যে চারটি আশ্রমের কথা যথাবিধি বলা হয়েছে, সেগুলির তিন প্রকার ভেদ হয়—বৈষ্ণবাশ্রম, ব্রাহ্মাশ্রম ও হরাশ্রম। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তি, যে যে দেবতার যে যে চিহ্ন, সেই সব চিহ্ন ধারণ করে সেই সেই দেবতার ভক্তের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ধ্যান ও অর্চনা করবেন। যিনি নারায়ণের পরম পদে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি সর্বদা সুগন্ধি জলের দ্বারা কপালে শূলচিহ্ন ধারণ করবেন। শিবের সমস্ত ভক্তেরাই শম্ভুর শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ত্রিপুণ্ড্রকে পবিত্র ভস্মের দ্বারা কপালে অঙ্কিত করবেন। যারা জগৎকারণ পরমলোকবাসী ব্রহ্মার শরণাগত, তারা সর্বদা কপালে তিলকচিহ্ন ধারণ করবেন। এতে সেই অনাদি, কালাত্মাকেই ধারণ করা হয়ে থাকে। ঊর্ধ্ব ও অধোভাবে যোগ থাকাই ত্রিপুণ্ড্রকের চিহ্ন। কপালে ত্রিশূল চিহ্ন ধারণ করলে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকেই ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিলক ধারণ করলে সেই ব্রহ্মতেজোময় ঐশ্বরিক উজ্জ্বল সূর্যমণ্ডলই ধৃত হয়ে থাকেন। তাই ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন ধারণ করবে। যথাবিধি মঙ্গলময় তিলক ধারণ করলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। বর্ণ ও আশ্রমের নিয়মগুলি যে ব্যক্তি জানেন, তিনি ইন্দ্রিয়কে দমন করে, শান্ত সংযত হয়ে, ক্রোধ ত্যাগ করে পূজা, হোম ও জপ করবেন। যিনি সারা জীবন সমাহিত চিত্তে দেবতাদের পূজা করেন, তিনি অচিরেই অক্ষয় সেই দেবস্থান লাভ করতে পারেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বর্ণাশ্রমবর্ণন নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, ভগবন, চারটি বর্ণ ও আশ্রমের কথা তো বলেছেন। প্রভু, এখন আশ্রমগুলির ক্রমিক ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

কূর্ম বলতে লাগলেন, আমি অনুকম্পার বশবর্তী হয়েই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি- যথাক্রমে এই চারটি আশ্রমের কথা বলেছি। অন্য কারণে নয়। যার জ্ঞান-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, যিনি পরম বৈরাগ্য লাভ করেছেন, তিনি মোক্ষলাভের ইচ্ছা করলে ব্রহ্মচারী হয়ে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবেন, বিধি অনুসারে বিবাহ করবেন এবং নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ করে পুত্র উৎপাদন করবেন। যদি বৈরাগ্য থাকে, তাহলেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।

যথানিয়মে যজ্ঞ না করে, পুত্র উৎপাদন না করে, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করেন না। অবশ্য যদি কোন জ্ঞানী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের বৈরাগ্যের তীব্রতা এত বেশি হয় যে তিনি আর গৃহে থাকতেই পারছেন না, তাহলে যজ্ঞ প্রভৃতি না করেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অরণ্যে গমন করে বিবিধ যজ্ঞ করবেন এবং তপস্যা করে তপঃফলের দ্বারা বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে একবার গমন করলে আর গৃহে ফেরা যায় না। জ্ঞানী গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ বেদের বিধান অনুসারে প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যজ্ঞ সম্পাদন করে বন আশ্রয় করবেন, তার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। যদি অন্ধ, পঙ্গু বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে হোম ও যাগ করবেন। কিন্তু যদি সংসারে তাদের একেবারেই আসক্তি না থাকে, তাহলে অবশ্য সন্ন্যাস অবলম্বন করাই উচিত। বৈরাগ্য উপস্থিত হলে যে কোন মানুষেরই সন্ন্যাস আশ্রয় করা কর্তব্য। কিন্তু বৈরাগ্য না থাকলেও যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি পতিত হন। যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা জীবন একটি মাত্র আশ্রমকে অবলম্বন করে থাকেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। যিনি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধন উপার্জন করেন এবং সংযত ও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হয়ে নিত্য স্বধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ব্রহ্মলাভ করতে পারেন। ব্রহ্মে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে আসক্তি এবং কামনা-বাসনা ত্যাগ করে যিনি প্রসন্ন মনে দিনযাপন করেন, তিনিই পরমপদলাভের অধিকারী। ব্রহ্মই সব কিছু দিচ্ছেন, আবার ব্রহ্মেই সব কিছু সমর্পিত হচ্ছে, ব্রহ্মকেই সব কিছু দেওয়া হচ্ছে—এই চিন্তাকেই ব্রহ্মার্পণ বলা যায়। তত্ত্বদর্শী ঋষিরা বলেন—আমি কিছুই করি না, ব্রহ্মই সব কিছু করছেন—এই জ্ঞানই হল ব্রহ্মার্পণ। সেই নিত্য ভগবান ঈশ এই কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট হোন—এই মনে করে সর্বদা কাজ করাকেই পরম ব্রহ্মার্পণ বলে। আবার পরমেশ্বরকে যদি সমস্ত কর্মের ফল উৎসর্গ করা যায়, তাহলে হয় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মার্পণ। জ্ঞানী ব্যক্তি কোন কর্মকে কর্তব্য মনে করে আসক্তি ত্যাগ করে যে কর্ম করেন, তাও মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু যদি জীব কর্মফলের আশা ত্যাগ না করে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্মফলই তার বন্ধনের কারণ হয়। তাই যার জ্ঞান উৎপন্ন হয় নি, সেই ব্যক্তি সর্বতোভাবে কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করবেন। তাহলেই বিলম্ব হলেও ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারবেন। কর্ম ইহজন্ম ও পূর্বজন্মের পাপকে ক্ষয় করে। এতে মানুষের মন প্রসন্ন হয় এবং মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম করলে সম্যক যোগ উৎপন্ন হয়। কর্মসঞ্চিত জ্ঞানকে দোষ স্পর্শ করে না। এই সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে যে কোন আশ্রয়কে আশ্রয় করে ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনের জন্য কর্ম করবেন এবং নিষ্কর্মতা অবলম্বন করবেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরম জ্ঞান এবং নৈষ্কর্ম্য লাভ করে যদি কেউ একাকী, মমত্বশূন্য ও সংযত হয়ে থাকেন, তাহলে জীবিত অবস্থাতেই তার মুক্তিলাভ হয়। সদানন্দ, আভাসশূন্য আর নির্মলবুদ্ধি হয়ে সর্বদা পরমেশ্বরের তৃপ্তির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করলে পরমব্রহ্মে বিলীন হওয়া যায়। আর তাহলেই নিত্যপদ লাভ হয়।

তোমাদের চারটি আশ্রমের উৎকৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে বললাম। এই ধর্ম অতিক্রম করলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে চাতুরাশ্রম্যকথন নামে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

সূত বলে চললেন, ঋষিরা সমস্ত আশ্রম বিধির বিবরণ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে হৃষীকেশকে নমস্কার করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো সমস্ত আশ্রমধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলেন। এখন বলুন, কি করে এই জগতের সৃষ্টি হল? আমরা এ বিষয়ে শুনতে উৎসুক। হে পুরুষোত্তম, বলুন, সমগ্র জগতের সৃষ্টি কার থেকে হল? কোথায়ই বা এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হবে? কে-ই বা সকলের নিয়ন্তা?

ঋষিদের কথা শুনে কূর্মরূপধারী নারায়ণ সারগর্ভ বাক্যে জীবগণের উৎপত্তি ও বিলয়ের তত্ত্ব বলতে শুরু করলেন—সর্বশক্তিমান ও মহান ঈশ্বরই সকলের নিয়ন্তা। তিনি পরম, অব্যক্ত, চতুর্ব্যূহ, সনাতন। তাঁর অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁর পরিমাপ করা যায় না। তিনি আছেন, আবার তিনি নেইও। তিনি নিত্য ও অব্যক্ত কারণ। দার্শনিকরা বলেন তিনি প্রকৃতি, আবার তিনিই পুরুষ। যে আত্মার গন্ধ, বর্ণ, রস নেই, শব্দ নেই, স্পর্শ নেই, যে আত্মার জরা নেই, যে আত্মা ধ্রুব, অক্ষয় আর নিত্য, সেই আত্মাতেই ব্রহ্ম প্রথমে ছিলেন। জগতের কারণ এই ব্রহ্ম বিপুল, সনাতন—এই পরব্রহ্ম সর্বজীবের শরীর। তিনি আত্মাতে অধিষ্ঠিত, মহৎ। তাঁর না আছে আদি, না আছে অন্ত। তাঁর জন্ম নেই, তিনি সূক্ষ্ম, তাঁর মধ্যে রয়েছে তিনটি গুণ। তিনিই সব কিছুর উৎস। অব্যয় আর অসাম্প্রত এই ব্রহ্মকে জানা যায় না।

যখন সেই আত্মপুরুষে গুণসাম্য হবে, তখন প্রাকৃত প্রলয় ঘটবে। সৃষ্টির প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত এর স্থিতি। একেই বলে ব্রাহ্মী রাত্রি। আর বিশ্বের উৎপত্তিই ব্রাহ্মী দিবস। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেই ব্রহ্মের দিন বা রাত্রি নেই। লক্ষণ্যর দ্বারা এই কথা বলা হচ্ছে। জগতের আদি এই অনাদি সর্বভূতময় অব্যক্ত অন্তর্যামী পরমেশ্বর রাত্রিশেষে জাগরিত হন। এই মহেশ্বর পরম পরমেশ্বর প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের বিক্ষোভিত করেন। যেমন করে তরুণী নারীর মধ্যে কামাবেশ ঘটে, যেমন করে বসন্ত কাল এলেই মলয় বাতাস বইতে থাকে, সেই রকম ভাবে সেই যোগমূর্তি ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষকে আলোড়িত করার জন্য তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। হে ব্রাহ্মণগণ, সেই পরমপুরুষই ক্ষোভিত করেন, আবার তিনিই ক্ষোভিত হন। সৃষ্টি আর প্রলয়ের দ্বারা তিনি প্রধান হয়ে অবস্থান করেন। সেই প্রধান পুরাতন পুরুষ ক্ষুব্ধ হওয়ায় প্রধান পুরুষরূপ মহাবীজের সৃষ্টি হয়েছিল। এঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল মহান আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, প্রবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি ও সংবিৎ। মহৎ থেকে আবার আবির্ভূত হল তিন প্রকার অহংকার—বৈকারিক, তৈজস আর তামস। তামস অহঙ্কারই সৃষ্টির কারণ, অহংকারই অভিমানের আর মননের কর্তা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তাঁর থেকেই সমস্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়েছে।

অহংকার থেকে পাঁচটি ভূত, পাঁচটি তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেবতারা জন্মলাভ করেছেন। এই সমগ্র জগৎই উৎপন্ন হয়েছে মহৎ তত্ত্ব থেকে। অব্যক্ত থেকে মন উৎপন্ন হয়। এটিই হল প্রথম বিকার। তাই মনই সকলের কর্তা, মনই জীবসমূহকে পর্যবেক্ষণ করে। বৈকারিক অহংকার থেকে বৈকারিক সৃষ্টি, তৈজস অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সমূহের জন্ম। বৈকারক থেকে ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হন। তার মধ্যে স্বকীয় গুণের দ্বারা উভয়াত্মক একাদশ মন উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজগণ, ভূতাদি থেকে ভূত-

তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ভূতাদি বিকারপ্রাপ্ত হয়ে শব্দমাত্রের জন্ম দিয়েছে। তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে শব্দের কারণ শূন্যময় আকাশের। আকাশ আবার বিকারপ্রাপ্ত হয়ে স্পর্শমাত্রকে সৃষ্টি করেছে। তার থেকে জন্ম নিয়েছে বায়ু। তার গুণ স্পর্শ। বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করেছে। তার থেকে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়েছে, যার গুণ রূপ। জ্যোতিঃ বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রসতন্মাত্রকে সৃষ্টি করেছে। তার থেকে যে জল উৎপন্ন হয়েছে, তাই রসের আধার। জল বিকারপ্রাপ্ত হয়ে গন্ধতন্মাত্রকে সৃষ্টি করেছে। এর থেকেই জন্ম দিয়েছে সকলের আশ্রয়রূপা সনাতনী পৃথিবী। পৃথিবীর গুণ গন্ধ। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবৃত করে আছে। তাই শব্দ ও স্পর্শ এই দুটি গুণযুক্ত বায়ু তার দ্বারা সৃষ্ট। আবার শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণই রূপে অন্তর্ভূত হয় বলে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণই বহ্নির রয়েছে। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণই আবার রসমাত্রে প্রবেশ করে বলে রসস্বভাব জলের গুণ চারটি। শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস গন্ধমাত্রের অন্তর্গত। তাই পৃথিবীর পাঁচটি গুণ। এজন্যই পৃথিবীকে ভূতগুলির মধ্যে স্থূলা নামে চিহ্নিত করা হয়। ভূতগুলি শান্ত, ঘোর, মূঢ় এবং বিশেষ নামে উক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তারা পরস্পরকে ধারণ করে থাকে। এই সাত মহাত্মা যদি সমবেত না হন, তাহলে পরস্পরের আধারে জীব সৃষ্টি করতে পারেন না। পুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই অব্যক্তের অনুগ্রহে মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সকলে অণ্ড সৃষ্টি করে। বিশেষ থেকে উৎপন্ন জলবুদ্বুদের সঙ্গে একই সময়ে জলে ভাসমান সেই বৃহৎ অণ্ড জন্ম নিয়েছিল। প্রাকৃত অণ্ড যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল, তখন ব্রহ্মার কার্যের কারণ তার মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধ হল। তাই তার নাম হল ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা। ইনিই প্রথম শরীরধারী বলে এঁকেই প্রথম পুরুষ বলা হয়। জীবগণের আদি স্রষ্টা সেই ব্রহ্মাই কেবল সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান ছিলেন। এঁকেই পুরুষ, হংস, প্রধানের পরস্থিত হিরণ্যগর্ভ, কপিল, ছন্দোমূর্তি ও সনাতন বলা হয়। সুমেরু সেই পরমাত্মস্বরূপের উল্বের, পর্বতগুলি জরায়ুর আর সমুদ্রগুলি গর্ভোদকের কাজ করেছিল।

সেই অণ্ডে দেব, অসুর, মানব, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও বায়ু নিয়ে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। দশ গুণ জল সেই অণ্ডের বহির্দেশ আবৃত করেছিল। দশ গুণ তেজ আবার জলের বহির্ভাগকে, আর দশ গুণ বায়ু তেজের বহির্ভাগকে আবৃত করেছিল। এই ভাবে দশ গুণ আকাশ বায়ুকে, ভূতাদি আকাশকে, মহৎ ভূতাদিকে এবং অব্যক্ত মহৎকে আবৃত করেছিল। এই হল সেই লোক যেখানে মহাত্মাগণ আর তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ আপনাতে আপনি থাকেন। তাঁরাই প্রভু, তাঁরাই যোগধর্মা আর তত্ত্বচিন্তক ; রজোগুণ তাঁদের নেই আর সদাই তাঁদের চিত্ত আনন্দিত।

এই প্রাকৃত সাতটি আবরণে অণ্ড আবৃত। হে দ্বিজগণ, এই পর্যন্তই বলতে পারি। কারণ ভগবানের মায়াকে সহজে জানা যায় না। আমি আদি কারণের বীজ কথাটুকুই বললাম। এই বীজ প্রধানের কার্য। বেদ বলেছেন, এ হল প্রজাপতির পরমা মূর্তি। এই সাতটি লোক বলযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডই স্রষ্টার দ্বিতীয় শরীর। সুবর্ণ অণ্ড থেকে জাত হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মাই ভগবানের তৃতীয় রূপ—এও বেদার্থদর্শীরা বলে থাকেন। সেই সর্বব্যাপী সত্তার রজোগুণময় আর এক চতুর্মুখ মূর্তি আছেন—তিনি ভগবান ব্রহ্মা —যিনি জগতের সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত।

বিশ্বের আত্মা সর্বতোমুখ ভুবনেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং সত্ত্বগুণযুক্ত হয়ে সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, আর প্রলয়কালে সকলের আত্মভূত পরমেশ্বর রুদ্রদেব স্বয়ং তমোগুণ আশ্রয় করে জগৎ সংহার করেন। নির্গুণ এবং নিরঞ্জন মহাদেব স্বরূপত এক হলেও সৃষ্টি, পালন ও সংহাররূপ কর্মদ্বারা তিনটি মূর্তিতে প্রকাশিত। গুণভেদে তাঁর একটি, দুটি বা তিনটি মূর্তি। যোগাধীশ ভগবান স্বকীয় লীলার দ্বারা নানা রকম আকৃতি, রূপ ও নামযুক্ত শরীর ধারণ করেন। কখনো বা সেই শরীরকে বিকৃত করেন। আবার ভক্তের হিতকামনায় সেই শরীরকে তিনি গ্রাসও করে থাকেন। তিনি জীব সৃষ্টি করে আবার তাদের গ্রাস করেন। এই গুণগরিমার জন্য ত্রিজগতে তিনি অদ্বিতীয় বলে কথিত হন।

প্রথমে সেই হিরণ্যগর্ভ সনাতন ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি আদি দেব। তাঁর জন্ম নেই—তাই তাঁকে অজ বলা হয়। তিনি সমস্ত প্রজা পালন করেন, তাই তিনি প্রজাপতি। আর সমস্ত দেবতার মধ্যে তিনি মহান—তাই তিনি মহাদেব। তিনি বৃহৎ বলে ব্রহ্মা, সকলের পর বলে পরমেশ্বর। তিনি বশীভূত হন, অথচ তাঁকে বশ করা যায় না, তাই তিনি ঈশ্বর বলে বিশ্রুত। তিনি সর্বত্র গমন করেন বলে ঋষি, সব কিছু সংহার করেন বলে হরি। তাঁর উৎপত্তি নেই আর তিনি সকলের পূর্ববর্তী, তাই তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি নারগণের অয়ন বা আশ্রয় বলে নারায়ণ, সংহারের কর্তা বলে হর এবং বিভু বলে বিষ্ণু। সব কিছু তিনি বিশেষ ভাবে জানেন, তাই তিনি ভগবান। সকলের অবন বা রক্ষা তিনিই করেন। তাই তিনি ওঁ, সব কিছু বিশেষ ভাবে তাঁর জ্ঞানের গোচর বলে তিনি সর্বজ্ঞ। সব কিছুতেই তিনি অনুস্যূত তাই তাঁর নাম সর্ব। তিনি নির্মল, তাই শিব। সমস্ত জীবের মধ্যে বর্তমান বলে তিনি বিভু। সকলের আর্তিনাশন করেন বলে তিনি তারক। আর বেশী কি বলব। এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময়। পরমেশ্বর নানা মূর্তি ধারণ করে লীলা করেন। হে বিপ্রগণ, এই প্রাকৃত সৃষ্টির কথা সংক্ষেপে বললাম। এখন সেই অবুদ্ধিপূর্বিকা ব্রাহ্মী সৃষ্টির কথা বলব।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে প্রাকৃত সর্গ নামে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

কূর্ম বলে চললেন, হে দ্বিজোত্তমগণ, বহু বর্ষের দ্বারাও স্বায়ম্ভুব মনুর কালগণনা করতে পারা যায় না। সমগ্র কালের সংখ্যা দুটি পরার্ধে পরিকল্পিত হয়। সেই হল পরকাল। তার অন্তে পুনরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই স্বায়ম্ভুব মনুর আয়ু তাঁর নিজের হিসাবে একশো বছর। তার পর বা প্রথম অর্ধকে পরার্ধ বলে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পনেরোটি নিমিষে হয় এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে মানুষের একটি অহোরাত্র, ত্রিশ অহোরাত্রে দুই পক্ষ বিশিষ্ট মাস আর ছয় মাসে একটি অয়ন। অয়ন আবার দুটি—দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি, উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন। দিব্য পরিমাণের বারো হাজার বছরে সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি চারটি যুগ হয়। তার বিভাগের কথা বলি শোন।

চার হাজার বছরে সত্যযুগ। চারশো বছরে সত্যযুগের সন্ধ্যা আর চারশো বছরে সন্ধ্যাংশ। ত্রেতা প্রভৃতি যুগের সন্ধ্যা কিন্তু যথাক্রমে তিনশো, দুশো ও একশো বছরে হয়। সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ ছাড়াও সন্ধ্যাংশকাল ছয়শো। সন্ধ্যাংশ ছাড়া ত্রেতা,

দ্বাপর ও কলির কাল হচ্ছে যথাক্রমে তিন, দুই ও এক হাজার বছর। তাহলে সব মিলে হল বারো হাজার বছর। এর সত্তর গুণের কিছু বেশি কালে হয় মন্বন্তর। হে দ্বিজগণ, ব্রহ্মার একটি দিন চোদ্দটি মন্বন্তরের সমান। স্বায়ম্ভুব মনুই আদি। তাঁর পরে রয়েছেন সাবর্ণিক প্রমুখ। পর্বতযুক্তা সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবীকে সেই সব শ্রেষ্ঠ মানুষ পূর্ণ সহস্র যুগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করবেন। একটি মন্বন্তর দ্বারা কল্পে কল্পে সমস্ত অন্তরগুলিও ব্যাখ্যাত হল—এ বিষয়ে সংশয় নেই। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন আর এক কল্পে ব্রহ্মার এক রাত্রি। মনীষীরা বলেন, চার হাজার যুগে এক কল্প হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ, তিনশো ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বছর হয়—এ কথা কল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন। সেই পরিমাণ কালের একশো গুণ কালকে পরার্ধ বলা যায়। তার অন্তে সমস্ত জীবের স্বকীয় উৎপত্তি-কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাবে। সাধুরা তাই একে প্রাকৃত প্রতি-সঞ্চর বলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনেরই প্রকৃতিতে লয় হয়, আবার যথাসময়ে উৎপত্তিও হয়ে থাকে। এই ভাবেই ব্রহ্মা সমস্ত ভূত, বাসুদেব, শঙ্কর সকলেই কালক্রমে সৃষ্টি ও সংহারের বশীভূত হয়ে থাকেন। এই ভগবান অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, কাল, সর্বত্রগামী, স্বতন্ত্র এবং সকলের আত্মস্বরূপ। তাই তিনি মহেশ্বর। এক ভগবান পরমেশ্বর কালই বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র ও বহু নারায়ণ—এই নানা রূপে প্রকাশিত হন। বেদে এ কথা বলা হয়েছে। হে দ্বিজগণ, ব্রহ্মার প্রথম পরার্ধ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন তাঁর দ্বিতীয় পরার্ধ চলেছে। এটি তাঁর অগ্রজ কল্প। যা অতীত হয়েছে তাকে পণ্ডিতেরা পাদ্মকল্প বলেন। সম্প্রতি যে বারাহকল্প চলেছে তার কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করব।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে কালসংখ্যাকথন নামে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কূর্ম বলতে লাগলেন, এই সবই এক সময় একটি বিপুল সমুদ্র ছিল। এর কোন ছেদ ছিল না। এ সবই ঢাকা ছিল অন্ধকারে। বায়ুরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। সে সময়ে কিছুই জানার উপায় ছিল না। পরে সেই সমুদ্রের অবিচ্ছিন্নতা নাশ পেলে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে জন্ম নিলেন সহস্রনেত্র ও সহস্রপাদ ব্রহ্মা। তাঁর বর্ণ সোনার মতো, সহস্রটি তাঁর মাথা। সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষ নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা জলরাশিতে শয়ান ছিলেন। তাই জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কর্তা ব্রহ্মরূপী নারায়ণ সম্বন্ধে এই শ্লোক বলা হয়ে থাকে—

'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥'

অর্থাৎ অপ্ নারা নামে খ্যাত, অপ্ই নরসূনু। সেই অপ্ বা জল তাঁর অয়ন বা আশ্রয়। তাই তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত।

সহস্র যুগ পর্যন্ত নৈশকাল ভোগ করে তিনি রাত্রিশেষে সৃষ্টির জন্যে ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন। এরপর যখন তিনি জানলেন পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না, তখন তার উদ্ধার সাধনের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বরাহের রূপ ধরলেন। জলক্রীড়ায় মনোরম এই বরাহের রূপ। মনের দ্বারাও একে আক্রমণ করা যায় না। এই রূপ বাঙ্ময় আর ব্রহ্মার নাম। এই রূপে তিনি নিজের আধার পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য পাতালে প্রবেশ করে দন্ত দ্বারা ধরিত্রীকে উদ্ধার করলেন। পৃথিবীকে তাঁর দন্তে বিন্যস্ত দেখে জনলোকে স্থিত সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বিপুলকীর্তি হরিকে এই বলে স্তব করতে লাগলেন—হে

দেবদেব, ব্রহ্মণ, পরমেষ্ঠিন, পুরাণপুরুষ, শাশ্বত, অজর, তোমাকে নমস্কার। হে স্বয়ম্ভূ, সৃষ্টির অধিকর্তা, সব কিছুই তুমি জানো। তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমি বিধাতা, পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব, হে বিষ্ণু, তুমি বিশ্বের মূল। হে নারায়ণ, হে দেবদেব, তুমি সকলের হিতকারী। তোমাকে নমস্কার। হে চতুর্মুখ, তুমি ধনু, চক্র, আর অসি ধারণ করে আছ, তুমি সর্বভূতের আত্মা। হে কূটস্থ, তোমাকে নমস্কার। তুমিই বেদরহস্য। বেদের উৎপত্তি তোমার থেকেই। তুমি বুদ্ধ। শুদ্ধ জ্ঞানই তোমার স্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি পঞ্চভূত, আবার তুমিই পঞ্চভূতের আত্মা। তুমি মূলপ্রকৃতি। তুমি মায়ারূপ, তোমাকে নমস্কার। হে বরাহ, তুমি মৎস্যেরও রূপ ধারণ করেছ। যোগের দ্বারাই তোমাকে পাওয়া যায়। হে সংকর্ষণ, তোমাকে নমস্কার। তোমার তিনটি মূর্তি, তিনটি ধাম। দিব্য তোমার তেজ। তুমি সিদ্ধের আরাধ্য। গুণত্রয়ের বিভাগ তুমিই করেছ। তোমাকে নমস্কার। তুমি আদিত্যরূপ, পদ্মসম্ভব। তুমি অমূর্ত হয়েও মূর্ত। হে মাধব, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমারই মধ্যে সব কিছু ধৃত রয়েছে। তুমি এই জগতের পালনকর্তা, তুমিই রক্ষাকর্তা, তুমি শরণ, তুমিই গতি।

বরাহরূপী ঈশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে সনক প্রমুখ ঋষিরা এই ভাবে স্তব করলে বিষ্ণু তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। তারপর সেই পৃথিবীর ধারণকর্তা ধরণীশ্বর পৃথিবীকে ধারণ করে স্বস্থানে আনয়ন করে মনে মনে বরাহ রূপ ত্যাগ করলেন। জলরাশির উপর বিশাল নৌকার মতো অবস্থিতা পৃথিবী তাঁরই দেহের বিস্তারের জন্য নিমজ্জিত হয়ে যান না। তিনি পৃথিবীকে সুসমঞ্জসভাবে স্থাপন করলেন এবং পূর্বে সৃষ্টির সময়ে যে সমস্ত পর্বত দগ্ধ হয়েছিল, তাদের পৃথিবীতে সন্নিবিষ্ট করলেন। এরপর তিনি সৃষ্টির কাজে মন দিলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে পৃথিবী-উদ্ধার নামে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

কূর্ম বলতে লাগলেন, তিনি পূর্বকল্পের মতো সৃষ্টি চিন্তা করলে এমন এক অন্ধকারময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হল যাকে জানাই যায় না। সেই মহাত্মা থেকে জন্ম নিল পাঁচটি অবিদ্যা—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। সেই অভিমানী পুরুষ ধ্যান করলে অন্ধকারাবৃত বীজকুম্ভের মতো আচ্ছাদিত সৃষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। বহির্ভাগে ও অভ্যন্তর ভাগে তার প্রকাশ ছিল না। তা ছিল শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ। তার মধ্যে মুখ্য বৃক্ষ ও পর্বত। এটিকেই মুখ্য সৃষ্টি বলা হয়। প্রভু যখন দেখলেন যে এই সৃষ্টি কার্যসাধনের উপকারক নয়, তখন তিনি অন্য সৃষ্টির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তার ফলে আঁকাবাঁকা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। ঐ স্রোত বক্রভাবে প্রবাহিত হয়েছিল বলে তার নাম 'তির্যক স্রোত।' হে দ্বিজগণ, ঐ সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী পশ্বাদি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু এই সৃষ্টিও কার্যসাধক হল না দেখে তিনি আর এক রকম সৃষ্টি করলেন—তার নাম ঊর্ধ্বস্রোত সাত্ত্বিক দেবসর্গ। সেই সৃষ্টিতে সুখ আর প্রীতির অভাব নেই। তা বহির্ভাগ আর অভ্যন্তরে আবৃত নয়। স্বভাবত সেটি বহির্দেশ ও অন্তর্দেশে প্রকাশিত। এই সৃষ্টির নাম হল 'দেব।' সত্যচিন্তক ভগবান এরপর যখন ধ্যান করলেন, তখন সৃষ্টি অর্বাক-স্রোত সাধক সর্গ। তার প্রকাশ অতি স্পষ্ট। তাতে তমোগুণের উদ্ভব হয়েছে। রজোগুণ রয়েছে বহুল পরিমাণে, আর দুঃখ উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আবার

সত্ত্বগুণও তাতেই রয়েছে। এরই নাম 'মানুষ'। তা দেখে ভগবান অজ অন্য সৃষ্টির কথা চিন্তা করলে উদ্ভব হল ভূতাদি সর্গের। এই ভূতগণ সর্বদাই বস্তুসমূহ সবলে হরণ করে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ করে, ভক্ষণ করতে তারা পটু, তাদের শীল বলে কিছু নেই, তারা অশান্ত। হে দ্বিজগণ, এই পাঁচটি সর্গের কথা বলা হল। এর মধ্যে প্রথম সর্গটি মহতের। সেটি ব্রহ্মার বলে জানবেন। তন্মাত্রের দ্বিতীয় সৃষ্টির নাম ভূতসর্গ। তৃতীয় সর্গের নাম বৈকারিক ঐন্দ্রিয়ক। প্রাকৃত সর্গ এই অবুদ্ধিপূর্বক সম্ভূত হয়েছে। চতুর্থটি মুখ্য সর্গ। তার নাম স্থাবর। যেটি তির্যকস্রোত সেটিই তির্যগযোনি পঞ্চম সর্গ। আর যেটি ঊর্ধ্বস্রোত সেটি ষষ্ঠ দেবসর্গ নামে উক্ত। যেটি অর্বাকস্রোত সেটিই সপ্তম মানুষ সর্গ এবং অষ্টম ভূতাদি হল ভৌতিক সর্গ। নবমটি কৌমার সর্গ। সেটি প্রাকৃত ও বৈকৃত এই দুই প্রকার। প্রথম তিনটি প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্বক সৃষ্ট হয়েছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, মুখ্য সৃষ্টিগুলি কিন্তু বুদ্ধিপূর্বক কৃত হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে মন থেকে নিজের তুল্য প্রভাবশালী সনক, সনাতন, সনন্দন, ক্রতু ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেছিলেন। হে বিপ্রগণ, এঁরা পাঁচজনেই যোগী। তাই পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করে এঁরা ঈশ্বরেই মনোনিবেশ করলেন, সৃষ্টির দিকে মন দিলেন না। তাঁরা জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে এই রকম ঔদাসীন্য দেখালে প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর মায়ায় মোহিত হলেন। তখন জগন্ময় মহামুনি মহাযোগী লোকপ্রিয় নারায়ণ তাঁকে যথাযথ ভাবে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর উপদেশে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা পরম তপস্যায় নিরত হলেন। কিন্তু ভগবান তপস্যা করেও কোন ফল লাভ করতে পারলেন না। এইভাবে যখন দীর্ঘকাল কেটে গেল, তখন তাঁর চিত্তে দুঃখ উপস্থিত হল—দুঃখ থেকে এলো ক্রোধ। তিনি ক্রুদ্ধ হলে তাঁর দুটি চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল। পরমেষ্ঠীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট থেকে তখন জন্ম নিলেন শরণাগতের ত্রাণকারী নীললোহিত মহাদেব। তেজোময় এই ভগবান হলেন সনাতন ঈশ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এঁকে নিজের মধ্যে পরমেশ্বর রূপে প্রত্যক্ষ করেন। ওংকার স্মরণ করে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—আপনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করুন। ভগবানের এই কথা শুনে ধর্মবাহন শঙ্কর শিব নিজের সদৃশ রুদ্রগণকে মনে মনে সৃষ্টি করলেন। তাঁরা শ্মশ্রুমান, নিরাতংক, ত্রিনয়ন আর নীললোহিত। ভগবান ব্রহ্মা তখন তাঁকে বললেন, আপনি জরামরণশীল জীব সৃষ্টি করুন। তার উত্তরে ভগবান ঈশ বললেন, জগৎপতি, আমি জরামরণশীল অমঙ্গলময় জীব সৃষ্টি করতে পারব না। তখন রুদ্রকে নিষেধ করে পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা স্থানাভিমানী ও বাক্যকথনশীল যে সত্তাসমূহের সৃষ্টি করলেন, তাদের কথা শোন।

তিনি প্রথমে জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, বায়ু, পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, লব, কলা কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ এবং স্থানাভিমানী পদার্থগুলিকে সৃষ্টি করলেন। তারপর আবার মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ধর্ম, সংকল্প প্রমুখ সাধকদের সৃষ্টি করলেন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রাণ থেকে দক্ষকে, নেত্রদ্বয় থেকে মরীচিকে, মস্তক থেকে অঙ্গিরাকে, হৃদয় থেকে ভৃগুকে, নেত্র থেকে অত্রিকে, ব্যবসায় থেকে ধর্মকে, সংকল্প থেকে সংকল্পকে, উদান থেকে পুলস্ত্যকে, ব্যান থেকে পুলহকে, অপান থেকে ক্রতুকে এবং সমান থেকে বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট গৃহস্থ ও সাধক। এঁরা মানুষের রূপ ধরে ধর্ম প্রবর্তন করেছেন! এর পর ভগবান ঈশ চার

রকম জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন—দেব, অসুর, পিতৃ ও মানুষ। তাতে তিনি আত্মা যোজিত করলেন। তখন মুক্তাত্মা প্রজাপতির মধ্যে তমোগুণের আবির্ভাব হয়েছিল। তার ফলে তাঁর জঘনদেশ থেকে প্রথমেই অসুর নামক সন্তান জন্ম নিল। পুরুষোত্তম অসুর সৃষ্টি করে যে শরীর পরিত্যাগ করলেন, সেই পরিত্যক্ত শরীর তৎক্ষণাৎ রাত্রিতে পরিণত হল। যেহেতু রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই জীবগণ ঐ সময় নিদ্রা যায়। এর পর প্রজাপতি এমন এক শরীর ধারণ করলেন যেটিতে কেবল সত্ত্বগুণ রয়েছে। তাঁর উজ্জ্বল মুখ থেকে জন্ম নিলেন দেবগণ। তিনি কিন্তু সেই শরীরও ত্যাগ করলেন। তার থেকে সৃষ্ট হল সত্ত্বগুণবহুল দিন। তাই দিবাকালে ধর্মযুক্ত দেবতারা উপাসিত হন। এর পর তিনি কেবল সত্ত্বগুণযুক্ত আর এক শরীর ধারণ করলেন। তার থেকে পিতৃবৎ মাননীয় পিতৃগণ উৎপন্ন হলেন। বিশ্বদর্শী পিতৃগণকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা সেই শরীরও ত্যাগ করলেন। সেই পরিত্যক্ত শরীর তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যাতে পরিণত হল। এই কারণে দিন দেবতাদের, রাত্রি অসুরদের। আর তার মধ্যে স্থিত সন্ধ্যা পিতৃগণের গরীয়সী মূর্তি। তাই দেব, অসুর, সকল মুনি ও মানবগণ যোগের সাহায্যে সেই রাত্রি ও দিনের মধ্য-শরীররূপ সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা করেন। তার পর ব্রহ্মা কেবল রজোগুণবিশিষ্ট আর একটি শরীর ধারণ করলেন। তার থেকেই জন্ম নিল রজোগুণময় মানবসন্তান। প্রজাপতি শীঘ্র সে শরীরও পরিত্যাগ করলেন। আর তৎক্ষণাৎ তা জ্যোৎস্নাতে পরিণত হল। হে বিপ্রগণ, একেই প্রাতঃ সন্ধ্যা বলা হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, এর পর ভগবান ব্রহ্মা আবার তমোগুণ ও রজোগুণ বিশিষ্ট মূর্তি গ্রহণ করলেন। তার থেকে জন্ম নিল সেই রাক্ষসেরা, যাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয় অন্ধকারে। এদের মধ্যে তমোগুণ আর রজোগুণেরই প্রাধান্য। এরা বলশালী আর ব্রহ্মার নিশাচর পুত্র। তার পর রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন সর্প, যক্ষ, ভূত ও গন্ধর্বেরা জন্ম নিল।

এর পর প্রভু আরো সৃষ্টি করলেন। তিনি বয়ঃ থেকে বয়স বা পক্ষী, বক্ষঃপ্রদেশ থেকে অবি, মুখ থেকে অজা, উদর থেকে গোসমূহ, পদদ্বয় থেকে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু ও অন্যান্য মৃগ সৃষ্টি করলেন। তাঁর রোম থেকে ওষধী ও ফলমূল উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর প্রথম মুখ থেকে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ থেকে নির্গত হল যজুঃসকল, ত্রিষ্টুভ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম এবং উক্থ। তাঁর পশ্চিম মুখ থেকে উৎপন্ন হল সামসকল, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র। উত্তর মুখ থেকে সৃষ্ট হল একবিংশতি অথর্বন্, অপ্তোর্যাম, অনুষ্টুভ এবং বৈরাজ ছন্দ। তাঁর গাত্র থেকে উচ্চ ও নীচ পদার্থগুলি উৎপন্ন হয়েছে।

প্রজা সৃষ্টি করতে উৎসুক প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে দেব, ঋষি, পিতৃগণ ও মানুষ—এই চারপ্রকার জীব সৃষ্টি করে ভূত, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, মঙ্গলময় অপ্সরোগণ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প প্রভৃতি এবং অব্যয়, ব্যয়, স্থাবর, জঙ্গম সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে যে যেমন কাজের ভার পেয়েছিল, বার বার সৃষ্ট হয়েও তারা সেই রকম কাজই পেয়ে থাকে। সেই বিচারের দ্বারাই তাদের হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম, অধর্ম, সত্য, অসত্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। এই গুলিই তাদের কাছে রুচিকর। স্বয়ং বিধাতাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ মহাভূতরূপে নানা মূর্তি ধারণ করে ভূতগণকে নিয়োগ করে থাকেন। সেই মহেশ্বরই প্রথমে বেদ থেকে ভূতগণের

নাম, রূপ, প্রাকৃত পদার্থের প্রকাশ প্রভৃতি বিধান করেছেন। অজ প্রজাপতিই রাত্রি-শেষে জাত এই ভূতদের বেদকথিত যত আর্যনাম, যত চিহ্ন, বিভিন্ন পর্যায়ে যত রূপ, যুগে যুগে যত বিভিন্ন ভাব, সব কিছুই প্রদান করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সর্গকথন বিষয়ে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

কূর্ম বলতে লাগলেন, এইভাবে স্থাবর ও জঙ্গম জীব সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এই বুদ্ধিমান জীবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল না দেখে তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্রহ্মা দুঃখিত হয়ে শোক করতে লাগলেন। তারপর তিনি নিশ্চিত উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত বুদ্ধি অবলম্বন করলেন। এর পর স্বভাবগত রজঃ এবং সত্ত্বগুণকে আবৃত করে যে নিয়ামিকা তমোমাত্রা বিদ্যমান ছিল, তাকে তিনি নিজের মধ্যে দেখতে পেলেন। তখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে অবলম্বন করে তিনি তমোগুণকে পরিত্যাগ করলেন। হে দ্বিজগণ, সেই তমঃ ক্ষয় পেলে একটি মিথুন উৎপন্ন হল—অধর্মাচরণ আর অশুভ হিংসা। তারপর ব্রহ্মা তাঁর দীপ্তিমান শরীরকে অন্তর্হিত করলেন। সেই বিরাটপুরুষ, প্রভু, আবার নিজের দেহকে দুভাগে ভাগ করলে অর্ধেক অংশে নারী ও বাকি অর্ধেক অংশে পুরুষ উৎপন্ন হল। সেই নারীর নাম শতরূপা। এই কল্যাণময়ী যোগিনী সৃষ্ট হয়েই স্বকীয় মহিমায় স্বর্গ এবং আকাশ ব্যাপ্ত করলেন। যোগ, ঐশ্বর্য আর শক্তিতে পরিপূর্ণা সেই নারী, জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাঁর করায়ত্ত। আর সেই অব্যক্তজন্মা পুরুষের থেকে জন্ম নিলেন এক বিরাট পুত্র। তিনিই পুরাণ মুনি স্বায়ম্ভুব মনু। দেবী শতরূপা দুরূহ তপস্যা করে বিশ্রুতকীর্তি মনুকে স্বামীরূপে লাভ করলেন। মনুর ঔরসে শতরূপার দুই পুত্র জন্ম নিল। মনুর সেই দুই পুত্রের নাম—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। তাঁর দুটি অনুপমা কন্যাও জন্ম নিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রসূতি নাম্নী কন্যাটিকে তিনি দক্ষকে দিলেন। আর ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি রুচি নিলেন আকূতিকে। আকূতির গর্ভে রুচির সুন্দর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম নিল। তাদের নাম যজ্ঞ ও দক্ষিণা। এই মিথুন থেকেই এই জগতের বৃদ্ধি। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের বারোটি পুত্রের জন্ম হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁদের বামদেব বলে উল্লেখ করা হয়। আর প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চব্বিশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে,—তাদের নাম ভালো করে শুনে রাখো—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা। এঁদের মধ্যে প্রথম তেরোজনকে ধর্ম-বিবাহ করেন, আর অবশিষ্ট এগারোজনকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, পরমধার্মিক ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি ও পিতৃগণ—এই এগারো-জন জ্ঞানী ঋষি। শ্রদ্ধার পুত্রের নাম কাম আর লক্ষ্মীর পুত্রের নাম দর্প। ধৃতির নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ, পুষ্টির লাভ, মেধার শম, ক্রিয়ার দণ্ড ও নয় এবং বুদ্ধির বোধ ও অপ্রমাদ নামে পুত্র জন্মেছিল। লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর ব্যবসায়, শান্তির ক্ষেম, সিদ্ধির সুখ, কীর্তির যশ। এঁরা সকলেই ধর্মের সন্তান। হর্ষ ও দেবানন্দ নামে কামের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধর্মের এই সৃষ্টি অত্যন্ত প্রীতিকর।

অধর্মের ঔরসে হিংসা নিকৃতি ও অনৃত নামে দুই সন্তান লাভ করে। নিকৃতি ও অনৃতের মিলনে উৎপন্ন হয় ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে

দুই কন্যা। এঁরা যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী। ভয় মায়ার গর্ভে ভূতনাশক মৃত্যু নামে সন্তান উৎপাদন করেন। নরকের ঔরসে বেদনা দুঃখ নামে পুত্র লাভ করেন। মৃত্যু থেকে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ নামে সন্তানগণ জন্মলাভ করেন। এঁদের পরিণাম দুঃখ আর এঁদের সকলের মধ্যেই রয়েছে অধর্মের লক্ষণ। এঁদের স্ত্রী বা পুত্র নেই। এঁরা সকলেই ঊর্ধ্বরেতা।

ধর্মনিয়ামক তামস সৃষ্টির বর্ণনা করা হল। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, আমি সংক্ষেপে এই সৃষ্টির কথা বললাম।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে মুখ্যাদিসর্গকথনপ্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, নারদ প্রমুখ মহর্ষিগণ এই সমস্ত কথা শুনে সংশয়াচ্ছন্ন হলেন। তাঁরা বরদাতা বিষ্ণুকে প্রণিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো মুখ্যাদির সর্গের কথা বলেছেন। এখন আমাদের কয়েকটি সংশয়ের সমাধান করে দিন। কি কারণে ভগবান পিনাকপাণি মহাদেব পূর্বে জাত হয়েও অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন? আর জগদীশ্বর ব্রহ্মা তো অণ্ড থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন বলে জানি। তিনি আবার পদ্ম থেকে উৎপন্ন হলেন কি ভাবে? সব কথা আপনি আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

কূর্ম বললেন, হে ঋষিগণ, আপনারা সকলেই শুনুন কি ভাবে অমিতবীর্য শংকর ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন, কি ভাবেই বা ব্রহ্মা পদ্মসম্ভব হতে পারলেন।

অতীত কল্পের শেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এক অতি ভয়ানক অখণ্ড সমুদ্রের আকার ধারণ করেছিল। তখন দেবতা বা ঋষি কারোরই অস্তিত্ব ছিল না। কেবল সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ সহর্ষশীর্ষা, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও সহস্রবাহু হয়ে নির্জন নিরুপদ্রব সমুদ্রের মধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন। এঁকেই মনীষীরা ধ্যান করে থাকেন। ইনি সর্বজ্ঞ, পীতাম্বর, আয়তলোচন, নবজলধরকান্তি। ইনি বিপুলবৈভব, যোগাত্মা, যোগীদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। অকস্মাৎ সুপ্ত ভগবান নারায়ণের নাভিদেশে লীলাচ্ছলে উদ্গত হল এক স্বর্গীয় ত্রিভুবনের সারভূত, আশ্চর্য উজ্জ্বল পদ্ম, এই পদ্মের বিস্তার একশত যোজন। নবোদিত সূর্যের মতো এর দীপ্তি। অতি সুন্দর এর গন্ধ। এই পদ্ম অতি পবিত্র এবং এর মধ্যে রয়েছে কর্ণিকা ও কেশর। এই ভাবেই শেষ-শয়নে নারায়ণ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলে ভগবান হিরণ্যগর্ভ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বের আত্মস্বরূপ-হিরণ্যগর্ভ হস্তদ্বারা সনাতন নারায়ণকে জাগরিত করে তাঁর মায়ায় মুগ্ধ হলেন। তিনি মধুর স্বরে বললেন, হে পুরুষোত্তম, এই ভীষণ জলময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জনহীন স্থানে কে তুমি একাকী শয়ন করে রয়েছ? আমাকে বল। হিরণ্যগর্ভের এই কথা শুনে গরুড়ধ্বজ একটু হেসে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, হে লোকস্রষ্টা, আমাকে পুরুষোত্তম, মহাযোগীশ্বর, সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু নারায়ণদেব বলে জেনো। আমারই মধ্যে সমস্ত জগৎকে, লোকপিতামহরূপে নিজেকে সপ্তসাগর দ্বারা আবৃত পর্বতগুলির সঙ্গে মহাদ্বীপকে প্রত্যক্ষ কর। বিশ্বাত্মা হরি এই কথা বলে উপস্থিত পুরুষকে বিধাতা বলে জেনেও জিজ্ঞাসা করলেন, মহাযোগিন, আপনি কে? তখন বেদনিধি প্রভু ভগবান ব্রহ্মা একটু হেসে অতি মধুর স্বরে কমলনয়ন নারায়ণকে

উত্তর দিলেন, আমি ধাতা এবং বিধাতা। আমি স্বয়ম্ভূ প্রপিতামহ। আমিই চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যেই অবস্থিত।

তখন সত্যপরাক্রম ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শুনে অনুমতি নিয়ে যোগবলে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করলেন। আদি দেব নারায়ণ ব্রহ্মার অভ্যন্তরে ত্রিভুবন, দেবতা, অসুর, মানুষ ইত্যাদি দেখতে পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। গরুড়ধ্বজ ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে পিতামহকে বললেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এখন আপনিও আমার এই শাশ্বত উদরে প্রবেশ করে বিচিত্র জগৎ দর্শন করুন। ব্রহ্মা এই প্রীতিকর বাক্য শুনে বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করে শ্রীপতির উদরে প্রবেশ করলেন, সত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরে প্রবেশ করে ভ্রমণ করতে করতে তাঁর গর্ভস্থ ভুবনগুলিকে দেখতে লাগলেন, কিন্তু তার শেষ পেলেন না। এর পর মহাত্মা জনার্দন শরীরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিলে ব্রহ্মা নাভিকেই দ্বার বলে বুঝতে পারলেন। সুবর্ণ অণ্ড থেকে জাত ব্রহ্মা যোগবলে সেই স্থানে প্রবেশ করে পদ্মেই নিজের রূপকে প্রকাশিত করলেন। পদ্মকোষের মতো কান্তিবিশিষ্ট জগৎকারণ পিতামহ ব্রহ্মা পদ্মেই বিরাজ করতে লাগলেন। তিনি নিজেকেই পরম পদ বিশ্বাত্মা মনে করে জলদগম্ভীর বাক্যে বিষ্ণুকে বললেন, আপনি নিজে জয় করতে ইচ্ছা করলে কি হবে ? আমিই সর্বাপেক্ষা বলশালী। আমাকে পরাজিত করতে পারে, এমন কে আছে ?

ব্রহ্মার এই কথা শুনে গণাশ্রয় অতন্দ্র হরি প্রিয়বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এই মধুর বাণী উচ্চারণ করলেন, আপনি ধাতা এবং বিধাতা, স্বয়ম্ভূ প্রপিতামহ। আমি আপনার প্রতি ঈর্ষার বশে দ্বাররুদ্ধ করি নি। লীলাচ্ছলে করেছিলাম। আপনাকে আবদ্ধ করবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। দেবদেব পিতামহকে আবদ্ধ করার ইচ্ছা কি কারো হতে পারে ? আপনি ভুল বুঝবেন না। আপনি সর্বথা আমার কাছে মাননীয়। হে কল্যাণময়, আমার সব দোষ মার্জনা করুন। হে জগন্ময়, আমার প্রীতির জন্য আপনি পদ্মযোনি নাম গ্রহণ করে আমার পুত্র হোন। তখন ভগবান ব্রহ্মা কিরীটিকে বর-প্রদান করে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন, আপনি সকলের আত্মা, অনন্ত। সর্বজীবের আপনি পরমেশ্বর, সর্বজীবের অন্তরাত্মা ; আপনি পরব্রহ্মস্বরূপ, সনাতন। আমি সর্বলোকের আত্মা, মহেশ্বর। এই সবই আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। আমিই পরম-পুরুষ ব্রহ্মা। আপনি আমি ছাড়া জীবের আর অন্য পরমেশ্বর নেই। আমরা মূলত এক-মূর্তি, কেবল নারায়ণ ও পিতামহ এই দু' প্রকারে ভিন্ন হয়ে আছি। ব্রহ্মার কথা শুনে বাসুদেব বললেন, এই রকম প্রতিজ্ঞাই আপনার বিনাশ ডেকে আনবে। আপনি কি যোগবলে প্রধান পুরুষের ঈশ্বর অব্যয় অধিপতি ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছেন না ? আমি পরমেশ্বরকে জানি। সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যোগীরাও যে মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, আপনি তাঁর শরণ নিন। তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। এই কথায় ব্রহ্মা রুষ্ট হয়ে পুণ্ডরীকাক্ষকে বললেন, 'ভগবন, পরম অব্যয় সেই আত্মাকে জগতের একমাত্র আত্মা ও পরমস্থান ব্রহ্ম বলে আমিও নিশ্চয় জানি। কিন্তু তুমি আর আমি ছাড়া লোকের অন্য পরমেশ্বর নেই, এও ঠিক। তোমার এই বিপুলা নিদ্রাকে ত্যাগ করে নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর। ব্রহ্মার ক্রোধময় বাক্য শুনে বিষ্ণু বললেন, কল্যাণময়, মহাত্মার নিন্দা হয় এমন কথা বলবেন না। আমি সবই জানি। আপনার কাছে মিথ্যা বলছি না। কিন্তু হে ব্রহ্মন, পরমেশ্বরের মায়ায় আপনি আচ্ছন্ন হয়েছেন। আত্মা থেকে সমুদ্ভূত

মায়াই সমস্ত ভেদবুদ্ধির কারণ। যে সুরেশ্বর বিষ্ণু নিজের আত্মাকেও পরম তত্ত্ব বলে জেনেছিলেন, তিনি এই কথা বলে নীরব হলেন। তখন অনন্তাত্মা সর্বভূতেশ্বর মহাদেব ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করবার জন্য আবির্ভূত হলেন। তাঁর ললাটে একটি নয়ন, তিনি জটাজুটধারী, হস্তে তাঁর ত্রিশূল। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। তাঁর গলায় যে মালাটি, সেটি জ্ঞানের বিলাস দিয়ে গাঁথা, চন্দ্র-সূর্য-তারকায় খচিত, পাদমূল পর্যন্ত লম্বিত আর সেটি দেখতে অতি চমৎকার।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা ঈশানকে দেখে মায়াতে নিতান্ত আচ্ছন্ন হয়ে পীতাম্বর হরিকে বললেন, হে জনার্দন, শূল হস্তে নিয়ে ত্রিনয়ন, দীপ্তিমান, অপরিমেয়াত্মা নীলবর্ণ যে পুরুষ আসছেন, তিনি কে? দনুজদলন বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রশ্ন শুনে উজ্জ্বল আকাশে দীপ্যমান দেব ঈশ্বরকে দেখলেন। ভগবান বিষ্ণু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরম ভাব বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলে উঠে দাঁড়িয়ে পিতামহকে বললেন, ইনিই দেবাদিদেব মহাদেব। ইনি স্বয়ং তেজঃস্বরূপ, সনাতন, অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য সর্বজীবের প্রভু, শংকর, শম্ভু, ঈশান, সর্বাত্মা, পরমেশ্বর ভূতগণের অধীশ্বর, যোগী, মহেশ, বিমল, শিব। ইনিই ধাতা, বিধাতা ইনিই প্রকৃতিপুরুষের ঈশ্বর। যতিরা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে এঁকেই দর্শন করেন। এই অদ্বিতীয়, অখণ্ড মহাদেবই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, মহাকাল হয়ে সংহারও করছেন। এই শংকরই সেই সনাতন পুরুষ যিনি পূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করে বেদরাশি দান করেছিলেন। তিনিই এখন আসছেন। হে পিতামহ, জানবেন আমি এঁরই অপরা মূর্তি। বিশ্বের মূল সনাতনী এই মূর্তি বাসুদেব নামে বিখ্যাত। আপনি কি অব্যয় ব্রহ্মাধিপতি যোগেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার দিব চক্ষু হোক যা দিয়ে আপনি সেই পরম তত্ত্বকে দর্শন করনে পারেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছ থেকে দিব্যচক্ষু লাভ করে সম্মুখে স্থিত পরমেশ্বরকে জানতে পারলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মা মহাদেবের শরণ নিলেন। তারপর তিনি ওংকারকে অনুসরণ করে আত্মার দ্বারা আত্মাকে সংরুদ্ধ করলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে মহাদেবের স্তব করলেন। ব্রহ্মার স্তুতিতে পরমেশ্বর মহাদেব যারপরনাই প্রীত হয়ে হাসিমুখে বললেন, বৎস, তুমি আমার সমান তাতে সন্দেহ নেই। তুমি আমার ভক্ত। লোকসৃষ্টির জন্যই পুরাকালে অব্যয়রূপে আমি তোমাকে উৎপন্ন করেছিলাম। তুমিই আত্মা, তুমি আমার দেহসম্ভূত আদিপুরুষ। হে বিশ্বাত্মন, তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমাকে আমি বর দিতে চাই। দেবদেব মহাদেবের কথা শুনে কমলযোনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করে শংকরকে প্রণামপূর্বক বললেন, হে অতীত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর ভগবন মহাদেব, আমার ইচ্ছা আপনি আমার পুত্র হোন অথবা আমার আপনার সদৃশ একটি পুত্র হোক। মহাদেব, আপনার সূক্ষ্ম মায়া আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। আমি যথার্থভাবে জানি না আপনার পরম ভাব কি। হে দেব, আপনিই ভক্তদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সব। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার শরণ নিয়ে আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণতি জানাচ্ছি।

বৃষধ্বজ মহাদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনে পুত্র জনার্দনকে অবলোকন করে বললেন, পুত্রক, তুমি যা চাও তাই পাবে। হে নিষ্পাপ, তুমি দিব্য ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করবে। তুমিই সর্বভূতের আদি কর্তারূপে নিয়োজিত হয়েছ। হে লোকপিতামহ, সেই সমস্ত জীবের ওপর মায়াজাল বিস্তার কর। এই নারায়ণ হরিকে আমার পরমা তনু বলে জেনো।

হে ঈশ্বর, ইনি তোমার যোগক্ষেম বহন করবেন। তুষ্ট পরমেশ্বর এই কথা বলে হাত দিয়ে ব্রহ্মাকে স্পর্শ করে হরির উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার ওপর আমি সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়েছি। হে ভক্ত, হে জগন্ময়, তুমি বর প্রার্থনা কর। তুমি আর আমি অবশ্যই মূলত ভিন্ন নই। তখন বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু মহাদেবের কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন ভাবে বললেন, আমার কাছে এই বরই শ্লাঘনীয় যে আমি যেন পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তোমাতে যেন আমার ভক্তি থাকে। মহাদেব বললেন, তাই হবে। তারপর তিনি বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে আবার বললেন, তুমি সকল কার্যের কর্তা আর আমি অধিদেবতা। এই সব পদার্থেই তুমি আর আমি ব্যাপ্ত হয়ে আছি। এ বিষয়ে সংশয় নেই। তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য। তুমি রাত্রি, আমি দিন। তুমি অব্যক্তা প্রকৃতি, আমি পুরুষ। তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞাতা। তুমি মায়া, আমি ঈশ্বর। তুমি বিদ্যারূপিনী শক্তি, আমি শক্তিমান ঈশ্বর। যে আমি অখণ্ড মহাদেব, সেই তুমি প্রভু নারায়ণ। ব্রহ্মবাদী যোগীরা আমাদের অভিন্নরূপেই দর্শন করেন। হে বিশ্বাত্মন, যোগীরা তোমাকে আশ্রয় না করে আমাকে প্রাপ্ত হবেন না। এই নিখিল জগৎ আর অসুর, মানুষ প্রভৃতিকে পালন কর। তাঁর মায়ায় মোহিত করে ভূতভেদকারী অমেয়শক্তি ভগবান অনাদি এই কথা বলে জন্ম বৃদ্ধি-বিনাশশূন্য অব্যক্তলোকে ফিরে গেলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

কূর্ম বললেন মহেশ্বরদেব অন্তর্হিত হলে পিতামহ ব্রহ্মা আবার বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত বিশাল পদ্মে অবস্থান করতে লাগলেন। এর পর বহু কাল কেটে গেল। একদিন অমিতবিক্রম বিপুল পর্বতাকার অত্যন্ত ক্রোধময় মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর ভ্রাতা বিষ্ণুর কর্ণের অভ্যন্তর থেকে জন্মলাভ করে এসে উপস্থিত হল। জন্মরহিত ব্রহ্মা ত্রিভুবনের শত্রু এই দুই অসুরকে আসতে দেখে নারায়ণকে বললেন, এই অসুর দুজনকে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য। ব্রহ্মার কথা শুনে নারায়ণ জিষ্ণু ও বিষ্ণু নামে দুই পুরুষ সৃষ্টি করে তাঁদের মধু ও কৈটভকে বধ করতে আদেশ দিলেন। হে দ্বিজগণ, নারায়ণের আদেশে সেই দুই পুরুষ মধু ও কৈটভের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এই যুদ্ধে জিষ্ণু কৈটভকে ও বিষ্ণু মধুকে পরাস্ত করলেন। তখন জগন্নাথ হরি স্নেহাবিষ্ট হয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে মধুর বাক্যে বললেন, আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে বহন করলাম। এখন আপনি পদ্ম থেকে অবতীর্ণ হোন। আপনি তেজোময় আর আপনার ভার অতি গুরু। আপনাকে আর বহন করতে পারছি না। তখন বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা পদ্ম থেকে অবতরণ করে বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে অভেদ আশ্রয়-পূর্বক বৈষ্ণবী নিদ্রা প্রাপ্ত হলেন, ঐ সময়ে শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ নামক বিষ্ণু ব্রহ্মার সঙ্গে এইভাবে বৈষ্ণবী নিদ্রায় অভিভূত হয়ে জলমধ্যে শয়ন করেছিলেন।

ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে অনাদি, অনন্ত, অদ্বৈত, স্বকীয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্মাখ্য পরমাত্মার আনন্দ অনুভব করলেন। তারপর প্রভাত হলে যোগাত্মা চতুরানন হয়ে বৈষ্ণব ভাব আশ্রয় করে সেই রকম এক জগৎ সৃষ্টি করলেন। দেবপিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে পূর্বজাত সনন্দ, সনক, ভৃগু, সনৎকুমার ও সনাতনদের সৃষ্টি করলেন। এঁদের শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি বিষয়ে মোহ ছিল না এবং এঁরা পরম বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেছিলেন। তাই এঁরা জ্ঞান-

বিষয়িণী বুদ্ধিকে আশ্রয় করলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সনক প্রমুখকে এই রকম নিরপেক্ষ দেখে পরমেশ্বরী মায়ার দ্বারা লোকসৃষ্টি করার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। তখন পুরাণ-পুরুষ সনাতন বিষ্ণু তাঁর মোহ নাশ করার জন্য নিজের পুত্র ব্রহ্মাকে বললেন, তুমি কি শূলপাণি মহাদেবকে ভুলে গেছ? তুমি যে মহাদেবকে বলেছিলে, শঙ্কর, আপনি আমার পুত্র হোন।

পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা গোবিন্দের কাছ থেকে চেতনা পেয়ে প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় অত্যন্ত দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ তপস্যাতেও ব্রহ্মার কোন ফল হল না। এতে ব্রহ্মার দুঃখ হল আর সেই দুঃখ থেকে উৎপন্ন হল ক্রোধ। ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার দু'চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল। সেই অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম নিল ভূত-প্রেতগণ। ব্রহ্মা এই সব ভূত-প্রেতদের সম্মুখে দেখে নিজেকেই নিন্দা করতে লাগলেন। তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মার মুখ থেকে সহস্র সূর্যের মতো, প্রলয়কালীন অগ্নির তুল্য, প্রাণময় রুদ্রগণ প্রাদুর্ভূত হলেন। তাই দেখে দেবদেব স্বয়ং মহাদেব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা রোদনকারী মহাদেবকে বললেন, কেঁদো না। তিনি আরও বললেন, তুমি রোদন করছ বলে জগতে তোমার নাম হবে রুদ্র। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে আরও সাতটি নাম দিলেন, পত্নী দিলেন, অবিনাশী পুত্রসমূহ দিলেন। আর তাঁদের আটটি স্থানও দিলেন। এই অপর সাতটি নাম হল—ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। আটটি মূর্তি হল—সূর্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সব স্থানে রুদ্রদের ধ্যান ও প্রণাম করে, অষ্টমূর্তি মহাদেব তাঁদের পরম পদ দান করেন। তাঁর আটজন পত্নীর নাম যথাক্রমে সুবর্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক, দীক্ষা আর রোহিণী। আটজন পুত্র হলেন—শনৈশ্চর, শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তক আর বুধ।

এইভাবে ভগবান মহেশ্বর প্রজা, ধর্ম, কাম—এই সবই পরিত্যাগ করে বৈরাগ্য আশ্রয় করলেন। তিনি আত্মাতে আত্মাকে যুক্ত করে অক্ষর ব্রহ্মরূপ পরম অমৃত পান করে ঈশ্বর ভাব অবলম্বন করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন মহাদেবকে জীব সৃষ্টি করতে আদেশ দিলেন, তখন মহাদেব মনের দ্বারা নিজেরই মতো জটাজুটধারী, ভয়শূন্য, নীলকণ্ঠ, পিনাকপাণি, ত্রিশূলহস্ত, উদ্যমযুক্ত, সদানন্দময়, ত্রিনয়ন, অজর, অমর, বন্ধনহীন, মহা-বৃষভবাহন, নিস্পৃহ আর সর্বজ্ঞ কোটি কোটি শত রুদ্র সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা এই নীলকণ্ঠ জরামরণরহিত রুদ্রদের দেখে মহাদেবকে বললেন, দেব, এ রকম জরামরণহীন জীব সৃষ্টি করো না। হে ভূতেশ্বর, অন্য এমন জীব সৃষ্টি কর, যাদের জন্ম মৃত্যু আছে। এ কথা শুনে কামশাসন কপর্দী মহাদেব ব্রহ্মাকে বললেন, আমি সে-রকম সৃষ্টি করতে পারব না। তুমিই বরং ঐরকম বিচিত্র জীব সৃষ্টি কর।

সেই থেকে মহাদেব আর ঐরকম প্রজা সৃষ্টি করলেন না। তিনি সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এই রকম অবস্থানের জন্যই দেবদেব মহাদেবের নাম স্থাণু। মহাদেবের দশটি স্থির বৈশিষ্ট্য সর্বদাই রয়েছে; সেগুলি হল—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, দ্রষ্টৃত্ব, আত্ম সম্বোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব। সেই পিনাকধর মহাদেবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। মানসপুত্রদের সঙ্গে বিদ্যমান মহাদেবকে দেখে ব্রহ্মার চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হল। তিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঈশ্বরের

পরম তত্ত্বকে জেনে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করে জগদীশ্বর মহাদেবকে স্তব করলেন, মহাদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমেশ্বর, তুমি কল্যাণময়, তুমি দেব, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি মহান ঈশ্বর, তুমি শান্ত, জগৎকারণ। তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রকৃতি পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তুমি দেবাধিপতি! তোমাকে নমস্কার। তুমি মহাকাল, রুদ্র, তোমার গ্রাস অতি বিপুল, তুমি শূলধারী, ত্রিনয়ন। তোমাকে নমস্কার। তুমি পিনাকপাণি, ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি জগতের সৃষ্টিকর্তা, বেদবিদ্যার অধীশ্বর, তুমিই বেদবিদ্যা প্রদান কর। তোমাকে নমস্কার। তুমিই বেদরাশির মধ্যে গুপ্তভাবে রয়েছ, তুমি কালনাশক, বেদসারের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, বেদান্তমূর্তি। তোমাকে নমস্কার। তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, যোগীদের গুরু। তোমার শোক নেই। বিবিধ ভূতগণ তোমাকে ঘিরে রয়েছে। তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাধিপতি, আদিদেব, তুমি পরমলোকে রয়েছে। তোমাকে নমস্কার। তুমি দিগম্বর মুণ্ড, তুমিই দণ্ডধারী, অনন্ত, নির্মল, জ্ঞানগম্য। তোমাকে নমস্কার। তুমিই ওঙ্কার তুমিই তীর্থ, তুমি যোগসিদ্ধির কারণ, ধর্ম ও যোগের দ্বারা তোমাকে জানা যায়। তোমাকে নমস্কার। তুমি জগৎ থেকে ভিন্ন, দীপ্তিশূন্য। তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম, তুমিই বিশ্ব, তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তোমাতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, আবার তুমিই মহাকাল হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের লয় সাধন করছ। তুমি প্রকৃতির আদি সৃষ্টি। হে জগন্ময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশ্বর, তুমি মহাদেব, তুমি পরম ব্রহ্ম, মহেশ্বর, পরমেষ্ঠী, তুমি মঙ্গলময়, শান্ত, তুমি পুরুষ, তুমি অবিনাশী পরম জ্যোতি, তুমি মহাকাল, পরমেশ্বর, পুরুষ, অনন্ত, তুমিই প্রকৃতি, আবার তুমিই প্রকৃতির পরিণাম। তুমি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অহংকার। তাই ব্রহ্মসংজ্ঞিত তোমাকে নমস্কার করি। স্বর্গ যাঁর শীর্ষ, পৃথিবী যাঁর চরণ, দিক যাঁর হস্ত, আর আকাশ যাঁর উদর সেই বিরাট পুরুষকে আমি নমস্কার করি। সেই সূর্যমূর্তি পুরুষকে আমি নমস্কার করি, যিনি নিজ তেজে সমস্ত দিক আলোকিত করে এই ব্রহ্মতেজোময় বিশ্বকে সন্তপ্ত করছেন। সেই বহ্নিরূপী পুরুষকেও নমস্কার, যিনি তেজোময় রৌদ্রশরীর দিয়ে দেবগণের হব্য আর পিতৃগণের কব্য অবিরত বহন করে চলেছেন। আর যে চন্দ্ররূপী পুরুষ স্বকীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎকে আলোকিত করছেন, যাঁর আলোক দেবগণেরও উপভোগ্য, তাঁকেও নমস্কার। সেই বায়ুরূপী পুরুষকেও নমস্কার, যিনি মাহেশ্বরী শক্তি, যে শক্তি অন্তরেও বিচরণ করে সমস্ত জীবকে ধারণ করছেন। আত্মাতে অবস্থিত সেই চতুরানন পুরুষকেও নমস্কার, যিনি নিজ নিজ কর্মানুসারে এই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করে চলেছেন। যিনি নিজের আত্মার উপলব্ধি দিয়ে মায়ার সাহায্যে বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে শেষ শয্যায় শয়ন করে আছেন সেই বিষ্ণুমূর্তি পুরুষকে নমস্কার। আর ব্রহ্মাণ্ডের আধার সেই শেষরূপী পুরুষকেও নমস্কার যিনি সর্বদা মস্তকের উপর চতুর্দশ ভুবনের এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন। যিনি মহাপ্রলয়ের শেষে পরমানন্দ আস্বাদ করে অনন্ত মহিমাযুক্ত একমাত্র দিব্য সাক্ষী হয়ে নৃত্য করেন, সেই রুদ্ররূপী পুরুষকে নমস্কার। যিনি নিয়ন্তা ঈশ্বর হয়ে সর্বজীবের মধ্যে রয়েছেন, সেই বিশ্বশরীর সর্বসাক্ষী দেবকে নমস্কার। যে সমস্ত অতন্দ্র যোগী শ্বাসকে জয় করেছেন। যাঁরা সন্তুষ্ট এবং সর্বভূতে সমদর্শী তাঁরা যাঁকে জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করেন, সেই যোগপুরুষকে নমস্কার। পাপশূন্য যোগী যে বিদ্যা বা বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির সাহায্যে অপারতর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ যে মায়াকে উত্তীর্ণ হন, সেই বিদ্যা তোমাতেই রয়েছে। তোমাকে

নমস্কার। যাঁর প্রভাব দ্বারা এই অন্ধকারের পরস্থিত অদ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সেই পরমতত্ত্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। সদানন্দস্বরূপ আধারশূন্য নিষ্ফল পরমাত্মা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

ব্রহ্মা মহাদেবের প্রতি একনিষ্ঠ চিত্ত হয়ে এইভাবে সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবকে স্তব করে গান করতে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হয়ে রইলেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাকে দান করলেন দিব্য আর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বরযোগ, ব্রহ্মসদ্ভাব এবং বৈরাগ্য। প্রণতজনের আর্তিনাশকারী মহাদেব তাঁর সুন্দর দুটি করতল দিয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে ধারণ করে ঈষৎ হেসে বললেন, ব্রহ্মণ, তুমি বর চেয়েছিলে যেন আমাকে পুত্ররূপে পাও। তোমার সে আকাঙ্ক্ষা আমি পূর্ণ করেছি। এখন তুমি নানা প্রকার জগৎ সৃষ্টি কর। ব্রহ্মণ, আমি অখণ্ড পরমেশ্বর। কিন্তু সৃজন, পালন, সংহার— এই তিন গুণের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর—এই তিন মূর্তিতে বিভিন্ন হয়েছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সৃষ্টির জন্য তোমাকে আমার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে নির্মাণ করেছি। বিষ্ণুকে নির্মাণ করেছি বাম অঙ্গ থেকে। সেই দেবাদিদেব শম্ভুর হৃদয় থেকে রুদ্র উৎপন্ন হয়েছেন। কিংবা এও বলতে পারো যে আমিই তাঁর শ্রেষ্ঠ তনু। ব্রহ্মণ, শঙ্কর যদিও অদ্বিতীয় তবু স্বেচ্ছায় তিনি সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের কারণরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মূর্তিতে নিজ শরীর বিভক্ত করেছেন। অন্যান্য সব মূর্তি আমার মায়ার দ্বারা নির্মিত। আর যে মহাদেব এই সমস্ত মূর্তির নিয়ন্তা, তিনি স্বভাবতই অরূপ, অদ্বৈত ও আত্মস্থ। এই মহাদেবের যে পরমা তনু—তা ত্রিমূর্তি, ত্রিলোচনা, যোগিগণের সর্বদা শান্তিদায়িনী। হে পিতামহ, জেনো আমিই সেই মাহেশ্বরী পরমা তনুর শ্রেষ্ঠ মূর্তি। এই মূর্তির রয়েছে নিত্য ঐশ্বর্য, নিত্য বিজ্ঞান, নিত্য তেজ আর নিত্য যোগ। আমি তমোগুণকে আশ্রয় করে মহাকালরূপে জগৎকে ধ্বংস করি। কেউ মনে মনেও আমাকে পরাজিত করতে পারে না। হে নিষ্পাপ, হে পদ্মসম্ভব, যে যে সময়ে আমার ধ্যান করবে, সে সেই সময়েই আমাকে কাছে পাবে। পিতা ব্রহ্মাকে এই সব কথা বলে এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মহাদেব পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে সেই ক্ষণেই অন্তর্হিত হলেন। তখন নারায়ণ নামক ভগবান প্রজাপতি যোগবলে পূর্বের মতো বিবিধ জগৎ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ব্রহ্মা যোগের সাহায্যে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠকে সৃজন করেছিলেন। এই জন্য পুরাণে এঁদের নব ব্রহ্মা বলা হয়। এঁরা সকলেই ব্রহ্মার তুল্য সাধক ও ব্রহ্মবাদী। সংকল্প, ধর্ম; যুগধর্ম ও সমস্ত স্থানাভিমানীদের কথা পূর্বেই তোমাদের কাছে যথারীতি বলা হয়েছে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে রুদ্রসৃষ্টি নামে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

কূর্ম বললেন, দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মা মরীচি প্রমুখ ঋষিদের এই ভাবে সৃষ্টি করে সেই সমস্ত মানসপুত্রের সঙ্গে তীব্র তপস্যায় রত হলেন। এই তপস্যার সময়ে ব্রহ্মার মুখ থেকে কালাগ্নি উদ্ভূত, ত্রিশূলধারী, ত্রিনয়ন, অতি ভীষণাকৃতি অর্ধনারীশ্বরের রূপ ধরে রুদ্র প্রাদুর্ভূত হলেন। সেই মূর্তিকে দর্শন করতে ক্লেশ হয়। তা দেখে ব্রহ্মা ভীত হয়ে বললেন, নিজেকে বিভক্ত করে ফেল। তারপর তিনি অন্তর্হিত হলেন। তাঁর কথায় রুদ্র

নিজেকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। সেই পুরুষ অংশটিকে আবার এগারোটি ভাগে ভাগ করলেন। বিপ্রগণ, এই এগারোজন পুরুষই কপালীশ প্রমুখ একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত। তাঁরা ত্রিজগতের ঈশ্বর এবং দেবকার্যে নিয়োজিত। প্রভু দেব নিজের সৌম্য-অসৌম্য, শান্ত-অশান্ত, সিত-অসিত রূপের সঙ্গে নারী অংশকেও নানা ভাগে ভাগ করলেন। হে বিপ্রগণ, রুদ্রের অংশস্বরূপ এই বিভূতিই লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত। ঈশ্বরী শংকরী এই সমস্ত শক্তির সাহায্যে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন।

এই ভাবে বিভাগ করার পর ঈশানী নিজের অংশকে পৃথক করলেন এবং মহাদেবের আদেশে সেই মূর্তিতে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তুমি দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্মার আদেশে তিনি দক্ষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন। দক্ষ আবার ব্রহ্মার আদেশে সেই সতী দেবীকে রুদ্রের কাছে উৎসর্গ করলেন। শূলধারী রুদ্রও স্বকীয় শক্তিস্বরূপা দক্ষকন্যাকে গ্রহণ করলেন। প্রজাপতির আদেশে কালক্রমে হিমালয়ের ঔরসে মেনার গর্ভে কন্যারূপে পরমেশ্বরীর জন্ম হল। পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ও দেবগণ, ত্রিভুবন ও নিজের মঙ্গল কামনায় পার্বতীকে রুদ্রের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। এঁকেই দেবাসুরের শ্রদ্ধেয়া শংকরের অর্ধাঙ্গিনী মহেশ্বরী হৈমবতী বলে জানবে। ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ও মুনিগণ তাঁর অতুল প্রভাবের কথা বলে থাকেন এবং শংকরও স্বয়ং হরি ও দেবীর প্রভাবের কথা অবগত আছেন। হে বিপ্রগণ, কি ভাবে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন আর কি ভাবেই বা অমিততেজা শংকর ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করেছিলেন, সে-কথা তোমাদের কাছে বলা হল।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দেবী-অবতার প্রসঙ্গে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, তখন মুনিরা কূর্মরূপী বিষ্ণুর এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যে শিবশক্তি প্রথমে দাক্ষায়ণী সতী হয়ে পরে হিমালয়কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই ভগবতী, শংকরার্ধশরীরিণী দেবীর পরিচয় কী? আপনি এর বৃত্তান্ত আমাদের বলুন।

মহাযোগী কূর্মরূপী পুরুষোত্তম মুনিদের কথা শুনে নিজ পরমপদ ধ্যান করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, পুরাকালে অত্যন্ত মনোরম মেরুপৃষ্ঠে বসে পিতামহ ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত বলেছিলেন। এ হল অতি গুহ্য এক রহস্য তত্ত্ব। এটি সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যায়ীদের কাছে পরম সাংখ্য। এটি সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞান আর সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন মানুষের কাছে এ তত্ত্ব মুক্তির দূত। যিনি জ্ঞানস্বরূপা, অতিলালসা, ব্যোমনাম্নী মাহেশ্বরী শক্তি, তাঁকেই হৈমবতী বলে জেনো। তিনি মঙ্গলময়ী, সমস্ত পদার্থে নিশ্চিতরূপে অনুস্যূতা, অনন্তা, ত্রিগুণাতীতা, অবয়বরহিতা, তিনি অদ্বিতীয়া—অথচ তাঁর বহু বিভাগ। ব্রহ্মা, তেজোরূপে তিনি পরমব্রহ্মে সংস্থিতা। সূর্যের ভাস্বর দীপ্তির মতো তাঁর স্বাভাবিক প্রভা। সেই মাহেশ্বরী শক্তি এক হয়েও উপাধিবশত অনেক। তিনিই পরাবররূপে মহাদেবের কাছে লীলা করেন। এই যা কিছু, সে সবই দেবী করছেন। এই জগৎ তাঁরই কার্য।

পণ্ডিতেরা বলেন ঈশ্বরের কার্য বা কারণ নেই। হে মুনিবরগণ, শুনুন। সেই দেবীর অধিষ্ঠানবশে চারটি শক্তি রয়েছে। এরা স্বরূপেই সংস্থিত। এদের নাম শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি। তাই দেব পরমেশ্বরকে চতুর্ব্যূহ বলা হয়। পরমেশ্বর এই প্রধানা দেবীর সংসর্গেই স্বকীয় আত্মানন্দ অনুভব করেন। মহাদেব চারটি বেদে চার রকম ভাবে অবস্থিত। দেবীর যে মহৎ অনুপম ঐশ্বর্য তা অনাদি বলে সিদ্ধ। তাই পরমাত্মা রুদ্রের সঙ্গে যোগ হলে ইনি অনন্তা নামে অভিহিত হন। এই সেই দেবী, যিনি সমস্ত জীবের প্রেরণাদাত্রী, সকলের ঈশ্বরী। আর ভগবান মহেশ্বরই মহাকাল ও হরিপ্রাণ। এ-সব কথা মুনিরা বলেন। সেই দেবের মধ্যেই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অনুস্যূত হয়ে আছে। বেদজ্ঞ মুনিরা বলেন দেব হরই কালাগ্নি। কালই প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেন, আবার কালই তাদের সংহার করেন। তাই সকলেই কালের বশ। কিন্তু কালকে কেউ বশ করতে পারে না। এই কালই প্রধান তত্ত্ব, পুরুষ, মহৎ তত্ত্ব, আত্মা ও অহঙ্কার। যোগী কালই অন্য সমস্ত তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সমস্ত জগৎ তাঁরই মূর্তি, তাঁর শক্তির নামই মায়া। তাই পুরুষোত্তম মায়াবী মহাদেব জগতের ভ্রম উৎপাদন করে চলেছেন। সেই সনাতনী মায়ারূপিণী শক্তিই সর্বদা মায়াবী মহেশ্বরের বিশ্বরূপ প্রকাশ করছেন।

জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর প্রাণশক্তি নামে সেই দেবের আরো তিনটি মুখ্য শক্তি রয়েছে। হে বিপ্রবরগণ, যদিও মায়া সমস্ত শক্তিরই এক একজন অধিষ্ঠাতা সৃষ্টি করেছেন, তথাপি মায়া নিজে অনাদি ও অবিনশ্বর। সর্বশক্তি যাঁর মধ্যে সমবেত হয়েছে, সেই মায়াকে নিবারণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তাকে বিনাশও করা যায় না। প্রভু মহাকাল সর্বশক্তি, ঈশ্বর, মায়াবী এবং প্রলয়কারী। কালই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, কালই সব কিছু ধ্বংস করছেন আবার কালই বিশ্বকে পালন করছেন। তাই এই জগৎ কালেরই বশ। মায়া যখন অনন্ত জগদীশ্বর কালস্বরূপ দেবাদিদেব পরমেষ্ঠী প্রভু শম্ভুর সান্নিধ্যে আসেন তখনই তাঁদের প্রকৃতি ও পুরুষ, কিংবা মায়া ও মায়াবী— এই ভাবে প্রভেদ হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুত সেই অখণ্ড মঙ্গলময়ী মায়াই অদ্বিতীয়া হয়ে সকলের মধ্যে রয়েছেন, আর এই অনন্ত শিবাই শক্তি, শিবই শক্তিমান বলে কীর্তিত হন। এঁরা অদ্বৈত। অন্য সমস্ত শক্তি ও শক্তির অধিষ্ঠাতা শিব-শক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন। পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে শক্তি ও শক্তিমানের এই রকম ভেদ কল্পনা করে থাকেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা শক্তি ও শক্তিমানকে অভিন্নরূপেই অনুভব করে থাকেন। ব্রহ্মবাদীরা পুরাণে বলেছেন যে গিরিজা দেবী সর্বশক্তিস্বরূপা আর শঙ্কর সেই শক্তির আধার, এই এঁদের ভেদ। পতি মহেশ্বরের প্রতি অনন্যচিত্তা বিশ্বেশ্বরী দেবী ভোগ্যা এবং নীললোহিত ভগবান কপর্দী ভোক্তা বলে কথিত আছে। সাধুগণের বিচারে আবার কন্দর্পারি বিশ্বেশ্বর ভগবান শঙ্কর মননকারী এবং ঈশানী তাঁর মননের বিষয়। হে বিপ্রগণ, সর্ববেদেই তত্ত্বদর্শী মুনিরা এইভাবে নিরূপণ করেছেন যে সব কিছুই শক্তি ও শক্তিমান থেকে উদ্ভূত। বেদান্তাদি সমস্ত দর্শনে ব্রহ্মবাদী মুনিরা দেবীর এই অনুপম স্বর্গীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। যোগীরা মহাদেবীর সেই পরমপদের সন্ধান পেয়েছেন যা অদ্বিতীয় সর্বগত, অতি সূক্ষ্ম, কূটস্থ, অচল আর শাশ্বত। যোগীরা দেবীর এই পরমপদকে আনন্দস্বরূপ, অক্ষর, ব্রহ্মস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও অখণ্ডরূপে দর্শন করেন। সেই পদ পরমেরও পরম তত্ত্ব, নিত্য, কল্যাণময়, অবিচল, অনন্ত, প্রকৃতিতে লীন, শুভ, উপাধিশূন্য, শুদ্ধ, নির্গুণ, অদ্বৈত। সেটিই আত্মজ্ঞানের বিষয়। যাঁরা পরমানন্দের

সন্ধান করেন, তাঁদের তিনি ধাত্রী ও বিধাত্রী। ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকায় তিনি সমস্ত সংসারতাপকে বিনষ্ট করেন। তাই যিনি বিমুক্তি লাভ করতে উৎসুক, তিনি সর্বভূতাত্মা শিবাত্মিকা পার্বতীকে আশ্রয় করবেন। অতি কঠিন তপশ্চর্যার পর সর্বাণীকে কন্যারূপে পেয়েও হিমবান মেনার সঙ্গে পার্বতীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

নিজেরই অভিলাষ থেকে যিনি উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মনোরমা পার্বতীকে দেখে হিমবানের পত্নী মেনা হিমবানকে বললেন, রাজন, আমাদের তপস্যার ফলে সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য উৎপন্না পদ্মের মতো সুন্দরাননা এই কন্যাটিকে দেখুন। তখন হিমবান সেই দেবীকে দেখলেন, নবোদিত সূর্যের মতো তাঁর রূপ, তিনি জটামণ্ডিতা। তাঁর চারটি মুখ, তিনটি চোখ, তীব্র তাঁর স্পৃহা। অষ্টভুজা এই দেবী আয়তনয়না, চন্দ্রকলায় সজ্জিতা। ইনি সমস্ত গুণ থেকে নির্মুক্ত, অথচ সাক্ষাৎ গুণময়ী রূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর মধ্যে সৎ অথবা অসৎ কোনটিরই প্রকাশ নেই। তাঁকে দেখে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে হিমবান প্রণাম করলেন এবং তাঁর তেজে অভিভূত ও ভীত হয়ে হাত জোড় করে সেই পরমেশ্বরীকে বললেন, হে বিশালাক্ষি, হে অর্ধেন্দুভূষিতে দেবি, তুমি কে ? আমি তোমাকে জানি না। তুমি যথার্থরূপে নিজের পরিচয় দাও। তখন যোগীদের অভয়দাত্রী পরমেশ্বরী হিমবানের কথা শুনে বললেন, আমাকে মহেশ্বরে সমাশ্রিতা পরমাশক্তি বলে জেনো। অনন্যা, অনশ্বরা, অদ্বিতীয়া এই আমাকেই মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেখে থাকেন। আমি সর্বজীবের আত্মা, সর্বপ্রকার কল্যাণ আমার মধ্যেই রয়েছে, নিত্য ঈশ্বর-বিষয়ক যে পরম জ্ঞান, তাই আমার রূপ, সমস্ত কার্যের আমি প্রেরণাদাত্রী। আমার অন্ত নেই, আমার মহিমার সীমা নেই। জীবগণকে আমি সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম, তুমি আমার বিভূতিসম্পন্ন রূপ দেখ।

এই কথা বলে হিমবানকে জ্ঞান দান করে দেবী নিজের পরমেশ্বর দিব্যরূপ তাঁকে দেখালেন, কোটি সূর্যের মতো সেই রূপের দীপ্তি, তা যেন তেজের বিম্বস্বরূপ, অসংখ্য অগ্নিশিখা তাতে নিশ্চল হয়ে আছে। শত শত কালানলের মতো তা ভীষণ, দ্রংষ্ট্রাকরাল, দুর্ধর্ষ, জটাজুটমণ্ডিত। সেই দেবীর হস্তে ত্রিশূল আর বরদমুদ্রা। তিনি অতিভীষণা হয়েও সৌম্যকান্তি, সুন্দরবদনা। তাঁর মধ্যে অনন্ত বিস্ময় লুকিয়ে আছে। তাঁর মস্তকে চন্দ্র শোভা পাচ্ছে, কোটি চন্দ্রের প্রভার মতো তাঁর লাবণ্য। তাঁর মাথায় মুকুট, হাতে গদা, পায়ে নূপুর, গলায় দিব্যমালা, পরণে দিব্যবস্ত্র। তিনি দিব্য সৌরভে অনুলিপ্ত। শঙ্খচক্রধারী এই কমনীয় মূর্তি ত্রিনয়না আর ব্যাঘ্রচর্মধারী। এই রূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও যেমন ব্যাপ্ত, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেও অনুস্যূত। এই রূপ সকলের বহিস্থ আবার অভ্যন্তরস্থ। এই রূপ সর্বশক্তিময়, শুভ্রবর্ণ, সর্বরূপধারী আর সনাতন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও যোগিশ্রেষ্ঠগণ এঁর পাদপদ্মে নিত্য প্রণাম করেন। হিমবান দেবীর যে রূপ দেখলেন, তার সমস্ত দিকেই হস্ত, সমস্ত দিকেই পদ, সমস্ত দিকেই চক্ষু আর সমস্ত দিকেই মস্তক ও মুখ, হিমবান আরও দেখলেন যে, এই রূপে দেবী সমস্ত পদার্থ আবৃত করে রয়েছেন। পর্বতরাজ দেবীর এহেন মাহেশ্বরী রূপ দর্শন করে ভীত অথচ পুলকিত চিত্তে পরমাত্মায় আত্মসংযোগ করলেন, তারপর ওঙ্কার উচ্চারণ করে পরমেশ্বরীকে এক হাজার আটটি নামে স্তব করলেন।

হিমবান বললেন, শিবা, উমা, পরমশক্তি, অনন্তা, নিষ্ফলা, অমলা, শান্তা, মাহেশ্বরী, নিত্যা, শাশ্বতী, পরমাক্ষরা, অচিন্ত্যা, কেবলা, অনন্তা, শিবাত্মা, পরমাত্মা, অনাদি,

অব্যয়া, শুদ্ধা, দেবাত্মা, স্বর্গা, অচলা, একা, অনেকবিভাগস্থা, মায়াতীতা, সুনির্মলা, মহামাহেশ্বরী, সত্যা, মহাদেবী, নিরঞ্জনা, কাষ্ঠা, সর্বান্তরস্থা, চিৎশক্তি, অতিলালসা, নন্দা, সর্বাত্মিকা, বিদ্যা, জ্যোতিরূপা, অমৃতা, অক্ষরা, শান্তি, সর্বপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, অমৃতপ্রদা, ব্যোমমূর্তি, ব্যোমালয়া, ব্যোমাধারা, অচ্যুতা, অমরা, অনাদিনিধনা, অমোঘা, কারণাত্মা, কলাকুলা, স্বতঃপ্রথমজা, অমৃতনাভি, আত্মসংশয়া, প্রাণেশ্বরপ্রিয়া, মাতা, মহামহিষঘাতিনী, প্রাণরূপা, প্রধানপুরুষেশ্বরী, সর্বশক্তি, কলাকারা, চন্দ্রের মহিমাস্পদা জ্যোৎস্না, সর্ব-কার্যনিয়ন্ত্রী, সর্বভূতেশ্বরী, সংসারযোনি, সকলা, সর্বশক্তিসমুদ্ভবা সংসারপোতা, দুর্বারা, দুর্নিরীক্ষ্যা, দুরাসদা, প্রাণশক্তি, প্রাণবিদ্যা, যোগিনী, পরমাকলা, মহাবিভূতি, দুর্ধর্ষা, মূলপ্রকৃতিসম্ভবা, অনাদি-অনন্তবিভবা, পরমপাপনাশিনী, স্বর্গস্থিত্যন্তকরণী, সুদুর্বাচ্যা, দুরত্যয়া, শব্দযোনি, শব্দময়ী, নাদাখ্যা, নাদবিগ্রহা, অনাদি, অব্যক্তগুণা, মহানন্দা, সনাতনী, আকাশযোনি, যোগস্থা, মহাযোগেশ্বরেশ্বরী, মহামায়া, সুদুষ্পারা, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী, প্রধানপুরুষাতীতা, প্রধানপুরুষাত্মিকা, পুরাণা, চিন্ময়ী, পুরুষ-গণের আদিপুরুষরূপিণী, ভূতান্তরস্থা, কূটস্থা, মহাপুরুষসংজ্ঞিতা, জন্মমৃত্যুজরাতীতা, সর্বশক্তিসমন্বিতা, ব্যাপিনী, অনবচ্ছিন্না, প্রধানানুপ্রবেশিনী, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, অব্যক্তলক্ষণা, মলবর্জিতা, অনাদিমায়াসম্ভিন্না, ত্রিতত্ত্ব, প্রকৃতিগ্রহা, মহামায়াসমুৎপন্না, তামসী, পৌরুষী, ধ্রুবা, ব্যক্তাত্মিকা, কৃষ্ণা, অব্যক্তাত্মিকা, রক্তা, শুক্লা, প্রসূতিকা, অকার্যা, কার্যজননী, নিত্য-প্রসবধর্মিণী, সর্গপ্রলয়নির্মুক্তা, সৃষ্টিস্থিত্যন্তধর্মিণী, ব্রহ্মগর্ভা, চতুর্বিংশা, পদ্মনাভা, অচ্যুতাত্মিকা, বৈদ্যুতী, শাশ্বতী, যোনি, জগন্মাতা, ঈশ্বরপ্রিয়া, সর্বাধারা, মহারূপা, সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতা, বিশ্বরূপা, মহাগর্ভা, বিশ্বেশের ইচ্ছানুবর্তিনী, মহীয়সী, ব্রহ্মযোনি, মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা, মহাবিমানমধ্যস্থা, মহানিদ্রা, আত্মহেতুকা, সর্বসাধারিণী, সূক্ষ্মা, অবিদ্যা, পারমার্থিকী, অনন্তরূপা, অনন্তস্থা, পুরুষমোহিনী, দেবী, অনেকাকারসংস্থানা, কালত্রয়বিবর্জিতা, ব্রহ্মজন্মা, হরিমূর্তি, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা, ব্রহ্মেশবিষ্ণুজননী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, ব্যক্তা প্রথমজা, ব্রাহ্মী, মহতী, ব্রহ্মরূপিণী, বৈরাগ্যৈশ্বর্যধর্মাত্মা, ব্রহ্মমূর্তি, হৃদিস্থিতা, অপাংযোনি স্বয়ম্ভূতি, মানসী, তত্ত্বসম্ভবা, ঈশ্বরাণী, সর্বাণী, শঙ্করার্ধ-শরীরিণী, ভবানী, রুদ্রাণী, মহালক্ষ্মী, অম্বিকা, মহেশ্বরসমুৎপন্না, ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা, সর্বেশ্বরী, সর্ববন্দ্যা, নিত্যমুদিতমানসা, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা, শঙ্করেচ্ছানুবর্তিনী, ঈশ্বরার্ধাসনগতা, মহেশ্বরপতিব্রতা, সকৃদ্বিভাতা, সর্বার্তিসমুদ্রপরিশোষিণী, পার্বতী, হিমবৎপুত্রী, পরমানন্দদায়িনী, গুণাঢ্যা, যোগজা, যোগ্যা, জ্ঞানমূর্তি, বিকাশনী, সাবিত্রী, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী, অনন্তবক্ষঃস্থলস্থিতা, সরোজনিলয়া, গঙ্গা, যোগনিদ্রা, অসুরার্দিনী, সরস্বতী, সর্ববিদ্যা, জগজ্জ্যেষ্ঠা, সুমঙ্গলা, বাগ্দেবী, বরদা, অবাচ্যা, কীর্তি, সর্বার্থ-সাধিকা, যোগীশ্বরী, ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা, সুশোভনা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ধর্মবিদ্যা, আত্মভাবিতা, স্বাহা, বিশ্বম্ভরা, সিদ্ধি, স্বধা, মেধা, ধৃতি, শ্রুতি, নীতি, সুনীতি, সুকৃতি, মাধবী, নরবাহিনী, পূজ্যা, বিভাবতী, সৌম্যা, ভোগিনী, ভোগশায়িনী, শোভা, বংশকরী, লোলা, মানিনী, পরমেষ্ঠিনী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, রম্যা, সুন্দরী, কামচারিণী, মহানুভাবা, সত্ত্বস্থা, মহামহিষমর্দিনী, পদ্মমালা, পাপহরা, বিচিত্রমুকুটাঙ্গদা, কান্তা, চিত্রাম্বরধরা, দিব্যাবরণভূষিতা, হংসাখ্যা, ব্যোমনিলয়া, জগৎসৃষ্টিবিবর্ধিনী, নিয়ন্ত্রী, যন্ত্রমধ্যস্থা, নন্দিনী, ভদ্রকালিকা, আদিত্যবর্ণা, কৌমারী, ময়ূরবরবাহনা, বৃষাসনগতা, গৌরী, মহাকালী, সুরার্চিতা, অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রী, পদ্মগর্ভা, বিবাহনা, বিরূপাক্ষী, লেলিহানা, মহাসুর-

বিনাশিনী, মহাফলা, অনবদ্যাঙ্গী, কামরূপা, বিভাবরী, বিচিত্ররত্নমুকুটা, প্রণতার্তিপ্রভঞ্জনী, কৌশিকী, কর্ষণী, রাত্রি, ত্রিদশার্তিবিনাশিনী, বহুরূপা, স্বরূপা, বিরূপা, সুরূপা, রূপবর্জিতা, ভক্তার্তিশমনী, ভব্যা, ভবতাপবিনাশিনী, নির্গুণা, নিত্যবিভবা, নিঃসারা, নিরপত্রপা, তপস্বিনী, সামগীতি, ভবাঙ্কনিলয়ালয়া, দীক্ষা, বিদ্যাধরী, দীপ্তা, মহেন্দ্রাদ্রিনিপাতিনী, সর্বাতিশায়িনী, বিদ্যা, সব সিদ্ধিপ্রদায়িনী, সর্বেশ্বরপ্রিয়া, তার্ক্ষী, সমুদ্রান্তরবাসিনী, অকলঙ্কা, নিরাধারা, নিত্যসিদ্ধা, নিরাময়া, কামধেনু, বৃহদ্গর্ভা, ধীমতী, মোহনাশিনী, নিঃসঙ্কল্পা, নিরাতঙ্কা, বিনয়া, বিনয়প্রিয়া, জ্বালা-মালাসহস্রাঢ্যা, দেবদেবী, মনোময়ী, মহাভগবতী, ভর্গা, বাসুদেবসমুদ্ভবা, মহেন্দ্রোপেন্দ্র ভগিনী, ভক্তিগম্যা, পরাবরা, জ্ঞানজ্ঞেয়া, জরাতীতা, বেদান্তবিষয়া, গতি, দক্ষিণা, দহনা, দান্তা, সর্বভূতনমস্কৃতা, যোগমায়া, বিভাগজ্ঞা, মহামোহা, গরীয়সী, সন্ধ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়াদির দ্বারা সকলের উৎপত্তিকারণভূতা, বীজাঙ্কুরসমুদ্ভূতি, মহাশক্তি, মহামতি, ক্ষান্তি, প্রজ্ঞা, চিতি, সংবিৎ মহাভোগীন্দ্রশায়িনী, বিকৃতি, শাঙ্করী, শান্তি, গণগন্ধর্বসেবিতা, বৈশ্বানরী, মহাশালা, দেবসেনা, গুহপ্রিয়া মহারাত্রি, শিবানন্দা, শচী, দুঃস্বপ্ননাশিনী, ইজ্যা, পূজ্যা, জগদ্ধাত্রী, দুর্বিনেয়া, সুরূপিণী, গুহাম্বিকা, গুণোৎপত্তি, মহাপীঠা, মরুৎসুতা, হব্যবাহান্তরাগাদি, হব্যবাহসমুদ্ভবা, জগদ্যোনি, জগন্মাতা, জন্ম-মৃত্যু-জরাতিগা, বুদ্ধি, মহাবুদ্ধিমতী, পুরুষান্তরবাসিনী, তরস্বিনী, সমাধিস্থা, ত্রিনেত্রা, দিবিসংস্থিতা, সর্বেন্দ্রিয়মনোমাতা, সর্বভূতহৃদিস্থিতা, সংসারতারিণী, বিদ্যা, ব্রহ্মবাদিমনোলয়া, ব্রহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মভূতা, ভবারণী, হিরণ্ময়ী মহারাত্রি, সংসারপরিবর্তিকা, সুমালিনী, সুরূপা, ভাবিনী, হারিণী, প্রভা, উন্মীলনী, সর্বসহা, সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী, সুসৌম্যা, চন্দ্রবদনা, তাণ্ডবাসক্তমানসা, সত্ত্বশুদ্ধিকরী, শুদ্ধি, মলত্রয়বিনাশিনী, জগৎপ্রিয়া, জগন্মূর্তি, ত্রিমূর্তি, অমৃতাশ্রয়া, নিরাশ্রয়া, নিরাহারা, নিরঙ্কুশপদোদ্ভবা, চক্রহস্তা, বিচিত্রাঙ্গী, স্রগ্বিনী, পদ্মধারিণী, পরাবরবিধানজ্ঞা, মহাপুরুষপূর্বজা, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, বিদ্যুৎ, বিদ্যুজ্জিহ্বা, জিতশ্রমা, বিদ্যাময়ী, সহস্রাক্ষী, সহস্রবদনাত্মজা, সহস্ররশ্মি, সত্ত্বস্থা, মহেশ্বরপদাশ্রয়া, ক্ষালিনী, মৃন্ময়ী, ব্যাপ্তা, তৈজসী, পদ্মবোধিকা, মহামায়াশ্রয়া, মান্যা, মহাদেবমনোরমা, ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা, চেকিতানা, অমিতপ্রভা, বীরেশ্বরী, বিমানস্থা, বিশোকা, শোকনাশিনী, অনাহতা, কুণ্ডলিনী, নলিনী, পদ্মভাসিনী, সদানন্দা, সদাকীর্তি, সর্বভূতাশ্রয়স্থিতা, বাগ্দেবতা, ব্রহ্মকলা, কলাতীতা, কলারণী, ব্রহ্মশ্রী, ব্রহ্মহৃদয়া, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাগ্রজা, ব্যোমশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, পরাগতি, ক্ষোভিকা, বন্ধিকা, ভেদ্যা, ভেদাভেদবিবর্জিতা, অভিন্না, ভিন্নসংস্থানা, বশিনী, বংশকারিণী, গুহ্যশক্তি, গুণাতীতা, সর্বদা, সর্বতোমুখী, ভগিনী, ভগবৎপত্নী, সকলা, কালকারিণী, সর্ববিৎ, সর্বতোভদ্রা, গুহ্যাতীতা, গুহারণী, প্রক্রিয়া, যোগমাতা, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরেশ্বরী, কপিলা, কাপিলা, কান্তা, কমলাভা, কলান্তরা, পুণ্যা, পুষ্করিণী, ভোক্ত্রী, পুরন্দরপুরঃসরা, পোষণী, পরমৈশ্বর্যভূতিদা, ভূতিভূষণা, পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি, পরমার্থার্থবিগ্রহা, ধর্মোদয়া, ভানুমতী, যোগিজ্ঞেয়া, মনোজবা, মনোরমা, মনোরস্কা, তাপসী, বেদরূপিণী, বেদশক্তি, বেদমাতা, বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী, যোগেশ্বরেশ্বরী, মাতা, মহাশক্তি, মনোময়ী, বিশ্বাবস্থা, বিয়ন্মূর্তি, বিদ্যুন্মালা, বিহায়সী, কিন্নরী, সুরভী, বিদ্যা, নন্দিনী, নন্দিবল্লভা, ভারতী, পরমানন্দা, পরাপরবিভেদিকা, সর্বপ্রহরণোপেতা, কাম্যা, কামেশ্বরেশ্বরী, অচিন্ত্যা, অনন্তবিভবা, ভূলেখা, কনকপ্রভা, কুষ্মাণ্ডী, ধনরত্নাঢ্যা, সুগন্ধা, গন্ধদায়িনী, ত্রিবিক্রমপদো-

ম্ভূতা, ধনুষ্পাণি, শিবোদয়া, সুদুর্লভা, ধনাধ্যক্ষা, ধন্যা, পিঙ্গললোচনা, শান্তি, প্রভাবতী, দীপ্তি, পঙ্কজায়তলোচনা, আদ্যা, হৃৎকমলোদ্ভূতা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, সৎক্রিয়া, গিরীশা, শুদ্ধি, নিত্যপুষ্টা, নিরন্তরা, দুর্গা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চর্চিতাঙ্গী, সুবিগ্রহা, হিরণ্যবর্ণা, জগতী, জগদ্যন্ত্রপ্রবর্তিকা, মন্দরাদ্রিনিবাসা, সারদা, স্বর্ণমালিনী, রত্নমালা, রত্নগর্ভা, পুষ্টি, বিশ্বপ্রমাথিনী, পদ্মাননা, পদ্মনিভা, নিত্যতুষ্টা, অমৃতোদ্ভবা, ধুন্বতী, দুষ্প্রকম্পা, সূর্যমাতা, দৃষদ্বতী, মহেন্দ্রভগিনী, সৌম্যা, বরেণ্যা, বরদায়িকা, কল্যাণী, কমলাবাসা, পঞ্চচূড়া, বরপ্রদা, বাচ্যা, অমরেশ্বরী, বন্দ্যা, দুর্জয়া, দুরতিক্রমা, কালরাত্রি, মহাবেগা, বীরভদ্রপ্রিয়া, হিতা, ভদ্রকালী, জগন্মাতা, ভক্তমঙ্গলদায়িনী, করালা, পিঙ্গলাকারা, কামভেদা, মহাস্বনা, যশস্বিনী, যশোদা, ষড়ধ্বপরিবর্তিকা, শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সাংখ্যা, সাংখ্যযোগপ্রবর্তিকা, চৈত্রা, সংবৎসরারূঢ়া, জগৎসম্পূরণী, ইন্দ্রজা, শুম্ভারি, খেচরী, খস্থা, কম্বুগ্রীবা, কলিপ্রিয়া, খগধ্বজা, খগারূঢ়া, বারাহী, পূগমালিনী, ঐশ্বর্যপদ্মনিলয়া, বিরক্তা, গরুড়াসনা, জয়ন্তী, হৃদ্গুহাগম্যা শঙ্করেষ্টগণাগ্রণী, সঙ্কল্পসিদ্ধা, সাম্যস্থা, সর্ববিজ্ঞানদায়িনী, কলি, কল্কিবিহন্ত্রী, গুহ্যোপনিষদুত্তমা, নিষ্ঠা, দৃষ্টি, স্মৃতি, ব্যাপ্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়াবতী, বিশ্বামরেশ্বরেশানা, ভুক্তি, মুক্তি, শিবা, অমৃতা, লোহিতা, সর্পমালা, ভীষণী, নরমালিনী, অনন্তশয়না, অনন্তা, নরনারায়ণোদ্ভবা, নৃসিংহী, দৈত্যমথিনী, শঙ্খচক্রগদাধরা, সঙ্কর্ষণসমুৎপত্তি, অম্বিকা, পাদসংশ্রয়া, মহাজ্বালা, মহাভূতি, সুমূর্তি, সর্বকামধুক, সুপ্রভা, সুস্তনী, সৌরী, ধর্মকামার্থমোক্ষদা, ভ্রূমধ্যনিলয়া, পূর্বা, পুরাণ-পুরুষারণি, মহাবিভূতিদা মধ্যা, সরোজনয়না, সমা, অষ্টাদশভুজা, অনাদ্যা, নীলোৎপলদলপ্রভা, সর্বশক্ত্যাসনারূঢ়া, ধর্মাধর্মবিবর্জিতা, বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা, নিরালোকা, নিরিন্দ্রিয়া, বিচিত্রগহনাধারা, শাশ্বতস্থানবাসিনী, স্থানেশ্বরী নিরানন্দা, ত্রিশূলবরধারিণী, অশেষদেবতামূর্তি, দেবতাবরদেবতা, গণাম্বিকা, গিরিপুত্রী, নিশুম্ভবিনিপাতিনী, অবর্ণা, বর্ণরহিতা, ত্রিবর্ণা, জীবসম্ভবা, অনন্তবর্ণা, অনন্যস্থা, শাঙ্করী, শান্তমানসা, অগোত্রা, গোমতী, গোপুত্রী, গুহ্যরূপা, গুণোত্তরা, গো, গীঃ, গব্যপ্রিয়া, গৌণী, গণেশ্বরনমস্কৃতা, সত্যভামা, সত্যসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধিবর্জিতা, সর্ববাদাশ্রয়া, সংখ্যা, সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা, অসংখ্যেয়া, অপ্রমেয়াখ্যা, শূন্যা, শুদ্ধকুলোদ্ভবা, বিন্দুনাদসমুৎপত্তি, শম্ভুবাসা, শশিপ্রভা, পিশঙ্গা, ভেদরহিতা, মনোজ্ঞা, মধুসূদনী, মহাশ্রী, শ্রীসমুৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতত্ত্বমাতা, ত্রিবিধা, সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া, শান্ত্যতীতা, মলাতীতা, নির্বিকারা, নিরাশ্রয়া, শিবাখ্যা, চিত্তনিলয়া, শিবজ্ঞানস্বরূপিণী, দৈত্যদানবনির্মথনী, কাশ্যপী, কালকর্ণিকা, শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্তি, চতুর্বর্গপ্রদর্শিকা, নারায়ণী, নরোদ্ভূতি, কৌমুদী লিঙ্গধারিণী, কামুকী, কলিতাভাবা,/পরাবরবিভূতিজা, পরার্ধজাতমহিমা, বড়বা, বামলোচনা, সুভদ্রা, দেবকী, সীতা, বেদবেদাঙ্গপারগা, মনস্বিনী, মন্যুমাতা, মহামন্যুসমুদ্ভবা, অমন্যু, অমৃতাস্বাদা, পুরুহূতা, পুরুষ্টুতা, অশোচ্যা, ভিন্নবিষয়া, হিরণ্যরঞ্জিপ্রিয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমী, হেমাভরণভূষিতা, বিভ্রাজমানা, দুর্জ্ঞেয়া, জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা, মহানিদ্রাসমুদ্ভূতি, অনিদ্রা, সত্যদেবতা, দীর্ঘা, ককুদ্মিনী, হৃদ্যা, শান্তিদা, শান্তিবর্ধনী, লক্ষ্ম্যাদিশক্তিজননী, শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা, ত্রিশক্তিজননী, জন্যা, ষড়ূর্মিপরিবর্জিতা, সুদামা, কর্মকরণী, যুগান্তদহনাত্মিকা, সঙ্কর্ষণী, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যনমিতা, বৈষ্ণবী, পরমেশ্বরী, প্রদ্যুম্নদয়িতা, দাত্রী, যুগ্মদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, মদোৎকটা, হংসগতি, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, বৃষাবেশা, বিয়ন্মাত্রা,

বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী, হিমবন্মেরুনিলয়া, কৈলাসগিরিবাসিনী, চাণূরহন্তৃতনয়া, নীতিজ্ঞা, কামরূপিণী, বেদবেদ্যা, ব্রতস্নাতা, ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী, বীরভদ্রপ্রজা, বীরা, মহাকামসমুদ্ভবা, বিদ্যাধরপ্রিয়া, সিদ্ধা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি, আপ্যায়নী, হরন্তী, পাবনী, পোষণীকলা, মাতৃকা, মন্মথোদ্ভূতা, বারিজা, বাহনপ্রিয়া, করীষিণী, সুধা, বাণী, বীণাবাদনতৎপরা, সেবিতা, সেবিকা, সেব্যা, সিনীবালী, গরুত্মতী, অরুন্ধতী, হিরণ্যাক্ষী, মৃগাক্ষী, মানদায়িনী, বসুপ্রদা, বসুমতী, বসুধারা, বসুন্ধরা, ধারাধারা, বরারোহা, চরাচরসহস্রদা, শ্রীফলা, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, শিবপ্রিয়া, শ্রীধরী, শ্রীকরী, কল্যা, শ্রীধরার্ধশরীরিণী, অনন্তদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধাত্রীশা, ধনদপ্রিয়া, দৈত্যসমূহনিহন্ত্রী, সিংহিকা, সিংহবাহনা, সুবর্চলা, সুশ্রোণী, সুকীর্তি, ছিন্নসংশয়া, রসজ্ঞা, রসদা, রামা, লেলিহানা, অমৃতস্রবা, নিত্যোদিতা, স্বয়ংজ্যোতিঃ, উৎসুকা, মৃতজীবনী, বজ্রতুণ্ডা, বজ্রজিহ্বা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, মঙ্গল্যা, মাঙ্গলা, মালা, নির্মলা, মলহারিণী, গান্ধর্বী, গারুড়ী, চান্দ্রী, কম্বলাশ্বতরপ্রিয়া, সৌদামিনী, জনানন্দা, ভ্রূকুটীকুটিলাননা, কর্ণিকারকরা, কক্ষ্যা, কংসপ্রাণাপহারিণী, যুগন্ধরা, যুগাবার্তা, ত্রিসন্ধ্যা, হর্ষবর্ধনী, প্রত্যক্ষদেবতা, দিব্যা, দিব্যগন্ধ্যাধিবাসনা, শক্রাসনগতা, শাক্রী, শধ্যা, চারুশরাসনা, ইষ্টা, বিশিষ্টা, শিষ্টেষ্টা, শিষ্টাশিষ্টপ্রপূজিতা, শতরূপা, শতাবর্তা, বিনতা, সুরভি, সুরা, সুরেন্দ্রমাতা, সুদ্যুম্না, সুষুম্না, সূর্যসংস্থিতা, সমীক্ষা, সৎপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, জ্ঞানপারগা, ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধর্মজ্ঞা, ধর্মবাহনা, ধর্মাধর্মবিনির্মাত্রী, ধার্মিকমঙ্গলপ্রদা, ধর্মময়ী, ধর্মশক্তি, বিধর্মা, বিশ্বধর্মিণী, ধর্মান্তার, ধর্মপূর্বা, ধনাবহা, ধর্মোপদেষ্ট্রী, ধর্মাত্মা, ধর্মগম্যা, ধরাধরা, কপালীশা, কলামূর্তি, কলাকলিতবিগ্রহা, সর্বশক্তিবিনিমুক্তা, সর্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া, সর্বা, সর্বেশ্বরী, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপিণী, প্রধানপুরুষেশেশা, মহাদেবৈকসাক্ষিণী, সদাশিবা, বিয়ন্মূর্তি, বেদমূর্তি এবং অমূর্তিকা।

ভীতমনা হিমবান এইভাবে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করে পুনরায় প্রণামপূর্বক দেবীকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, পরমেশ্বরী, তোমার এই ভয়ানক ঐশ্বর্যরূপ দেখে আমি ত্রস্ত হয়েছি, তুমি আমাকে অন্য রূপ দেখাও। হিমবানের কথায় দেবী পার্বতী নিজের ভয়ানক রূপ সংহরণ করলেন এবং হিমবানকে অন্য এক রূপ দেখালেন। সেই রূপ নীলপদ্মের পাপড়ির মতো, নীলপদ্মের মতোই তার সুগন্ধ। এই মূর্তির দুটি নয়ন। এই মূর্তি অতি সুন্দর ও কৃষ্ণকেশে সজ্জিত। এঁর পদ্মের মতো পা দুখানির তলদেশ রক্তবর্ণ, করতলও রক্তবর্ণ। অতি সুশ্রী এবং বিলাসময়ী এ মূর্তি। এঁর ললাট তিলকে উজ্জ্বল, বিচিত্র অলংকারে এঁর অতি পেলব ও সুন্দর অঙ্গ সজ্জিত। বক্ষোদেশে তাঁর অতি বিশাল এক কনকমালা, তাঁর সুন্দর বিম্বসদৃশ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি। তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চরণে নূপুর ঝংকৃত। প্রসন্নবদনা এই দেবীর রূপ স্বর্গীয় আর অনন্ত মহিমার আধার।

শৈলরাজ এই রূপ দেখে সমস্ত আতংক ভুলে পুলকিত হয়ে পরমেশ্বরীকে বললেন, আজ আমার জন্ম সার্থক হল, তপস্যা ফলবতী হল। কারণ তুমি অব্যক্তা হয়েও প্রত্যক্ষ রূপে আমার দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিলে। তুমি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছ। প্রকৃতি প্রভৃতি তোমাতেই অবস্থিত। তোমারই মধ্যে সমস্ত জগৎ লয় পায়। দেবি, তুমিই পরমাগতি। কেউ কেউ বলেন তুমি প্রকৃতি, কেউ বলেন তুমি প্রকৃতিরও পর, অন্য কোন কোন পরমার্থদর্শী বলেন, যেহেতু তুমি শিবে সমাশ্রিতা, তাই তুমি শিবা। প্রকৃতি,

পুরুষ, মহৎ তত্ত্ব, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, নিয়তি, মায়া, কলা প্রভৃতি শত শত পদার্থ তোমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তুমিই সেই পরমা শক্তি, অনন্তা, পরমেষ্ঠিনী, সর্ব-ভেদশূন্যা আর সর্বভেদাশ্রয়ের আশ্রয়। যোগেশ মহাদেব তোমাতেই অধিষ্ঠিত হয়ে জগতের সৃষ্টি ও লয় করে চলেছেন। তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েই মহাদেব স্বকীয় আত্মানন্দ অনুভব করছেন। তুমিই সেই পরম আনন্দস্বরূপা এবং আনন্দদায়িনী। তুমি অক্ষর, মহাকাশ, মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপ, গুণাতীত, মঙ্গলময়, সর্বপদার্থে স্থিত, সূক্ষ্ম ও সনাতন, পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ। তুমিই দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, ব্রহ্মবিদ্‌গণের তুমিই ব্রহ্মা, বলবানের মধ্যে তুমি বায়ু, যোগিগণের মধো তুমিই কুমার, তুমি ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদবিদ্-গণের মধ্যে বেদব্যাস, সাংখ্যবেত্তাদের মধ্যে কপিল, রুদ্রদের মধ্যে শঙ্কর, আদিত্যগণের মধ্যে উপেন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, বেদের মধ্যে সামবেদ আর ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী। দেবি, তুমি সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, গতির মধ্যে মোক্ষ, সর্বশক্তির মধ্যে মায়া, বিনাশকের মধ্যে কাল, সকল গুহ্যপদার্থের মধ্যে ওঙ্কার, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। আশ্রমের মধ্যে তুমি গার্হস্থ্য আর ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর। পুরুষগণের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রাণীর অন্তরস্থিত অদ্বিতীয় পুরুষ, সকল উপনিষদের মধ্যে তুমি গুহ্য উপনিষদ, কল্পের মধ্যে ঈশানকল্প, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, সমস্ত মার্গের মধ্যে আদিত্য, বাক্যের মধ্যে সরস্বতী। সুন্দর রূপের মধ্যে তুমিই লক্ষ্মী, তুমি মায়াবীর মধ্যে বিষ্ণু, সতীর মধ্যে অরুন্ধতী, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, সূক্তের মধ্যে পুরুষসূক্ত, সামের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাম, জপনীয়ের মধ্যে সাবিত্রী, যজুঃসমূহের মধ্যে তুমি শতরুদ্রিয়। দেবি, পর্বতের মধ্যে তুমি মহামেরু, সর্পের মধ্যে অনন্ত আর সকল পদার্থের তুমিই ব্রহ্ম-স্বরূপ। তাই বেশি আর কি বলব, সমস্ত পদার্থই তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত। তোমার সেই রূপকে নমস্কার করি যা বিকারশূন্য, অদর্শনীয়, নির্মল, অদ্বিতীয়, বাল্য-যৌবন-বার্ধক্যরহিত, অনন্ত, আদিভূত আর অন্ধকারের পারে স্থিত। বৈদান্তিকগণ যাঁকে জগজ্জননী বলে জানেন, সেই আনন্দময় ওঙ্কার নামক রূপের শরণাপন্ন হই। তোমার সেই রূপকে নমস্কার করি, যা সমস্ত প্রাণীর অন্তরস্থিত, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-বিয়োগের কারণ, তেজোময়, অজর, অমর, ওঙ্কার-স্বরূপ। আদি-অন্তহীন, জগতের আত্ম-স্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিত, প্রকৃতির পরবর্তী, কূটস্থ, অপ্রকাশিত শরীর পুরুষ নামক রূপকেও নমস্কার করি, যা সকলের আশ্রয়, সমস্ত জগতের যা বিধাতা, যা সর্বত্রগামী, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু, সূক্ষ্ম, বিচিত্র, ত্রিগুণময় ও প্রধান, তোমার সেই রূপভেদশূন্য রূপকে নমস্কার। যে আদিভূত মহৎ তত্ত্বের নাম পুরুষ, যা প্রকৃতিতে অবস্থিত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কারণ, যাতে ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধর্ম রয়েছে, তোমার সেই রূপকে নমস্কার। তোমার এই রূপ চতুর্দশ ভুবন-স্বরূপ, প্রলয়পয়োধিস্থিত, বিচিত্র এর রূপভেদ, পরম-পুরুষের সঙ্গে এই রূপ যুক্ত, বহু ভাগে এই রূপ বিভক্ত, এই রূপের নামই ব্রহ্মাণ্ড ; একে নমস্কার। যা অদ্বিতীয়, আদিভূত, যা স্বকীয় তেজে সমস্ত ভুবন পরিপূর্ণ করেছে, যা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণ, সূর্যমণ্ডলে স্থিত পরমেষ্ঠী নামে তোমার সেই রূপকেও নমস্কার। তোমার নারায়ণ নামক রূপকেও নমস্কার, যার সহস্রটি শীর্ষ, যার শক্তির অন্ত নেই, যার সহস্রটি বাহু আর যা জলমধ্যে শয়ান আদিপুরুষ স্বরূপ। তোমার কালসংজ্ঞক রূপকেও নমস্কার, যাকে দেবগণ পূজা করেন, যা দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়কালীন অগ্নিস্বরূপ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশের কারণ। আবার সহস্রফণায় ভূষিত,

শ্রেষ্ঠ সর্পগণ কর্তৃক পূজিত, জনার্দনের দ্বারা আরূঢ়, নিদ্রিত, শেষ নামে তোমার সেই রূপকেও নমস্কার। অপ্রতিহতবিভূতি, ত্রিনয়ন, ব্রহ্মামৃতরূপ আনন্দরসের জ্ঞাতা, যুগান্ত পর্যন্ত স্থায়ী, স্বর্গে নৃত্যপর, তোমার সেই রুদ্রনামক রূপকেও নমস্কার। হে দেবি, ভবানি, তোমার এই রূপ শোকরঞ্জিত, রূপরহিত; সুর ও অসুরগণ তোমার এই রূপের পাদপদ্ম পূজা করে। এই রূপ সুকোমল আর শুভ্র দীপ্তিময়; এই রূপকে নমস্কার। হে মহাদেবি, তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বরি, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবতি ঈশানি, তোমাকে নমস্কার। হে শিবে, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তুমিই আমার আধার। তুমিই আমার গতি। তোমার শরণ নিই। হে পরমেশ্বরি, তুমি প্রসন্ন হও। জগতে আমার সমান দেবতা ও দানব আর কেউ নেই। কারণ জগজ্জননী হয়েও তুমি আমার কন্যারূপে জন্ম নিয়েছ। দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মাতা, অথচ পিতৃকন্যকা মেনা তোমার মাতা হলেন—এর চেয়ে পুণ্য গৌরবের কথা আর কী হতে পারে? হে অমর ঈশানি, মেনার সঙ্গে আমাকেও সর্বদা রক্ষা কর। আমি তোমার পাদপদ্মে নমস্কার করছি, তোমারই কাছে আশ্রয় নিচ্ছি। আহা, আমার কী মহাভাগ্য—আমার কাছে মহাদেবী এসেছেন। হে মহাদেবি, আদেশ কর, আমি কী করব।

এই কথা বলে হিমবান পার্বতীকে দর্শন করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। জগৎরূপ অরণির দাবাগ্নিস্বরূপ সেই দেবী হিমবানের এই সমস্ত কথা শুনে স্বীয় পতি পশুপতিকে স্মরণ করলেন। তারপর ঈষৎ হেসে হিমবানকে বললেন, হে গিরি-শ্রেষ্ঠ, যাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের দ্বারা আরাধিত, অতিগুহ্য আদি-ভূত এই উপদেশ শোন। সকল শক্তির দ্বারা মণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ, প্রেরয়িতা-স্বরূপ আমার যে অতি আশ্চর্য এবং অনুত্তম রূপ তুমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছ, শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অভিমান আর অহঙ্কার ত্যাগ করে একনিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হয়ে সেই রূপের শরণ নাও। তাত, অনন্যা ভক্তি নিয়ে আমার পরম ভাবকে আশ্রয় কর আর সর্বদা সর্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের দ্বারা সেই মূর্তির ধ্যান কর, সেই মূর্তির আরাধনা কর। হে নিষ্পাপ, তাহলেই আমি তোমাকে সংসারপাশ থেকে মুক্ত করব। যখন তুমি পরমা ভক্তিকে আশ্রয় করে ঐশ্বর যোগ প্রাপ্ত হবে, তখনই বিলম্ব না করে আমি তোমাকে সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করব। হে গিরিশ্রেষ্ঠ, ধ্যান, কর্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যেই আমাকে পাবে। অন্য কোটি কোটি কর্ম করেও কিন্তু আমাকে পাওয়া যায় না। মুক্তি পাবার জন্য সর্বদা বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে যে সমস্ত বর্ণাশ্রমভিত্তিক অধ্যাত্মজ্ঞান-যুক্ত কর্ম বিহিত হয়েছে, সেগুলি আচরণ কর। ধর্ম থেকে ভক্তি আসে আর ভক্তিই পরমাত্মতত্ত্বের দিকে নিয়ে যায়।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মই ধর্মজনক। অন্য কিছু থেকেই ধর্ম উৎপন্ন হয় না। কারণ ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে বেদ থেকেই। তাই মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ধর্মকামী ব্যক্তিরা বেদকে আশ্রয় করবেন। বেদ আমারই রূপ। আমার এই শ্রেষ্ঠা শক্তির নামই বেদ। এই শক্তি পুরাতনী, এই শক্তিই সৃষ্টির উষালগ্নে ঋক্, যজুঃ ও সামরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত বেদের রক্ষার জন্যই জন্মরহিত ভগবান ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের সৃষ্টি করে তাদের নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত করেছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি বেদবিহিত সেই সব ধর্মকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্যই অতি কুৎসিত তামিস্র প্রভৃতি নরক সৃষ্ট হয়েছে। বেদ ছাড়া এমন আর কোন শাস্ত্র নেই যেখানে ধর্মের কথা

আলোচিত হয়েছে। এই শাস্ত্র পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রে মনোযোগ দেয়, তার সঙ্গে দ্বিজগণ বাক্যালাপও করেন না। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধে যে সব শাস্ত্র দেখতে পাওয়া যায় সেই সব শাস্ত্রে নিষ্ঠা তমোগুণের পরিচায়ক। কাপাল, ভৈরব, যামাল, বাম, আর্হত, কাপিল, পাঞ্চরাত্র ও ডামর শাস্ত্রও মোহ উৎপাদন করে। এই সব শাস্ত্র এবং এই ধরনের অন্যান্য শাস্ত্র অসুরদের মোহিত করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এই জগতে যে সব ব্যক্তি কুশাস্ত্রের সাহায্যে মানুষকে মোহিত করে, আমার সৃষ্ট শাস্ত্র তাদের মোহ উৎপাদনের জন্যই।

শ্রেষ্ঠ বেদার্থবিদ্‌গণের দ্বারা করণীয় যে সব বৈদিক কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেই সমস্ত কর্ম যে মানুষেরা যত্ন সহকারে সাধন করে, তারাই আমার প্রিয়।

বিরাট পুরুষ স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে আমার আদেশেই সমস্ত বর্ণের হিতের জন্য মুনিদের কাছে ধর্মের কথা বলেছিলেন। মনুর কাছে থেকে উৎকৃষ্ট ধর্মের কথা শুনে অন্য মুনিরাও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ শাস্ত্র লিখেছেন। প্রলয়কালে সেই সব শাস্ত্র লোপ পাবে; তখন মহর্ষিরা ব্রহ্মার আদেশে যুগে যুগে সেই সমস্ত ধর্ম-শাস্ত্রই বার বার রচনা করবেন। রাজন, ব্রহ্মার কথায় বেদব্যাস আঠারোটি পুরাণ লিখেছেন। সেই সব পুরাণে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদব্যাসের শিষ্যেরা আবার অন্য নানা উপপুরাণ লিখেছেন। এই ভাবেই যুগে যুগে ধর্মশাস্ত্রকারগণ ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করবেন। হে দ্বিজগণ, বলা হয় শাস্ত্রের সংখ্যা চতুর্দশ। সেগুলি হল—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ন্যায়বিদ্যা, মীমাংসা, পুরাণশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং চারটি বেদ। এই সমস্ত শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও ধর্মের স্বরূপ চিত্রিত হয় নি। আমার আদেশে মনু, ব্যাস, প্রমুখ মুনিগণ পিতামহের দ্বারা উক্ত উত্তম ধর্মকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে যাবেন। ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে। তখন আত্মসাক্ষাৎকারী মুনিরা ব্রহ্মার সঙ্গে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাবেন। তাই যত রকম ভাবে সম্ভব ধর্মের জন্য বেদকে আশ্রয় করবে। ধর্মের সঙ্গে জ্ঞান মিলিত হলে তবেই পরমব্রহ্ম প্রকাশিত হন। যে সব ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হন, ঐশ্বর যোগ অবলম্বন করে আমারই ভজনা করেন, সর্বজীবে দয়া করেন, যারা শান্ত, সংযত, মাৎসর্য-শূন্য, জ্ঞানবান, তপস্বী, যারা যথাবিধি ব্রত আচরণ করেছেন, আমাতেই যাদের চিত্ত সমর্পিত, আমারই উদ্দেশে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, যারা আমার জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করেন, আর যারা সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে আমার উপাসনা করেন, সর্বদাই কর্মে নিযুক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ঘোর অন্ধকাররূপে উদ্ভূত মায়াকে আমি জ্ঞানের দীপ জ্বেলে অচিরেই বিনাশ করে থাকি। আমাতেই সমর্পিতপ্রাণ, সদানন্দ, তমোগুণবর্জিত সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সংসারে বার বার ফিরে আসতে হয় না, তাই সর্বপ্রকারে আমার ভক্ত হয়ে, আমাতে চিত্ত অর্পণ করে তুমি আমার পূজা কর আর সর্বদা মনে মনে আমার শরণাপন্ন হও। যদি আমার অব্যয় ঐশ্বর রূপের ধ্যান করতে না পারো, তাহলে কাল নামক পরমরূপের শরণ নাও। তাত, আমার যে রূপটি তোমার মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়, তাতে নিষ্ঠা রেখে তাতেই মন প্রাণ অর্পণ করে সেই রূপেরই অর্চনা কর। অখণ্ড, চেতনাময়, অদ্বিতীয়, মঙ্গলময়, সর্বপ্রকার উপাধি থেকে নির্মুক্ত, অনন্ত, শ্রেষ্ঠ, অমৃতস্বরূপ, অদ্বৈতজ্ঞানমাত্র, অংশশূন্য আমার যে রূপটি আছে পরমপদ স্বরূপ সেই রূপকে কেবল অতি ক্লেশে লভ্য জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায়। অন্যভাবে তার প্রাপ্তি

ঘটে না। কেবল আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই আমাতে প্রবেশ করতে সমর্থ। যারা সেই তাঁকেই চিন্তা করেন, যাদের আত্মায় তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন, তাঁতেই যাদের নিষ্ঠা আর যারা তাঁরই কাছে মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তারাই জ্ঞানের দ্বারা পাপকে ধুয়ে ফেলতে পারেন। তাদের আর এই সংসারে ফিরতে হয় না। রাজেন্দ্র, আমাকে আশ্রয় না করলে শ্রেষ্ঠ ও নির্মল মোক্ষ লাভ করা যায় না। তাই আমার শরণাপন্ন হও। রাজন, এক ভাবে অথবা পৃথক ভাবে অথবা দু'ভাবেই আমার উপাসনা করলে সেই পরম পদ লাভ করতে পারবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আমাকে আশ্রয় না করলে সেই শুদ্ধস্বরূপ পরম তত্ত্বকে জানতে পারবে না। তাই আমার শরণ নাও। যত্ন করে ব্রহ্মরূপ বা ঐশ্বরূপের আরাধনা কর। তাহলেই বন্ধনমুক্তি ঘটবে। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সর্বস্থানে শিবের পূজা কর। তাহলে শিবপদ পেতে পারবে। সেই মঙ্গলময় মহাদেবকে আমারই মায়ায় অন্ধ হয়ে মানবগণ দেখতে পায় না। এই মহাদেব অনাদি, অনন্ত, সর্বজীবের আত্মারূপে অবস্থিত, সমস্ত পদার্থের আধার, স্বপ্রকাশ, সদানন্দ, আভাসশূন্য, গুণরহিত, তমোগুণের অতীত, অদ্বিতীয়, অচল, অখণ্ড, ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎ সংসার থেকে ভিন্ন, আত্মার দ্বারা অনুভবের যোগ্য, অজ্ঞেয়, পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এবং জন্মরহিত। মানুষ আমার সূক্ষ্ম তমোরূপ মায়ায় আবৃত হয়ে এই ভয়ানক সংসার সাগরে বার বার জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন, জন্মের বন্ধন ছিন্ন করতে গেলে অনন্যা ভক্তি ও যথার্থ জ্ঞান নিয়ে সেই ব্রহ্মকে অন্বেষণ করতে হবে। অহঙ্কার, মাৎসর্য, কাম, ক্রোধ, দানগ্রহণ এবং অধর্মে মনোযোগ পরিহার করে আর বৈরাগ্য অবলম্বন করে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মতো এবং নিজেকে সমস্ত প্রাণীর মতো মনে করতে হয়, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। তাহলেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে প্রসন্ন চিত্তে সর্বভূতকে অভয় দান করলে অনন্যাভাবিনী ঈশ্বরবিষয়িণী পরম ভক্তি লাভ করা যায়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব দর্শন হয় এবং সংসারের সমস্ত পাশ থেকে নির্মুক্ত হয়ে পরমব্রহ্মে অবস্থান করা যায়। অনন্য, অব্যয়, অদ্বিতীয়, আত্মার আধারভূত, পরম কল্যাণময় মহেশ্বরই পরম ব্রহ্মের চরম পরিণতি। হে নৃপ, সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ বা কর্মযোগের সাহায্য নিয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। হে পর্বতাধিরাজ, এই যে অতি গুহ্য উপদেশ তোমাকে দান করলাম, একে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করে তোমার যা অভিলাষ হয় কর। দেবতারা আমাকে চেয়েছিলেন বলে পরমেশ্বর থেকে আমি উৎপন্ন হয়েছি। আমার পিতা দক্ষ মহেশ্বরের নিন্দা করেছিলেন বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করে আমি ধর্মের সংস্থাপনের জন্যও বটে, আবার তোমার আরাধনায়ও বটে, মেনার গর্ভে জন্ম নিয়েছি, তোমাকে পিতা রূপে পেয়েছি। তুমি পরমাত্মা ব্রহ্মার আদেশে স্বয়ম্বর সভায় আমাকে রুদ্রের উদ্দেশে উৎসর্গ কর। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলে ইন্দ্রের সঙ্গে অন্য সব দেবতারা তোমাকে নমস্কার করবেন এবং শংকর তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। অতএব সর্বপ্রকার যত্নের সঙ্গে আমাকে ঈশ্বরের সন্নিহিতা বলে জেনো। শরণ্য দেব ঈশানকে পূজা করে তাঁর শরণাপন্ন হও।

দেবী এই কথা বললে হিমবান মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে আবার বললেন, শিবপ্রিয়ে, তুমি বিশদভাবে মহেশ্বরবিষয়ক পরম আত্মজ্ঞান লাভ ও তার উপায়গুলির কথা আমাকে বল।

সূত বললেন, এই কথা শুনে দেবী পরমেশ্বরী তাঁকে সেই পরম [illegible] আত্ম-

যোগ ও তার উপায়গুলির কথা সবিস্তারে যথাযথ ভাবে বললেন। লোকমান্য গিরিরাজ লোকমাতার মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত পরম জ্ঞানের কথা শুনে যোগের প্রতি আসক্ত হলেন। ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের সম্মুখে সাধ্বী পার্বতীকে মহেশের হাতে দান করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

যে ব্যক্তি পবিত্র ও তদ্গত চিত্তে শিবসন্নিধানে ভক্তির সঙ্গে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন নামক এই অধ্যায় পাঠ করে, সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে, দিব্যযোগ লাভ করে ব্রহ্মলোক পার হয়ে দেবীর পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সদ্‌ব্রাহ্মণদের কাছে সমাহিত চিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করে, সেও সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। ভক্তিযোগযুক্ত যে ব্রাহ্মণ দেবীর এই এক হাজার আটটি নাম জেনে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে স্থিতা দেবীকে আবাহন করে গন্ধপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা তাঁর পূজা করে এবং দেবীর সঙ্গে মহেশ্বরের পরম ভাব স্মরণ করে অনন্য মনে আমরণ নিত্যদিন জপ করে, সে মৃত্যুকালে স্মৃতি লাভপূর্বক পরমব্রহ্মে গমন করে। অথবা সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করে পূর্বজন্মের সমস্ত সংস্কারের মাহাত্ম্যে বেদবিদ্যা লাভ করে পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সেই দিব্য পরম যোগ প্রাপ্ত হয় এবং শান্ত সংযত হয়ে পরে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা ঐ প্রত্যেকটি নাম উচ্চারণ করে হোম করে, সে মহামারীকৃত দোষ এবং গ্রহবৈগুণ্য থেকে মুক্ত হয়। লক্ষ্মীলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি বিধি অনুসারে দেবী পার্বতীকে পূজা করে আলস্য ত্যাগপূর্বক সারা বছর ধরে দিবারাত্র এই জপ করবে। যে ব্যক্তি ভক্তির সঙ্গে দেবীর পার্শ্বস্থিত ত্রিনয়ন শম্ভুকে পূজা করে, সে মহাদেবের প্রসাদে বিপুলা শ্রী লাভ করতে পারে। অতএব দ্বিজগণ সমস্ত রকম যত্ন আশ্রয় করে সর্বপাপ নাশের জন্য দেবীর সহস্র নাম জপ করবে।

সূত বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ, প্রসঙ্গক্রমে দেবীর অনুপম মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের কাছে বললাম। এখন ভৃগু প্রমুখের প্রজাসৃষ্টির কথা শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর নামসহস্রকথননামে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, ভৃগুর খ্যাতি নামে যে স্ত্রী ছিলেন, তাঁর গর্ভে নারায়ণবল্লভা লক্ষ্মী জন্ম নিলেন। মেরুর দুই জামাতার নাম ধাতা ও বিধাতা। মহাত্মা মেরুর কন্যা দুটির নাম আয়তি ও নিয়তি। আয়তি আর নিয়তির দুটি পুত্র। আয়তির পুত্রের নাম প্রাণ, নিয়তির পুত্রের নাম মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডু থেকেই মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হয়েছিল। প্রাণের ঔরসে বেদশিরা নামে দীপ্তরূপসম্পন্ন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে একটি পুত্রের ও তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারটি সর্বলক্ষণযুক্তা কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তুষ্টিই জ্যেষ্ঠা, পূর্ণমাসের দুই পুত্র—বিরজা ও পর্বত। প্রজাপতি পুলহের পত্নী ক্ষমা তিনটি পুত্র প্রসব করেছিলেন—কর্দম, বরীয়ান ও সহিষ্ণু। এঁদের মধ্যে সহিষ্ণু কনিষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ মুনিরা তপস্যার দ্বারা পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। অত্রির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে তিনটি নিষ্পাপ পুত্রের জন্ম হয়েছিল। এঁদের নাম সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়। এঁদের মধ্যে

দত্তাত্রেয় যোগী। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি সর্বলক্ষণযুক্তা চারটি কন্যা প্রসব করেন—সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। ভগবান পুলস্ত্যের ঔরসে প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। ইনিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্বজন্মে অগস্ত্য নামে পরিচিত ছিলেন। এর পরে ঐ দম্পতীর দেববাহু নামে একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে। ক্রতুর পত্নী সম্মতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হয়—এরা সকলেই উধর্বরেতা ও বালখিল্য নামে বিখ্যাত। বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জার গর্ভে সাতটি পুত্র এবং সর্বশোভামণ্ডিতা কমলনয়না একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই সাতটি পুত্রের নাম—রজ. গাত্র, উধর্ববাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। এঁরা সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী। হে ব্রাহ্মণগণ, যিনি রুদ্র বহ্নি নামে খ্যাত ব্রহ্মার সেই পুত্রের ভার্যা স্বাহা পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিনটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। অগ্নিরূপী এই পুত্রেরা অতিমহান ও তেজস্বী। যে অগ্নিকে নির্মথিত করা হয় তিনি পবমান, বৈদ্যুত অগ্নি পাবক আর সূর্যের উত্তাপে যে অগ্নির জন্ম তিনি শুচি। এঁদের আবার পঁয়তাল্লিশটি পুত্র হয়েছিল। পাবক, পবমান ও শুচি অগ্নি, এঁদের পিতা রুদ্রস্বরূপ বহ্নি এবং পাবক প্রমুখের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র—সব মিলিয়ে এই উনপঞ্চাশজনকেই বহ্নি বলা হয়ে থাকে। এঁরা সকলেই তপস্বী এবং সমস্ত যজ্ঞের ভাগ এঁদের দেওয়া হয়। এঁরা সবাই রুদ্রস্বরূপ এবং সকলের কপালেই ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন আছে। পিতৃগণ হলেন ব্রহ্মার পুত্র। এঁদের দুটি ভাগ—অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ। এঁদের মধ্যে অগ্নিষ্বাত্তেরা যাগ করেন নি আর বর্হিষদেরা যাগ করেছেন। স্বধার গর্ভে এঁদের ঔরসে মেনা ও ধারিণী নামে দুটি কন্যার জন্ম হয়। এই দুই কন্যাই বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যোগ আশ্রয় করেছিলেন। মেনার গর্ভে মৈনাক ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রৌঞ্চ জন্মগ্রহণ করে। ত্রিভুবনের মধ্যে অনুপমা, পাবয়িত্রী গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়েছিল হিমবান থেকে আর হিমবান যোগাগ্নির প্রভাবে দেবী মহেশ্বরীকেও নিজের কন্যারূপে পেয়েছিলেন।

এই অতুলনীয়া দেবী-মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের কাছে যথাক্রমে বললাম। আর দক্ষের কন্যাদের পতি আর সন্তানদের কথাও আপনারা শুনলেন। এখন মনুর সৃষ্টির কথা বলি, শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভৃগ্বাদিসর্গকথননামে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, শতরূপা ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী। তাঁর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয়—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত বীর্যবান ও ধার্মিক ছিলেন। উত্তানপাদের ধ্রুব নামে যে পুত্র ছিলেন সেই ধ্রুবই দেব নারায়ণের প্রতি ভক্তির ফলে উৎকৃষ্ট স্থান পেয়েছেন। ধ্রুবের শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র। ভব্য থেকে আবার শম্ভুর জন্ম। শিষ্টির সুচ্ছায়া নামে পত্নী ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠের উপদেশে অতি কঠোর তপস্যা করে শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। এর ফলে তিনি পাঁচটি পবিত্র পুত্রের জননী হন—রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র. বৃকল ও বৃকতেজা। এঁরা সকলেই নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান, শুদ্ধচেতা ও স্বধর্মের প্রতিপালক। রিপুর মহিষী সর্বতেজোময় একটি পুত্র প্রসব করেন—তাঁরই নাম চক্ষু। চক্ষু আবার বীরণ প্রজাপতির

কন্যা পুষ্করিণী নামে স্ত্রীর গর্ভে স্বরূপ চাক্ষুষ মনুর জন্ম দিয়েছিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে মহাতেজা মনুর অতিবীর্যবান দশটি পুত্র হয়—উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন আর অভিমন্যুক। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী অত্যন্ত বলবান ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। এঁদের নাম—অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস আর শিবি। অঙ্গ থেকে বেণ এবং বেণ থেকে বৈণ্য জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈণ্যই মহাপরাক্রমশালী প্রজানুরঞ্জক নৃপতি পৃথু নামে বিখ্যাত। তিনিই দেবেন্দ্রের সঙ্গে পুরাকালে প্রজাদের হিতকামনায় ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। প্রাচীনকালে বৈণ্য অতি বিপুল পৈতামহ যজ্ঞ করেছিলেন। সেখানে মায়ারূপী স্বয়ং হরি পৌরাণিক সর্বশাস্ত্রবক্তা ধর্মজ্ঞ গুরুভক্ত সূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, আমিই সেই পুরাকালে উদ্ভূত সনাতন সূত। এই মন্বন্তরে পুরাণপুরুষ হরি নিজে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রূপ ধরে প্রসন্ন হয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমার বংশে বেদবর্জিত যে সমস্ত সূতের জন্ম হয়েছে, পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর আজ্ঞায় তারা পুরাণকথা আবৃত্তিকেই জীবিকা বলে গ্রহণ করেছে।

জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, মহাবলী, সার্বভৌম নৃপতি পৃথু একান্তভাবে স্বধর্মের অনুশীলন করতেন। বাল্যকাল থেকেই নারায়ণের প্রতি পৃথুর ভক্তি ছিল। সংযতেন্দ্রিয় এই পৃথু তাই গোবর্ধনগিরিতে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় প্রীতিলাভ করে শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান দামোদর স্বয়ং সেই স্থানে আবির্ভূত হন ও রাজাকে বর দিয়ে বলেন, আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই তুমি এমন দুটি ধার্মিক সুরূপ পুত্রের জনক হবে যারা সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বলে হৃষীকেশ অন্তর্হিত হলেন। আর মহাতেজা পৃথু নারায়ণে অচলা ভক্তি রেখে মধুসূদনকে চিন্তা করতে করতে নিজের রাজ্য প্রতিপালন করতে লাগলেন।

পৃথুর পবিত্রহাসিনী তন্বী স্ত্রী অল্পকালের মধ্যেই শিখণ্ডী, হবির্ধান ও অন্তর্ধান নামে পুত্রদের প্রসব করলেন। শিখণ্ডীর সুশীল নামে এক পুত্র হয়। ইনি বেদবেদাঙ্গ-পারঙ্গম অতি রূপবান আর ধার্মিক। ধর্মজ্ঞ সুশীল চারটি বেদ অধ্যয়ন করে তপস্যায় রত হলেন। তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে যে তিনি সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে-ছিলেন। নিয়মিত বেদ অধ্যয়ন এবং তপস্যায় নিরত সুশীল তীর্থ পর্যটন শেষ করে সিদ্ধগণের প্রিয় হিমালয়পৃষ্ঠে গমন করলেন। সেই হিমালয়পৃষ্ঠে তিনি ধর্মপদ নামে এক অরণ্য দেখলেন যেখানে কেবল যোগীরাই যেতে পারেন, ব্রহ্মবিদ্বেষীরা পারে না। ঐ স্থানে বয়ে যাচ্ছে মন্দাকিনী নামে স্বচ্ছ পবিত্র নদী যার তীরে সিদ্ধদের আশ্রম আর বুকে পদ্মের বন। সুশীল হৃষ্টমনে মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীরে মুনিবর আর যোগীদের অতি রমণীয় আশ্রম দেখলেন। তিনি মন্দাকিনীতে নেমে স্নান করে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন, পদ্মফুল দিয়ে মহাদেবকে পূজা করলেন আর মাথায় জোড়হস্ত স্পর্শ করে সূর্যমণ্ডলে স্থিত ঈশানকে ধ্যান করে অতি দীপ্তিময় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করলেন, তারপর স্তব করতে লাগলেন। রুদ্রাধ্যায়, রুদ্রচরিত আর বিভিন্ন বেদে শম্ভুর যে সমস্ত স্তোত্র আছে সেগুলির দ্বারা তিনি গিরিশের স্তব করলেন।

এমন সময়ে তাঁর চোখে পড়ল এক মহামুনি আসছেন। এই মুনি মহাপাশুপত, এঁর সর্বাঙ্গে ভস্ম, পরণে কৌপীন। তপস্যায় ইনি শীর্ণকায়, গলায় রয়েছে সাদা যজ্ঞোপবীত। এঁর নাম শ্বেতাশ্বতর। সুশীল শম্ভুর স্তব শেষ করে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে মহামুনির

পাদপদ্মে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন। তারপর হাত জোড় করে বললেন, আজ আমি ধন্য, আমি অনুগৃহীত। কারণ যোগবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান যোগীশ্বরকে আজ প্রত্যক্ষ করেছি। আহা, আমার কী পরম ভাগ্য। আমার তপস্যা আজ সার্থক হল। আমি আপনারই শিষ্য। কি করতে হবে আদেশ করুন। হে নিষ্পাপ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তখন শ্বেতাশ্বতর মুনি তপস্যার দ্বারা মুক্তপাপ চরিত্রবান রাজার প্রতি অনুগ্রহবশত তাঁকে শিষ্য বলে স্বীকার করলেন। তাঁকে দিয়ে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিধির অনুষ্ঠান করিয়ে তাঁকে ঐশ্বর জ্ঞান আর নিজ শাখায় বিহিত ব্রত দান করলেন। এই জ্ঞান অসীম, বেদের মূলকথা এতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান পশুপাশের বিমোচন করে। আর এই ব্রতের নাম অন্ত্যাশ্রম—ব্রহ্মবাদীরা যা অনুষ্ঠান করে থাকেন। এরপর ঐ আশ্রমে তাঁর যে সব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় শিষ্য বাস করতেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমি যে শাখা প্রবর্তন করেছি, যোগীরা সেই শাখা অধ্যয়ন করে অখণ্ড মহাদেব শিবের ধ্যানে রত হয়ে এই স্থানে সমাসীন। ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে উমার সঙ্গে লীলায় মেতে এই স্থানেই রয়েছেন। সমস্ত লোকের বিধাতা স্বয়ং নারায়ণ লোকসমূহের মঙ্গলকামনা করে পুরাকালে এই স্থানে মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। দেবাদিদেব ঈশানকে এই স্থানেই ভজনা করে দেব আর দানবেরা পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন। এই স্থানেই মরীচি প্রমুখ মুনিরা তপোবলে মহেশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়ে ত্রিকালজ্ঞ হতে পেরেছেন, রাজেন্দ্র, তাই তুমিও তপোযোগ আশ্রয় করে আমার সঙ্গে এই স্থানেই চিরকাল থেকে যাও। তাহলেই তোমার সিদ্ধি হবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনি এই রকম বলে পিনাকী মহাদেবের ধ্যানে রত হয়ে সর্বসিদ্ধির জন্য নিয়মানুসারে সর্বপাপনাশক, বেদের সারভূত, মোক্ষদায়ক, ঋষি প্রবর্তিত, পুণ্যজনক 'অগ্নি' ইত্যাদি মহামন্ত্র উপদেশ করলেন। রাজা সুশীলও মুনির আদেশে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সাক্ষাৎ পাশুপত হয়ে বেদাভ্যাস করতে লাগলেন। তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন এবং সর্বাঙ্গে ভস্ম অবলেপন করে কন্দ, ফল-মূল খেয়ে শান্ত, সংযত হয়ে ক্রোধকে জয় করলেন।

পৃথুর পুত্র হবির্ধান পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে প্রাচীনবর্হিঃ নামে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী এক পুত্রের জন্ম দিলেন। শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই প্রাচীনবর্হিঃ আবার সমুদ্রতনয়ার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম দেন। এঁদেরই প্রচেতস্ বলা হয়। এই রাজাদের বীর্যের কথা জগতে বিশ্রুত ছিল। নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান হয়ে এঁরা সকলেই নিজ নিজ বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। এই দশজন প্রচেতার ঔরসে মারিষার গর্ভে মহাভাগ দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হল। এই দক্ষই আবার পূর্বজন্মে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ধীমান মহেশ্বর রুদ্রের সঙ্গে কলহ করেছিলেন বলে তাঁর অভিশাপে প্রচেতার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

একদিন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষকে তাঁদের গৃহে সমাগত দেখে মহাদেব স্বয়ং মহাদেবীর সঙ্গে তাঁকে যথোপযুক্তভাবে পূজা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ব্রহ্মার পুত্র তমোগুণে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাই সেই পূজা তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে অধিক হলেও তিনি ভাবলেন যে তা তাঁর উপযুক্ত হয় নি। ফলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। এর পর একদিন সতী পিতৃগৃহে গমন করলে নিতান্ত হীনমনা দক্ষ মহাদেবের সঙ্গে সতীকে নিন্দা করলেন। তারপর ক্রোধে উন্মাদ হয়ে এই সব নানা কথা

বলে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—তোমার স্বামী মহাদেবের চেয়ে আমার অন্য জামাতারা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার মন্দ কন্যা। তাই যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। মহাদেবপ্রিয়া দেবী দক্ষের এই কথা শুনে পিতাকে নিন্দা করলেন। তারপর পশুপতি ব্যাঘ্রচর্মাম্বর স্বামীকে প্রণাম করে যোগবলে নিজের শরীর দগ্ধ করে ফেললেন। এর পরেই তিনি হিমবানের তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শরণাগতের আর্তিনাশকারী ভগবান হর এই সমস্ত কথা জানতে পেরে দক্ষের গৃহে গমন করে ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষকে অভিশাপ দিলেন, তুমি এই ব্রাহ্ম দেহ ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মাবে। তারপর মোহগ্রস্ত হয়ে নিজেরই কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে। এই বলে মহাদেব কৈলাসে ফিরে গেলেন। স্বায়ম্ভুব দক্ষও কালক্রমে প্রাচেতস হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

আমি আপনাদের কাছে এতক্ষণ স্বায়ম্ভুব মনুর দক্ষ পর্যন্ত সৃষ্টির কথা বললাম। এই বৃত্তান্ত শুনলে পাপ নাশ হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে স্বায়ম্ভুব মনুসর্গকথন নামে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা বললেন, সূত, বৈবস্বত মন্বন্তরে দেব, দানব, গন্ধর্ব, সর্প ও রাক্ষসদের উৎপত্তির কথা বিশদভাবে বলুন। হে মহাবুদ্ধি, প্রচেতার পুত্র দক্ষকে মহাদেব অভিশাপ দিলে তিনি কী করেছিলেন, এখন সে-কথাই শুনতে চাই।

সূত বললেন, নারায়ণ পূর্বকালের প্রসঙ্গক্রমে প্রজাসৃষ্টির বিস্তারের বিষয়ে যে সব কথা বলেছিলেন, আমি তারই পুনরাবৃত্তি করব। এই কথা শুনলে ত্রিকালে সঞ্চিত সমস্ত পাপের নাশ হয়। প্রচেতার পুত্র দক্ষ পূর্বকালে মহাদেবের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে আগের শত্রুতার কথা স্মরণ করে গঙ্গাদ্বারে হরির যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণুর সঙ্গে অন্য সব দেবতারাও নিজ নিজ ভাগ গ্রহণের জন্য আহূত হয়েছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠরাও অন্যান্য মুনিদের সঙ্গে এসেছিলেন। সেই যজ্ঞে মহাদেব ছাড়া অন্য সমস্ত দেবতাকে উপস্থিত দেখে দধীচ নামে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ প্রাচেতস দক্ষকে বললেন, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই যাঁর আজ্ঞাধীন সেই রুদ্রদেবকে কি এখন যথানিয়মে পূজা করা হবে না? দক্ষ উত্তর দিলেন, সব যজ্ঞেই ভার্যার সঙ্গে মহাদেবের ভাগ আছে এমন কথা বলা হয় নি। এই কাজের জন্য মন্ত্রসমূহও দেখা যায় না। তাই তাঁর পূজা করি নি। তখন স্বয়ং সর্বজ্ঞানী মহামুনি দধীচ ক্রুদ্ধ হয়ে অট্টহাস্য করতে করতে, সমস্ত দেবতাদের শুনিয়ে তাঁদের প্রতি অবজ্ঞাভরে বললেন, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়েছে, যিনি বিশ্বের আত্মস্বরূপ, সেই পরমেশ্বর শঙ্করকে সব জেনেশুনেও কি সকল যজ্ঞে সকলে পূজা করে না? দক্ষ বললেন, এই রুদ্র তো শঙ্কর বা মঙ্গলকর নন, ইনি নগ্ন নরকপালে ভূষিত তমোগুণাচ্ছন্ন ধ্বংসকর্তা হর বলে পরিচিত। এঁকে বিশ্বের আত্মাও বলতে পারি না। প্রভু নারায়ণ হরিই ঈশ্বর ও জগৎস্রষ্টা। সত্ত্বগুণাবলম্বী ভগবান হরিকেই সর্বকার্যে পূজা করা হয়। দধীচ বললেন, আপনি কি সমস্ত লোকের একমাত্র সংহারকর্তা কালরূপী এই ভগবান সহস্রকিরণ পরমেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছেন না? বেদাধ্যায়ী ধার্মিক পণ্ডিতরাও যাঁর স্তব করে থাকেন,

ইনি সেই সর্বলোকসাক্ষী কালাত্মা সূর্য। ইনি সেই মহাদেবেরই এক রূপ। এই রুদ্রই মহাদেব, নৃমুণ্ডমাল, অথচ দয়ালু হর। ইনিই ভগবান আদিত্য সূর্য আর বিলোহিত নীলকণ্ঠ। আপনি এই বিশ্বস্রষ্টা, ত্রয়ীময় রুদ্রমূর্তি দর্শন করুন। দক্ষ বললেন, যে বারোজন আদিত্য যজ্ঞ ভাগ গ্রহণের জন্য এসেছেন, তাঁরা সকলেই সূর্য বলে খ্যাত। এঁরা ছাড়া অন্য সূর্য নেই। যাঁরা যজ্ঞ দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই দক্ষের এই কথা শুনে তাঁকে সাহায্য করার জন্য—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই, সে তো বটেই—বলতে লাগলেন। সেখানে যে শত সহস্র মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলেরই চিত্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় তাঁরা কেউই মহাদেবকে দেখতে পেলেন না। সকলেই বেদমন্ত্র আর মহাদেবের নিন্দায় মুখর হলেন। বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত হয়ে তাঁরা সকলে কেবল দক্ষের কথাই সমর্থন করতে লাগলেন। এমন কি যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য ইন্দ্র প্রমুখ যে সমস্ত দেবতা এসেছিলেন তাঁরাও নারায়ণ হরিকেই কেবল দেখলেন, দেব ঈশানকে দেখতে পেলেন না। ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মাও সকলের সামনে থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হলেন। ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলে দক্ষ স্বয়ং জগতের রক্ষক নারায়ণ হরির শরণ নিলেন। দক্ষ নির্ভয়ে যজ্ঞ শুরু করলেন আর শরণাগতের রক্ষক ভগবান বিষ্ণু সেই যজ্ঞকে রক্ষা করতে লাগলেন। ভগবান দধীচ ঋষি সমস্ত দেবতা ও ঋষিদের রুদ্রের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন দেখে আবার দক্ষকে বললেন, যে পূজনীয় নয়, তার পূজা করা আর যে পূজনীয় তাঁর পূজা না করা যে ঘোর পাপ, তাতে সন্দেহ নেই। যেখানেই অসতের আদর আর সজ্জনের অসম্মান হয় সেখানে অচিরেই ভয়ানক দৈবদণ্ড নেমে আসে। এই কথা বলে বিপ্রর্ষি সমাগত যে সমস্ত রুদ্রদ্বেষী ব্রাহ্মণ দক্ষকে সমর্থন করছিলেন, তাদের এই বলে শাপ দিলেন, তোমরা যখন পরমেশ্বরকে বেদ থেকে বহির্ভূত করলে আর লোকবন্দিত শঙ্করের নিন্দা করলে, তখন ঈশ্বরবিদ্বেষী তোমরা সকলেই বেদ থেকে বহিষ্কৃত হবে। তোমাদের চিত্ত মন্দ শাস্ত্রে আকৃষ্ট বলেই তোমরা শিবমার্গের নিন্দা করছ। তাই তোমাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল। মিথ্যা জ্ঞানের অভিমানে তোমরা স্ফীত। ঘোর কলিযুগে কলিকালের পাপের বোঝা নিয়ে সমস্ত তপস্যার ফল পরিত্যাগ করে তোমরা নরকে যাও। তোমরা যে হৃষিকেশকে আশ্রয় দিয়েছ, তিনিও তোমাদের প্রতি বিমুখ হবেন। তপোধন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এই কথা বলে নীরব হলেন এবং সর্বপাপহর রুদ্রকে আপন মনে ধ্যান করতে লাগলেন। এই অবকাশে সর্বদর্শিনী ভগবতী মহেশ্বরী সব কথা জানতে পেরে স্বামী পশুপতিকে বললেন, হে শঙ্কর, আমার পূর্বজন্মের পিতা দক্ষ আপনার স্বরূপ ও ঐশ্বর্যে নিন্দা করে যজ্ঞ করছেন। এই কাজে দেবতা আর মহর্ষিরা সাহায্য করছেন। আপনি সত্বর এই যজ্ঞ নষ্ট করুন। আমি এই বর প্রার্থনা করছি। পরমপুরুষ প্রভু দেবাদিদেবকে দেবী এই কথা জানালে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার ইচ্ছায় তিনি সহস্র বীরভদ্র নামে এক রুদ্রের সৃষ্টি করলেন। এই রুদ্রের সহস্রটি মস্তক, সহস্রটি চরণ, সহস্রটি নেত্র, বিশাল বাহু, সহস্র হস্ত। ইনি দুর্ধর্ষ, প্রলয়কালের বহ্নির মতো ভীষণ, দংষ্ট্রাকরাল। এঁর দিকে চেয়ে থাকা যায় না। এঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, দণ্ড। ইনি ভয়ানক গর্জন করছেন। ইনি ধনুর্ধর, ভস্মভূষিত। এঁর রূপ দেবাদিদেবেরই মতো। জন্ম নিয়েই ইনি কৃতাঞ্জলিপুটে মহেশ্বরের কাছে উপস্থিত হলেন।

মহেশ্বর এঁকে বললেন, হে গণেশ্বর, দক্ষ আমার নিন্দা করে গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করছে। তুমি তার যজ্ঞ পণ্ড কর। তোমার মঙ্গল হোক।

তখন বীরভদ্র বন্ধনমুক্ত সিংহের মতো অনায়াস গতিতে গিয়ে দক্ষের যজ্ঞ নাশ করলেন। পার্বতীও ক্রোধের বশে ভদ্রকালী নামে এক মহাকালীর সৃষ্টি করেছিলেন। বীরভদ্র তাঁরই সঙ্গে বৃষে আরোহণ করে গমন করেছিলেন। সেই ধীমান বীরভদ্র রোমজ নামে আরো হাজার হাজার রুদ্র সৃষ্টি করেন। এঁরা তাঁর সাহায্যকারী। এঁরাও কালাগ্নি রুদ্রের মতো অতি ভীষণ। এঁদের সকলের হাতে শূল, শক্তি. গদা. দণ্ড আর প্রস্তর। এঁরা একসঙ্গে দশ দিক নিনাদিত করে ভার্যার সঙ্গে বৃষে আরোহণ করে দক্ষযজ্ঞে গমন করলেন। গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হয়ে এঁরা অমিততেজা দক্ষের সেই যজ্ঞ ভূমি দেখতে পেলেন। হাজার দিব্য রমণী সেই যজ্ঞভূমি অলংকৃত করে ছিল। অপ্সরারা সেখানে গান গাইছিল, বীণা ও বেণুর ধ্বনিতে সেই যজ্ঞস্থলী মনোরম আর বেদের তর্কে মুখর হয়েছিল। বীরভদ্র দেবতা ও মহর্ষিদের সঙ্গে উপবিষ্ট দক্ষ প্রজাপতিকে দেখে ঈষৎ হাসতে হাসতে ভদ্রকালী আর রুদ্রদের সঙ্গে মিলে বলতে লাগলেন, আমরা সকলে অমিতবীর্য শিবের অনুচর। যজ্ঞের ভাগ নেবার জন্যই আমরা এসেছি। আমরা যা চাই, সেই মতো যজ্ঞভাগ আমাদের দাও। হে মুনিগণ, বল, আমাদের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ দিতে কে তোমাদের বারণ করেছে ? তোমরা বল, আমরা সেই ব্যক্তিকে দেখতে চাই। প্রজাপতি প্রমুখ দেবগণ গণেশ্বরের কথা শুনে বললেন, প্রভু, আপনাকে যজ্ঞভাগ দেওয়া যেতে পারে, এ রকম কথা কোন মন্ত্রেই বলা হয় নি। তখন মন্ত্রগণ বলে উঠলেন, দেবগণ, আপনাদের চিত্ত অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়েছে। তাই আপনারা যজ্ঞের রাজা মহেশ্বরের পূজা করছেন না। হরই সর্ব-ভূতের ঈশ্বর। অন্য সব দেবতা তাঁরই শরীর। তিনিই সর্বপ্রকার সম্পদ ও সিদ্ধি দান করেন। সমস্ত যজ্ঞে তাঁরই পূজা হয়ে থাকে। মন্ত্রগণ গণেশ্বরকে এই কথা বলে মায়ার দ্বারা হতচেতন দেবতাদের সম্মান না করেই তাঁদের ত্যাগ করে নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন। তারপর ভার্যা আর গণেশ্বরদের সঙ্গে ভগবান বীরভদ্র বিপ্রর্ষি দধীচকে হস্ত দিয়ে স্পর্শ করে দেবতাদের বললেন, তোমরা বলদর্প দিয়ে মন্ত্রগণকে প্রমাণ করতে পারলে না। তাই এখনই তোমাদের বিনাশ করব। তোমাদের অত্যন্ত গর্ব হয়েছে। এই কথা বলেই গণেশ্বর যজ্ঞশালা দগ্ধ করলেন আর অন্যান্য গণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে যূপকাষ্ঠ উপড়ে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। ভীষণ দর্শন সেই গণেরা স্তোতা আর হোতার সঙ্গে যজ্ঞের ঘোড়াটিকেও গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। দীপ্তাত্মা বীরভদ্র অক্লেশে দেবগণ ও ইন্দ্রের উদ্যত হাতকে স্তম্ভিত করে দিলেন। অবলীলাক্রমে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে ভগ দেবতার দুটি চোখ উপড়ে ফেললেন আর মুষ্ট্যাঘাত করে পূষার সমস্ত দন্ত চূর্ণ করে ফেললেন। বলবান সেই গণেশ্বর হাসতে হাসতেই চন্দ্রকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে পিষ্ট করলেন। গণেরা অগ্নির হাত দুটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং অবলীলাক্রমে তাঁর জিভ উপড়ে নিলেন আর মুনিদের মাথায় পদাঘাত করতে লাগলেন। আর মহাবল বীরভদ্র গরুড়ের পিঠে বিষ্ণুকে আসতে দেখে তাঁর সুদর্শন চক্রকে আটকে দিলেন এবং তীক্ষ্ন তীর দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন মহাভুজ গরুড় বীরভদ্রকে দেখে প্রবলবেগে পাখা ঝাপটাতে লাগলেন এবং সমুদ্র গর্জনের মতো ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন। তাতে স্বয়ং বীরভদ্র বৈনতেয় গরুড়ের চেয়েও শক্তিধর সহস্র সহস্র গরুড় সৃষ্টি করলেন। তারা বিনতার পুত্রকে তাড়া করল। বুদ্ধিমান গরুড় এই পরিস্থিতি দেখে মাধবকে ফেলেই দ্রুত বেগে পালাতে লাগলেন। এতে এক আশ্চর্য ঘটনার সৃষ্টি হল। গরুড় অদৃশ্য হলে ভগবান ব্রহ্মা এসে বীরভদ্র আর কেশবকে থামালেন। ব্রহ্মা মহাদেবের গৌরব হেতু বীরভদ্রকে সন্তুষ্ট করলেন

এবং মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন। তাতে মহাদেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান ব্রহ্মা, দক্ষ ও দেবগণ সকলেই মহাদেবকে দেবীর সঙ্গে উপস্থিত দেখে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। দক্ষ হাত জোড় করে ঈশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী ভগবতী পার্বতীকে বিশেষ করে নানা রকম ভাবে স্তুতি করতে লাগলেন। তখন দয়াশীলা পার্বতী প্রসন্ন চিত্তে হাসতে হাসতে মহেশ্বর রুদ্রকে বললেন, দেব, আপনিই সমস্ত জগতের স্রষ্টা আর নিয়ন্তা। দক্ষ ও দেবতারা সকলেই আপনার অনুগ্রহভাজন। তা শুনে ভগবান জটাজুটধারী নীললোহিত হর হাসতে হাসতে প্রণত দেবগণ ও দক্ষরাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেবগণ, আমি তোমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছি। এখন তোমরা চলে যাও। আমি সমস্ত যজ্ঞেই পুজো পাবার যোগ্য। কোন ভাবেই আমার নিন্দা করো না। দক্ষ, আমি সমস্ত কার্যের রক্ষার কারণ রূপে যে কথা তোমাকে বলছি, তা শোন। সাধারণ লোকের মতো বুদ্ধি ত্যাগ করে যত্ন সহকারে আমাতে ভক্তি কর। আমার অনুগ্রহে কল্পের শেষে তুমি গণেশ্বর হবে। এখন আমি আদেশ করছি তুমি নিজের রাজ্যে সুখে বাস কর। এ কথা বলেই ভগবান পত্নী আর অনুচরদের সঙ্গে অমিততেজা দক্ষের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হলেন। মহাদেব অদৃশ্য হলে স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা দক্ষকে সমস্ত জগতের কল্যাণসাধক এই বাক্য বললেন, বৃষভধ্বজের প্রসাদে তোমার মোহ আশা করি কেটে গেছে। দেবাদিদেব নিজে যা বলে গেলেন, আলস্য ত্যাগ করে তাই কর। এই ঈশ্বরই সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরা এঁকেই পরব্রহ্মস্বরূপ দেখে থাকেন। ইনিই সর্বভূতের আত্মা, সকলের বীজ এবং আশ্রয়। বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সকলে সেই দেবদেবেরই স্তব করে থাকে। যারা ভক্তিপূর্ণ ও তদ্গত চিত্তে সেই সনাতন রুদ্রের উপাসনা করে, তারাই পরম পদ লাভ করে। পরমেশ্বর মহেশ্বরের আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই। এই কথা জেনে যত্ন সহকারে কায়মনোবাক্যে তাঁরই ভজনা কর। শিবনিন্দা তোমার বিনাশের কারণ, সযত্নে একে পরিহার কর। যে তাঁর নিন্দা করে, তার সমস্ত কার্যই দোষাবহ হয়। এই যে মহাযোগী অব্যয় বিষ্ণুকে দেখছ, ইনিও সেই ভগবান মহাদেব রুদ্রের এক রূপ। এতে কোন সংশয় নেই। যারা জগৎকারণ বিষ্ণুকে মহাদেবের থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, তারা বেদের তাৎপর্য বুঝতে পারে না এবং অন্তিম কালে নরকে যায়। যারা বেদার্থ বুঝতে পারে তারা নারায়ণ আর রুদ্রকে অভিন্ন বলেই জানে এবং তাদেরই মুক্তি ঘটে। যিনি বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনিই জনার্দন—এ কথা বুঝে যে পুজো করে সে-ই পরম পদ লাভ করে। ইনিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণু তারই পালক। তাই সমস্ত জগৎকে লোকে রুদ্র নারায়ণের থেকে উদ্ভূত বলে। তাই হরের নিন্দা পরিত্যাগ করে হরেই চিত্ত সমর্পণ করে ব্রহ্মবাদীদের শরণ্য হরের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ কর।

এরপর প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার কথায় গোপতি ভগবান কৃত্তিবাসের শরণ নিলেন। আর যে সমস্ত মহর্ষি দেবমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে শিবের নিন্দা করে দধীচের অভিশাপের অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিলেন, তাদের তপোবল নিঃশেষে বিনষ্ট হবে এবং কলিকালে ব্রাহ্মণ-কুলে তাদের জন্মটুকুই হবে। কল্পের শেষ পর্যন্ত কালধর্মের কবলিত হয়ে তারা রৌরব প্রভৃতি নরকে বার বার পতিত হতে থাকবেন। পরে ব্রহ্মবাক্যে এবং পূর্বসংস্কারের মাহাত্ম্যে শাপ থেকে মুক্তিলাভ করে সূর্যসদৃশ রূপ লাভপূর্বক ব্রহ্মার অনুমতি পেয়ে স্বর্গের অধিপতি জগতের অধীশ্বর পরব্রহ্মরূপ মহেশের আরাধনা করে তাঁরই প্রসাদে নিজেদের পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

দক্ষযজ্ঞ নাশের কথা তো আপনারা শুনলেন। এখন দক্ষকন্যাদের সন্তান সন্ততির কথা বলি।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংস নামে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, দক্ষকে পুরাকালে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ করলে তিনি দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি, অসুর আর সর্পের সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করতে করতে যখন আর সেই সমস্ত প্রজার বৃদ্ধি হল না, তখন ধর্মসঙ্গত মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। বীরণ নামে প্রজাপতির কন্যা ছিলেন অসিক্নী। দক্ষ এই ধর্মনিরতা কন্যার গর্ভে এক হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। নারদের মায়ায় সেই সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হলে দক্ষ বীরণ কন্যার গর্ভে ষাটজন কন্যার জন্ম দিলেন। তাদের মধ্যে দশটি দান করলেন ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে, চারটি অরিষ্টনেমিকে, দুটি বহুপুত্রকে, দুটি ধীমান কৃশাশ্বকে আর দুটি অঙ্গিরাকে। তাদের কথা সবিস্তারে বলছি।

যে দশজন দক্ষকন্যা ধর্মের পত্নী ছিলেন, তাঁদের নাম মরুত্বতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও ভামিনীবিশ্বা। তাঁদের পুত্রদের নাম শুনুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্‌গণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে ভানুগণ, মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্তজগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ, যামীর গর্ভে নাগবীথী, অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীর সমস্ত বিষয় এবং সংকল্পার গর্ভে সংকল্প জন্মগ্রহণ করেন। এরা সকলেই ধর্মের পুত্র।

এখন অষ্টবসুর কথা বলব। এই দেবতাদের প্রাণ হল অনেক 'বসু'। আর এঁদের সম্মুখে জ্যোতি বর্তমান। আপ্, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই আটজন অষ্টবসু বলে বিখ্যাত। আপের পুত্রদের নাম বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র ভগবান কাল—যিনি লোকের প্রকাশক। ভগবান বর্চ সোমের পুত্র। ধরের পুত্র দ্রবিণ। অনিলের পুত্রদের নাম মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অনলের পুত্র সেনাপতি কুমার। ভগবান যোগী দেবল প্রত্যুষের পুত্র আর শিল্পকার প্রজাপতি বিশ্বকর্মা প্রভাসের পুত্র।

কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু এবং ধর্মনিষ্ঠা মুনি। এখন এঁদের পুত্রদের নাম শুনুন। অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, অংশুমান ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ দেবতা পুরাকালে চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত দেবতা নামে বিখ্যাত ছিলেন। পরে যখন বৈবস্বত মনুর কাল উপস্থিত হল, তখন এঁরাই অদিতির পুত্র হয়ে জন্মালেন। এঁদের নাম হল দ্বাদশ আদিত্য। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে বলদর্পিত দুই পুত্র জন্মেছিল। জ্যেষ্ঠের নাম হিরণ্যকশিপু ও কনিষ্ঠের নাম হিরণ্যাক্ষ।

দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বল ও বিক্রম ছিল বিপুল। তিনি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে তপস্যার দ্বারা আরাধিত করেছিলেন এবং নানাভাবে তাঁর স্তব করে দিব্য বর লাভ করেছিলেন। তখন মহর্ষি ও দেবগণ তাঁর বলদর্পে পীড়িত ও তাড়িত হয়ে শরণ্য, রক্ষাকর্তা, জগদ্‌ব্যাপী, লোকস্রষ্টা, ত্রাতা, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়, কূটস্থ পুরাণপুরুষ, পুরুষোত্তম

পিতামহের কাছে গেলেন। হে মুনীশ্বরগণ, কমলাসন ব্রহ্মা মুনি আর দেবতাদের প্রার্থনায় সমস্ত দেবতার হিতের জন্য ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে যেখানে ভগবান হরিকে প্রণত মুনিরা স্তব করছেন, সেখানে গেলেন। জগদ্‌যোনি বিশ্বগুরু বিষ্ণুকে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর পাদমূলে মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনিই সমস্ত ভূতের গতি। সকল দেবতাই আপনার শরীরস্বরূপ। আপনি অনন্ত। এই সব কিছুর আত্মা আপনিই। আপনি মহাযোগী, সর্বব্যাপী এবং সনাতন। আপনি সর্বভূতের আত্মা, প্রধান পুরুষ, পরা প্রকৃতি। আপনি একই সঙ্গে বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যে নিরত। বাক্যে আপনাকে প্রকাশ করা যায় না। আপনি নিরঞ্জনস্বভাব, জগতের স্রষ্টা ও পালক। আপনিই দেবদ্বেষীদের নিধনকারী। হে অনন্ত, হে ঈশ, আপনি পরমেশ্বর, আমাদের রক্ষা করুন। দ্বিজগণ, ভগবান পীতবসন বিষ্ণু ব্রহ্মার এই কথা শুনে জেগে উঠলেন। কমলনয়ন মেলে তিনি দেবতাদের বললেন, হে মহাবীর্য দেবগণ, কি কারণে তোমরা প্রজাপতিকে নিয়ে এখানে এসেছ? আমিই বা তোমাদের জন্য কী করতে পারি? দেবতারা বললেন, ভগবন, দৈত্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে গর্বিত হয়ে সমস্ত দেবতা আর মহর্ষি-দের ওপর উৎপাত শুরু করেছে। জগন্ময়, আপনি ছাড়া আর কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না। সকলের মঙ্গলের জন্য আপনি তাকে হত্যা করে সকলকে রক্ষা করুন। লোকস্রষ্টা ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের কথা শুনে দৈত্যরাজকে বধ করার জন্য ভয়ংকর এক পুরুষের সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষের শরীর মেরুপর্বতের মতো বিশাল, হাতে শংখ, চক্র, গদা। এঁর রূপ অতি ভীষণ। এঁকে বিষ্ণু বললেন, নিজের পৌরুষে ঐ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে আবার শীঘ্র এই স্থানে ফিরে আসবে। শংখ-চক্র-গদাধারী পুরুষ বিষ্ণুর কথা শুনে অব্যক্ত মহাপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণাম করে ঘোর গর্জন করতে করতে গরুড়ে আরোহণপূর্বক অগ্রসর হলেন। দেখে মনে হল যেন দ্বিতীয় সুমেরু পর্বত চলেছেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ মহামেঘের মতো সেই ভীমনাদ শুনে দৈত্যরাজের ভয়ে সেই রকম শব্দ করতে শুরু করলেন। অসুরেরা বলাবলি করতে লাগল, দেবতারা কোন মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন। তিনি ভৈরব হুংকারে আসছেন। আমাদের মনে হয় ইনিই জনার্দন।

তখন হিরণ্যকশিপু বর্মে আবৃত অস্ত্রধারী প্রহ্লাদ প্রমুখ পুত্র ও দৈত্যবরদের সঙ্গে স্বয়ং গমন করলেন। গরুড়ের পৃষ্ঠে আরূঢ় কোটি সূর্যের মতো দীপ্তিময় দ্বিতীয় নারায়ণ তুল্য পর্বতাকৃতি সেই পুরুষকে দেখে কেউ কেউ পলায়ন করল, কেউ বা সসম্ভ্রমে তাকিয়ে পরস্পর জল্পনা করতে লাগল, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের শত্রুস্বরূপ রক্ষাকর্তা অব্যক্ত নারায়ণ। আর নয়তো তাঁর পুত্র এসেছেন। এই কথা বলে দৈত্যেরা সেই পুরুষকে লক্ষ্য করে শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি অবলীলায় অক্ষত দেহে সেই সমস্ত অস্ত্রকে বিনষ্ট করলেন। তারপর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে হিরণ্যকশিপুর প্রথিতবীর্য চার পুত্র মেঘের মতো নাদ করতে করতে নারায়ণ থেকে উৎপন্ন পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র, অনুহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংহ্লাদ কৌমারাস্ত্র আর হ্লাদ আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করল। কিন্তু এই চার প্রকার অস্ত্রও বিষ্ণু থেকে জাত বিষ্ণুতুল্য সেই পুরুষের কাছে গিয়েও তাঁকে কোন ভাবেই বিচলিত করতে পারল না। তখন সেই মহাবাহু মহাবল পুরুষ স্বহস্তে দৈত্যরাজের পুত্রদের পা ধরে টেনে তাদের দূরে ছুড়ে ফেললেন। বলবান হিরণ্যকশিপু নিজের পুত্রদের দূরে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে সবলে তাঁর

বক্ষে পদাঘাত করলেন।

তখন সেই পুরুষ দৈত্যরাজের প্রহারে অত্যন্ত কাতর হয়ে গরুড়ে আরোহণ করে প্রভু নারায়ণের কাছে শীঘ্র পলায়ন করলেন। সেখানে গিয়ে সমস্ত ঘটনা সর্বজ্ঞ নারায়ণকে জানালে অমলস্বভাব বিষ্ণু মনে মনে কল্পনা করে অর্ধেক মনুষ্যশরীর ও অর্ধেক সিংহের শরীর ধারণ করে নৃসিংহ মূর্তিতে শান্ত ভাবে হিরণ্যকশিপুর সামনে আবির্ভূত হলেন। দিনের মধ্যভাগে সব কিছুর সংহারে সমর্থ স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হলে সূর্যের যেমন রূপ হয়, সেই যোগাত্মা অনন্ত নারায়ণও প্রলয়কালের বহ্নির মতো ঘোর এবং করালদংষ্ট্র রূপ নিয়ে দৈত্য ও দানবদের বিহ্বল করে ফেললেন। অসুর হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ মূর্তি দেখে তাঁকে হত্যা করার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদকে বললেন, এই নৃসিংহ পুরুষের শক্তি পূর্বের পুরুষটির তুলনায় কম। আমার আদেশ—তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে গিয়ে শীঘ্র একে হত্যা কর। এই কথা বলে তিনি প্রহ্লাদকে যুদ্ধে পাঠালেন। অসুর প্রহ্লাদ তাঁর আদেশে সমস্ত শক্তি দিয়ে অব্যয় বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কাছে পরাজিত হলেন। তখন দৈত্যপতি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে পাঠালেন। তিনি ধ্যান করে পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ও বার বার সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলেন। কিন্তু সেই অস্ত্র যেমন মহাদেবের কোন ক্ষতি করে না, সেই রকম দেবাদিদেব অমিতবীর্য বিষ্ণুরও কোন ক্ষতি করতে পারল না।

প্রহ্লাদ যখন দেখলেন সমস্ত অস্ত্রই প্রতিহত হচ্ছে, তখন নিজের সৌভাগ্যবশত তাঁকে সকলের আত্মা সনাতন বাসুদেব বলে বুঝতে পারলেন। তিনি সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে সাত্ত্বিক চিত্তে যোগীদের হৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে প্রণাম করলেন আর ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র দ্বারা নারায়ণের স্তব করলেন। তারপর পিতা, ভ্রাতা ও হিরণ্যাক্ষকে নিবৃত্ত করে বলতে লাগলেন, ইনি সনাতন, অনন্ত, অজ, পুরাণপুরুষ, মহাযোগী, জগদ্ব্যাপী, ভগবান বিষ্ণু। ইনিই ধাতা, বিধাতা, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি নিরঞ্জন, প্রধানপুরুষ, জগতের মূলতত্ত্ব আর অব্যয় প্রকৃতি। ইনিই সমস্ত ভূতের ঈশ্বর আর অন্তর্যামী, ইনি সর্বগুণাতীত। আপনারা এই অব্যক্ত অক্ষর বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করুন।

কিন্তু হিরণ্যকশিপুর দুর্বুদ্ধির সীমা ছিল না। তিনি বিষ্ণুর মায়ায় অত্যন্ত মোহিত হয়ে পুত্রকে বলতে লাগলেন, এই নৃসিংহের বিক্রম অল্প। একে যে রকম ভাবে পারো বধ কর। কালপ্রেরিত হয়ে এ আমাদের গৃহে এসেছে। তখন মহামতি পুত্র প্রহ্লাদ হাসতে হাসতে পিতাকে বললেন, এঁকে নিন্দা করবেন না। ইনি সর্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর। এঁর ক্ষয় নেই। ইনি শাশ্বত, মহান দেবতা। কালের গ্রাস এঁর জন্য নয়। ইনিই কালের আত্মা স্বয়ং কালরূপধারী বিষ্ণু। কালের সাধ্য কি এঁকে বিনাশ করে?

কিন্তু দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু পুত্রের দ্বারা নিবারিত হয়েও কালের অমোঘ নির্দেশে অব্যয় হরির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন ভগবান অনন্ত রক্তচক্ষু হয়ে প্রহ্লাদের সামনেই হিরণ্যকশিপুকে নখর দিয়ে বিদীর্ণ করলেন।

হিরণ্যকশিপুকে নিহত দেখে হিরণ্যাক্ষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে শিশু প্রহ্লাদকে ফেলেই পালিয়ে গেলেন। অনুহ্লাদ প্রমুখ পুত্রদের আর শত শত অনুচরকে নরসিংহের দেহ থেকে নির্গত সিংহ যমালয়ে প্রেরণ করল। তখন প্রভু নারায়ণ হরি সেই রূপ সংবরণ করে নিজের নারায়ণ নামক রূপ ধারণ করলেন।

নারায়ণ চলে গেলে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ শাস্ত্রসম্মত অভিষেক ক্রিয়ার দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে

সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু হিরণ্যাক্ষও মুনিদের জয় করে দেবতাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়ন করতে লাগলেন। মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে তিনি অন্ধক নামে এক মহাপুত্র লাভ করেছিলেন। সে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাকে জয় করল এবং পৃথিবীকে বন্ধন করে পাতালে নিয়ে গেল। সে সমস্ত দেবতার দীপ্তি হরণ করল। তখন পিতামহ প্রমুখ দেবগণ শুষ্ক মুখে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কিছু জানালেন। অব্যয় বিশ্বাত্মা নারায়ণ তার বধের উপায় স্থির করলেন এবং সর্বদেবময় শুভ্র শূকরদেহ ধারণ করলেন। পুরুষোত্তম বরাহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করে কল্পারম্ভে পৃথিবীকে নিজের দন্ত দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। ভগবান এই ভাবে অসুরদের বশীভূত করে শূকররূপ ত্যাগ করে নিজের দিব্য প্রকৃতি পরম পদ প্রাপ্ত হলেন। দেবশত্রু হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে প্রহ্লাদ তাঁর অসুরোচিত স্বভাব পরিত্যাগ করে বিষ্ণুনিষ্ঠ হয়ে স্বরাজ্য পালন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর আরাধনায় চিত্ত অর্পণ করে তিনি বিধি অনুসারে দেবযজ্ঞসমূহ সম্পাদন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে তাঁর রাজ্য সব রকম ভাবে শত্রুশূন্য হয়ে উঠল।

তারপর একদিন অসুর প্রহ্লাদ দেবগণের মায়ায় অভিভূত হয়ে গৃহে সমাগত কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের পূজা করলেন না। মোহগ্রস্ত দৈত্যরাজের দ্বারা এই রকম ভাবে অপমানিত হয়ে তাপস ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে উঠলেন এবং এই বলে তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি যার বলে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করছ, তোমার সেই দিব্য বৈষ্ণবী শক্তি বিনষ্ট হবে। এই কথা বলে ব্রাহ্মণ সত্বর প্রহ্লাদের গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। শাপের প্রভাবে দৈত্যও রাজের প্রতি আসক্তিতে অভিভূত হয়ে রইলেন। নারায়ণের মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের অবমাননা করতে লাগলেন এবং পিতার হত্যার কথা মনে করে নারায়ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। দেবদ্বেষী প্রহ্লাদ আর নারায়ণের মধ্যে তখন ভীষণ রোমহর্ষণ যুদ্ধ হল।

ঘোরতর যুদ্ধের পর প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে পরাজিত হয়ে পূর্ব সংস্কারের মাহাত্ম্যে প্রধান পুরুষ নারায়ণের শরণ নিলেন। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তারপর থেকে অনন্য ভক্তি সহকারে নারায়ণের সেবায় রত হলেন এবং মহাযোগবলে সেই পুরুষোত্তমকেই প্রাপ্ত হলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্রের অন্তর যোগের দিকে আকৃষ্ট হলে শিবের দেহ থেকে উদ্ভূত হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক সেই বিশাল রাজ্যের অধিকারী হল। সে মন্দর পর্বতে স্থিত ভগবতী পার্বতী দেবীকে কামনা করতে লাগল। পুরাকালে হাজার হাজার গৃহমেধী মুনি পবিত্র দেবদারু বনে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য দুশ্চর তপস্যা করছিলেন। তারপর কোন সময়ে কাল ধর্মের নিয়মে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এই অনাবৃষ্টির প্রতিকার করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং এর ফলে প্রাণীদের মৃত্যুও হচ্ছিল। তখন মুনিরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে তপোধন গৌতমের কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রাণ ধারণের উপযুক্ত খাদ্য প্রার্থনা করলেন, গৌতম সেই মুনিদের নানা প্রকার পরিষ্কৃত অন্ন দিয়েছিলেন আর তাঁরা সকলেই তা নির্ভয় চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর কল্পান্তের মতো বারো বছর কেটে গেলে সকলের মঙ্গলদায়ক বিপুল বৃষ্টি হল এবং জগৎও পূর্বের মতো হয়ে উঠল। মুনিরা তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলে মিলে মহর্ষি গৌতমের কাছে গিয়ে বললেন, এবার আমরা যাই। গৌতম তাঁদের বারণ করে বলতে লাগলেন, পণ্ডিতগণ, আপনারা আর কিছু দিন আমার বাড়িতে

আরামে থাকুন। তার পরে নিশ্চয়ই যাবেন। তখন মুনিরা সকলে মিলে এক কৃষ্ণবর্ণ গাভী সৃষ্টি করে গৌতমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গাভীটিকে দেখে গৌতমের মনে দয়া হল। তিনি একে পালন করতে উৎসুক হলেন। কিন্তু তাকে যেই তিনি গোষ্ঠে বাঁধতে গেলেন, অমনি স্পর্শ করা মাত্র সে প্রাণত্যাগ করল। এই শোকে মহামুনি এত কাতর হলেন যে কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় সে সব কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তখন মুনিরা হঠাৎ এসে পড়ে তাঁকে বললেন, দ্বিজবর, এই গোহত্যার পাপ তোমার শরীরে যত দিন থাকবে, তত দিন আমাদের পক্ষে তোমার দেওয়া অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। তাই আমরা চললাম। এইভাবে ছল করে মুনিরা গৌতমকে পাপের ভাগী করলেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে পূর্বের মতো পবিত্র দেবদারু বনে তপস্যা করতে গেলেন।

এরপর গৌতম মুনি কোন ভাবে জানতে পারলেন যে গোহত্যা-জনিত এই পাপ তাঁদের মায়ার ফলে হয়েছে। তাতে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিলেন, রে পাপিষ্ঠেরা, তোরা মহাপাতকী। তাই তোরা বেদবহিষ্কৃত হবি। আমি শাপ দিচ্ছি, তোদের বার বার জন্মাতে হবে। তখন গৌতমশাপ-গ্রস্ত উচ্ছিষ্টতুল্য অপবিত্র মুনিরা দেবতাধিপতি শংকর ও অব্যয় বিষ্ণুকে লৌকিক স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে বলতে লাগলেন, আপনারা মহাযোগী। স্বেচ্ছায় আপনারা যে কোন স্থানে গমন করতে পারেন। আপনারা ভক্তজনের দুঃখ দূর করেন। আপনারা আমাদের এই পাপ থেকে মুক্ত করুন। তখন মহাদেব পাশে উপবিষ্ট বিষ্ণুর দিকে চেয়ে বললেন, এরা পুণ্য করতে চায়। এদের কী গতি হবে বলুন।

ভক্তবৎসল শরণ্য ভগবান বিষ্ণু বিপ্রশ্রেষ্ঠদের প্রণত দেখে গোপতি শঙ্করকে বললেন, মহাদেব, যে সমস্ত লোককে বেদবহিষ্কৃত করা হয়েছে, তাদের কিছুমাত্র পুণ্য থাকে না। কারণ ধর্ম বেদ থেকেই উৎপন্ন। তাই এরা অবশ্যই নরকে যাবে। কিন্তু মহাদেব, তবুও ভক্তের প্রতি বাৎসল্যবশত এই ব্যক্তিদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বৃষধ্বজ, তাই আমি বেদবহিষ্কৃত এই পাপিষ্ঠদের রক্ষা করার জন্য ও এদের বিমোহিত করার জন্য শাস্ত্র রচনা করব। মুরারি মাধব এইভাবে রুদ্রকে সম্বোধন করলেন এবং শিবের প্ররোচনায় কেশব উৎসাহিতও হলেন। তাঁরা দুজনে তখন কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব, পূর্ব-পশ্চিম, পঞ্চরাত্র এবং পাশুপত ও অন্যান্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করলেন। এই সমস্ত শাস্ত্র সৃষ্টি করে তাঁরা তাদের বললেন, বেদবহিষ্কৃত হয়ে এবং অনেক কল্প ধরে মনুষ্যজন্ম লাভ করে তোমাদের ঘোর নরকে বার বার নিপতিত হবার সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রবিহিত কার্য করে নিজেদের ঈশ্বর-আরাধনার শক্তিতে পাপক্ষয়-পূর্বক তোমরা সদ্গতি লাভ কর। তোমরা আমার আদেশ মেনে চল। নাহলে তোমাদের অন্য কোন উপায়ে মুক্তি হবে না। দেবতানিষ্ঠ মহর্ষিগণ শিব ও বিষ্ণুর এই আদেশে তাঁদের কথা শুনেছিলেন। সেই সমস্ত শাস্ত্রে নিরত থেকে আবার তারা অন্যান্য নানা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। ফলপ্রদর্শন করে এই সমস্ত শাস্ত্র তারা শিষ্যদের পড়িয়েওছিলেন।

ভগবান শংকর দুষ্টনিগ্রহের জন্য ভৈরবকে নিযুক্ত করে নিজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। নরমুণ্ডের মালায় তিনি সজ্জিত, জটাজুটে শোভিত আর সমস্ত দেহ তাঁর প্রেতভস্মে ঢাকা। সমস্ত পৃথিবীকে এই রূপে মোহিত করে ঐ ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভিক্ষা করেছিলেন। সেই সময়ে দেবী পার্বতী আর তাঁর কুলনন্দন

পুত্রকে তিনি অমিততেজা বিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে ও প্রমথাদি গণসমূহকেও সেখানেই রেখে গিয়েছিলেন। মহাদেব প্রস্থান করার পর স্বয়ং বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ রমণীয় স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে মহাদেবী পার্বতীকে সব সময়ে সেবা করতে লাগলেন। মহাদেবের অতিশয় প্রীতির পাত্র গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর পূর্বের মতো দ্বারদেশেই অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময়ে দুর্মতি অন্ধক নামে দৈত্য পার্বতীকে হরণ করার উদ্দেশ্যে মন্দর পর্বতে আগমন করল। অমেয়াত্মা কালরূপধারী শঙ্করমূর্তি কালভৈরব অন্ধককে দেখে প্রবেশ করতে বারণ করলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ভীষণ রোমহর্ষণ যুদ্ধ হল। কালভৈরব সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থল শূল দিয়ে বিদীর্ণ করলেন। তখন অন্ধক দৈত্য অন্ধক নামে সহস্র দৈত্যের সৃষ্টি করল। তারা নন্দীশ্বর প্রমুখ দেবতাকে পরাজিত করল। ঘণ্টাকর্ণ, মেঘনাদ, চণ্ডেশ, চণ্ডতাপন, বিনায়ক, মেঘবাহ, সোমনন্দী ও বৈদ্যুত নামে অতি বলশালী গণেরা শূল, শক্তি, পরশু ও দ্বিধার খড়্গ নিয়ে দৈত্যরাজ অন্ধকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন অত্যন্ত শক্তিশালী দৈত্যপতি তাদের পা ধরে হাত দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে একশো যোজন দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর অন্ধক প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তেজস্বী যে শতসহস্র অন্ধক দৈত্য সৃষ্টি করেছিল, তারা ভৈরবের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগল। এই সময়ে চারদিকে কেবল ভয়ঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে হা হা শব্দ ধ্বনিত হতে লাগল। ভৈরবদেব ভীষণ শূল নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হরমূর্তি ভৈরব যখন দেখলেন যে অন্ধকদের সৈন্যকে জয় করা দুঃসাধ্য, তখন নিজে প্রায় পরাজিত হয়ে ভগবান বিভু অজ বাসুদেবের শরণ নিলেন। তারপর দেবীর পার্শ্বস্থিত ভগবান বিষ্ণু অসুর সংহারের জন্য একশোজন উত্তম দেবীর সৃষ্টি করলেন। বিষ্ণুর মাহাত্ম্যে ঐ সমস্ত দেবী অতি সহজেই যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র অন্ধককে হত্যা করলেন।

তখন মহাসুর অন্ধক নিজের সৈন্যকে পরাজিত হতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবেগে পলায়ন করল।

তারপর মহাদেব ভক্তদের মঙ্গলের জন্য বারো বছর লীলা করে মন্দর পর্বতে এলেন। দ্বিজগণ, গণেশ্বরেরা সকলেই মহাদেব এসেছেন জানতে পেরে ব্রাহ্মণেরা যেমন সূর্যোপাসনা করে, সেই রকম ভাবে তাঁর উপাসনা করতে এলেন। যোগবিহীন ব্যক্তিদের পক্ষে দুরধিগম্য পবিত্র ভবনে প্রবেশ করে মহাদেব ভৈরব নন্দী ও কেশবকে দেখতে পেলেন। প্রথমে নন্দী তাঁকে প্রণাম করলে তিনি নন্দীকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন। তারপর প্রীতিপূর্বক নারায়ণকে আলিঙ্গন করলেন। আনন্দে বিস্ফারিতনয়না পার্বতী দেবী মহাদেবকে দেখে তাঁর চরণে মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং শঙ্করকে জয়ের কথা জানালেন। তখন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য জেনে শঙ্করেরই অন্য মূর্তি ভৈরবও তাঁর কাছে এলেন। মহাদেব নারায়ণের বিক্রম ও জয়ের কথা শুনে দেবীর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। তারপর সমস্ত দেবতা ও মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ দেবাদিদেব ত্রিলোচনকে দেখবার জন্য মন্দর পর্বতে উপস্থিত হলেন। দেবসৈন্যারূপী একশত যে দেবী পূর্বে দৈত্যসৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন তাঁরাও মহাদেবের দর্শনলাভের ইচ্ছায় এলেন।

চন্দ্রশেখর মহাদেবকে পার্বতীর সঙ্গে বরাসনে উপবিষ্ট দেখে দেবীরা ভক্তিসহকারে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং সাগ্রহে গান করতে লাগলেন। মহাদেবের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা ভগবতী গিরিজা এবং দেবাসনে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণকেও তাঁরা প্রণাম করলেন।

বরাঙ্গনারা দেবী আর নারায়ণের সঙ্গে মহাদেবকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁর কান্তির এত দীপ্তি, সেই আপনি কে ? আর সূর্যের মতো প্রভাবশালিনী এই বালাই বা কে ? যাঁর শরীরের এত সৌন্দর্য সেই এই পদ্মায়তলোচন পুরুষেরই বা পরিচয় কী? মহাযোগী বৃষরাজবাহন অব্যয় ভূতেশ্বর তাঁদের কথা শুনে উত্তর দিলেন, ইনি সনাতন নারায়ণ আর ইনি জগজ্জননী গৌরী। ঈশ্বর নিজের আত্মাকে অনেক রূপে বিভক্ত করে রেখেছেন। মহর্ষিরা আমার এবং দেবীর পরমতত্ত্ব জানতে পারেন না। কিন্তু আমি তা জানি এবং বিশ্বাত্মা বিষ্ণু ও দেবী ভবানীও তা জানেন। আমি কেবল শান্ত, নিস্পৃহ ও নিষ্পরিগ্রহ। আমাকেই সকলে কেশব, লক্ষ্মী অথবা অম্বিকা বলে থাকে। এই বিষ্ণুই একাধারে ধাতা ও বিধাতা, কারণ ও কার্য, কর্তা ও কারয়িতা। ইনিই ভোগ এবং মুক্তিফল প্রদান করেন। এই অজ্ঞেয় পুরুষই বিষয়-ভোগ করছেন, ইনিই কালরূপ ধারণ করে সংহার করছেন। এই বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ বাসুদেবই জগতের স্রষ্টা ও পালক। এই সর্বব্যাপী মহাযোগী অব্যয় নারায়ণই কূটস্থ ব্রহ্মা। এই পুরুষই আত্মা ও ত্রাতা এবং ইনিই কেবলমাত্র পরমপদ। এই শান্তা, সত্য-স্বরূপা, সদানন্দময়ী মহেশ্বরী গৌরীই আমার নিরঞ্জনা শক্তি। বেদে এঁকেই পরমপদ বলা হয়েছে। এঁর থেকেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, এঁরই মধ্যে সমস্ত জগৎ বিলীন হবে। ইনিই সমস্ত প্রাণীর যাবতীয় অবলম্বনের মধ্যে প্রধান। আমি কলারঞ্জিত হয়ে সেই দেবীর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে অনন্ত, অব্যয় পরমেশ্বরকে দেখতে পাই। অতএব অনাদি, অদ্বৈত, ঈশ্বর, আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে একমাত্র বলেই জানবে। তাহলেই তোমাদের মোক্ষ লাভ হবে। যারা শ্রদ্ধাবান তারা আমাকেই অব্যক্ত বিষ্ণু মনে করে। যারা ভিন্ন দৃষ্টিতে মহাদেবের আরাধনা করে তারা আমার প্রিয় হতে পারে না। যারা মোহের বশবর্তী হয়ে জগজ্জননী পার্বতীর নিন্দা করে তারা রৌরব প্রভৃতি নরকে পচতেই থাকে, শতকোটি কল্পেও তাদের মুক্তি হয় না। অতএব অব্যয় বিষ্ণুকে সমস্ত জীবের রক্ষক বলে জেনে ইহলোকে সর্বপ্রকার বিপদের সময় সেই প্রভুকেই ধ্যান করবে।

দেবতা ও গণেশ্বরেরা সকলেই ভগবানের এই বাক্য শুনে মহাদেব, নারায়ণ ও ভগবতীকে প্রণাম করলেন। তাঁরা সকলেই ভক্তজনপ্রিয় মহাদেবের কাছে, ভবানীর চরণযুগলে এবং নারায়ণের পাদপদ্মে ভক্তিপ্রার্থনা করলেন।

তারপর মাতৃগণ ও গণদেবতাগণ নারায়ণ এবং জগজ্জননী গৌরীকে আর দেখতে পেলেন না। তখন সব কিছুই খুব অদ্ভুত বলে বোধ হল। এই অবসরে কামান্ধ দৈত্যপতি অন্ধক মোহবশে পার্বতীকে হরণ করার জন্য সেই পর্বতে আগমন করল। তখন অনন্তদেহ, শ্রীসমন্বিত, যোগী, নির্মল, পুরুষোত্তম নারায়ণ দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সেই স্থানে আবির্ভূত হলেন। ভগবান শঙ্কর বিষ্ণুকে নিজের পাশে রেখে প্রধান প্রধান গণদেবতা, কালরুদ্র, মুখ্য শিলাদপুত্র ও মাতৃকাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্থান করলেন। দেবাদিদেব অগ্নিতুল্য ত্রিশূল নিয়ে আগে আগে যেতে লাগলেন। আর সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গণরাজ ও সহস্রবাহু বিষ্ণু তাঁর অনুগমন করলেন। ত্রিজগতের চক্ষু-স্বরূপ ভগবান সূর্য সুমেরু শিখরে আরোহণ করলে যে শোভা হয়, পদ্মপলাশবর্ণ গরুড়বাহন ভগবান বিষ্ণুও দেবগণের মধ্যে থেকে সেই রকম শোভা বিস্তার করছিলেন। বিষ্ণু, অনাদি, অমেয়, ত্রিশূলহস্ত, ভগবান হর গর্জন করতে করতে আকাশপথে সহস্র আকৃতি ধারণ করলেন। তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। গণাধিপতিকে আসতে

দেখে এবং মধুসূদনকে গণশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিবৃত দেখে অন্ধকদৈত্য ইন্দ্র, মাতৃকাগণ, প্রধান প্রধান দেবতা ও গণদেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। তারপর অন্ধক বাহুবলে সকলকে পরাস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রের যে স্থানে অনন্তজ্যোতি শম্ভু উদ্বিগ্নচিত্তে কালরুদ্রের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বিমানে আরূঢ় ছিলেন, সেখানে গমন করল।

ভগবান গরুড়ধ্বজ অন্ধককে আসতে দেখে ভগবান ভূতিভূষণ ভৈরব মহাদেবকে বললেন, আপনি জগতের কণ্টকস্বরূপ এই দৈত্যরাজ অন্ধককে বিনাশ করুন। আপনি ছাড়া আর কেউই এর বিনাশ করতে পারবে না। আপনি সমস্ত লোকের কর্তা, কালাত্মা; পরম ব্রহ্মময় আপনার দেহ। বিচক্ষণ বেদবিদেরা নানা প্রকার মন্ত্র দ্বারা আপনারই স্তব করে থাকে। ভগবান হর বাসুদেবের কথা শুনে তাকে দেখে অন্ধকাসুরের বিনাশ করতে চাইলেন। গণের আনন্দবর্ধন করে দেবসৈন্য যখন যুদ্ধের জন্য গমন করল, তখন অন্তরীক্ষচরেরা ভৈরবরূপী মহাদেবকে স্তব করে বললেন, হে অনন্ত, মহাদেব, কালমূর্তি, সনাতন, আপনি সর্বগামী ও অগ্নিস্বরূপ হয়ে সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজ করছেন। আপনার জয় হোক। আপনিই নিধন করেন, আপনিই লোক সৃষ্টি করেন, আবার আপনিই পালন করেন। আপনি অব্যয় হরি, আপনি ব্রহ্মা, মহাদেব, আপনিই তেজঃস্বরূপ, আপনি পরমপদ। ওঙ্কারই আপনার মূর্তি, যোগ আপনার আত্মা, ত্রয়ী নেত্র। আপনি ত্রিনয়ন, মহাবিভূতি, বিশ্বেশ্বর। হে অনন্ত জগৎপতে, আপনি জয়লাভ করুন।

তারপর সাধুদের শরণ্য ঈশ্বর কালাগ্নিরুদ্র অন্ধককে ত্রিশূলের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে নৃত্য করতে লাগলেন। পিতামহ ও দেবগণ অন্ধককে শূলবিদ্ধ দেখে ভবমোচন ঈশ্বর ও ভৈরবদেবকে প্রণাম করলেন। মুনি আর সিদ্ধেরা স্তব করতে লাগলেন, গন্ধর্ব আর কিন্নরেরা গান করতে লাগলেন, আকাশপথে সুন্দরদেহী অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন।

অন্ধক ভগবানের শূলাগ্রে স্থাপিত হওয়ায় তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হল। সর্বজ্ঞান লাভ করে সে পরমেশ্বরের স্তব করতে আরম্ভ করল, সমাধিমগ্ন ব্যক্তিরা যাঁকে ঈশতত্ত্ব বলে জানেন, আমি সেই পুরাতন, পুণ্যস্বরূপ, অনন্তমূর্তি, কালরূপ, কবি, জন্মমৃত্যুর হেতু একমাত্র ভগবানকে প্রণাম করছি। দংষ্ট্রাকরাল, অগ্নিমুখ, জ্বলন্ত সূর্যসদৃশ, কবি, সহস্র চরণ, চক্ষু ও মস্তকযুক্ত আকাশে নৃত্যপর রুদ্ররূপ একমাত্র আপনাকে আমি প্রণাম করছি। দেবগণ আপনার চরণ বন্দনা করেন, আপনার বিভাগ নেই, আপনি অমল তত্ত্ব-স্বরূপ। হে আদিদেব, আপনি জয়ী হোন। যদিও আপনি এক এবং অদ্বিতীয় তবু নানা প্রকারে আপনার পূজা করা যায়। আপনার মূর্তির বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ থাকলেও আপনি সমস্ত জগতের আত্মা। পণ্ডিতেরা আপনাকেই একমাত্র পুরাণপুরুষ বলে থাকেন। আপনি আদিত্যবর্ণ, অন্ধকারের পারে আপনি থাকেন। আপনিই এই সমগ্র সংসার দেখছেন ও তার রক্ষা করছেন। আবার আপনিই একে ধ্বংস করছেন। যোগীদের কাছে আপনিই আরাধ্য। আপনিই একমাত্র অন্তরাত্মা হয়ে সকলের দেহে বহু প্রকারে অনুস্যূত। অথচ আপনার কোন বিশেষ শরীর নেই। আপনিই আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা। কেউ কেউ আপনাকে শিব বলে থাকেন। আপনিই অক্ষর ও পরম পবিত্র ব্রহ্মা। আনন্দরূপ আপনার আর এক নাম ওঙ্কার। আপনি ঈশ্বর, বেদবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত বিশেষ গুণ থেকে নির্মুক্ত স্বায়ম্ভুব। বেদবিদ পণ্ডিতেরা নানা নামে

আপনার স্তব করে থাকেন--ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, হংস, প্রাণ, মৃত্যু, অন্ত, যজ্ঞ, প্রজাপতি, একরূপ, ভগবান নীলগ্রীব ইত্যাদি। আপনি নারায়ণ, অনাদি, জগতের পিতামহ এবং প্রপিতামহ, বেদান্তগুহ্য। উপনিষদে আপনারই কথা বলা হয়। আপনি সদা মঙ্গলময়, পরমেশ্বর। আপনি তমোগুণাতীত, পরমাত্মা, ত্রিশক্তির অতীত, নিরঞ্জন, আপনিই চতুর্দশ ভুবন, সহস্র শক্তির আসনে আসীন। আপনাকে প্রণাম। আপনি ত্রিমূর্তি, অনন্ত, পরমাত্মমূর্তি, জগতের আশ্রয়, জগদ্ব্যাপী, অহিভূষণ; সর্বজনের হৃদয়ে আপনি বিরাজিত। আপনাকে প্রণাম। শ্রেষ্ঠ মুনিরা আপনারই চরণকমল বন্দনা করেন। হে সহস্রচন্দ্রার্ক, হে সহস্রমূর্তি, আপনি পরমতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত, জগতের উৎস, ঐশ্বর্য ও ধর্মের আসনে সংস্থিত। আপনাকে প্রণাম। আপনি সোম আর মধ্যম। আপনাকে নমস্কার। আপনি হিরণ্যবাহু। আপনাকে নমস্কার। চন্দ্র, সূর্য অগ্নি আপনারই চক্ষু স্বরূপ। আপনি অম্বিকাপতি মৃড়। আপনাকে নমস্কার। আপনি গুহ্য, গুহান্তর, বেদান্তবিজ্ঞানের দ্বারা বিনিশ্চিত। আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিকালাতীত, পুণ্য-জ্যোতি, মহেশ্বর, মঙ্গলময়। আপনাকে নমস্কার।

ভগবান অন্ধকের এই স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাকে শূলের অগ্রভাগ থেকে নামিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, দৈত্য, আমি তোমার এই স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন তুমি আমার গণের অধিপতি হয়ে চিরকাল আমার কাছে বাস কর। তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হোক, রোগ দূর হোক, সংশয়ের অবসান ঘটুক। তুমি নন্দীশ্বরের অনুচর হও এবং দেবতাদের মধ্যে পূজিত হও।

মহাদেব এই কথা বললে মহাদৈত্য অন্ধক দেবতাদের সামনেই সহস্র সূর্যের মতো ভাস্বর, ত্রিলোচন, চন্দ্রচিহ্নিত, নীলকণ্ঠ, জটাধারী শূলপাণি, মহাবাহু গণেশ্বরে পরিণত হল। তা দেখে বিস্মিত হয়ে দেবতারা তার প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন দেবদেব বিষ্ণু হাসতে হাসতে ভৈরবকে বললেন, মহাদেব, পুরুষোচিত এই বিপুল মাহাত্ম্য যথার্থই আপনার উপযুক্ত। কারণ আপনি আত্মীয়দের দোষ দেখেন না, গুণটুকুই গ্রহণ করে থাকেন। গণদেবতাশ্রেষ্ঠ ভৈরবকে এই কথা বললে তিনি নারায়ণ ও অন্ধকের সঙ্গে মহাদেবের কাছে গেলেন। নারায়ণ, অন্ধক ও মাতৃকাদের সঙ্গে কালভৈরবকে আসতে দেখে মহাদেব নিশ্চিন্ত হলেন। এর পরে শৈলসুতা পার্বতী যে বিমানে ছিলেন, মহাদেব হিরণ্যাক্ষতনয়কে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। জগতের আর্তিনাশক স্বামীকে অন্ধকের সঙ্গে আসতে দেখে ভগবতী অন্ধকের প্রতি অনুগ্রহের কথা বললেন। তখন অন্ধক মহেশ্বরীকে মহাদেবের পাশে পাশে আসতে দেখে তাঁদের চরণের কাছে মাটিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলল, যাঁর থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগৎকে সংহার করছেন, সেই অনাদি, পর্বতকন্যা, শিবপ্রিয়া পার্বতীকে প্রণাম করি। অতি পবিত্র, স্বর্ণময় শিবাসনে যিনি মহাদেবের সঙ্গে শোভা বিস্তার করছেন, সেই হিমালয়-কন্যা পার্বতীকে প্রণাম করি। তিনিই সর্বজগৎরূপা-তাঁকে ছাড়া সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হবে। সকল ভেদবর্জিতা এই পার্বতী উমাকে প্রণাম করি। যাঁর জন্ম নেই, হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, সেই গুণাতীতা গিরীশ-কন্যাকে প্রণাম করি। হে দেবি শৈলজে, আমি মোহের বশে এমন কাজ করে ফেলেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার যে পাদপদ্মে সুর ও অসুর প্রণাম জানায়, সেই পাদপদ্মে আমিও প্রণাম করি। দৈত্যরাজ ভক্তিবিনত হয়ে এই ভাবে পার্বতীর স্তব করলে ভগবতী প্রসন্না হয়ে তাকে

নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন, তখন কালরুদ্র সমুদ্ভব পরমেশ্বর ভৈরব মহাদেবের অনুমতি নিয়ে মাতৃকাদের সঙ্গে পাতালে গমন করলেন। সেখানে বিধ্বংসী তামসী নরসিংহ মূর্তিতে বিষ্ণু বিরাজ করছেন।

তারপর অনন্তমূর্তি ভগবান কালাগ্নিরুদ্র শেষনাগের দ্বারা পূজিত হয়ে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করলেন। ভৈরব যোগে লীন হলে সমস্ত মাতৃকা ক্ষুধায় কাতর হয়ে ত্রিনয়ন মহাদেবকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, আমরা ক্ষুধায় বড় কাতর হয়েছি। আপনি অনুমতি দিন, আমরা সমস্ত ত্রিভুবনকে ভক্ষণ করি। না হলে আমাদের পরিতৃপ্তি হবে না। বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন মাতৃকারা এই কথা বলে সমস্ত ত্রৈলোক্যকে খেয়ে ফেলতে লাগলেন। তখন সেই ভৈরবদেব প্রণত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নৃসিংহনারায়ণের ধ্যান করতে লাগলেন। তাঁর ধ্যানের কথা জানতে পেরে হরি ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ভৈরব হরিকে জানালেন, ভগবন, আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন মাতৃকারা সমগ্র জগৎ উদরসাৎ করছেন। তখন নৃসিংহমূর্তি নারায়ণ মাতৃকাদের স্মরণ করলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ নরসিংহের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সংহারকারিণী মাতৃকারা বিষ্ণুর কাছে এসে অমিতবীর্য ভৈরবকে নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলেন। তখন মাতৃকারা দেখলেন যে জগতের জনক অতি ভয়ংকর নৃসিংহ ও সর্পরাজ অনন্ত এক হয়ে যাচ্ছেন।

তারপর হৃষিকেশ শূলপাণিকে বললেন, যারা আমার ভক্ত এবং যারা আমাকে স্মরণ করে, তাদের আমি সর্বপ্রকারে রক্ষা করি। মহেশ্বরের অঙ্গসম্ভূতা সর্বসংহারকারিণী ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী এই অনুপমা মূর্তি আমারই মূর্তি। ভগবান অনন্ত ও কালভৈরব আমারই দু'রকম অবস্থাভেদ, আর কিছু নয়। এ আমার তামসী মূর্তি। আর দেবাদেব চতুরাননও আমারই এক মূর্তি—তা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। জগতের উদ্ভাসক, দুর্ধর্ষ, কালরূপে আমিই কল্প শেষে রৌদ্রতেজে সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করব। সত্ত্বগুণ থেকে জাত আমার লোকমোহিনী যে নারায়ণী মূর্তি আছে, তাই সমস্ত জগৎকে নিয়ত পালন করছে। সেই বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাগতি, মূলগতি, অব্যক্ত ও সদানন্দ বলে কথিত।

বিষ্ণুসমুদ্ভূত মাতৃকাদের বিষ্ণু এই কথা বুঝিয়ে বললে তাঁরা মহাদেবেরই শরণ নিলেন।

অন্ধক বিনাশের সমস্ত বিবরণ এবং অমিততেজা ভৈরবের মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের কাছে বিশদভাবে বললাম।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দক্ষকন্যাদের বংশকীর্তনপ্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, অন্ধক নিগৃহীত হলে মহাত্মা প্রহ্লাদের পুত্র বলবান মহাসুর বিরোচন রাজা হয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতাকে জয় করে নিজ ধর্মানুসারে অনেক বছর পর্যন্ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন পালন করেছিলেন। একবার কোন সময়ে মহামুনি সনৎকুমার বিষ্ণুর আদেশে অসুররাজের প্রাসাদে এসেছিলেন। ব্রহ্মার পুত্রকে আসতে দেখে সিংহাসনে উপবিষ্ট মহাসুর সিংহাসন ছেড়ে উঠে তাঁর চরণে প্রণাম করলেন

এবং হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, আজ আমি ধন্য, আমি অনুগৃহীত। স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্ যোগীশ্বর ভগবান আজ আমার পুরোত্তমে এসেছেন। হে ব্রহ্মপুত্র, আপনি স্বয়ং দেব-পিতামহ। কী কারণে আপনি এখানে এসেছেন? হে ব্রহ্মন, আদেশ করুন, আপনার কোন্ কার্য সম্পন্ন করতে হবে? ভগবান সনৎকুমার ধার্মিক মহাসুরকে বললেন, তুমি বড় ভাগ্যবান। তোমাকে দেখতেই আমি এসেছি, দৈত্যরাজ, জগতে তোমার মতো ধার্মিক আর কেউ নেই। কিন্তু ধর্মপথে চলা দৈত্যদের পক্ষে খুবই কঠিন। এই কথা শুনে অসুররাজ মুনিকে বললেন, হে ব্রহ্মবিত্তম, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যা পরম ধর্ম তার কথা আমাকে বলুন। তখন মহাযোগী সনৎকুমার মহাত্মা দৈত্যপতিকে সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুহ্য, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান ধর্ম তার উপদেশ দিলেন।

দৈত্যপতি পরম জ্ঞান লাভ করে গুরুদক্ষিণা দিলেন। তারপর পুত্রের কাছে রাজ্যভার দিয়ে নিজে যোগাভ্যাস করতে লাগলেন।

বিরোচনের পুত্র বলি অত্যন্ত ধার্মিক, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এক সময়ে এই মহাসুর ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে জয়লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলির সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে তাঁকে অচ্যুত বিষ্ণুর শরণ নিতে হয়েছিল। ইন্দ্র পরাজিত হলে দেবমাতা অদিতি দেবী অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। দৈত্যেন্দ্রের বধ করতে পারে, আমার এমন একটি পুত্র হোক—এই কামনা করে তিনি নিজে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন, তিনি অখণ্ড, পরম-পদ, অনাদি, অনন্ত, আনন্দরূপ, ব্যোমময়, বাসুদেবকে হৃৎপদ্মের প্রতিটি রেণুতে ধ্যান করতে লাগলেন আর সেই জগতের শরণ্য, অব্যক্ত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। যোগাত্মা, শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান হরি প্রসন্ন হয়ে দেবজননী অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ভক্তিনম্রা অদিতি দেবী বিষ্ণুকে আসতে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করলেন এবং স্তব দ্বারা নারায়ণকে প্রসন্ন করলেন। অদিতি বললেন, আপনি সকল দুঃখনাশের একমাত্র হেতু। আপনার মাহাত্ম্যের শেষ নেই। হে যোগাভিযুক্ত, আপনার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্তও নেই। হে বিজ্ঞান-মূর্তি, হে আকাশকল্প, হে অমলানন্দস্বরূপ, আপনার জয় হোক। হে বিষ্ণু, আপনিই কাল, আপনি নরসিংহ, আপনিই শেষনাগ, আপনি সংহারকর্তা কালরুদ্র, আপনিই বাসুদেব। আপনাকে বার বার প্রণাম। হে বিষ্ণু, আপনি বিশ্বমায়া সৃষ্টি করেছেন। যোগের দ্বারাই আপনাকে পাওয়া যায়। আপনি সত্যস্বরূপ ও ধর্মজ্ঞানপরায়ণ, আপনি বরাহরূপধারী। আপনাকে আমি বার বার প্রণাম করি। হে প্রভু, সহস্র সূর্য আর সহস্র চন্দ্রের দীপ্তির মতো আপনার শরীরের শোভা। বেদ, বিজ্ঞান আর ধর্মের দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়। আপনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, আপনি অজ্ঞেয় এবং বিশ্বের উৎস। আপনাকে আবার প্রণাম। হে বিষ্ণু, আপনিই শম্ভু এবং সত্যপরায়ণ, আপনিই বিশ্বের হেতু এবং বিশ্বরূপ। আপনি যোগপীঠের অন্তরে থাকেন, আপনি অদ্বিতীয় শিব। আবার আপনাকে বারংবার প্রণাম করি।

দেবমাতার এই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান জগন্ময় বিষ্ণু যেন হাসতে হাসতেই তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। অদিতি দেবী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং এই উত্তম বর প্রার্থনা করলেন, আমি দেবগণের কল্যাণের জন্য আপনাকেই আমার পুত্র-রূপে প্রার্থনা করি। আশ্রিতবৎসল ভগবান তথাস্তু বলে বর দিলেন এবং সেই অপ্রমেয় দেবতা আরও নানারকম বর দান করে অন্তর্হিত হলেন। তারপর বহু দিন কেটে গেলে

দেবমাতা অদিতি স্বয়ং নারায়ণ ভগবান জনার্দনকে গর্ভে ধারণ করলেন। হৃষীকেশ দেবমাতার গর্ভে প্রবেশ করলে বৈরোচন বলির পুরে নানা ঘোর উৎপাত আরম্ভ হল। দৈত্যরাজ সেই সমস্ত উৎপাত দেখে ভীত হয়ে পিতামহ বৃদ্ধ অসুর প্রহ্লাদকে প্রণাম করে সব কিছু জানালেন। বলি বললেন, হে মহাজ্ঞানী পিতামহ, এখন আমাদের গৃহে কেন এই সমস্ত ঘোর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে ? এর জন্য আমাদের কী করা উচিত ?

মহাসুর প্রহ্লাদ বলির কথা শুনে বহুক্ষণ ধ্যান করে ও নারায়ণকে প্রণাম করে বললেন, যজ্ঞে যাঁর পূজা করা হয় এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁর সৃষ্ট সেই নারায়ণকে দেবমাতা গর্ভে ধরেছেন। যাঁর থেকে সব কিছু অভিন্ন, অথচ যিনি নিজে সমস্ত কিছু থেকে পৃথক, সেই বাসুদেব দেবমাতার গর্ভে প্রবেশ করেছেন। দেবতারাও যথার্থ ভাবে যাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না, সেই বিষ্ণু স্বেচ্ছায় সম্প্রতি অদিতির দেহ আশ্রয় করেছেন। যাঁর থেকে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হয়েছে, আবার সমস্ত ভূত যাঁর মধ্যে বিলীন হবে, সেই মহাযোগী পুরাণপুরুষ হরি অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁর নাম নেই, জাতি নেই, সেই বিশুদ্ধ সত্তা আত্মরূপী বিষ্ণু অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরই ধর্মযুক্তা জগন্মাতা ভগবতী লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, সেই জনার্দন অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁর তামসী মূর্তি শঙ্কর এবং রাজসী মূর্তি ব্রহ্মা, স্বয়ং সত্ত্বমূর্তিধারী সেই বিষ্ণুই এক অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভক্তিবিনত চিত্তে নারায়ণকে এই ভাবে ধ্যান করে তাঁরই শরণ নাও, তাহলেই মুক্তি লাভ করতে পারবে। তখন বিরোচন পুত্র বলি প্রহ্লাদের কথায় হরির শরণ নিলেন এবং ধর্ম অনুসারে সমগ্র রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

কশ্যপের ঔরসে দেবমাতা অদিতি গর্ভধারণ করে যথাকালে দেবতাদের আনন্দবর্ধনকারী চতুর্ভুজ, আয়তনয়ন মহাবিষ্ণুকে প্রসব করলেন। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। নীল মেঘের মতো তাঁর কান্তি। তিনি দীপ্তিমান আর শ্রীসমন্বিত। এই সময়ে ঋষিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ব্রহ্মা আর ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা এবং সিদ্ধ, সাধ্য ও চারণেরা উপেন্দ্রের কাছে এসে তাঁর উপাসনা করছিলেন। ভগবান হরি ত্রিভুবনের সকলকে সদাচার শেখাবার জন্য যথাকালে উপস্থিত হয়ে ভরদ্বাজ মুনির কাছে বেদসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রভু এই ভাবেই সকলকে লৌকিক পথগুলি দেখিয়ে দেন। তিনি যা করেন তাই প্রমাণ, এবং লোকে তারই অনুকরণ করে।

তারপর কোন সময়ে মতিমান বিরোচনপুত্র বলি স্বয়ং যজ্ঞ করে সর্বব্যাপী যজ্ঞাধীশ বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দান করে পূজা করতে করতে লাগলেন। তাতে ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই মহাত্মা বলির যজ্ঞে এসেছিলেন। অনন্তর ভগবান বিষ্ণু ভরদ্বাজের আদেশে বামনরূপ ধারণ করে বলির যজ্ঞভূমিতে গমন করলেন। তাঁর অঙ্গে কৃষ্ণাজিনের উপবীত এবং হস্তে পলাশদণ্ড শোভা পাচ্ছিল। জটাজুটধারী এবং মহাদীপ্তিমান ভগবান হরি বেদগান করতে করতে ভিক্ষুক বেশে অসুররাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং নিজের তিনটি পদক্ষেপের সম পরিমাণ স্থানমাত্র যাচঞা করলেন।

ভক্তিমান বলিরাজ সোনার ভৃঙ্গার নিয়ে বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন। আচমনের পর তিনি বললেন, আমি আপনাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করব। তারপর মনে মনে বললেন, অব্যয়াকৃতি ভগবান হরি প্রসন্ন হোন এবং ভগবানের করাগ্রপল্লবে সুশীতল জল দান করলেন। তখন ভগবান আদিদেব ভোগ্য বিষয়ের প্রতি সেই শরণাগত দৈত্যরাজের

আসক্তি হ্রাস করার জন্য এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে পাদবিক্ষেপ করলেন। ভগবানের চরণ ত্রিভুবনের উপর দিয়ে প্রজাপতিলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলে গেল। সেখানে যে আদিত্য প্রমুখ দেবগণ ও সিদ্ধগণ বাস করতেন, তাঁরা সকলেই তাঁর চরণে প্রণত হলেন। তারপর ভগবান অনাদি পিতামহ উপাসনা করে নারায়ণকে প্রসন্ন করতে চাইলেন। কিন্তু তবুও সেই চরণ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বকপাল ভেদ করে আচরণ জল পর্যন্ত চলে গেল। তখন অণ্ড বিদীর্ণ হওয়ায় পুণ্যজনসেবিত সেই বিপুল সুশীতল জলরাশি নিঃসৃত হল। সেই জল আকাশপথে প্রবাহিত হলে ব্রহ্মা তাকেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা নামে অভিহিত করলেন। ভগবানের চরণ বিশ্বমূল পুরুষ নামক ব্রহ্মরূপী প্রকৃতির আবরণ পর্যন্ত গিয়ে অবস্থান করতে লাগল। সেই সেই স্থানের দেবতারা ঐ অব্যয় পদ দর্শন করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ চিত্তে যে অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ নারায়ণকে প্রণাম করে থাকেন, মহান বলি সেই পুরুষকে বিশ্বদেহ বিষ্ণুরূপে দেখে ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন। তখন ভগবান আদিকর্তা বাসুদেব আবার বামন রূপ ধারণ তাঁকে বললেন, দৈত্যরাজ, এই তিনটি লোক এখন আমারই। তুমি ভক্তিপূর্বক আমাকে তা দান করেছ। দৈত্যপতি বলি আবার মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং বললেন, আপনি অনন্তজ্যোতি, ত্রিবিক্রম এবং অনন্তপরাক্রম। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। এই কথা বলতে বলতে তিনি নারায়ণের করাগ্রপল্লবে জল দিলেন।

তখন জগতের অন্তরাত্মা শঙ্খপাণি প্রহ্লাদপৌত্রের দান গ্রহণ করে তাঁকে বললেন, তুমি পাতালমূলে প্রবেশ কর। সেখানে দেবতাদেরও অপ্রাপ্য কাম্যবস্তু ভোগ করে ভক্তির সঙ্গে সর্বদা আমার ধ্যানে নিরত হয়ে বাস করবে। পরে কল্পশেষে আবার আমাতেই প্রবেশ করবে। বিপুলপরাক্রম, জয়শীল, সত্যবিক্রম বিষ্ণু দৈত্যরাজকে এই কথা বলে ইন্দ্রকে ত্রিভুবন দান করলেন। ভগবান ব্রহ্মা, রুদ্র ও আদিত্য প্রমুখ দেবতারা এবং দেবর্ষি, সিদ্ধ ও কিন্নরেরা মহাযোগী বাসুদেবের স্তব করতে লাগলেন। বামনরূপী বিষ্ণু এই আশ্চর্য কর্ম সমাধা করে সকলের সামনেই সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

বিষ্ণুভক্ত শ্রীসমন্বিত দৈত্যরাজ বলি প্রহ্লাদের অনুমতি নিয়ে শ্রেষ্ঠ অসুরদের সঙ্গে পাতালে প্রবেশ করলেন। সেই সময়ে বলিরাজা প্রহ্লাদকে উত্তম ভক্তিযোগ, বিষ্ণুমাহাত্ম্য আর পূজাবিধানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রহ্লাদ যেমন যেমন বলেছিলেন, তিনি ঠিক সেই রকম আচরণ করতে লাগলেন। এরপর বলিরাজা প্রণয়গতি কর্মযোগ সম্বন্ধে জেনে ভক্তির সঙ্গে শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত, কমলনয়ন, অজ্ঞেয় ভগবান বিষ্ণুরই শরণ নিলেন।

বিপ্রগণ, আমি আপনাদের কাছে বামনের পরাক্রমের বিবরণ দিলাম। সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ সর্বদাই সমস্ত দেবকার্য সম্পন্ন করছেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণে পূর্বভাগে দক্ষকন্যাদের বংশানুকীর্তনপ্রসঙ্গে
ত্রিবিক্রমচরিত নামে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সূত বলে চললেন, বলিরাজার মহা শৌর্য বীর্য সম্পন্ন একশোটি পুত্র ছিল। দ্যুতিমান বাণই তাদের মধ্যে মুখ্য। বাণরাজা শঙ্করের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কালে ত্রিভুবনকে নিজের বশে এনে ইন্দ্রের ওপরেও অত্যাচার করতে লাগলেন। তখন

ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা মহাদেবের কাছে গিয়ে বললেন, আপনার ভক্ত মহাসুর বাণ তো আমাদের অত্যন্ত পীড়ন করছে। দেবগণ এই কথা বললে দেবদেব মহেশ্বর অবলীলায় একটি মাত্র তীবের সাহায্যে বাণের পুরী দগ্ধ করে দিলেন। বাণরাজা যখন নিজের পুরীকে দগ্ধ হতে দেখলেন, তখন তিনি ত্রিশূলধারী গোপতি নীললোহিত ঈশানের শরণাপন্ন হলেন এবং নিজে আসক্তি ত্যাগ করে মস্তকে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পুরীর বাইরে গিয়ে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন। ভগবান পরমেশ্বর নীললোহিত শঙ্কর বাণের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্নেহভরে নিজের গণপতির পদ দান করলেন।

এইভাবে দনুর পুত্র তার প্রমুখও অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে তার, শম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু এবং বৃষপর্বাই প্রধান বলে খ্যাত। দ্বিজগণ, সুরসার গর্ভে সহস্র গন্ধর্বের জন্ম হয়। তারা মহাত্মা, বহুশীর্ষ এবং আকাশচর। অরিষ্টার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল সহস্র সর্প। প্রসিদ্ধ অনন্ত প্রমুখ মহানাগেরা ছিলেন কদ্রুর সন্তান। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা এবং শুচি নামে ছয়টি কন্যা তাম্রার গর্ভে জাত হয়। সুরভি প্রসব করেন গাভী আর মহিষীদের। বৃক্ষ, লতা, বল্লী আর তৃণজাতি—এ সব কিছুর জননী ইরা। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, খসা, যক্ষ এবং রাক্ষসদের, মুনি অপ্সরাদের, ক্রোধবশা রাক্ষসদের প্রসব করেছিলেন। বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ নামে দুই বিশ্রুত পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে ধীমান গরুড় কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের বরে নারায়ণের বাহন হয়েছিলেন। অরুণও তপস্যার দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলে মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সূর্যের সারথি পদ দান করেন।

হে মুনিগণ, এই বৈবস্বত কল্পে এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম কশ্যপ সন্ততিদের বিবরণ দিলাম। এই কথা শুনলে পাপ নাশ হয়। হে সুব্রত মুনিগণ, চন্দ্রের সাতাশজন পত্নীর সাতাশটি পুত্র হয়েছিল এবং অরিষ্টনেমির চার পত্নীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। বিদ্বান বহুপুত্রের চারটি পুত্র। তাঁদের নাম বৈদ্যুত। ব্রহ্মসৎকৃত ঋষিরা অঙ্গিরার পুত্র। সহস্র যুগ শেষ হলে মন্বন্তরের সময়ে এঁরা সকলেই নিজের নিজের কৃতকর্মের সাদৃশ্য অনুসারে নিজ নিজ নাম নিয়ে নিয়ত জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দক্ষকন্যাদের বংশানুকীর্তননামে
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, কশ্যপমুনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত পুত্র উৎপাদন করে আবার পুত্র লাভ করার জন্য ঘোরতর তপস্যা শুরু করলেন। এই রকম কঠোর তপস্যা করতে করতে তাঁর বৎসর আর অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্রের আবির্ভাব হল। বৎসর থেকে জন্ম নিলেন বিশ্রুতকীর্তি রৈভ্য আর নৈধ্রুব। দ্যুতিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুভ্র নামক পুত্রেরা রৈভ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মহাত্মা নৈধ্রুবের পত্নী চ্যবনকন্যা সুমেধার গর্ভে কুণ্ডপায়ী পুত্রদের জন্ম হয়েছিল। অসিতের পত্নী একপর্ণা জন্ম দিয়েছিলেন মহাতপা যোগাচার্য দেবল আর সর্বশাস্ত্রবেত্তা পবিত্র শ্রীসমন্বিত শাণ্ডিল্যকে। শাণ্ডিল্য মহাদেবের প্রসাদে উত্তম যোগ লাভ করেছিলেন। শাণ্ডিল্য, নৈধ্রুব আর রৈভ্য—এই তিনজন কশ্যপের পক্ষের।

এবার আপনাদের কাছে বলব পুলস্ত্যের পক্ষীয় নয়জন প্রধান ব্রাহ্মণের কথা। হে বিপ্রগণ, তৃণবিন্দু ঋষির এক কন্যা ছিল। তার নাম ইলবিলা। রাজর্ষি তাকে পুলস্ত্য মুনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তার গর্ভে ঐলবিল বিশ্রবা ঋষির জন্ম হয়। বিশ্রবার চার পত্নী—পুষ্পোৎকটা, বাকা, কৈকসী আর দেববর্ণিনী। এঁরা সকলেই রূপলাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন এবং পুলস্ত্যের বংশকে বিস্তৃত করেছিলেন। এখন এঁদের পুত্রদের কথা শুনুন।

দেববর্ণিনী বৈশ্রবণ নামে যে পুত্রের জন্ম দেন, তিনি সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কৈকসী ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের জননী এবং বিশ্রবার ঔরসে তাঁর গর্ভে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে আরো দুটি পুত্রের এবং সুর্পণখা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। পুষ্পোৎকটা প্রসব করেছিলেন চারটি পুত্র এবং একটি কন্যা। এদের নাম মহোদর, প্রশস্ত, মহাপার্শ্ব, খর এবং কুম্ভীনসী। বাকার গর্ভে জন্ম নেয় ত্রিশিরা, দূষণ এবং মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে পুত্র। রাবণ প্রভৃতি দশজনই পুলস্ত্য বংশীয় রাক্ষস। এরা সকলেই নিষ্ঠুর কার্যে রত, অতি ভীষণ, রুদ্রভক্ত এবং উৎকৃষ্ট তপোবল সম্পন্ন।

পুলহের পুত্রেরা হল—মৃগ, ব্যাল, দংষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, ঋক্ষ, শূকর আর হস্তী।

বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু নিঃসন্তান ছিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি কশ্যপই মরীচির পুত্র। মহাতপা, বেদাধ্যয়নে এবং যোগে রত, হরভক্ত, দীপ্তিমান দৈত্যগুরু শুক্র ভৃগুর পুত্র। আমরা শুনেছি অত্রির পুত্র বহ্নি আর তাঁর সহোদর কৃশাশ্বপুত্র নৈধ্রুব ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মেছিলেন। অত্রি মুনি এঁর গর্ভে যে স্বস্ত্যাত্রেয়দের জন্ম দেন তাঁরা বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠে নিরত, তপস্যার দ্বারা দগ্ধপাপ আর মহাবলবান। দক্ষের শাপে নারদ ঊর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন। তাই দেবী অরুন্ধতীকে তিনি বশিষ্ঠের হাতে তুলে দেন। নারদের মায়ায় দক্ষের হর্যশ্ব নামে পুত্রেরা বিনষ্ট হয়। তখন দক্ষ ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাঁকে এই বলে শাপ দেন, তুমি যেমন নিজের মায়ার বলে আমার পুত্রদের বিনাশ করেছ, ঠিক তেমনি করেই তুমিও নির্বংশ হবে। বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তি নামে এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। শক্তির পুত্র সুন্দর পরাশর সর্বজ্ঞ আর তপস্বীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইনি দেবদেব ত্রিপুরারি মহাদেবের অর্চনা করে অনন্য প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পুত্ররূপে লাভ করেন। ভগবান শংকরই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে শুক নামে জন্ম নিয়েছিলেন। অংশের অংশরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি নিজের পরম পদ লাভ করেছিলেন। শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ আর গৌর নামে যে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা সকলেই অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর তিনটি কন্যাও ছিল—কীর্তিমতি, যোগমাতা আর ধৃতব্রতা।

ব্রহ্মা ব্রহ্মবাদীদের কাছে এই সব অত্রি বংশীয়দের বিবরণ বলেছিলেন। এখন কশ্যপের ঔরসে যে ক্ষত্রিয় সন্তানেরা জন্ম নেয়, তাদের বিবরণ শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ঋষিবংশকীর্তননামে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

সুত বলতে লাগলেন, অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে প্রভু আদিত্যের জন্ম হয়। সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা ও ছায়া নামে তাঁর চার ভার্যা ছিলেন। এখন এঁদের পুত্রদের নাম শুনুন।

ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম নেন সূর্যের শ্রেষ্ঠ পুত্র মনু, রাজ্ঞীর গর্ভে যম, যমুনা ও রেবন্ত, ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি, শনি, তপতী ও বিষ্টি এবং প্রভার গর্ভে কেবল প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মনুর ইন্দ্রতুল্য যে নয়টি পুত্র হয়েছিল, তারা তাঁরই মতো গুণবান। এদের নাম ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নভগ, অরিষ্ট, করূষ এবং মহাতেজা পৃষধ্র। মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ইলার থেকে চন্দ্রবংশের বিস্তার হয়েছিল। শুনেছি এই শ্রেষ্ঠা রমণী চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর ঔরসে পিতৃগণের আনন্দবধর্ক পুরূরবা নামে উত্তম এক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেন। পুরূরবা নামে এই নির্মল পুত্রের জন্ম দিয়ে তিনি সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। এই সময়ে তাঁর তিনটি পুত্র হয়। এর পর অবশ্য তিনি আবার রমণীতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্রের নাম উৎকল, গয় আর বিনত। এঁরা সকলেই অতুলনীয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। বীর রাজা বিকুক্ষি ছিলেন ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পনেরোজন পুত্র। এঁদের মধ্যে ককুৎস্থই জ্যেষ্ঠ। সুযোধন ককুৎস্থের পুত্র শ্রীমান পৃথু, আর পৃথুর পুত্র বিশ্বক। বিশ্বকের পুত্র ধীমান আর্দ্রক। আর্দ্রকের পুত্রের নাম যুবনাশ্ব।

পরাক্রান্ত রাজা যুবনাশ্ব পুত্রলাভের আশায় গোকর্ণ তীর্থে গমন করে বহ্নির মতো সমুজ্জল তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ গোতমকে দেখে তাঁর সামনে মাটিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ কর্মের দ্বারা ধার্মিক পুত্র লাভ করা যায়? গোতম বলেছিলেন, অনাদি, অনন্ত, অনাময় আদিপুরুষ দেব নারায়ণের আরাধনা করলে ধার্মিক পুত্র লাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁর পুত্র এবং নীললোহিত যাঁর পৌত্র সেই আদি কৃষ্ণ ইশানের উপাসনা করে লোকে সৎপুত্র পায়। ভগবান ব্রহ্মাণ্ড যথার্থভাবে যাঁর মাহাত্ম্যের কথা বুঝতে পারেন না, সেই হৃষীকেশের অর্চনা করে লোকে ধার্মিক পুত্রের জনক হয়। রাজা যুবনাশ্ব গোতমের কথা শুনে সনাতন হৃষীকেশ বাসুদেবের উপাসনা করে শ্রাবস্তি নামে বিখ্যাত এক বীর পুত্র লাভ করেছিলেন। ইনিই গৌড় দেশে শ্রাবস্তি নামে মহানগরী নির্মাণ করেন। শ্রাবস্তির থেকে বৃহদশ্ব এবং বৃহদশ্ব থেকে কুবলয়াশ্বের জন্ম হয়। কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামে এক মহাসুরকে বধ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় ধুন্ধুমার। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, ধুন্ধুমারের তিন পুত্র—দৃঢ়াশ্ব, দত্তাশ্ব আর কপিলাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ, প্রমোদের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ এবং নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব। সংহতাশ্বের কৃতাশ্ব ও অরুণাশ্ব নামে দুই পুত্র। তার মধ্যে আবার অরুণাশ্বের যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র হয়। ইনি যুদ্ধে ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী ছিলেন। যুবনাশ্ব বারুণী যজ্ঞ করে ঋষিদের বরে মান্ধাতা নামে এক অদ্বিতীয় পুত্র লাভ করেন। মান্ধাতা ছিলেন সর্বগুণের আকর, বিষ্ণুভক্ত, শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী এবং মহাপ্রাজ্ঞ। মান্ধাতার তিনটি পুত্র হয়েছিল—পুরুকুৎস, অম্বরীষ আর মুচুকুন্দ। এঁরা সকলেই যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য বীর ছিলেন। এঁদের মধ্যে অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। এর আগে যে যুবনাশ্বের কথা বলেছি, ইনি কিন্তু তিনি নন। এই যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র হারিত। নর্মদার গর্ভে পুরুকুৎসরাজার ত্রসদস্যু নামে এক বিশ্রুত পুত্রের জন্ম হয়। ত্রসদস্যুর আবার সম্ভূতি নামে পুত্র হয়েছিল। সম্ভূতির পুত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ, বিষ্ণুবৃদ্ধের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্রের নাম বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্রের নাম হর্যশ্ব। তিনি কর্দম প্রজাপতির প্রসাদে সূর্যভক্ত এক ধার্মিক পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম বসুমনা। বসুমনা আবার সূর্যের উপাসনা করে ত্রিধন্বা নামে এক অদ্বিতীয় অরিন্দম পুত্র লাভ করেন।

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, ধর্মনিষ্ঠ, তিতিক্ষু, দানশীল, বেদাধ্যয়ননিরত রাজা বসুমনা শত্রুদের জয় করবার মানসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। বশিষ্ঠ ও কশ্যপ প্রমুখ ঋষিরা এবং ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা সেই মহাত্মার যজ্ঞে এসেছিলেন। মহারাজ তাঁদের দেখে আশ্চর্য হয়ে প্রণাম করলেন এবং বিধি অনুসারে যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ, আপনারা তো সব কিছুই জানেন। আপনারা আমাকে বলে দিন যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়। বশিষ্ঠ বললেন, বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করে, যত্ন-সহকারে সৎপুত্র উৎপাদন করে আর যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করে সমাহিত মনে বানপ্রস্থ অবলম্বনই শ্রেয়। পুলস্ত্য বললেন, প্রথমে যজ্ঞ করে দেবতাদের আরাধনা করে, তার পর মহাযোগী পরমেশ্বরকে তপস্যা দ্বারা উপাসনা করে নিয়মানুসারে সন্ন্যাস আশ্রয়ই শ্রেয়। পুলহ বললেন, যাকে একমাত্র পুরাণপুরুষ ও পরমেশ্বর বলা হয়, তপস্যার দ্বারা সেই সহস্ররশ্মির আরাধনা করলেই মোক্ষলাভ হয়। জমদগ্নি বললেন, যিনি জগতের বীজ, সর্বভূতের অন্তর্যামী এবং বিশ্বের স্রষ্টা, সেই অজ সনাতন বিষ্ণুকেই তপস্যার দ্বারা আরাধনা করা হয়। বিশ্বামিত্র বললেন, যিনি অগ্নিস্বরূপ, সর্বাত্মক, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ ও স্বয়ম্ভু, সেই রুদ্রকেই কেবল উগ্র তপস্যার দ্বারা পূজা করা উচিত। অন্য যজ্ঞাদির আবশ্যক নেই। ভরদ্বাজ বললেন, সমস্ত যজ্ঞে যে সনাতন বাসুদেবের পূজা করা হয়, সর্বদেবতার অদ্বিতীয় মূর্তিরূপ সেই পরমেশ্বরেরই পূজা করবে। অত্রি বললেন, যাঁর থেকে এই সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁর পুত্র, শুধু সেই মহেশ্বরের জন্যই কঠোর তপস্যা করবে। গৌতম বললেন, যাঁর থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের জন্ম, এই সমস্ত জগৎ যাঁর শক্তি, তপস্যার দ্বারা সেই সনাতন দেবাদিদেবকেই পূজা করবে। কশ্যপ বললেন, যিনি পর দেবতা, সহস্রনয়ন, সর্বকর্মের দ্রষ্টা, মহাযোগী প্রজাপতি, সেই শম্ভুই তপস্যার দ্বারা পূজিত হলে প্রসন্ন হন। ক্রতু বললেন, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করেছে, যজ্ঞ সমাপ্ত করেছে এবং পুত্র লাভ করেছে, তার পক্ষে তপস্যা করা ছাড়া অন্য কোন ধর্মের কথাই শাস্ত্রে নেই।

এই সমস্ত উপদেশ শুনে রাজর্ষি বসুমনা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং ঋষিদের যথাবিধি পূজা করে তাঁদের বিদায় দিলেন। তারপর পুত্র ত্রিধন্বাকে বললেন, আমি সূর্যমণ্ডলস্থ, জগতের প্রাণভূত, সেই এক অক্ষর বৃহৎ পুরুষ দেবতাকে তপস্যার দ্বারা আরাধনা করব। তুমি আলস্য ত্যাগ করে ধর্মনিষ্ঠ হয়ে চাতুর্বর্ণ্য সমন্বিত এই সমগ্র পৃথিবীকে পালন কর। এই কথা বলে সেই নিষ্পাপ রাজা পুত্রের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে শ্রেষ্ঠ তপস্যা করার জন্য অরণ্যে চলে গেলেন।

হিমালয় চূড়ার মনোরম দেবদারুবনে সেখানকার কন্দ ফল মূল আহার করে তিনি দেবতাদের আরাধনা করতে লাগলেন। তপস্যায় তাঁর সব পাপ দগ্ধ হল। তিনি মনে মনে বেদমাতা গায়ত্রী জপ করতে লাগলেন। এই ভাবে সম্পূর্ণ একশো বছর কেটে গেলে হিরণ্যগর্ভ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই স্থানে এলেন। সর্বতোমুখ ব্রহ্মাকে আসতে দেখে রাজা বসুমনা নিজের নাম বলে ভূমির উপর তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, আপনি দেবাদিদেব, পরমাত্মা, হিরণ্যমূর্তি, সহস্রচক্ষু, বেধা ও ব্রহ্মা। আপনাকে প্রণাম। হে দেব, আপনি বিজ্ঞানমূর্তি, ধাতা, বিধাতা, সাংখ্য ও যোগের সাহায্যে আপনার কাছে যাওয়া যায়। দেবতারা আপনারই নিজের রূপ। আপনাকে

প্রণাম। আপনি ত্রিমূর্তি, স্রষ্টা, সর্বার্থদর্শী, পুরাণপুরুষ, যোগীদের গুরু। আপনাকে প্রণাম। তখন ভগবান বিশ্বভাবন বিরিঞ্চি প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বর দেব। তুমি কল্যাণময় বর প্রার্থনা কর। রাজা বললেন, হে দেবাদিদেব, আমি আরও একশো বছর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করতে চাই। ততদিন পর্যন্ত যেন আমার আয়ু থাকে। বিশ্বাত্মা রাজাকে দেখে প্রসন্নমনে দুহাতে তাঁর গাত্র স্পর্শ করে বললেন, তাই হবে। তারপর সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। অতি স্বচ্ছবুদ্ধি, শ্রীসমন্বিত বসুমনা বর লাভ করে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ফলমূল কন্দ আহার করে শান্ত মনে কেবল জপ করে যেতে লাগলেন।

এই ভাবে সেই একশো বছরও কেটে গেল। তখন সূর্যমণ্ডলের মধ্যস্থিত মহাযোগী ভগবান উগ্ররশ্মি তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। রাজা সেই সূর্যমণ্ডলস্থ বেদশরীর, সনাতন, আদি-অন্তহীন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে দেখে বিস্মিত হলেন এবং বৈদিকমন্ত্র ও গায়ত্রী উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করলেন। ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি দেখলেন যে সেই পরমেশ্বর পুরুষ চতুর্মুখ, জটাশীর্ষ, অষ্টহস্ত, ত্রিনয়ন, চন্দ্রকলাভূষিত, রক্তবস্ত্র, রক্তবর্ণ, রক্তমাল্য ও অনুলেপনধারী, নীলকণ্ঠ, অর্ধনারীশ্বর মহাদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং নিজের দেহনির্গত কিরণ দিয়ে সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করছেন, রাজা তখন তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে পরম অনুরাগের সঙ্গে গায়ত্রী উচ্চারণ করে রুদ্রের প্রতি প্রণত হলেন ও তাঁর স্তব করতে লাগলেন, আপনি নীলকণ্ঠ, কিরণময়, পরমেষ্ঠী, ত্রয়ীময়, কালরূপ, জগতের হেতু স্বয়ংরুদ্র। আপনাকে প্রণাম। তাতে রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, শোন নিষ্পাপ রাজন, পবিত্র হয়ে আমার সর্ববেদ প্রণীত সংসারনাশক এই রহস্যনামগুলি উচ্চারণ করে সর্বদা আমাকে প্রণাম করবে। হে নৃপ, অনন্যচিত্ত হয়ে আমাতেই মন সমর্পণ করে যজুর্বেদের সাররূপে কথিত শতরুদ্রীয় অধ্যায় সর্বদা জপ করবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, মিতাহারী, ভস্মনিষ্ঠ আর সমাহিতচিত্ত হয়ে আমরণ তা জপ করে সে পরমপদ লাভ করে। ভগবান রুদ্র এই কথা বলে রাজার প্রতি অনুগ্রহ করে আবার তাঁকে একশো বছর আয়ু দান করলেন। তারপর পরমেশ্বর রুদ্র তাঁকে সেই পরমজ্ঞান ও বৈরাগ্য দান করে ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তর্ধান করলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

রাজা শরীরে ভস্ম লেপন করে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে শান্ত সমাহিত চিত্তে অন্য বিষয়ে মন না দিয়ে তপস্যারত অবস্থায় শতরুদ্রিয় জপ করতে লাগলেন। ঐ ভাবে জপ করতে করতে আবার একশো বছর কেটে গেল। কিন্তু রাজার আবার যোগে প্রবৃত্তি হতে লাগল। তারপর রাজা পরমেষ্ঠী সূর্যের মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত বেদসার শুভ্রবর্ণ কালপর পরমপদ প্রাপ্ত হলেন। পরে তিনি মহেশ্বরত্বও লাভ করলেন।

যে ব্যক্তি রাজা বসুমনার এই শ্রেষ্ঠ চরিতগাথা পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে পূজা পান।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে রাজবংশকীর্তনপ্রসঙ্গে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, রাজপুত্র ত্রিধন্বা ধর্ম অনুসারে এই পৃথিবী পালন করেছিলেন। তাঁর ত্রয্যারুণ নামে এক বিদ্বান পুত্র ছিলেন। তাঁর আবার সত্যব্রত নামে অত্যন্ত বলশালী

এক পুত্র হয়। সত্যব্রত সত্যধনার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র নামে পুত্রের জন্ম দেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বীর্যবান রোহিত। রোহিতের পুত্র হরিত। হরিতের পুত্র ধুন্ধু। ধুন্ধুর বিজয় ও বাসুদেব নামে দুই পুত্র হয়। বিজয়ের পুত্র ছিলেন শৌর্যসম্পন্ন কারুক। কারুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র পরমধার্মিক রাজা সগর। সগর রাজার দুই মহিষী ছিলেন—প্রভা ও ভানুমতী। তাঁরা দুজনেই অগ্নির আরাধনা করায় অগ্নি তুষ্ট হয়ে বর-রূপে ভানুমতীকে অসমঞ্জা নামে একটি পুত্র আর প্রভাকে ষাট হাজার পুত্র দান করেন। রাজা অংশুমান অসমঞ্জার পুত্র। তাঁর পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই তপস্যা করে ধীমান দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন। চন্দ্রশেখর মহাদেব ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে নিজের শিরঃস্থিত চন্দ্রের উপরিভাগে ধারণ করেছিলেন।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভাগ। তাঁর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র মহাবল ঋতুপর্ণ। এই ঋতুপর্ণের সুদাস নামে এক ধার্মিক পণ্ডিত পুত্র হয়েছিল। সুদাসের পুত্র সৌদাস। এঁরই আরেক নাম কল্মাষপাদ। মহাতেজা বশিষ্ঠের ঔরসে এই কল্মাষপাদ রাজার অশ্মক নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। ইনি ইক্ষ্বাকুকুলের কেতন স্বরূপ। উৎকলার গর্ভে অশ্মকের নকুল নামে এক পুত্র হয়েছিল। এই রাজা পরশুরামের ভয়ে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে বনে গমন করেছিলেন ও নারীরূপ কবচ ধারণ করেছিলেন। এঁর পুত্রের নাম শতরথ। শতরথের পুত্র শ্রীমান ইলিবিলি। তাঁর পুত্র আবার বৃদ্ধধর্মা। বৃদ্ধধর্মার পুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র রাজা দশরথ। লোকশ্রুত ধার্মিক বীর রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও মহাবল শত্রুঘ্ন—এই চারজন দশরথের পুত্র। এঁরা সকলেই বিষ্ণুভক্ত ও যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রতুল্য। বিশ্বপালক বিষ্ণুই রাবণ বধের জন্য বিভিন্ন অংশে রাম প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবতী পার্বতী জনক রাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক ত্রিভুবন বিখ্যাতা কন্যা প্রদান করেন। ইনিই রূপলাবণ্যময়ী, শীল-ঔদার্য আর গুণের আকর জনক-তনয়া সীতা। ইনি রামচন্দ্রকে পতিরূপে বরণ করেন।

শূলপাণি নীললোহিত ভগবান পার্বতীশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে জনকরাজাকে শত্রুনাশের জন্য এক আশ্চর্য ধনুক দান করেছিলেন। শত্রুঘ্ন ধীমান রাজা জনক এই কন্যাকে পাত্রস্থ করার অভিপ্রায়ে জগতে ঘোষণা করে দিলেন যে ত্রিভুবনের মধ্যে দেব বা দানব যে-ই জ্যারোপণ প্রভৃতি দ্বারা এই ধনুকের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে, সে-ই সীতাকে লাভ করবে। বলশালী প্রভু রাম তা জানতে পেরে জনকের প্রাসাদে গিয়ে অবলীলায় সেই ধনুক উত্তোলন করেই ভেঙে ফেললেন। তখন পরম ধার্মিক রাম সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন—যেন শঙ্কর আর পার্বতীর, ষড়ানন আর দেবসেনার মিলন ঘটল।

এর পর বহুকাল কেটে গেল। রাজা দশরথ নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর রামকে রাজা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন দশরথের সুভগা চারুহাসিনী মহিষী কৈকেয়ী সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বামীকে নিবারণ করে বললেন, হে নিষ্পাপ, আপনি আমার পুত্র ভরতকে রাজা করুন। আগেই আপনি আমাকে বর দিয়েছিলেন। রাজা কৈকেয়ীর কথা শুনে ক্লিষ্ট মনে বললেন, তাই হবে। ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রও তা মেনে নিলেন।

তারপর দৃঢ়াত্মা রাম পিতার চরণ বন্দনা করে লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাকে নিয়ে সংকল্প-বদ্ধ হয়ে বনে চলে গেলেন। মহাবলসম্পন্ন ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে চোদ্দ

বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। এঁদের বনবাসের সময়ে একদিন রাক্ষস রাবণ ভিক্ষুক বেশে এসে সীতাকে হরণ করে নিজের পুরীতে নিয়ে গেল। শত্রুদমনকারী রাম এবং লক্ষ্মণ সীতাকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল এবং দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে পড়লেন। তারপর এক সময়ে অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্রের সঙ্গে বানর সুগ্রীব এবং অন্য বানরদের বন্ধুত্ব হল। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা, সুগ্রীবের অনুগত বায়ুপুত্র মহাতেজস্বী হনুমান নামে খ্যাত বানর চিরকালের জন্য রামচন্দ্রের অত্যন্ত প্রীতির পাত্র হয়ে উঠলেন। হনুমান রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে সীতা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর অসীম ধৈর্য নিয়ে সীতার সন্ধানে রত হয়ে তিনি আসমুদ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই ভাবে এক সময়ে তিনি রাবণের পুরী লংকায় প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন লাবণ্যবতী, অনিন্দিতা, শুচিস্মিতা, অসহায়া সীতা এক বিজন স্থানে বৃক্ষমূলে বসে আছেন আর ইন্দীবরশ্যাম রামচন্দ্র সংযতাত্মা লক্ষ্মণের কথা মনে করে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করছেন। রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছে।

প্রভু হনুমান গোপনে সীতার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য রামচন্দ্রের দেওয়া একটি অঙ্গুরীয় তাঁকে দিলেন! স্বামীর সেই অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় দেখে সীতার দু'চোখ আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং তিনি রামচন্দ্র এসে গেছেন বলেই ধরে নিলেন। তখন হনুমান সীতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসছি। তারপর তিনি রামচন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন।

জিতেন্দ্রিয় হনুমান রামচন্দ্রকে সীতা-দর্শনের কথা জানালেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ তাকে প্রচুর সমাদর করলেন। এরপর বলবান রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে স্থির করলেন। পরমধার্মিক অরিন্দম রামচন্দ্র পবনাত্মজের সাহায্যে শত শত বানর দ্বারা লংকায় গমন করার জন্য সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করালেন। তারপর তিনি পত্নী-পুত্র আর ভ্রাতা সহ রাবণকে নিধন করে সীতাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেতুর মধ্যে রাম কৃত্তিবাস প্রভু ঈশানের এক লিঙ্গ স্থাপন করে নিজে তাঁর পুজো করেছিলেন। ভগবান মহাদেব শংকর পার্বতীর সঙ্গে তাঁর সামনে এসে এই শ্রেষ্ঠ বর দান করেছিলেন—যে সমস্ত দ্বিজ তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন করবে, তারা মহাপাতকী হলেও তাদের পাপ নষ্ট হবে। তাছাড়া এই সমুদ্রে স্নান করে লিঙ্গমূর্তি দর্শন করলে অন্যান্য পাপও ধুয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। যত দিন পর্যন্ত পর্বত থাকবে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, যত দিন এই সেতু বর্তমান থাকবে, আমিও তত দিন এই স্থানে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকব। এখানে যে স্নান, দান, তপস্যা, ও শ্রাদ্ধ করা হবে সে সবই অক্ষয় হবে এবং এই লিঙ্গের কথা স্মরণ করলে দিনগত পাপেরও ক্ষয় হবে।

এই কথা বলে ভগবান রুদ্র রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং নন্দী ও গণদেবতাদের সঙ্গে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। মহাতেজস্বী মহাশক্তিধর ধার্মিক রামকে ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত করলে তিনি রাজ্য পালন করতে লাগলেন। তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করে দক্ষযজ্ঞনাশক ঈশ্বর শংকরের এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের পুজো করেছিলেন। রামচন্দ্রের লব আর কুশ নামে দুই পুত্র হয়েছিল। তারা সর্বতত্ত্বদর্শী, সুমহাভাগ আর বিদ্বান। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল এবং নলের পুত্র নভ। নভার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র ক্ষেমধন্বা। বীর ও

প্রতাপান্বিত দেবানীক ক্ষেমধন্বার পুত্র। দেবানীকের পুত্র অহীনগু, তার পুত্র মহস্বান, মহস্বানের পুত্র চন্দ্রাবলোক, চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়, তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুচিত্ত এবং তার পুত্র শ্রুতায়ু। এরা সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান।

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা, আমি সংক্ষেপে ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান প্রধান পুরুষের নাম কীর্তন করলাম। যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের বর্ণনা করে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দেবলোকে বাস করে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সূর্যবংশে ইক্ষ্বাকুবংশকথন নামে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, অনন্তর ইলার পুত্র পুরূরবা রাজ্য পালন করতে লাগলেন। উর্বশীর গর্ভে তাঁর ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দিব্যপুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম—আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বীর্যবান, বিশ্বায়ু, শতায়ু এবং শ্রুতায়ু। মহাতেজা আয়ু বাহুকন্যা প্রভার গর্ভে পাঁচটি বীর পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। শুনেছি লোকবিশ্রুত ধর্মজ্ঞ নহুষই এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের পাঁচটি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী মহাশক্তিধর পুত্র হয়। তাঁদের নাম—যতি, যযাতি, সংযতি, আযাতি এবং অশ্বক। এঁদের মধ্যে যযাতীই মহাবলী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও অসুর বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা—এই দুজনকে বিবাহ করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। যযাতি অনিন্দিত জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে উপেক্ষা করে পিতৃবাক্য পালনে ব্যগ্র সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে সার্বভৌম রাজা করেছিলেন। রাজা যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, তুর্বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, দ্রুহ্যুকে পশ্চিম দিকে এবং অনুকে উত্তর দিকের আধিপত্যে স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা এই সমগ্র পৃথিবীকে ধর্মানুসারে পালন করতেন। মহাযশা রাজা পুত্রদের মধ্যে এই রকম ভাবে রাজ্যের বিভাগ করে দিয়ে যথাসময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে বনে গমন করলেন।

যদুর দেবপুত্র সদৃশ পাঁচটি পুত্র হয়েছিল—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু। সহস্রজিতের শতজিৎ নামে একটি পুত্র হয়। শতজিতের আবার হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামে পরমধার্মিক তিনটি পুত্র হয়েছিল। হে দ্বিজগণ, তাঁদের মধ্যে রাজা হৈহয়ের ধর্ম নামে বিখ্যাত এক পুত্র হয়েছিল আর রাজা ধর্মেরও ধর্মনেত্র নামে প্রতাপান্বিত এক পুত্র হয়েছিল। ধর্মনেত্রের পুত্র কীর্তি, কীর্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিষ্মান, মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র রাজা দুর্মদ, দুর্মদের পুত্র ধীমান ও বীর্যশালী অন্ধক। অন্ধকের আবার কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা নামে চারজন জগদ্বন্দিত পুত্র হয়। তাঁদের মধ্যে রাজা কৃতবীর্যের কার্তবীর্যার্জুন নামে জ্যোতিঃসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ও সহস্রবাহু এক পুত্রের জন্ম হয়েছিল। এই অর্জুনের মৃত্যু হয় ভগবান জামদগ্ন্য পরশুরামের হাতে। কার্তবীর্যার্জুনের বহুশত পুত্র। তাঁদের মধ্যে শূর, শূরসেন, কৃষ্ণ, ধৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ এই পাঁচজন ছিলেন মহারথী, অস্ত্রবিদ্যাপারঙ্গম, বলবান, বীর, ধার্মিক ও মনস্বী। কনিষ্ঠ শক্তিমান রাজা জয়ধ্বজ নারায়ণভক্ত ছিলেন এবং তাঁর শূরসেন প্রমুখ প্রথিতবীর্য মহাত্মা চারজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রের প্রতি ভক্তিশীল হয়ে

মহাদেবের আরাধনা করতেন। মতিমান ধর্মপরায়ণ জয়ধ্বজ ভগবান নারায়ণ হরির শরণ নিলে একদিন কার্তবীর্যার্জুনের শূর প্রমুখ চারজন পুত্র তাঁকে বললেন, হে নিষ্পাপ, এ রকম কাজ তোমার করা উচিত হচ্ছে না। কারণ শুনেছি আমাদের পিতা মহাদেবের আরাধনা করতেন। মহাতেজা জয়ধ্বজ উত্তর দিলেন, এই আমার পরম ধর্ম। যখন বিষ্ণুই জগতের পালক এবং পৃথিবীর সব রাজা তাঁরই অংশ থেকে উদ্ভূত তখন রাজ্যপালনকারী রাজার পক্ষে বিষ্ণুর পূজা করা অবশ্যই উচিত। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য স্বয়ম্ভূ ভগবানের সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী এই তিন রকম মূর্তি হয়েছে। তার মধ্যে সত্ত্বগুণী ভগবান বিষ্ণুই নিরন্তর জগৎ পালন করেন। রজোগুণাশ্রয়ী ব্রহ্মা তার সৃষ্টি করেন আর তমোগুণাবলম্বী মহাদেব তাব সংহার করেন। এজন্য রাজ্যপালনে নিযুক্ত রাজাদের পক্ষে ভগবান কেশি নিষূদন কেশব বিষ্ণুরই অর্চনা করা কর্তব্য।

তাঁর মনস্বী ভ্রাতারা এ কথা শুনে উত্তর দিলেন, মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে সংহারকর্তা রুদ্রের পূজাই বিধেয়। কারণ সমস্ত জগৎই শিবময় এবং সেই ভগবান প্রভু রুদ্রই তমোগুণের আশ্রয় নিয়ে কল্পান্তে এই জগৎকে ধ্বংস করবেন। তাঁর যে ঘোরতমা তেজোময়ী পরমা মূর্তি আছে, শূলপানি সেই বিদ্যামূর্তির দ্বারা প্রথমেই সংসারের লয় সাধন করেন।

তখন রাজা জয়ধ্বজ বিবেচনাপূর্বক উত্তর দিলেন, সত্ত্বগুণের প্রভাবেই জীবগণ মুক্তি পেয়ে থাকে। ভগবান হরি সেই সত্ত্বগুণের আকর। তাঁর ভ্রাতারা বললেন, লোকে সাত্ত্বিক ভাবে রুদ্রের পূজা করলে মহাদেব নিজে সত্ত্বগুণযুক্ত হয়ে তাদের মুক্তিদান করেন। অতএব তাঁরই পূজা কর। তখন রাজপুত্র জয়ধ্বজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, মানুষ নিজের বিহিত ধর্ম আচরণের দ্বারাই মুক্তি পেয়ে থাকে। তাছাড়া মুক্তিলাভের আর কোন পথ নির্দিষ্ট নেই। মুনিরাই এ কথা বলেছেন। আর রাজাদের মধ্যেও নিহিত রয়েছে বৈষ্ণবী শক্তি। অতএব অমিতবীর্য মুররিপুর আরাধনা করাই তাঁদের পক্ষে পরম ধর্ম। তখন শ্রেষ্ঠবুদ্ধি রাজপুত্র কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, আমাদের পিতা অর্জুন যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন, তাই আমাদের স্বধর্ম। এই রকম মতবিরোধ দেখা দিলে শূরসেন বললেন, ঋষিদের কথাই এ বিষয়ে আমাদের কাছে প্রামাণ্য। তারা যা বলবেন, সেটাই ঠিক। তখন সেই ব্রহ্মবাদী রাজপ্রবরেরা অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সপ্তর্ষিদের আশ্রমে গিয়ে তাদের সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিরা রাজাদের এই যথার্থ উত্তর দিলেন, হে রাজগণ, যে দেবতা যার অভীষ্ট, সেই দেবতাকেই তার উপাসনা করা উচিত। কার্যবিশেষে তাঁদের পূজা করলে তাঁরা সকলকেই ঈপ্সিত ফল দান করেন। কিন্তু কার্যবিশেষ ছাড়া মানুষের পক্ষে সকল সময়ে এই নিয়ম বিহিত নয়। বিষ্ণু ও ইন্দ্র রাজাদের দেবতা, অগ্নি, আদিত্য ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদের উপাস্য। বিষ্ণু দেবগণের, মহাদেব দানবদের, চন্দ্র যক্ষ আর গন্ধর্বদের উপাস্য দেবতা। সরস্বতী বিদ্যাধরদের, ভগবান হরি সিদ্ধদের, ভগবান রুদ্র রক্ষোগণের, পার্বতী কিন্নরগণের দেবতা। ভগবান ব্রহ্মা ও ত্রিশূলী মহাদেব ঋষিদের উপাস্য। উমাদেবী স্ত্রীজাতির মান্যা। এইভাবে বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ভাস্কর গৃহস্থদের, ব্রহ্ম ব্রহ্মচারীদের, সূর্য বানপ্রস্থাশ্রমীদের, মহেশ্বর যতিদের, ভগবান রুদ্র ভূতগণের, বিনায়ক কুষ্মাণ্ডগণের, ভগবান দেবদেব প্রজাপতি সমস্তলোকের আরাধ্য দেবতা, ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং এই রকম বলেছেন। অতএব জয়ধ্বজের পক্ষে অবশ্যই বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তব্য। রুদ্রের সঙ্গে হরিকে অভিন্ন

জেনেই মানুষের পূজা করা উচিত। তা না করলে ভগবান হরি রাজাদের শত্রুনাশ করেন না।

তখন রাজারা তাঁদের প্রণাম করে নিজেদের পরম মনোহর পুরীতে গমন করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণকে জয় করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন।

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এর পর কোন এক সময়ে সমস্ত প্রাণীর ভীতি উৎপাদক, দংষ্ট্রাকরাল, জ্বলন্তশরীর, প্রলয়কালীন বহ্নিতুল্য বিদেহ নামে দানব সূর্যের মতো দীপ্তিময় শূল হাতে নিয়ে বিকট চিৎকারে দশদিক প্রতিধ্বনিত করে সেই রাজপুরীতে এসে উপস্থিত হল। সেই সময়ে সেই স্থানে যে সব লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই শব্দ শুনে ভয়ে অভিভূত হয়ে প্রাণত্যাগ করল, কেউ বা সেই স্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল। তখন অর্জুনপুত্র মহাবল শূরসেন প্রমুখ পাঁচজন যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রণসাজে সেই বিদেহের অভিমুখে গমন করলেন। শূর রৌদ্রাস্ত্র, শূরসেন বারুণাস্ত্র, কৃষ্ণ প্রাজাপত্য অস্ত্র এবং ধৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন এবং জয়ধ্বজ কৌবের, ঐন্দ্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেই দানব ঐ সমস্ত অস্ত্র শূলে দিয়ে ভেঙে ফেলতে লাগল। তখন মহাবীর্য কৃষ্ণ ভীষণ গদা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র-বেগে তার দিকে ছুড়ে মেরে গর্জন করে উঠলেন। কিন্তু সেই গদা বিদেহের প্রস্তর কঠিন বক্ষঃস্থলে পতিত হয়েও সমতুল্য ঐ দানবকে বিচলিত করতে পারল না। তখন অন্য সকলেই তার বিপুল পৌরুষ দেখে ভয়ে পলায়ন করলেন। মতিমান জয়ধ্বজ কিন্তু জগৎপতি জিষ্ণু লোকস্রষ্টা, অজেয়, অনাময়, ত্রাতা, পুরাণপুরুষ, পীতাম্বর, শ্রীপতি বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন।

তখন ভক্তপ্রেমী ভগবান বাসুদেবের আদেশে অযুত সূর্যের দীপ্তি নিয়ে এক চক্র রাজার সামনে আবির্ভূত হল। রাজা জগতের উৎস নারায়ণকে স্মরণ করে সেই চক্র গ্রহণ করলেন। তারপর নারায়ণ যেমন দানবদের প্রতি চক্র নিক্ষেপ করেন, সেই রকম ভাবে রাজাও বিদেহের দিকে সেই চক্র ছুড়ে মারলেন। সেই সুদর্শন চক্র ভীষণাকৃতি দানবের স্কন্ধে সংলগ্ন হয়েই তার পর্বতশিখর সদৃশ মুণ্ডকে ভূপাতিত করল।

পুরাকালে বিষ্ণু মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করে অসুরবিনাশের জন্য এই চক্র লাভ করেন। তাই অসুরবংশ নিধনের কাজে এই চক্র অপ্রতিহত। দেবতাগণের সেই শত্রু নিহত হলে শূর প্রমুখ ভ্রাতারা সকলে নিজেদের পরম রমণীয় পুরীতে ফিরে এলেন এবং ভ্রাতা জয়ধ্বজকে নানাভাবে সম্মানিত করলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা জয়ধ্বজের পরাক্রমের কথা শুনে সেই কীর্তবীর্য তনয়কে দেখবার মানসে সেখানে এলেন। তাঁকে আসতে দেখে তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে সুন্দর এক আসনে বসিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তারপর বললেন, ভগবন, আপনার অনুগ্রহেই আমি ভয়ংকর অসুর বিদেহ নামা দানবরাজকে হত্যা করতে পেরেছি। আপনার কথাতেই আমার সন্দেহের নিরসন ঘটে এবং আমি সত্য-পরাক্রম বিষ্ণুর শরণ নিই। সেই জন্যই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। হে সুব্রত, আমি পদ্মপলাশনয়ন পরমেশ্বর বিষ্ণুকে কিভাবে আরাধনা করব এবং কী বিধান অনুসারেই বা সেই হরির পূজা করতে হয়? এই ভগবান নারায়ণের স্বরূপ কেমন, এঁর শক্তিই-বা কি রকম? এই সমস্ত তত্ত্ব আমাকে বলুন। এ সব কথা শোনবার জন্য আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্য বোধ করছি।

বিশ্বামিত্র বললেন, যাঁর থেকে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়েছে, সমস্ত পদার্থই যাঁতে

নিহিত রয়েছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর থেকে হয়েছে, তিনিই সর্বভূতাত্মা বিষ্ণু। লোকে তাঁকে আশ্রয় করেই মুক্তি পায়। যাঁকে তত্ত্বদর্শীরা পরতর ব্রহ্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেন, যাঁকে গুহাহিত, পরম আনন্দময় এবং ব্যোমস্বরূপ বলেন, তিনিই নারায়ণ। যিনি সদা-প্রকাশ, নির্বিকল্প, নিত্যানন্দ ও নিরঞ্জন, যিনি চতুর্ব্যূহধারী হয়েও নিজে ব্যূহশূন্য, তিনিই বিষ্ণু। তিনিই পরমাত্মা, পরম তেজঃস্বরূপ, পরমাকাশময় আর পরম পদ। ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁকে ত্রিপাদ অক্ষর ব্রহ্ম বলে থাকেন। তিনিই বিশ্বাত্মা, যোগাত্মা, পুরুষোত্তম বাসুদেব। স্বয়ং ব্রহ্মা ও পরমেশ্বর রুদ্র তাঁরই অংশ থেকে উৎপন্ন। লোকে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম অনুসারে এই পুরুষোত্তমের পূজা করে থাকে। রুদ্রের পরম মূর্তিকে জেনে তবেই তাঁর পূজা করা উচিত, নাহলে নয়।

ভগবান মহাতপা বিশ্বামিত্র এই পর্যন্ত বলে শূর প্রমুখ নৃপতিদের পূজা গ্রহণ করে নিজের আশ্রমে গমন করলেন। তারপর শূরাদি রাজগণ যজ্ঞের দ্বারা কামনাশূন্য হৃদয়ে অব্যয়, যজ্ঞাধিগম্য মহেশ্বর রুদ্রের আরাধনা করলেন। এঁদের যজ্ঞ সমাধা করে-ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠ, রুদ্রপরায়ণ গৌতম, অগস্তি আর অত্রি মুনি। ভগবান বিশ্বামিত্রও শত্রুদমনকারী রাজা জয়ধ্বজকে দিয়ে ভূতস্রষ্টা আদিদেব জনার্দনের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়েছিলেন। রাজা জয়ধ্বজ অচ্যুত বিষ্ণুকে রুদ্রের পরমামূর্তি বলে জেনে সযত্নে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞে ভগবান মহাযোগী সাক্ষাৎ হরি নিজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন জয়ধ্বজের এই পরাক্রমের কথা শ্রবণ করেন, তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুলোক গমন করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সোমবংশানুকীর্তনে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, জয়ধ্বজ রাজার তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়েছিল। তাল-জঙ্ঘের আবার একশত পুত্র। তারাও সকলে তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাতেজা বীতিহোত্র রাজা হয়েছিলেন। বৃষ প্রমুখ পুণ্যধর্মা অন্য যে সব যাদব ছিলেন, তাদের মধ্যে বৃষই বংশরক্ষা করতে পেরেছিলেন। তার মধু নামে এক পুত্র হয়। মধুর আবার একশত পুত্র। তার মধ্যে বৃষণ মধুর বংশ বজায় রেখেছিলেন। বীতি-হোত্রের পুত্র বিশ্রুত, বিশ্রুতের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম দুর্জয়। এর পত্নী অত্যন্ত রূপবতী, সর্বগুণোপেতা, পতিব্রতা এবং স্বধর্মপালিকা ছিলেন। একদিন মহারাজ দুর্জয় কালিন্দীর তীরে দেবী উর্বশীকে মধুর স্বরে গান করতে দেখে তার কাছে গিয়ে বললেন, দেবি, তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল বিহার কর। উর্বশী দেখলেন রাজা রূপলাবণ্যের অধিকারী, দ্বিতীয় কন্দর্পের মতো কান্তিমান। তিনি রাজার সঙ্গে দীর্ঘ-কাল বিহার করতে লাগলেন। বহুকাল পরে রাজার চৈতন্য ফিরে এলে তিনি পরমা-সুন্দরী উর্বশীকে বললেন, এবার আমি নিজের রমণীয় পুরীতে ফিরব। তখন উর্বশী হাসতে হাসতে বললেন, রাজসুন্দর, আপনার এই সম্ভোগ আমাকে পরিতৃপ্ত করে নি। আরো এক বছর আপনাকে আমার সঙ্গে কাটাতে হবে। বুদ্ধিমান রাজা বললেন, আমি নিজের পুরীতে গিয়ে আবার শীঘ্র এখানে ফিরে আসব। আমাকে যেতে দাও। সুভগা

উর্বশী উত্তর দিলেন, রাজন, তাই করুন। কিন্তু অন্য কোন অপ্সরার সঙ্গে যেন রমণ করবেন না। রাজা তাতেই স্বীকৃত হয়ে পরম রমণীয় পুরীতে ফিরে গেলেন। সেখানে নিজের পতিব্রতা ভার্যাকে দেখে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। তাঁর পীনপয়োধরা পতিব্রতা গুণবতী স্ত্রী তাঁকে ভয়বিহ্বল দেখে প্রসন্ন বাক্যে বললেন, স্বামিন. কেন আজ আপনি এ রকম ভয় পেয়েছেন, আমাকে সত্য করে বলুন। এ রকম ভয় তো রাজাদের পক্ষে গৌরবের নয়। তাঁর কথা শুনে রাজা লজ্জায় অবনত হলেন, কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর পত্নী জ্ঞানচক্ষে সবই দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। যাতে পাপ নষ্ট হয় এমন কাজ করুন। আপনি যদি ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন, তাহলে তো আপনার সমস্ত রাজ্যের নাশ হবে। তখন সেই দ্যুতিমান মহাবল রাজা রাজপুরী থেকে বেরিয়ে এলেন। মহামুনি কণ্বের আশ্রমে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করে তাঁর কাছ থেকে শুভ প্রায়শ্চিত্ত বিধি জেনে নিয়ে তিনি হিমালয়চূড়ার দিকে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে আকাশমার্গে দিব্যমালায় সজ্জিত অতি সুন্দর এক গন্ধর্বরাজকে তিনি দেখতে পেলেন। সেই মালাটি দেখে শত্রুজয়ী রাজার অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে মনে পড়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, এ মালা উর্বশীকেই মানায়। তারপর কামের প্রভাবে নিতান্ত কাতর হয়ে রাজা সেই মালাটি নেবার জন্য গন্ধর্বের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করলেন। ঘোর যুদ্ধে গন্ধর্বকে পরাজিত করে রাজা মালাটি নিলেন এবং উর্বশীকে দেখবার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে কালিন্দীর তীরে গমন করলেন। কামজর্জর রাজা উর্বশীকে সেখানে দেখতে না পেয়ে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর উর্বশীর দর্শন পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে হিমালয়ের পার্শ্ব-দেশ দিয়ে পর্বতশ্রেষ্ঠ হেমকূটে গমন করলেন। সেখানেও প্রধান প্রধান অপ্সরারা সুন্দর মালায় শোভিত সিংহপরাক্রম রাজাকে দেখে অত্যন্ত কামার্ত হল। কিন্তু রাজা উর্বশীকেই মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন বলে 'অন্য কোন অপ্সরার সঙ্গে যেন রমণ করবেন না' উর্বশীর এই কথা মনে করে ঐ অপ্সরাদের উপেক্ষা করলেন। সেখান থেকে তিনি সমস্ত পর্বতশিখরগুলিতে গেলেন। কিন্তু দেবপরাক্রম রাজা সেখানেও উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে কামপীড়িত হয়ে দেবতাদের বাসভূমি মহামেরুতে গমন করলেন। স্বকীয় বাহুবলে বিক্রান্ত রাজা সেই শৃঙ্গ পেরিয়ে সেখানে পৃথিবীবিশ্রুত মানস সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই সরোবরের তীরেই পরম রমণীয়া অনবদ্যাঙ্গী সুভগা উর্বশী বিচরণ করছিলেন। তাকে দেখে রাজা সেই মালা তাকে দিলেন। উর্বশীকে মালায় শোভিত দেখে রাজা মোহিত হলেন এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করে তার সঙ্গে দীর্ঘকাল বিহার করতে লাগলেন। একদিন রতিশেষে রাজপ্রবরকে উর্বশী জিজ্ঞাসা করলেন, হে বীর নৃপ, সেই সময়ে আপনি নগরে গিয়ে কী করলেন ? রাজা তাকে নিজের পত্নী যা বলেছিলেন সেই কথা, কণ্বমুনির দর্শন প্রাপ্তির কথা আর মালাহরণের বৃত্তান্ত—সবই জানালেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষিণী উর্বশী এ কথা শুনে বললেন, রাজন, আপনি শীঘ্র ফিরে যান। তা না হলে কণ্বমুনি আপনাকে শাপ দেবেন, আপনার স্ত্রীও আমাকে শাপ দেবেন। এভাবে উর্বশী রাজাকে বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও দুর্জয় তার প্রতি আসক্তচিত্ত ও মদমোহিত হয়ে তার সঙ্গ ছাড়লেন না। তখন কামরূপা উর্বশী রাজাকে সর্বদা নিজের অতি লোমশ পিঙ্গলাক্ষ উৎকট রূপ দেখাতে শুরু করলেন। তাতে উর্বশীর ওপর রাজার বিরক্তি জন্মাল এবং তিনি মহামুনি কণ্বের বাক্য স্মরণ করে নিজের কৃতকর্মকে

ধিক্কার দিতে দিতে তপস্যা শুরু করলেন। প্রথম বারো বছর তিনি ফলমূল আর কন্দ খেয়ে রইলেন। এর পরের বারো বছর কেবল বায়ু ভক্ষণ করে রইলেন। তারপর ভয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে আবার গিয়ে অপ্সরার সংসর্গের কথা এবং উত্তম তপস্যার কথা সবই তাঁকে জানালেন। ভগবান কণ্ব রাজপুঙ্গবকে দেখে প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর মধ্যে যে পাপের বীজ ছিল তাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি মহাদেবের বাসভূমি বারাণসী নগরীতে যাও। সেখানে ভগবান মহেশ্বর সমস্ত লোকের পাপ নাশ করার জন্য অবস্থান করছেন। যথাবিধি গঙ্গায় স্নান করে তুমি দেবতা আর পিতৃগণের তর্পণ করবে, তারপরে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করবে। তাহলেই সমস্ত পাপ থেকে মুহূর্ত মধ্যে তোমার মুক্তি ঘটবে। তখন রাজা দুর্জয় মাথা নত করে কণ্বকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বারাণসীতে গেলেন। সেখানে মহাদেব দর্শনে তাঁর পাপমুক্তি ঘটল। তারপর নিজের সমুজ্জ্বল পুরীতে গমন করে তিনি পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনায় কণ্বমুনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে দিয়ে যজ্ঞ করালেন। তাঁর সুপ্রতীক নামে এক বুদ্ধিমান পুত্র হয়। সুপ্রতীকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজারা তাঁকে রাজা বলে উপাসনা করেছিল। হে দ্বিজগণ, উর্বশীর গর্ভে রাজার দেবতুল্য মহাশৌর্যসম্পন্ন সাত পুত্র হয়। এরা সকলেই গন্ধর্ব কন্যাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

সহস্রজিৎ রাজার উত্তম বংশের বৃত্তান্ত আপনাদের কাছে সবিস্তারে বললাম। এ কথা শ্রবণ করলে মানুষের পাপ বিনষ্ট হয়। এখন ক্রোষ্টু রাজার বংশের বিবরণ শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সোমবংশানুকীর্তনপ্রসঙ্গে সহস্রজিতের-বংশবর্ণন নামে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, ক্রোষ্টু রাজার বৃজিনীবান নামে এক পুত্র হয়েছিল। বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের পুত্র বলবান চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু, শশবিন্দুর পুত্র ধর্মরত রাজা পৃথুযশা, তার পুত্র পৃথুকর্মা, পৃথুকর্মার পুত্র পৃথুজয়, পৃথুজয়ের পুত্র পৃথুকীর্তি, পৃথুকীর্তির পুত্র পৃথুদান, পৃথুদানের পুত্র পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার পুত্র পৃথুসত্তম, পৃথুসত্তমের পুত্র উশনা, উশনার পুত্র শিতেষু, শিতেষুর পুত্র রুক্মকবচ, রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃত্ত, পরাবৃত্তের পুত্র ভুবনবিখ্যাত জ্যামঘ, জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের ক্রথ, কৌশিক আর লোমপাদ নামে তিন পুত্র। তাদের মধ্যে তৃতীয় লোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র শ্বেত, শ্বেতের পুত্র বলবান বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র মহাবীর্য, মহাবীর্যের পুত্র প্রজাবান কৌশিক, কৌশিকের পুত্র ধীমান সুমন্তু, সুমন্তুর পুত্র নল। বিদর্ভপুত্র কৌশিকের পুত্রের নাম চেদি, তাঁর চৈদ্য প্রভৃতি নামে অনেক পুত্র হয়েছিল। দ্যুতিমানই তাদের মধ্যে প্রধান। এই দ্যুতিমানের বপুষ্মান নামে এক পুত্র হয়। বপুষ্মানের পুত্র বৃহন্মেধা, বৃহন্মেধার পুত্র শ্রীদেব, শ্রীদেবের পুত্র মহাবল রুদ্রভক্ত বীতরথ। হে দ্বিজগণ, ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্টি, ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র নবরথ।

হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, তিনি সর্বদা দানধর্মে রত, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এই বীর

ও পরবীর হন্তা ভীমরথতনয় একদিন বিকৃত অবস্থায় মৃগয়ায় গিয়ে এক রাক্ষস মূর্তি দেখে অত্যন্ত ভীত বিহ্বল হয়ে পলায়ন করলেন। সেই মহাবল অগ্নিতুল্য রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ কথা নয়। সে তার বিপুল এক হস্তে শূল নিয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। ভয়াকুলিতচিত্ত রাজা নবরথ দেখলেন যে কাছেই এক সুগুপ্ত অতি সুন্দর সরস্বতী নিকেতন রয়েছে। বুদ্ধিমান ও শত্রুহননকারী রাজা তীব্র বেগে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীকে দর্শন করলেন। নতমস্তকে প্রণাম করে রাজা ভূমিতে দণ্ডবৎ হলেন। তারপর জোড় হস্তে অভীষ্ট বাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। এই আমি আপনার শরণ নিলাম। সাক্ষাৎ মহাদেবী, আদি-অন্তহীনা, ব্রহ্মচারিণী, ঈশ্বরী, বাগ্‌দেবতা দেবী সরস্বতীকে আমি প্রণাম করছি। যিনি জগতের উৎস, যোগিনী, পরমা কালরূপা, হিরণ্যগর্ভ-তনয়া, ত্রিনয়না, চন্দ্রশেখরা, সেই সরস্বতীকে আমি প্রণাম করি। দেবি, আপনি পরমানন্দা, চিৎকলা, ব্রহ্মরূপিণী, আপনাকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বরি, আমি ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় নিয়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

এমন সময়ে সেই বলদর্পিত রাক্ষসরাজ যেখানে ত্রিলোকপ্রসূতি দেবী সরস্বতী অবস্থান করছিলেন, সেই চন্দ্রসূর্যসন্নিভ স্থানে রাজাকে হত্যা করবার মানসে ক্রুদ্ধ ভাবে শূল উত্তোলন করে প্রবেশ করল। তখন প্রলয়কালের সূর্যের মতো এক বিশালকায় ভূত এসে শূল দিয়ে সেই রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করল। তারপর রাজাকে বলল, মহারাজ, আপনার শত্রু রাক্ষস এখানে নিহত। এখন আপনি নির্ভয়ে নিজের গৃহে সত্বর ফিরে যান। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তখন রাজা নবরথ আহ্লাদিত মনে দেবীকে প্রণাম করে ইন্দ্রপুরীতুল্য নিজ নগরীতে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি সরস্বতী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে নানাবিধ যজ্ঞ ও হোম প্রভৃতি দ্বারা তাঁর অর্চনা করতে লাগলেন।

নবরথের পরম ধার্মিক মহাতেজা দশরথ নামে এক পুত্র হয়। ইনিও সরস্বতী দেবীর অত্যন্ত ভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ, করম্ভের পুত্র দেবরাত, ইনি স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এর দেবদত্ত নামে এক পুত্র হয়েছিল। দেবদত্তের মধু নামে একটি পুত্র, তার পুত্র কুরু, কুরুর পুত্র দুটি—সুত্রামা ও অনু। অনুর পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের পুত্র অংশু, অংশুর বিষ্ণুভক্ত, প্রতাপবান, মহাত্মা, দানশীল, ধনুর্বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্বত নামে এক পুত্র হয়েছিল। ইনি নারদের কথায় ভগবান বাসুদেবের অর্চনায় রত হন এবং কুণ্ড গোলাদির পাঠ্য এক শাস্ত্র প্রবর্তিত করেন। তাঁর মতাবলম্বীদের কল্যাণকর ও কুণ্ড গোলাদির হিতাবহ স্বনামপ্রসিদ্ধ ঐ বৃহৎ শাস্ত্র তখন থেকেই প্রচলিত হয়। তাঁর পুত্র সর্বশাস্ত্রবিশারদ পুণ্যশ্লোক মহারাজ সাত্বতও সেই শাস্ত্র প্রচলন করিয়েছিলেন। কৌশল্যার গর্ভে সাত্বত রাজার ধনুর্বেদ-বিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও রাজা দেবাবৃধ—এই পাঁচ পুত্র জন্মেছিল। তাঁদের মধ্যে দেবাবৃধ রাজা সর্বগুণযুক্ত পুত্র লাভের জন্য অতি দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর বভ্রু নামে পুণ্যশ্লোক, ধার্মিক, রূপগুণ-সম্পন্ন এবং সর্বদা তত্ত্বজ্ঞানে রত পুত্র হয়েছিল। ভজমানের অনেকগুলি পরমসুন্দর পুত্র হয়। নিমি এবং কৃকণই তাঁদের মধ্যে প্রধান। মহাভোজের বংশে মৃত্তিকাবৎ পুরনিবাসী ভোজগণের জন্ম হয়। বৃষ্ণির বলবান সুমিত্র, অনমিত্র ও শিনি নামে তিন পুত্র হয়েছিল। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের প্রসেন আর সত্রাজিৎ নামে দুই মহাভাগ ও উত্তম পুত্র হয়। বৃষ্ণির পুত্র

অনমিত্রের কনিষ্ঠ শিনির ঔরসে সত্যপরায়ণ সত্যবাক সত্যক নামে এক পুত্র হয়েছিল। সত্যকের পুত্র যুযুধান. ইনি সত্যকের পুত্র বলে সাত্যকি নামেও কথিত হয়ে থাকেন। যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের পুত্র ধীমান কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। মাদ্রীর গর্ভে যাদবগণের বৃষ্ণি নামে এক পুত্র হয়েছিল। ঐ বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক এবং চিত্রক। শ্বফল্ক কাশিরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে ধর্মপরায়ণ অক্রূর. উপমঙ্গু, মঙ্গু নামে পুত্র এবং অন্য অনেক পুত্র উৎপাদন করেন। অক্রূরের দেববান এবং দেবস্বভাব উপদেব নামে প্রসিদ্ধ দুই পুত্র হয়েছিল। তাদেরও বিশ্ব ও প্রমাথী নামে দুই পুত্র হয়েছিল। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু. সুপার্শ্বক এবং গবেষণ নামে ছয় পুত্র হয়েছিল। কাশ্যপদুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শমীক ও বলগর্বিত নামে চার পুত্র হয়। কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, তাঁর পুত্র বিখ্যাত কপোতরোমা. কপোতরোমার পুত্র বিলোমক। বিদ্বান তম বিলোমকের পুত্র। তিনি তুম্বুরুসখা। তমের পুত্র আনকদুন্দুভি। বিপ্রগণ, এই আনকদুন্দুভি গোবর্ধন পর্বতে গিয়ে বিপুল তপস্যা করেছিলেন এবং লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তাঁকে বংশের অক্ষয় যশ. গুরুর চেয়েও অধিক উত্তম জ্ঞানযোগ এবং ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারা—এই বরগুলি দিয়েছিলেন। স্থিরচিত্ত রাজা এই সমস্ত বরলাভ করে পুনরায় বরেণ্য বৃষবাহনের কাছ থেকে বরলাভের ইচ্ছায় গান দ্বারা স্বর্গপূজিত মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। তখন ভগবান অম্বিকাপতি গাননিরত সেই রাজাকে দেবদুর্লভ এক কন্যারত্ন দান করলেন। শত্রুদমনকারী রাজা আনকদুন্দুভি সেই কন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং ভ্রান্তলোচনা সেই প্রিয়াকে উত্তম গানযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে শোভন নামে এক মহাবাহু পুত্র এবং শ্রীমতী নামে এক রূপলাবণ্যময়ী কন্যার জন্ম হয়। তাঁদের জননী বাল্যকালেই তাদের যথাবিধি গানবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। উপনয়নের পর গুরুর কাছে নিয়মানুসারে বেদ অধ্যয়ন করে রাজা শোভন গন্ধর্বদের মানসী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে গানবিদ্যায় পারংগম ও বীণাবাদনে পারদর্শী পাঁচজন উত্তম পুত্রের জন্ম হয়। সঙ্গীতজ্ঞ রাজা আনকদুন্দুভি স্ত্রী, পুত্র আর পৌত্রদের সঙ্গে মিলে কেবল গানের দ্বারাই ত্রিপুরারির আরাধনা করতে লাগলেন।

একদিন সুবাহু নামে এক গন্ধর্ব বিশালাক্ষী সর্বাঙ্গশোভনা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীতুল্যা কন্যা শ্রীমতীকে নিজের পুরীতে নিয়ে যায়। তাঁর গর্ভে ঐ সুতেজা গন্ধর্বের সুষেণ, বেণ. সুগ্রীব, সুভোগ আর নরবাহন নামে পাঁচ পুত্র হয়। তারপর চন্দনোদক দুন্দুভির অভিজিৎ নামে এক পুত্র হয়েছিল। অভিজিতের পুত্র পুনবসু. পুনর্বসুর পুত্র আহুক. আহুকের পুত্র উগ্রসেন এবং দেবক। দেববান উপদেব, সুদেব এবং দেবরক্ষিত এই ক'জন দেবসদৃশ বীরপুত্র দেবকের ঔরসে জন্ম নেয়। এঁদের যে সাতজন ভগিনী ছিল, তাদের নাম ধৃতদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। এঁদের মধ্যে সুমধ্যমা দেবকীই সকলের চেয়ে বরণীয়তমা ও সুব্রতা ছিলেন। বসুদেবের হাতে এঁদের সকলকেই সমর্পণ করা হয়েছিল। ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, তুষ্টিমান এবং শঙ্কু এই ছয়জন উগ্রসেনের পুত্র। সত্বতনন্দন ভজমানের পুত্র প্রখ্যাত বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর, শূরের পুত্র সমি. সমির পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ. স্বয়ম্ভোজের পুত্র শত্রুতাপন হৃদিক. হৃদিকের পুত্র কৃতবর্মা, কৃতবর্মার পুত্র দেবল. দেবলের পুত্র শূর, তাঁর পুত্র ধীমান বসুদেব। বসুদেবের পুত্র মহাবাহু জগদগুরু বাসুদেব। ইনি দেবগণের প্রার্থনায় দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন. ইনিই স্বয়ং হরি। হে মহাভাগ মুনিগণ,

বসুদেবের পরমশোভনা রোহিণী নাম্নী পত্নী জ্যেষ্ঠ হলায়ুধ সংকর্ষণ রামকে প্রসব করেছিলেন। ইনিই পরমাত্মা বাসুদেব, জগন্ময়, হলায়ুধ সাক্ষাৎ স্বয়ং শেষ এবং প্রভু সংকর্ষণ। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ভৃগু মুনির শাপে মানুষদেহ ধারণ করে দেবকী এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাসুদেবের আদেশে উমাদেহ-সম্ভবা যোগনিদ্রা কৌশিকী যশোদার গর্ভে জন্মেছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস এবং পূজিত কীর্তিমান নামে যে সব বসুদেব পুত্রেরা ভগবানের জন্মের পূর্বে জন্মেছিলেন, কংস তাঁদের সকলকেই বিনষ্ট করেছিল। এঁরা বিনষ্ট হলে রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের পুত্র লোকাধিপতি হলায়ুধ রাম বলভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম জন্মগ্রহণ করলে দেবকী দেবগণের আত্মাস্বরূপ আদি, অচ্যুত, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেছিলেন। বলরামের সুগুণান্বিতা পত্নী রেবতীর গর্ভে নিশঠ এবং উল্মুক নামে দুই পুত্র হয়েছিল। অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী ছিল। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ভগবানের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র হয়। চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন এবং শংখ নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটি বিশিষ্ট এবং মহাবলপরাক্রমসম্পন্ন পুত্র রুক্মিণীর গর্ভে জন্মলাভ করে। বাসুদেবের সকল পুত্রের মধ্যে এই কজনই প্রধান। বাসুদেবের পত্নী শুচিস্মিতা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত সেই পুত্রদের দেখে ভগবানকে বললেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, দৈত্যনিষূদন হরি, আপনি বিশেষ গুণযুক্ত শিবতুল্য একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন। তপোধন শত্রুদমনকারী স্বয়ং জগৎপতি হরি জাম্ববতীর কথা শুনে তপস্যা করতে শুরু করলেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, দেবকীনন্দন মহৎ এবং তীব্র তপস্যার দ্বারা মহাদেবের দর্শন লাভ করে যে ভাবে মহাদেবকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, সে-কথা শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সোমবংশে যদুবংশানুকীর্তন
প্রসঙ্গে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, অনন্তর ভগবান পুরুষোত্তম বিশ্বধৃক্ তপোধন হৃষীকেশ পুত্রলাভের জন্য ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। তিনি সর্বদা কৃতকৃত্য হলেও স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নিজের আত্মার মূলস্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞাপন করার জন্যই তপস্যা করেছিলেন। শংখচক্রগদাধারী শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষা ভগবান কৃষ্ণ অতি তেজস্বী পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুর আশ্রমে গমন করলেন। নানাপ্রকার পক্ষীর দ্বারা সমাকুল, বিবিধ বৃক্ষলতায় আকীর্ণ এবং বিচিত্র পুষ্পে শোভিত সেই আশ্রমে যোগিগণ বাস করতেন। সেখানে বহু মুনির আশ্রম ছিল। সেখানে অবিরল সামগান প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, সর্বদা সিংহ, ভল্লুক, শজারু, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বিচরণ করছিল, স্বচ্ছ আর স্বাদুজলের সরোবরগুলি শোভা পাচ্ছিল নানা প্রকার বিশ্রামগৃহ ও পবিত্র দেবমন্দির বিরাজিত ছিল। সেখানে অধীতবেদ এবং অগ্নিহোত্রী বহু ঋষি, ঋষিপুত্র এবং মহামুনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। চতুর্দিকে তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী জাপকগণ অবস্থান করছিলেন। সেই পবিত্র আশ্রমের চারদিকে নানা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। পবিত্র, প্রশান্ত, দৃঢ়সংকল্প, শোকশূন্য,

উপদ্রবরহিত, শুদ্ধচিত্ত, জ্ঞানী আর ব্রহ্মবাদী তাপসেরা সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করে কেউ বা রুদ্রের জপে, কেউ বা মহাদেবের আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ মুণ্ডিত মস্তক, কারো বা মস্তকে রয়েছে জটা, কারো বা কেবল শিখায় জটা দেখা যাচ্ছে। সেই সিদ্ধাশ্রমবহুল রমণীয় আশ্রমে পতিতপাবনী ভগবতী গঙ্গা সর্বদা প্রবাহিত হয়ে চলেছেন।

বিশ্বাত্মা মাধব সেখানে নিষ্পাপ তাপসদের দেখে প্রণাম করলেন এবং বাক্য দ্বারা তাদের পুজা করলেন। তারাও জগতের স্রষ্টা শঙ্খচক্রগদাধারী যোগীদের পরমগুরু নারায়ণকে দেখে ভক্তিসহকারে প্রণাম করলেন এবং বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অব্যক্ত মহামুনি আদিদেব হৃদিস্থিত সনাতনের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন, 'যিনি এসেছেন, তিনিই সেই কর্মসাক্ষী অদ্বিতীয় স্বয়ং প্রধান পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ, ইনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা, ইনি অব্যয়, এঁর কোন মূর্তি নেই। কিন্তু এখন মূর্তি গ্রহণ করে মুনিদের দেখবার জন্য এসেছেন। ইনি ধাতা, বিধাতা, সর্বগামী, অনাদি, অক্ষয়, অনন্ত, মহাভূত ও মহেশ্বর। বাক্যের অগোচর গোবিন্দ হরি তাদের বাক্য শুনে এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধি করে সেই মহাত্মার স্থানে শীঘ্রই গমন করলেন। দেবকীতনয় যাদব ভক্তির সঙ্গে প্রত্যেক তীর্থে আচমন করে দেবতা, ঋষি আর পিতৃগণের তর্পণ করলেন এবং বিভিন্ন নদীতীরে শ্রেষ্ঠ মুনিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অমিততেজা শিবের লিঙ্গগুলির পুজা করলেন। জনার্দন শিবলিঙ্গ দর্শন করতে আসছেন দেখে সেখানে যারা ছিলেন, তারা সবাই আতপ চাল এবং ফুল দিয়ে তাঁর পুজা করলেন। ধনু, শঙ্খ ও অসিধারী সুলক্ষণ বাসুদেবকে দেখে সকলেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যাদের মন জনার্দনে আরোহণ করতে আগ্রহী ছিল, তাদের সেই মন জনার্দনের দর্শনমাত্র শুধু সমাধিস্থ হয়েই রইল, দেহ থেকে আর নির্গত হল না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গায় অবগাহন করে দেবতা ও ঋষিদের তর্পণ সম্পন্ন করে উত্তম পুষ্প সকল নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করলেন। সেই ভস্মাচ্ছাদিত-গাত্র জটাধারী, শান্ত, যোগিবর উপমন্যু মুনিকে দর্শন করে মাথা নত করে তিনি প্রণাম জানালেন। তত্ত্বদর্শী মুনি উপমন্যু কৃষ্ণকে আসতে দেখে তাঁর পুজা করলেন এবং যোগীদের প্রথম অতিথি সেই হরিকে বসতে আসন দিলেন। তারপর শিষ্যরূপে উপস্থিত, বাক্যের উৎপত্তির কারণ, অব্যক্ত সংস্থান বিষ্ণুকে বলতে লাগলেন, হে হৃষীকেশ, আপনাকে স্বাগত জানাই। আমরা আপনাকে পরমপদ বলেই জেনেছি। আজ আমাদের সমস্ত তপস্যা সফল হল। কারণ সাক্ষাৎ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমাদের গৃহে আগমন করেছেন। সহস্র প্রযত্নেও মুনিরা আপনাকে এই পৃথিবীতে দেখতে পান না। এমন যে আপনি, সেই আপনার এখানে আগমনের হেতু কী? মহাযোগী দেবকীনন্দন ভগবান উপমন্যুর কথা শুনে প্রণাম-পূর্বক সেই প্রসন্ন মুনিবরকে বলতে লাগলেন, ভগবন্, আমি ব্যাঘ্রচর্মাম্বর মহাদেবকে দেখতে চাই। তাঁকে দর্শন করবার জন্য ব্যগ্র হয়েই আপনার কাছে এসেছি। আপনি যোগবিদ্-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলুন, কিভাবে সেই ভগবান মহেশ্বরের দর্শন পাব এবং কোথায় আমি সেই উমাপতির শীঘ্র দর্শন লাভ করব? এ কথা শুনে ভগবান উপমন্যু বললেন, ভক্তি এবং তীব্র তপস্যা দ্বারাই মহাদেবকে দেখতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে শান্ত ভাবে তপস্যা করুন। এইখানেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মুনিরা এবং যোগী ও অন্যান্য তাপসগণ দেবদেব মহাদেবের ধ্যান ও আরাধনা করছেন। ভগবান বৃষধ্বজ বিবিধ ভূত এবং যোগীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এইখানেই পত্নীর সঙ্গে লীলা করছেন। ভগবান বশিষ্ঠ

ঋষি পূর্বে এই আশ্রমেই দারুণ তীব্র তপস্যা করে মহেশ্বরের কাছ থেকে যোগলাভ করেছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান ব্যাস এইখানেই স্বয়ং মহাদেবের দর্শন লাভ করে পরমাত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। ভক্তিমান পণ্ডিতগণ এই রমণীয় আশ্রমেই অবস্থান করে মহাদেবের তপস্যা করে সেই জটাধরের আশীর্বাদে পুত্রসকল লাভ করেছিলেন। হে শ্রীমান, দেবতারা কালভয়ে ভীত হয়ে এখানেই মহাদেবের দর্শন লাভ করেছিলেন ও নিঃশঙ্কচিত্ত হয়ে শান্তি পেয়েছিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, তপস্বিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি এখানেই মহাদেবের আরাধনা করে পরমযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রচয়িতা হন এবং সুপুণ্যের জন্য পবিত্র পৌরাণিক সংহিতা রচনা করে উত্তম শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। কাপেয় শাংশপায়ন এখানেই মহাদেবের আরাধনা করে তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন ও তাঁর আদেশে পবিত্র পুরাণ সংহিতা প্রচাব করেছিলেন। হে পুরুষোত্তম, তার পূর্বভাগে বারো হাজার ও উত্তরভাগে আটহাজার শ্লোক আছে। তাঁর শিষ্যরা সেই শাংশপায়ন ভাষিত বেদতুল্য বায়বীয়োত্তর পুরাণ প্রচার করেছিলেন। এখানেই মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যা দ্বারা মহাদেবের দর্শন লাভ করে তাঁর আদেশে সর্বোত্তম যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। পূর্বে ভৃগুমুনি এখানেই অভূতপূর্ব ঘোর তপস্যা করে মহাদেবের প্রসাদে যোগবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। অতএব হে দেবেশ, এখানে সুতীব্র তপস্যা করে বিশ্বনাথ, উগ্র, ভীম, কপর্দীর দর্শন লাভ করতে পারবেন। মহামুনি উপমন্যু এই কথা বলে অক্লান্তকর্মা শ্রীকৃষ্ণকে পাশুপত ব্রত ও যোগ দান করলেন। প্রভু মধুসূদন মুনিবরের এই কথায় সেখানেই মহাদেবের তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন এবং ভস্মাবলিপ্ত গাত্রে মুণ্ডিত মস্তকে বল্কল পরিধান করে দিবা-রাত্র শিবেতেই চিত্ত অর্পণ করে কেবল রুদ্রকে জপ করতে লাগলেন। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেল। একদিন ভগবতীর সঙ্গে অর্ধেন্দুভূষণ ভগবান মহেশ্বর আকাশ মার্গে দেখা দিলেন। নারায়ণ পার্বতীর সঙ্গে দেবদেব মহাদেবকে দেখলেন—মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে বিচিত্র মালা, হস্তে গদা, ত্রিশূল আর পিনাক, শরীর ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। সেই পুরাণপুরুষ যোগীদের ঈশ্বর অণু থেকেও অণুতম প্রাণের ঈশ্বর, সনাতন প্রভু মহেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখেই দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন ত্রিলোচনের হাতে পরশু বিরাজ করছে, তাঁর ভস্মাচ্ছন্ন দেহ নৃসিংহের চর্মে আবৃত রয়েছে। তিনি বৃহৎ প্রণব উচ্চারণ করছেন এবং তাঁর শরীর থেকে সহস্র সূর্যের তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেবগণ, পিতামহ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—কেউই আজ পর্যন্ত যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারেন নি সেই দেবদের রুদ্রকে তিনি নিজের সামনে দেখতে পেলেন। তখনই আবার মহাদেবের বামপার্শ্বে নিজের বৈষ্ণবী মূর্তিরও দর্শন পেলেন। সেই অব্যক্ত, অনন্তরূপ আদিপুরুষ বিষ্ণুর মূর্তি নানাবিধ বাক্যে মহাদেবের স্তব করছেন এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র ও অসি শোভা পাচ্ছে। মহেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বেও অন্য এক পুরুষকে তিনি দেখলেন। ইনি স্বয়ং লোকগুরু দ্যুলোকবাসী সুরেশ্বর পিতামহ। হংসে আরোহণ করে ইনিও কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের পরমপ্রভাবের স্তব করছেন। আরও দেখলেন—ত্রিলোকগুরু মহাদেবের সামনে সহস্র সূর্যের মতো তেজস্বী অমিতপ্রভাব নন্দীশ্বর প্রমুখ গণদেবতারা এবং অগ্নিতুল্য বিশাখ-কুমার কার্তিকেয় অবস্থান করছেন। দেখলেন—মহাদেবের সামনে মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, প্রাচেতসদক্ষ, কণ্ব, পরাশর, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু সকলেই রয়েছেন। তখন মহাবুদ্ধি বাসুদেব কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই দেবপ্রধানের স্তব করলেন, গিরিশ ও

গৌরীকে প্রণাম করলেন এবং নিজ শক্তি অনুসারে মনে মনে পরমাত্মার চিন্তা করে স্তব করতে শুরু করলেন—

হে শাশ্বত, সর্বভূতযোনি, আপনাকে প্রণাম। ঋষিরা বলেন আপনিই ব্রহ্মাধিপতি, সাধুরা আপনাকেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তপঃ এই সব কিছু বলে বর্ণনা করেন। আপনিই ব্রহ্মা, বিশ্বযোনি ঈশ্বর, আপনিই অগ্নি, সংহারকর্তা এবং আপনিই সূর্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন। প্রভু, আপনিই প্রাণ, আপনিই অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে লোকপাল এবং আপনিই ঈশ। আমি কেবল আপনারই শরণ নিচ্ছি। সাংখ্যেরা আপনাকে একরূপ এবং ত্রিগুণ বলে থাকেন। যোগীরা নিয়ত আপনাকে হৃদয়ে রেখে ধ্যান করেন। বেদে আপনাকে পূজনীয় রুদ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি একমাত্র আপনারই শরণ নিলাম। যে আপনার পাদপদ্মে একটি পুষ্প অথবা একটি পত্র দেয় সে-ই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সিদ্ধ আর যোগীদের দ্বারা সেবিত আপনার পদদ্বয় স্মরণ করলে আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যাঁর অখণ্ড, অমল, হৃদয়ান্তরে অবস্থিত, তত্ত্বরূপ অনন্ত, অদ্বিতীয়, অচল সত্য পরম এবং সর্বত্রগামী জ্যোতিকে আদি মধ্যান্ত-হীন স্থান বলা হয়েছে, সমস্ত জগৎ যাঁর থেকে উৎপন্ন, আমি সেই সত্যবিভূতি বিশ্বেশ্বর শিবকে সতত আশ্রয় করি। হে দেব, আপনি নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, বংহঃ, ঈশান ও মহাদেব, আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি পিনাকী, মুণ্ডী, দণ্ডী, বহুহস্ত, দিগম্বর ও কপর্দী। আপনাকে নমস্কার। আপনি ভৈরব নাদ, দংষ্ট্রী, নাগরূপ যজ্ঞোপবীতধারী, বহ্নিরেতাঃ। আপনাকে নমস্কার। আপনি গিরিশ, স্বাহাকার, মুক্ত আপনার অট্টহাস, আপনি ভয়ঙ্কর। আপনাকে প্রণাম। আপনি কামনিধন, কালপ্রমাক্ষী, ভৈরববেশ, আর নিষঙ্গী হর। আপনাকে প্রণাম। আপনি ত্রিনয়ন, ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, অম্বিকাপতি ও পশুপতি। আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যোমরূপ, ব্যোমাধিপতি, অর্ধনারীশ্বর শরীর, সাংখ্য ও যোগের প্রবর্তক। আপনাকে প্রণাম। আপনি ভৈরবনাথ, দেবানুগতলিঙ্গী, কুমারগুরু ও দেবদেব। আপনাকে নমস্কার। আপনি যজ্ঞের অধিপতি, ব্রহ্মচারী, মহান মৃগব্যাধ ও ব্রহ্মাধিপতি। আপনাকে প্রণাম। আপনি হংস, আপনিই বিশ্ব, আপনি মোহন, যোগী, যোগাধিগম্য আর যোগময়। আপনাকে প্রণাম। আপনি প্রাণপালক, ঘণ্টানাদ আপনার প্রিয় ধ্বনি, মুণ্ড আপনার ভূষণ, আপনি জ্যোতির অধীশ্বর, আপনাকে প্রণাম। হে পরমেশ্বর, আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আপনি সর্বতোভাবে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

সূত বলতে লাগলেন, হে বিপ্রগণ, ভগবান মাধব এইভাবে ভক্তিভরে দেবদেবের স্তব শেষ করে দেবদেবীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হলেন। তখন ভগবান শিব কেশিনিষূদন নারায়ণকে তুলে ধরে জলদগম্ভীর স্বরে মধুর বাক্যে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, আপনি কেন তপস্যা করছেন? ইহলোকে আপনিই তো যে যা চায় তার কামনা সিদ্ধ করেন। পুরুষোত্তম, আপনিই আমার পরমা নারায়ণী মূর্তি। আপনাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়ে যায়। হে নারায়ণ, কেশব, আপনি নিজের যোগবলে নিজেকেই অনন্ত পরমেশ্বর মহাযোগ মহাদেব বলে জেনেছেন। কৃষ্ণ তাঁর কথা শুনে দেবী পার্বতী ও বিশ্বেশ্বরকে নিরীক্ষণ করে হাসিমুখে বৃষধ্বজকে বললেন, শঙ্কর, আপনি আত্মযোগ বলে সব কিছুই জানতে পেরেছেন। হে শঙ্কর, আপনার তুল্য ও আপনার ভক্ত একটি পুত্র আমি কামনা করি। তখন বিশ্বাত্মা হর বললেন, তাই পাবে। তারপর প্রফুল্লমনে পার্বতীর দিকে

তাকিয়ে কেশবকে আলিঙ্গন করলেন। তখন জগন্মাতা, শংকরার্ধশরীরিণী দেবী হিমালয়-তনয়া হৃষীকেশকে বলতে লাগলেন, হে অনন্ত, অচ্যুত, কেশব, পরমাত্মা এবং মহেশ্বরের প্রতি আপনার যে অচলা ও অনন্য পরাভক্তি রয়েছে তা আমি জানি। আপনিই সাক্ষাৎ সর্বাত্মা, পুরুষোত্তম নারায়ণ। পুরাকালে দেবগণ প্রার্থনা করেছিলেন বলেই কেবল দেবকীর পুত্ররূপে আপনি জন্ম নিয়েছেন। এখন আপনি আপনার আত্মা ও আমার আত্মাকে দেখুন। আমাদের দুজনের কোন ভেদ নেই। আমাদের উভয়কে পণ্ডিতগণ অভিন্নরূপেই দেখে থাকেন। হে কেশব, এবার আপনি আমার কাছ থেকে সর্বজ্ঞত্ব, ঐশ্বর্য, পরমেশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি এবং আপনার শ্রেষ্ঠ বল—এই ইষ্ট বরগুলি গ্রহণ করুন।

জনার্দন কৃষ্ণ মহাদেবীর এই কথা শুনে নিজ মস্তকে আশীর্বাদসকল গ্রহণ করলেন এবং মহেশ্বরও আশীর্বাদ বাক্য বলতে লাগলেন। তারপর ভগবান ঈশ্বর দেবদেব গিরিশ, দেবতা ও মুনিদের পূজা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হাত ধরে নিয়ে দেবীর সঙ্গে কৈলাসপর্বতে গমন করলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সোমবংশ যদুবংশানুকীর্তনপ্রসঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণেরতপশ্চর্যা নামে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়

স্বর্ণপ্রভ মেরুতুঙ্গ কৈলাসে প্রবেশ করে ভগবান মহেশ্বর দেবী ভগবতী আর কেশবের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হলেন। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ, বিপুলকায়, কৃষ্ণমেঘকান্তি কিরীটধারী ধনুষ্পাণি শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষ, দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষ, পীতাম্বর। তাঁর বক্ষঃস্থলে ছিল অনুপম বৈজয়ন্তী-মালা, তাঁর সৌন্দর্য অতি মনোরম। অতি কমনীয়কান্তি এই যুবার চরণ দুটি পদ্মতুল্য, নয়ন দুটিও পদ্মেরই মতো। তিনি স্মিতমুখ আর সঙ্গীতপ্রিয়। এই অচ্যুত প্রভু দেবনারায়ণ মহাত্মা কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে কৈলাসবাসীগণ তাঁর পূজা করলেন। সুন্দরকান্তি দেবকীনন্দনবর্ধন ভগবান কৃষ্ণ একদিন সেখানে লীলা করার জন্য গিরি-গুহায় ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময়ে সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেবগণ, নাগকন্যা, প্রধান প্রধান অপ্সরা ও গান্ধর্বকন্যা সকলের নয়ন জগন্ময়কে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হল এবং তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভগবানের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। স্বর্গের গন্ধর্বকন্যা এবং শ্রেষ্ঠ অপ্সরা সকলেরই শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বস্ত্র ও অলংকার স্খলিত হয়ে গেল এবং সকলেই মনে মনে তাঁকে কামনা করতে লাগল। এক সঙ্গীতজ্ঞা রমণী সুন্দর দেবকীনন্দনকে দেখে কামমোহিত হয়ে নানাপ্রকার গান করতে শুরু করল, আবার এক বিলাসিনী তাঁর সামনে নৃত্য করতে লাগল। কেউ কেউ আবার দৃষ্টি দিয়েই তাঁর সস্মিত বদনের অমৃত পান করতে লাগল। কোন কোন কামিনী নিজের অঙ্গ থেকে সুন্দর অলংকার খুলে ফেলে লোকভূষণ কৃষ্ণকে সযত্নে সাজাতে লাগল। আবার কোন কোন রমণী তাঁর অঙ্গ থেকে উত্তম সব অলংকার খুলে নিয়ে নিজেদের অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল ও নিজেদের অলংকারে মাধবকে অলংকৃত করতে লাগল। মুগ্ধকুরঙ্গাক্ষী আর এক রমণী কামমোহিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে হরির মুখপদ্মে চুম্বন করতে লাগল। আর এক রমণী তাঁর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে লোকস্রষ্টা গোবিন্দের হাত ধরে নিজের গৃহে

নিয়ে গেল। কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ বহু প্রকার রূপ ধরে অনায়াসেই সেই কামিনীদের ইচ্ছা পূরণ করতে লাগলেন। শ্রীমান নারায়ণ হরি মহাদেবের পুরীতে দীর্ঘকাল বাস করে স্বকীয় মায়াবলে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করে এই রকম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর বহুকাল কেটে গেলে দ্বারকার অধিবাসীরা গোবিন্দের বিরহে অত্যন্ত ভীত ও বিহ্বল হয়ে উঠল। বলবান গরুড়কে এর আগেই শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে পাঠানো হয়েছিল। তিনি কৃষ্ণকে খুঁজতে খুঁজতে হিমালয় পর্বতে গমন করলেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে মহামুনি উপমন্যুকে প্রণাম করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। এই অবসরে সহস্র সহস্র অতি ভীষণ রাক্ষস ও মহাদৈত্যগণ ভয় দেখাবার জন্য শুভ্র দ্বারকাপুরীতে আগমন করল। বলবান গরুড়ের বিক্রম ছিল কৃষ্ণেরই মতো। তিনি যুদ্ধে তাদের হত্যা করে পবিত্র দ্বারকাপুরী রক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময়ে ভগবান নারদ ঋষি কৈলাস শিখরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করে দ্বারকায় এলেন। দ্বারকাবাসীরা সকলে নারদ ঋষিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু ভগবান নারায়ণ হরি এখন কোথায় আছেন? ভগবান নারদ উত্তর দিলেন, মহাযোগী হরি এখন কৈলাসশিখরে লীলা করছেন। আমি তাঁকে দেখেই এখানে আসছি। হে বিপ্রগণ, পক্ষিরাজ গরুড় তাঁর কথা শুনে আকাশপথে পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, রত্ন-খচিত গৃহে দেবদেব মহাদেবের পাশে দিব্য আসনের উপর ভগবান দেবকীনন্দন গোবিন্দ বসে আছেন, আর চারদিকে সিদ্ধ, যোগী, গণদেবতা, দেবতারা ও দিব্যস্ত্রীরা তাঁর উপাসনা করছেন। সুপর্ণ শঙ্কর শিবকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকার বৃত্তান্ত জানালেন। তখন কৃষ্ণ নীললোহিত শঙ্করকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজের পুরীতে গমন করলেন। মধুসূদন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করলে কামিনীগণ তাঁর পূজা করতে লাগল এবং অমৃততুল্য বচনে তাঁর সম্মান করতে লাগল। শত্রুহন্তা মহাযোগী শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান চলে যাচ্ছেন দেখে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা কন্যা আর গন্ধর্ব কন্যারা তাঁর অনুগমন করতে লাগল। বিশ্বাত্মা গোবিন্দ হরি সেই রমণীদের বিদায় দিয়ে শীঘ্রই দিব্যপুরী দ্বারকায় ফিরে এলেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, চন্দ্র অস্ত গেলে রাত্রির শোভা যেমন নষ্ট হয়, মুরারি চলে যাওয়ায় তাঁর বিরহে সেখানকার কামিনীরাও সেই রকম নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। পুরবাসীজন শ্রীকৃষ্ণের শুভ আগমন-বার্তা শুনে নিজেদের পবিত্র ও দিব্যপুরী দ্বারবতীকে সজ্জিত করতে লাগল। সেখানকার লোকেরা পুরীর অভ্যন্তরে ও বাইরে বহু ধ্বজা ও পতাকা বিন্যস্ত করল, পুষ্পমাল্য দ্বারা সেই রমণীয় দ্বারকাকে ভূষিত করল, নগর-মধ্যে মধুর সুরে নানা-প্রকার বাদ্য বাজাতে লাগল এবং চতুর্দিক সহস্র সহস্র শঙ্খ ও বীণার ধ্বনিতে মুখর করে তুলল। ভগবান গোবিন্দ পবিত্র দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলে সুযৌবনা রমণীরা মধুর স্বরে গান করতে লাগল। প্রাসাদ-চূড়ায় দাঁড়িয়ে কামিনীরা ভগবানের দর্শনে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল আর তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। মহাযোগী কৃষ্ণ সকলের আশীর্বাদে অভিনন্দিত হয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। তারপর শঙ্খাদির দ্বারা ভূষিত হয়ে সুন্দর শুভ্র মণ্ডপে শ্রেষ্ঠ আসনে দেবীদের সঙ্গে আলো করে বসলেন। শঙ্খপ্রমুখ তাঁর প্রধান প্রধান পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র নরনারী তাঁকে পরিবৃত করে রইলেন। দেবী উমার পাশে মহাদেবের যেমন শোভা, সেই রমণীয় আসনে জাম্ববতীর সঙ্গে উপবিষ্ট নারায়ণেরও তেমনি শোভা হয়েছিল। হে দ্বিজগণ, দেব,

গন্ধর্ব আর মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ অব্যয় আদিপুরুষ হরিকে দেখবার জন্য এসেছিলেন। ভগবান হরি মার্কণ্ডেয়কে আসতে দেখে মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং মহর্ষিকে নিজের আসনে বসালেন। ভগবান হরি নিজের অনুচরদের সঙ্গে সেই ঋষিদের পূজা করলেন ও তাদের বাঞ্ছিত বস্তু দান করে স্ব স্ব গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মধ্যাহ্নে স্নানের পর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে কৃতাঞ্জলি অবস্থায় ভানুর পূজা করতে লাগলেন। দেবেশ নারায়ণ সূর্যদর্শন করতে করতে যথাবিধি জপ শেষ করলেন। তারপর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করে মার্কণ্ডেয়ের সঙ্গে দেবালয়ে গিয়ে লিঙ্গস্থ ভূতিভূষণ ভূতনাথের পূজা করলেন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, সকল মানুষের নিয়ন্তা হরি নিজের যাবতীয় কর্তব্য বিধিমতে শেষ করে ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ভোজন সমাধা করালেন। তারপর আত্মযোগ শেষ করে পুত্র প্রমুখের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সঙ্গে পবিত্র পুরাণ কথা বলতে শুরু করলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই সব দেখে সহাস্যে মধুর বচনে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—যাবতীয় লোক কর্ম দ্বারা আপনারই পূজা করে থাকে, যোগীরা আপনাকেই ধ্যান করে। কিন্তু আপনি পুণ্যকর্ম দ্বারা কোন্ দেবতার আরাধনা করছেন আমাকে বলুন। আপনি নিজেই সেই পরমব্রহ্ম, মোক্ষরূপ অমল আস্পদ জগতের ভার লাঘবের জন্য আপনিই বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের পুত্রগণ সব কথা শুনতে উৎসুক হয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ মহাভুজ কৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখেই সহাস্যে মার্কণ্ডেয়কে বললেন, আপনি যা যা বললেন সে সবই নিঃসন্দেহে সত্য। তবু আমি সনাতন মহেশ্বরের পূজা করছি। হে ব্রাহ্মণ, আমার কর্তব্যও কিছু নেই আর চাইবারও কিছু নেই। এ সব জানা সত্ত্বেও আমি পরম শিব মহেশ্বরের পূজা করছি। মায়ায় মুগ্ধ মানুষ সেই দেবাদিদেবকে দেখতে পায় না। তাই মহাদেবই যে আত্মার মূল, তা জানাবার জন্য আমি তাঁর পূজা করছি। শিবলিঙ্গ পূজা করার চেয়ে জগতে অধিকতর পুণ্যের কাজ আর কিছুই নেই। দুর্গতি মোচনের অন্য কোন উপায়ও নেই। তাই এই সমস্ত লোকের হিতের জন্য শিবলিঙ্গের পূজা করবে। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা আমাকেই শিবলিঙ্গ বলে থাকেন। অতএব আমি স্বয়ং আপনাতে মহাদেবের পূজা করছি। আমিই সেই শিবের পরমা মূর্তি এবং আমিই শিবময়। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বেদে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে। তাই সংসার-ভীরু লোকদের সর্বদাই লিঙ্গে সেই দেবদেব মহেশ্বরের ধ্যান, পূজা ও বন্দনা করা উচিত। মার্কণ্ডেয় বললেন, হে দেব-শ্রেষ্ঠ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ, সেই লিঙ্গ বস্তুত কী এবং লিঙ্গে কারই বা পূজা হয়? এই সুগভীর উত্তম বিষয়টি আমাকে বলুন। ভগবান বললেন, লিঙ্গ অব্যক্ত, আনন্দ-স্বরূপ, জ্যোতির্ময় ও অক্ষর। বেদে মহেশ্বরই লিঙ্গরূপী দেবতা বলে উক্ত হয়েছেন। পুরাকালে যখন ঘোর একটি মাত্র সমুদ্রেরই অস্তিত্ব ছিল, তখন স্থাবর ও জঙ্গম সব বস্তু বিলুপ্ত হয়ে গেলে ব্রহ্মা ও আমাকে জাগরিত করার জন্য মহাশিব প্রাদুর্ভূত হন। সেই থেকে ব্রহ্মা ও আমি সমস্ত লোকের হিতের জন্য সর্বদাই মহাদেবের পূজা করে থাকি। মার্কণ্ডেয় বললেন, কৃষ্ণ, পুরাকালে আপনাদের জাগরিত করার জন্য কীভাবে পরম পদ ঐশ্বরিক লিঙ্গের উৎপত্তি হল সে কথা বলুন। ভগবান বলতে শুরু করলেন, পূর্বে যখন ভয়ংকর অবিভক্ত তমোময় একটি মাত্র মহাসাগরেরই অস্তিত্ব ছিল, তখন আমি সেই একাকার পয়োধিজলে শঙ্খচক্রগদাধারী, সহস্রশীর্ষ, সহস্রনেত্র, সহস্রভুজ, সহস্র-

পাদ, সনাতন পুরুষরূপে শয়ান ছিলাম। এমন সময়ে দূরে দেখতে পেলাম অমিতাভ, কোটি সূর্যের তুল্য কান্তিযুক্ত, সুন্দর, দীপ্ত, চতুর্মুখ, মহাযোগী, জগৎকারণ কৃষ্ণাজিনধারী, ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুত সর্বব্যাপী আদিপুরুষকে। শ্রেষ্ঠ যোগবিদ মহাতেজা স্বয়ং ব্রহ্মা নিমেষের মধ্যে আমার কাছে চলে এলেন এবং বিস্মিত ভাবে বললেন, প্রভু, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কেনই বা এখানে রয়েছেন? আমি লোকস্রষ্টা স্বয়ম্ভূর প্রপিতামহ। ব্রহ্মার কথা শুনে উত্তর দিলাম, আমিই এই জগৎকে বার বার সৃষ্টি করছি। পরমেষ্ঠীর মায়ায় আমাদের মধ্যে এই রকম বাদানুবাদ শুরু হলে আমাদের বোধোদয়ের জন্য কালানলের মতো দীপ্তিমান, অগ্নিশিখার মালায় সজ্জিত ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, আদি-মধ্য-অন্তহীন শিবাত্মক পরলিঙ্গ আবির্ভূত হলেন। তখন স্বয়ম্ভূ ভগবান ব্রহ্মা আমাকে বললেন, আপনি শীঘ্র এঁর নিম্নদেশে গমন করুন, আমি এঁর ঊর্ধ্বদেশে যাচ্ছি। আমরা দুজন জানব এঁর শেষ কোথায়। এই রকম স্থির করে পিতামহ ও আমি সেই লিঙ্গের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে গমন করলাম। কিন্তু কেউই তাঁর অন্ত জানতে পারলাম না। তখন শূলপানি মহাদেবের মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রহ্মা ও আমি ভীত এবং বিস্মিত হলাম। আর সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত মনে করে ধ্যান করতে করতে পরম পদ মহানাদ ওংকারধ্বনি শুনতে লাগলাম। তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা সেই পরম শম্ভু মহাদেবের স্তব করলাম—

যাঁর আদি নেই, মূল নেই, যিনি সংসাররূপ রোগের ধন্বন্তরী, সেই মঙ্গলময় শান্ত ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। প্রলয়পয়োধিজলে সংস্থিত প্রলয়কর্তা মঙ্গলময় শান্ত ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। অগ্নিশিখার মালায় যাঁর অঙ্গ আবৃত, জ্বলনস্তম্ভরূপী সেই মঙ্গলময় শান্ত, ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। যাঁর আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, স্বভাবতই অমলদীপ্তি সেই মঙ্গলময়, শান্ত, ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। যিনি মহান দেব, মহৎ জ্যোতি, অনন্ত যাঁর তেজ সেই মঙ্গলময় শান্ত ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। যিনি প্রধান পুরুষরূপ ঈশ্বর, যিনি ব্যোমরূপ, বিধাতা সেই মঙ্গলময়, শান্ত ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। যিনি বিকাররহিত, সত্য, নিত্য, অমিততেজা, সেই মঙ্গলময়, শান্ত, ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার। যিনি বেদান্তের সার, কালরূপী ও ধীমান, সেই মঙ্গলময়, শান্ত, ব্রহ্মরূপী লিঙ্গমূর্তিকে নমস্কার।

এই ভাবে স্তুত হয়ে মহাদেব মূর্তি ধরে আবির্ভূত হলেন। সেই মহাযোগী, কোটি সূর্যের জ্বালা নিয়ে সহস্র কোটি মুখ ব্যাদান করে যেন আকাশমণ্ডলকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। তাঁর সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ, চন্দ্র-সূর্য আর অগ্নি তাঁর তিনটি নেত্র, তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। ত্রিশূলী ও পিনাকপাণি এই মহাদেবের গলায় ভুজঙ্গনির্মিত যজ্ঞোপবীত, মেঘগর্জন আর দুন্দুভির ধ্বনির মতো গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা আর ভয় পেয়ো না। চেয়ে দেখ, আমি মহাদেব। আমারই দেহ থেকে পূর্বে তোমরা উৎপন্ন হয়েছিলে। তোমরা সনাতন। এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আর পালনকর্তা বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে আছেন। আর আমার হৃদি মধ্যে বিরাজ করছেন হর। আমি তোমাদের ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা যে বর চাও তাই আমি দেব। এই কথা বলে স্বয়ং মহাদেব আমাকে আর বিষ্ণুকে আলিঙ্গন করলেন এবং আমাদের দুজনকেই বর দিতে প্রস্তুত হলেন। তখন আমি ও পিতামহ হৃষ্ট মনে মহাদেবকে প্রণাম করে বললাম, যদি

আমাদের ওপর আপনি প্রসন্ন হয়েই থাকেন এবং আমাদের বর দিতে যদি আপনার একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে এই বর দিন যেন আপনার প্রতি আমরা চিরকাল ভক্তিমান থাকি। ভগবান মহেশ্বর প্রসন্ন মনে হাসতে হাসতে বললেন, বৎস পৃথিবীপতি হরি, তুমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা। তুমিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপালন করে থাক। বিষ্ণু, আমি নিরঞ্জন ও নির্গুণ। তবু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছি। বিষ্ণু, তুমি নিজের মোহ ত্যাগ করে পিতামহ ব্রহ্মাকে পালন কর। এই সনাতন ভগবানই তোমার পুত্র হবেন। আর আমিও তোমার ক্রোধজাত পুত্ররূপে কল্প শেষে ঘোরাকৃতি পিনাকপাণি হয়ে তোমার মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হব।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, এই রকম কথা বলেই মহেশ্বর ব্রহ্মাও আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। ব্রাহ্মণ, সেই থেকেই লোকে শিবলিঙ্গের পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রলয়ের কারণ বলেই লোকে মহাদেবকে লিঙ্গ বলে। সেই লিঙ্গই ব্রহ্মের পরম শরীর। হে নিষ্পাপ, শিবলিঙ্গের মাহাত্মের কথা আপনাকে বললাম। যারা যোগ জানেন তারাই এ কথা বুঝতে পারবেন। অন্য কেউ, সে দেবতাই হোক বা দানবই হোক, এ কথা বুঝতে পারবে না। এই হল শিব নামে অব্যক্ত পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হলেই লোকে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা চিন্তার অগোচর সূক্ষ্ম পদার্থ দেখতে পায়। এই জন্যই আমি ভগবান মহেশ্বরকে প্রতিদিন নমস্কার করি। তিনিই মহাদেব, দেবদেব, ভৃঙ্গী। বেদের গূঢ়তত্ত্ব তিনিই। সেই নীলকণ্ঠকে প্রণাম। সেই বিভীষণ, শান্ত, স্থাণু, যোগীকে প্রণাম। তিনিই ব্রহ্মা, বামদেব, ত্রিনেত্র, মহীয়ান, শঙ্কর, মহেশ, গিরিশ এবং শিব। তাঁকে নমস্কার। সেই মহেশ্বরকেই সর্বদা নমস্কার করুন। তাঁরই ধ্যান করুন। তাহলেই অচিরে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হতে পারবেন। মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় বাসুদেবের এই কথা শুনে বিশ্বতোমুখ মহাদেবেই নিজের চিত্ত সমর্পণ করলেন। সেই মহামুনি কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে ত্রিশূলী দেব-দেবের অভীপ্সিত স্থানে গমন করলেন।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সর্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গাধ্যায় অপরকে শ্রবণ করায় অথবা নিজে শ্রবণ করে, অথবা পাঠ করে, সে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, মহাযোগী প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলেছেন যে বাসুদেবের এই উত্তম তপশ্চর্যার বৃত্তান্ত যে একবার মাত্র শ্রবণ করে, তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন তার জপ করে সে ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়ে বাস করে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে সোমবংশে যদুবংশানুকীর্তনপ্রসঙ্গে কৃষ্ণতপস্যায় লিঙ্গাবির্ভাব নামে ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, তারপর কৃষ্ণ মহাদেবের বরে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব নামে এক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুত্রের জন্ম দিলেন। শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে মহাবল পুত্র হয়। শাম্ব ও অনিরুদ্ধ উভয়েরই নানা গুণ ছিল এবং তারা দুজনেই যেন কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি ছিলেন। নারায়ণ হরি কংস, নরক ও অন্যান্য শত শত অসুরের নাশ করলেন, অনায়াসে শক্র এবং মহাসুর বাণকে জয় করলেন এবং সমস্ত জগতের উদ্ধার সাধন করে সংসারে

সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর তিনি নিজের স্থানে ফিরে যাবার সংকল্প করলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিরা সেই সনাতনকে দেখবার জন্য দ্বারকায় এলেন। ধীমান বলরামের সঙ্গে ঋষিরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হলে বিশ্বাত্মা নারায়ণ তাঁদের প্রণাম ও পূজা করে বললেন, হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, এখন আমি আমার বিষ্ণু নামক পরম স্থানে ফিরে যাব। আমার কর্তব্য যা ছিল সব সমাপ্ত হয়েছে। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ঘোর অশুভ কলিযুগ উপস্থিত হয়েছে। এই সময় সকলেই পাপ কার্যে রত হবে। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, যাতে সকলে কলির পাপ থেকে মুক্তি পায়, সেই উদ্দেশ্যে আপনারা অজ্ঞ লোকের কল্যাণকর জ্ঞানসম্বন্ধ শাস্ত্র প্রচার করুন। হে দ্বিজগণ, কলিকালে যে ভক্তজনেরা একবার মাত্র প্রভু বলে আমাকে স্মরণ করে, তাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং কলিযুগে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়ে বেদবিহিত নিয়মানুসারে যারা ভক্তিসহকারে আমার নিত্যপূজা করে, তারা সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। আপনাদের বংশে যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করবেন, তারা কলিকালে নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান হবেন। নারায়ণনিষ্ঠ লোকেরাই পরাৎপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যারা মহেশ্বরের নিন্দা করে তারা তাঁকে প্রাপ্ত হয় না। মহেশ্বরের নিন্দুকদের ধ্যান, যোগ, তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি সব কিছুই সত্বর নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তির সংগে প্রতিদিন আমার পূজা করে অথচ মহেশ্বরের নিন্দা করে তাকে নানা প্রকারে নরকভোগ করতে হয়। হে দ্বিজগণ, তাই সযত্নে কায়মনোবাক্যে পশুপতি ও আমার ভক্তগণের নিন্দা পরিহার করবেন। দক্ষযজ্ঞের সময়ে শিবের নিন্দা করায় দধীচ মুনির শাপে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কলিকালে আপনাদের বংশে জন্ম-গ্রহণ করবে আর গৌতম মুনির শাপেও যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের সযত্নে পরিহার করবেন। তাদের সংগে ব্রাহ্মণদের বাক্যালাপ করা উচিত নয়! হে সত্তমগণ, কৃষ্ণ এই কথা বললে মহর্ষিরা বললেন, আচ্ছা, তাই হবে। তারপর তারা শীঘ্রই নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন। তারপর জগন্ময় নারায়ণ কৃষ্ণ অবলীলায় নিজের কুল সংহার করে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হলেন।

আমি সংক্ষেপে আপনাদের কাছে এই রাজবংশের বিবরণ দিলাম। এর চেয়ে বিশদ করে বলতে আমি অক্ষম। এখন বলুন, আর কী শুনতে চান। যিনি এই পবিত্র বংশ-কথন পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তার সব পাপ বিনষ্ট হয়, তিনি স্বর্গে বাস করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে রাজবংশানুকীর্তন নামে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন সূত, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি—এই যে চারটি যুগ, এদের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলুন। সূত বলতে লাগলেন, নারায়ণ কৃষ্ণ নিজের পরমপদ প্রাপ্ত হলে, শত্রু সন্তাপকারী পরমধার্মিক পৃথাপুত্র অর্জুন যথাবিধি তাঁর সৎকার সমাপন করলেন এবং তাঁর শোকে নিতান্ত আকুল হয়ে উঠলেন। একদিন ব্রহ্মবাদী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনিকে শিষ্য প্রশিষ্য পরিবৃত হয়ে পথে যেতে দেখে অর্জুন শোকসংবরণপূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হলেন এবং অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে বললেন, হে প্রভু মহামুনি, আপনি কোন্ দেশ থেকে এলেন, এখনই বা কোথায় যাচ্ছেন? হে পদ্মপলাশলোচন, আপনাকে দেখে আমার বিপুল শোকভার অপসৃত হয়েছে। এখন আমার কি কর্তব্য বলে দিন। মহাযোগী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন

মুনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে নদীতীরে উপবেশন করলেন। তারপর অর্জুনকে বললেন, পাণ্ডুতনয়, এখন ঘোর কলি। তাই আমি মহাদেবের পবিত্র ধাম বারাণসীতে গমন করছি। হে মহাভুজ, এই ঘোর কলিতে লোক পাপেরই অনুগমন করবে, বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করবে। কলিযুগে জীবের বারাণসী ছাড়া অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যাতে তাদের সব পাপ বিনষ্ট হয়। সেই বারাণসীবাসী মানুষেরাই সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মহাত্মা, ধার্মিক ও সত্যবাদী হবে। তুমি পৃথিবীর মধ্যে ধৈর্যবান ও জনপ্রিয় বলে খ্যাত। এ সময়ে তুমি নিজের পরমধর্ম পালন কর। তাহলেই সংসার ভয় থেকে মুক্তি ঘটবে। হে দ্বিজোত্তমগণ, ভগবান ব্যাসদেব এই কথা বললে শত্রু পুরঞ্জয় অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে যুগধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সত্যবতীর পুত্র তখন দেবদেব ঈশানকে প্রণাম করে অর্জুনের কাছে সনাতন যুগধর্মগুলির কথা বলতে লাগলেন: হে নরেশ, অতি সংক্ষেপে তোমাকে যুগধর্মের কথা বলব। হে রাজন, বিশদ ভাবে সব কিছু বলতে পারব না। পণ্ডিতদের মতে প্রথমে সত্যযুগ, তারপর ত্রেতা, দ্বাপর তৃতীয় যুগ আর চতুর্থ যুগ হল কলি। সত্য যুগে ধ্যান ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে কেবল জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই মোক্ষের হেতু। সত্যযুগের দেবতা ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগের দেবতা ভগবান রবি, দ্বাপরের দেবতা বিষ্ণু এবং কলিযুগের দেবতা মহেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য কলিকালের উপাস্য কিন্তু পিনাকপাণি ভগবান রুদ্র চারটি যুগেই পূজিত হন। প্রথমে সত্যযুগে ধর্ম থাকেন চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে হন ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ এবং কলিযুগে তাঁর ত্রিপাদবিহীন সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকে। পুরঞ্জয়, সত্যযুগে সকল জীবই মিথুনরূপে জন্মগ্রহণ করত। লোকে কেউ কারো আচরণ দেখে লুব্ধ হত না, তখন সমস্ত প্রজা সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত চিত্তে ভোগ্য বস্তু ভোগ করত। সে সময় কেউ উত্তম কেউ অধম এ রকম ভেদ ছিল না। সকলেই সমান সুখ ভোগ করত। সকলেরই আয়ু আর রূপ একই রকম ছিল। হে পরন্তপ, সত্যযুগে কারো শোক ছিল না, মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের বাহুল্য ছিল, তারা নির্জনতা ভালোবাসত। সেই সময় সকলেই ধ্যান আর তপস্যায় মগ্ন থাকত এবং মহাদেবের আরাধনা করত। তখন কারো নির্দিষ্ট বাসগৃহ বলে কিছু ছিল না। সকলেই পর্বতে বা সমুদ্রতীরে বাস করত। তাদের আচরণ ছিল নিষ্কাম, হৃদয় ছিল সদাপ্রফুল্ল।

হে দ্বিজগণ, পরে ত্রেতাযুগে কালধর্ম অনুসারে পূর্বের সমস্ত রসোল্লাস বিনষ্ট হল। সেই সব সুখভোগ যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন লোকে অন্য রকম এক সুখ ভোগ করার অধিকারী হল। সেই সময় চেষ্টাবিহীন ভাবে জল পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটল এবং সগর্জন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের সূচনা হল। সেই বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে একবার মাত্র পতিত হওয়ায় প্রজাদের গৃহরূপে নানা বৃক্ষ আবির্ভূত হল। ত্রেতাযুগের শুরুতে সেই সব বৃক্ষ থেকেই জীবের যাবতীয় প্রয়োজন মিটে যেত, এমন কি, জীব তাদের সাহায্যেও নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। এর পর দীর্ঘকাল গত হলে প্রজাদের পদস্খলন ঘটল। আকস্মিক ভাবে তাদের মধ্যে রাগ ও লোভ দেখা দিল। প্রজাদের এই স্খলনে সেই সময় গৃহরূপ সমস্ত বৃক্ষই নষ্ট হল।

তারপর সেই বৃক্ষগুলির বিনাশ ঘটলে মৈথুনোদ্ভব প্রজাদের সত্যযুগের কথা মনে পড়তে লাগল। তারা পূর্বকালের সুখভোগের কথা চিন্তা করতে লাগল। তারা এই রকম চিন্তা করতে থাকলে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য আবার সেই গৃহরূপ বৃক্ষগুলি আবির্ভূত হল এবং ফল, আভরণ ও বস্ত্র প্রসব করতে লাগল। সেই সব বৃক্ষ থেকে

সুন্দর, সুগন্ধ, সুমিষ্ট ও বলকারক মধু প্রজাদের জন্য পত্রনির্মিত পাত্রে সঞ্চিত হতে লাগল। এই মধু কিন্তু মক্ষিকার মাধ্যমে সংগৃহীত হয় নি। ত্রেতাযুগের আরম্ভে প্রজারা সেই মধু খেয়েই জীবনধারণ করত এবং সেই রকম সুখভোগের শক্তিতেই তারা হৃষ্ট, পুষ্ট ও নীরোগ হয়েছিল।

কিন্তু আবার কিছু কাল অতীত হলে প্রজারা লোভের বশীভূত হল এবং বৃক্ষগুলি থেকে সেই স্বাভাবিক মধু সবলে আহরণ করতে লাগল। লোভের বশে তারা পুনরায় এই রকম অমঙ্গলজনক আচরণ করায় কোন কোন স্থানে কল্পবৃক্ষগুলি মধু নিয়ে অদৃশ্য হল। তারপর দারুণ শীত, গ্রীষ্ম আব বর্ষায় প্রজারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ল। শীতাতপ প্রভৃতি দ্বৈত ভাবের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে তারা নিজেদের রক্ষার জন্য গৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করতে লাগল। সেই সময়ে মধু নিয়ে কল্পবৃক্ষগুলিকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখে তারা শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বৈত ভাবের প্রতিকার রূপে গৃহ নির্মাণ করে কৃষি ও গোপালন প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা নির্বাহের কথা ভেবে দেখল। তারপর সেই ত্রেতাযুগে প্রজাদের আবার সুসময় এলো। কৃষিকর্ম সাধনের উপযোগী সুপ্রচুর বৃষ্টি হতে লাগল এবং যে বৃষ্টিজল পৃথিবীর নিম্নভূমিতে পতিত হয়েছিল, তাই আবার পরে বৃষ্টিপাতের ফলে স্রোতময়ী নদীতে পরিণত হল।

আর পৃথিবীতে যে সব জলবিন্দু সঞ্চিত হয়েছিল, তারা মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সুপ্রসিদ্ধ ওষধিতে পরিণত হল। বপনক্রিয়া বা হলাকর্ষণ না করলেও চতুর্দশটি গ্রাম্য ও আরণ্য বৃক্ষ এবং গুল্মের জন্ম হল। সেগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট ঋতুতে ফুলে ফলে ভরে যেত।

কিন্তু আবার ত্রেতাযুগের বশে অনিবার্যভাবে প্রজারা সব দিক দিয়ে রাগ ও লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ল। পরে তারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে পর্বত, নদী, ক্ষেত্র, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধিগুলি সবলে অধিকার করতে লাগল। তাদের এই রকম বিরুদ্ধাচারণের ফলে ওষধিরা পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করল। তারপরে পৃথু ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। তার ফলে প্রজারা নিজ নিজ পত্নী এবং ধনসম্পত্তি পেল এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কালবশে পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগল। ভগবান ব্রহ্মা এই সব জানতে পেরে সকলের আচরণের সীমা নির্ধারিত করার জন্য এবং ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্য ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করলেন। তাছাড়া ভগবান ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা ও পশুহত্যাবিহীন যজ্ঞেরও প্রবর্তন করেন। দ্বাপর যুগে মানুষের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় সর্বদাই রাগ, লোভ ও যুদ্ধ হয় এবং তত্ত্বাবিনিশ্চয় হয় না। এই সময়ে চতুষ্পাদ বেদ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে ছিল। দ্বাপর যুগে ব্যাস আবার তাকে চারভাগে ভাগ করেন। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিপুত্রেরা আবার বেদকে মন্ত্রব্রাহ্মণাদির বিন্যাস এবং স্বর ও বর্ণের বিভেদ অনুসারে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করেন। এর পর আবার শাস্ত্রজ্ঞানী ঋষিরা নিজ নিজ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে কোন কোন স্থলে সাধারণ অংশ রচনা করে ঋক্, যজুঃ ও সামের সংহিতাগুলি সঙ্কলিত করেন। হে সুব্রত, ঋষিরা ব্রাহ্মণ কল্পসূত্র, ব্রহ্মা, প্রবচন ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ পূর্ববর্তীকালে রচনা করেছিলেন। হে দ্বিজগণ, এই সময়ে দ্বাপর যুগে অনাবৃষ্টি, মৃত্যু এবং রোগের উৎপাত শুরু হল। তখন লোকের শরীর মন ও বাক্যের নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হল। এই রকম ক্লেশ হতে থাকলে তারা কী উপায়ে নিজেদের দুঃখ দূর করা যায়, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। এই রকম বিচার করতে

করতেই তাদের সদসদ্‌ বিচার বুদ্ধির উদয় হল এবং এই বিবেকবুদ্ধির বলে তারা নিজেদের দোষ দেখতে পেল। এই দোষ দর্শনের ফলেই দ্বাপরে জ্ঞানের আবির্ভাব হল। এই হল দ্বাপর যুগের বিবরণ। এই যুগে রজোগুণে আর তমোগুণেরই প্রাবল্য। প্রথমে সত্যযুগে যে ধর্ম ছিল, তাই ত্রেতাতেও বর্তমান ছিল। কিন্তু দ্বাপরে সেই ধর্ম বিপর্যস্ত হয় এবং কলিযুগে তা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে যুগধর্মানুকীর্তনপ্রসঙ্গে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বেদব্যাস বলতে লাগলেন, কলিকালে মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে। সর্বদাই তারা কপটতা আর অসূয়ার প্রশ্রয় দেয় এবং তপস্বীদের হত্যা করে। কলিকালে মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়, সর্বদা ক্ষুধার ও ঘোর অনাবৃষ্টির ভয় থাকে এবং দেশবিপ্লব ঘটে থাকে। এই সময় লোক অধার্মিক, অনাহারী, মহাক্রোধী, অল্পবীর্য, মিথ্যাবাদী ও লুব্ধ হয়, তিষ্য নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের সন্তানগণ অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব হয়। কোন কিছু ত্যাগ করতে তাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। ব্রাহ্মণদের দুরভীষ্ট, ভ্রান্ত অধ্যয়ন, দুরাচারিতা ও মন্দ উপদেশ প্রভৃতি কর্মদোষের ফলে মানুষের কেবল ভয়ই উৎপন্ন হতে থাকে। সে সময় কোন দ্বিজাতিই যজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন করে না। অল্পবুদ্ধি লোকেরাই কেবল যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নে রত হয়। কলিকালে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের সঙ্গে একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন এবং মন্ত্রসংযোগ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকে। রাজারা শূদ্রদেরই বেশি প্রশ্রয় দেন এবং ব্রাহ্মণদের পীড়ার কারণ ঘটান। রাজাদের মধ্যে ভ্রূণহত্যা ও বীরহত্যাও ঘটে থাকে। কলিযুগে দ্বিজাতিরা তীর্থস্নান, হোম, জপ, দান, দেবপূজা ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করে না, বেদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ব্রাহ্মণ এবং পুরুষোত্তম মহাদেবের নিন্দা করে নানা রকম বেদবিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। ব্রাহ্মণদের প্রায়ই স্বধর্মে অনুরাগ দেখা যায় না। লোকে দুরাচার পাষণ্ডদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অসৎ আচরণ করে এবং পরস্পর লোকের কাছে বহু যাচঞা করে। কলিযুগে জনপদে প্রাসাদের ওপর গৃহে শূলবিদ্ধ থাকবে, চারটি পথের সংযোগস্থলে শিবশূল থাকবে এবং রমণীদের কেশে লৌহশলাকা বিদ্ধ থাকবে। কলিকাল উপস্থিত হলে শূদ্রেরাই ধর্মাচরণ করবে। এদের দাঁতগুলি সাদা, চোখে কাজল, এরা মুণ্ডিত মস্তক, এবং এদের পরিধানে কাষায় বস্ত্র। অনেকেই শস্য ও বস্ত্র অপহরণ করবে এবং একজন চোরের কাছ থেকে আরেকজন চুরি করবে। সেই চোরকে আবার আরেকজন চোর এসে প্রহার করবে। দুঃখের বাহুল্য, অল্প আয়ু, দেহের অবসন্নতা, রোগ-ভোগ, অধর্মে মতি ও পাপের অনুষ্ঠান—এই সব তমোগুণময় কার্য কলিকালে ঘটবে। এ সময়ে কেউ শাস্ত্রাধ্যয়ন না করেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করে, কেউ বা নরকপাল হাতে নিয়ে ভ্রমণ করে, কেউ বা বেদ বিক্রয় করে, কেউ বা তীর্থ বিক্রয় করে থাকে। অল্পবুদ্ধি লোকেরা ব্রাহ্মণদের উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেখলে তাদের বিতাড়িত করে। শূদ্র রাজপুরুষরাও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের তাড়না করে থাকে। হে পরন্তপ, কলিকালে শূদ্রেরাই দ্বিজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকে, কালধর্মের বশে রাজারাও ব্রাহ্মণদের সম্মান রক্ষা করে না। অল্প বিদ্যা, অল্প ভাগ্য ও অল্প শক্তি নিয়ে ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অলংকার ও অন্য

মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে শূদ্রের পরিচর্যা করে। হে নৃপ, পূজা করলেও কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তবুও ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সেবার অবসর দেখে শূদ্রের দ্বারে অপেক্ষা করে। কলিকালে শূদ্রের উপর নির্ভরশীল ব্রাহ্মণেরা বাহনে উপবিষ্ট শূদ্রের চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তুতি পাঠ করে ও তাদের সেবা করতে থাকে। ব্রাহ্মণেরা এই রকম বেদবহির্ভূত আচরণ করে ঘোর নাস্তিকতা প্রদর্শন করে এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করে শূদ্রকে বেদপাঠ করায়। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিজের তপস্যা ও যজ্ঞের ফল অন্যের কাছে বিক্রয় করে। হে রাজন, শত সহস্র মানুষ নিজেদের ধর্মনাশ করে যতিব্রত নেয় অথচ ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারে না। সকলেই লৌকিক গানের দ্বারা দেবতার স্তব করে। কলিকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা সকলেই বামাচারী. পাশুপতাচারী ও পাঞ্চরাত্রিক হবে। জ্ঞান ও যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম বিনষ্ট হলে এবং সমস্ত মানুষ কর্মনিষ্ক্রিয় হলে কীট. মূষিক ও সর্পেরাও মানুষকে আক্রমণ করবে। হে ব্রাহ্মণগণ, পূর্বে দক্ষযজ্ঞের সময়ে দধীচ মুনি যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়েছিলেন, তারাও অন্তিম কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাদের চিত্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় তারা মহাদেবের নিন্দা আর নিষ্ফল ধর্মের অনুষ্ঠান করবেন। মহাত্মা গৌতম যে সমস্ত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের শাপ দিয়েছিলেন. তারাও দুরাচার ও আশ্রমচ্যুত হয়ে নিজেদের ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং নারায়ণের নিন্দা করবেন। এই ব্রাহ্মণেরা মার্জারব্রত গ্রহণ করে তমোগুণে আচ্ছন্নচিত্ত হয়ে বেদবহির্ভূত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন এবং সেই সব কর্মে নিজেদের কুশলতা দেখিয়ে লোককে মুগ্ধ করবেন। কলিকালে মহাদেব রুদ্র মানুষের প্রধান দেবতা। অতএব কলিতে দেবতা ও মানুষের আরাধ্য সেই দেবতারই সাধনা করবে। নীললোহিত শঙ্কর ভক্তের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হবেন এবং শ্রৌত ও স্মার্ত মতের প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যদের বেদান্তসার ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদবিহিত ধর্মের উপদেশ দেবেন। যারা নির্মল চিত্তে যে কোন উপচার দিয়ে তাঁর পূজা করে, তারা কলির পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে। বহুদোষযুক্ত কলিযুগের এই একটিই প্রধান গুণ যে, মানুষ মহাদেবের পূজা করেই প্রচুর পুণ্যের অধিকারী হতে পারে। অতএব সকলেই বিশেষত ব্রাহ্মণেরা মাহেশ্বর যুগে সর্বপ্রথম মহাদেবেরই শরণ নেবে। যারা প্রসন্ন চিত্তে বিরূপাক্ষ ব্যাঘ্রচর্মাম্বর ঈশান রুদ্রকে প্রণাম করে তারাই পরমপদ লাভ করে। রুদ্রদেবকে নমস্কার করলে যেমন সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়, অন্য দেবতাকে নমস্কার করলে কিন্তু সেই রকম ফল লাভ হয় না। এই কলিকালে সমস্ত দোষ ধুয়ে ফেলবার একমাত্র উপায় হল মহাদেবকে নমস্কার, দান ও ধ্যান। এ কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অতএব লোকে যদি পরমপদ লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে অন্যান্য দেবতাকে ছেড়ে যেন কেবল বিরূপাক্ষ মহেশ্বরেরই শরণ নেয়। যারা ইহলোকে স্বর্গবন্দিত মহাদেবের আরাধনা করে না তাদের দান, তপস্যা, যজ্ঞ, জীবন সবই বৃথা। হে দেবদেব, তুমি রুদ্র, ত্রিশূলধারী, ত্র্যম্বক, ত্রিনয়ন, তুমি যোগিগণের গুরু। তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব, তুমি মহাদেব, বিধাতা, শম্ভু, স্থাণু, পরমেষ্ঠী, সদামঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি চন্দ্র, তুমি রুদ্র, বিপুল তোমার গ্রাস। তুমি জগতের হেতু, তুমি বিরূপাক্ষ, জগতের শরণ্য, ব্রহ্মচারী। আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। হে ঈশান, মহেশ্বর, তুমি মহাযোগী, অম্বিকাপতি, তুমি যোগীদের যোগ দান করে থাকো অথচ নিজে যোগমায়ায় আবৃত থাকো। হে রুদ্র, তুমিই যোগীদের গুরু ও আচার্য, তুমি যোগাধিগম্য, পিনাকপাণি, সংসারনাশক রুদ্র। হে

ব্রহ্মণ, তুমিই ব্রহ্মার অধিপতি। তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি শাশ্বত, শান্ত, ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণপ্রিয় হে নাথ, তুমি সর্বত্রগামী জটাজুটমণ্ডিত, কলামূর্তি, হয়েও অমূর্তি, তুমি দেবাধিপতি। তোমাকে নমস্কার। হে দেব তুমি একমূর্তি। তোমার মূর্তি অতি বিপুল। বেদের সাহায্যে তোমাকে জানা যায়, তুমি স্বর্গের অধিপতি, তুমি নীলকণ্ঠ, বিশ্বমূর্তি, সর্বব্যাপী, বিশ্বরেতা। তোমাকে নমস্কার। প্রলয়কালের অগ্নির সদৃশ, কালদহন, কন্দর্পনাশী, কামদ, চন্দ্রকলামণ্ডিত মহাদেব গিরিশকে আমি নমস্কার করি। নমস্কার করি সেই উগ্র ভাস্কর পশুপতিকে যিনি বিলোহিত, লেলিহান আদিত্য, পরমেষ্ঠী আর ভয়ঙ্কর, যিনি অন্ধকারের পরপারে থাকেন। হে অর্জুন, যত দিন না মন্বন্তর কালের ক্ষয় হয়, সেই পর্যন্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ সব যুগের লক্ষণই তোমাকে সংক্ষেপে বললাম। এক মন্বন্তরের বর্ণনা আর এক মন্বন্তরের পক্ষেও প্রযোজ্য, আর, এক কল্পের কথা বলায় অন্য কল্পের কথাও বলা হল। এ বিষয়ে সংশয় কোর না। হে অর্জুন, অতীত ও অনাগত সমস্ত মন্বন্তরেই সকলেই নিজ নিজ সদৃশ নাম ধারণ করবে, সদৃশ কার্যেরই অনুষ্ঠান করবে। শ্বেতবাহন কিরীটী ভগবান বেদব্যাসের এই কথা শুনে মহাদেবের প্রতি অবিচল ভক্তি সমাশ্রয় করলেন এবং সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা ও সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য সেই প্রভু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষিকে প্রণাম করলেন। বেদব্যাস মুনি প্রণত পরপুরঞ্জয় অর্জুনের দেহে নিজের পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে বললেন, হে পরপুরঞ্জয়, এখন যে তুমি ধন্য ও অনুগৃহীত হয়েছ তা বুঝতে পারছি। ত্রিভুবনে তোমার মতো মহাদেবভক্ত আর কেউ নেই। তুমি সেই বিশ্বচক্ষু, বিশ্বতোমুখ, সর্বজগদ্ব্যাপী মহাদেবকে সকলের সম্মুখে দর্শন করেছ। তুমি তাঁর দিব্য ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্যকরূপে জেনেছ। এই জ্ঞানের কথা সনাতন হৃষীকেশ স্বয়ং প্রীতির বশে তোমাকে বলেছিলেন। অর্জুন, এবার নিজের গৃহে ফিরে যাও। আর শোক কোরো না। এখন থেকে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে সকলের শরণ্য শিবের আশ্রয় নাও। ভগবান প্রভু বেদব্যাস এই কথা বলে অর্জুনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করে শিবের আরাধনা করার মানসে বারাণসীধামে গমন করলেন। অর্জুনও তাঁর উপদেশে মহাদেবকে আশ্রয় করে অন্য সব কার্য পরিত্যাগ করে কেবল মহাদেবেই অর্পিতচিত্ত হয়ে রইলেন। পৃথিবীর মধ্যে সত্যবতীপুত্র ও দেবকীপুত্র ছাড়া আর কেউই অর্জুনের মতো ভক্ত হতে পারে নি, পরেও হতে পারবে না।

সূত বললেন, শান্ত, ধীমান, অমিততেজা পরাশরতনয় ভগবান বেদব্যাস মুনিকে সতত প্রণাম করি। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু। তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি পরমেশ্বর রুদ্রের স্বরূপ জানতে পেরেছে? হে মুনিগণ, আপনারা সেই পরাশরতনয়, মহাত্মা, যোগী, অব্যয়, বিষ্ণুরূপ, সত্যবতীনন্দন ঋষি কৃষ্ণকে প্রণাম করুন। মুনিরা সূতের কথায় সমাহিত চিত্তে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাসকে প্রণাম করলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ব্যাসার্জুনসংবাদে যুগধর্মপ্রসঙ্গে
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, মহামতি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনি দিব্যধাম বারাণসীতে গিয়ে কি করলেন সে-কথা শুনতে আমাদের কৌতূহল হচ্ছে। সূত বললেন, মহামুনি বারাণসীতে গিয়ে গঙ্গাজলে আচমন করে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের পূজা করলেন। সেখানে যে সমস্ত মুনি

বাস করতেন, তারা সকলেই মুনিবর ব্যাসকে আসতে দেখে তাঁর বন্দনা করলেন এবং সকলেই প্রণত হয়ে পবিত্র পাপঘ্ন শিবকথা, সনাতন মোক্ষধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান ঋষিও দেবদেবের মাহাত্ম্য এবং বেদবিহিত ধর্মের কথা বললেন। সেই সব শ্রেষ্ঠ মুনিদের মধ্যে ব্যাসশিষ্য মহামুনি জৈমিনি ব্যাসদেবকে ধর্মের সনাতন গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, আপনি পরম ঋষি, সর্বজ্ঞ। কিছুই আপনার অজানা নেই। আমার একটি সন্দেহ আপনি দূর করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কোন কোন মহর্ষি কেবল ধ্যানেরই প্রশংসা করে থাকেন, কেউ বা ধর্মের প্রশংসা করেন, কেউ আবার সাংখ্য ও যোগের প্রশংসা করেন, আবার কোন মহর্ষি কেবল তপস্যারই গুণগান করেন। কেউ বলেন ব্রহ্মচর্যই প্রশস্ত, কেউ বলেন মৌনই শ্রেয়, কারো মতে অহিংসাই শ্রেয়, কেউ সন্ন্যাসকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কেউ দয়ার প্রশংসা করেন, কেউ দান ও অধ্যয়নের প্রশংসা করেন, কেউ বলেন তীর্থযাত্রাই শ্রেয়, কারো মতে ইন্দ্রিয়-সংযমই প্রশস্ত। এদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃতপক্ষে শ্রেয়, তা বলে দিন। আর যদি অন্য কোন গুহ্য কথা বলার থাকে তাহলে তা-ও বলুন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনি জৈমিনির কথা শুনে বৃষকেতন মহাদেবকে প্রণাম করে গম্ভীর বাক্যে বলতে লাগলেন, হে মহাভাগ মুনি, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টি অতি সুন্দর। আমি সর্বাপেক্ষা গুহ্যের চেয়েও গুহ্য বিষয় বলছি। অন্য মহর্ষিরাও শুনুন। পূর্বে মহেশ্বর স্বয়ং এই সনাতন জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন। যারা সূক্ষ্মদর্শী তারাই এই জ্ঞানের সেবা করে থাকেন, আর যারা মূর্খ তারা এর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। যারা পরমেশ্বরের ভক্ত নয়, যারা শ্রদ্ধারহিত আর যারা বেদার্থ বুঝতে পারে না, সেই সব মানুষকে জ্ঞানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানের কথা বলতে নেই। পুরাকালে সুমেরুশিখরে মহাদেবের সঙ্গে একাসনে বসে পার্বতী ত্রিপুরারিকে এই জ্ঞানের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, হে দেবদেব মহাদেব, আপনি ভক্তদের দুঃখমোচন করে থাকেন। লোকে সত্বর কিভাবে আপনার দর্শন পেতে পারে? হে শঙ্কর, সাংখ্যযোগ, তপস্যা, ধ্যান, বৈদিক কর্মযোগ আর অন্য সব কর্ম বহু পরিশ্রমসাধ্য। বিজ্ঞ যোগজ্ঞেরাও এই সব কার্যের অনুষ্ঠান করে বিভ্রান্তচিত্তে আপনার দর্শন লাভ করে। আপনি সকল জীবের ইন্দ্রিয়ের অতীত। হে কামাঙ্গনাশন, এখন এই গূঢ় ও গুহ্যতম জ্ঞানসকল ভক্তের হিতের জন্য বলে দিন। ঈশ্বর বললেন, এই গূঢ়ার্থ জ্ঞান অজ্ঞ লোকের বুদ্ধির অগোচর। সকলের কাছে এর কথা বলতেও নেই। তবে পরম ঋষিগণ যেমন বলেছেন, আমিও ঠিক সেইভাবে তোমার কাছে এ কথা বলছি। আমার পুরী বারাণসী পরম গুহ্যতম ক্ষেত্র। এই পুরী সকল প্রাণীকেই সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করে। হে মহাদেবি, মহাত্মা ভক্তেরা দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমার ব্রত অবলম্বন করে সেইখানে বাস করছে। আমার কাশী সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান। কি অন্য স্থানে, কি শ্মশানে, কি স্বর্গে, কি ভূতলে যেখানে যত পবিত্র ও প্রশস্ত তীর্থ আছে, সে-সবই এখানে রয়েছে। আমার নিকেতন বারাণসী পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন নয়, তা অন্তরীক্ষে অবস্থিত। যারা মুক্ত হয়েছে, তাদেরই এ রকম দর্শন হয়; যারা মুক্ত হয় নি, তাদের হয় না। সুন্দরি, এই কাশী শ্মশান বলে বিখ্যাত, আমি কালরূপ ধারণ করে এখানে বাস করেই সমস্ত জগৎ সংহার করে থাকি। দেবি, সমস্ত গুহ্য স্থানগুলির মধ্যে এইটিই আমার প্রিয়তম স্থান। কিন্তু আমার ভক্তেরা যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। দান, জপ,

হোম, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান এবং অন্য যা কিছু কর্ম এখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাই অক্ষয় হয়। পূর্বে সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হয়েছে, অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার আগেই সেই সব পাপ বিলীন হয়ে যায়। হে দেবি বরাননে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, স্ত্রীজাতি, ম্লেচ্ছ, পাপজ সঙ্কীর্ণ জাতি, কীট, পিপীলিকা, মৃগ, পক্ষী এবং অন্যান্য সব জন্তু—কালবশে যাদের কাশীতে মৃত্যু হয়, তারা সকলেই অর্ধেন্দুশেখর ত্রিনয়ন মহা বৃষভবাহন হয়ে আমার শিবপুরীতে অবস্থান করে। কাশীতে মৃত্যু হলে কোন পাপীকেই নরকভোগ করতে হয় না। সকলেই মহাদেবের কৃপায় পরমা গতি লাভ করে। সংসার অত্যন্ত ভীষণ এবং মোক্ষ লাভ করাও সহজ নয় এ কথা জেনে প্রস্তরখণ্ড দিয়ে নিজের দুটি চরণ ভগ্ন করে কাশীতেই অবস্থান করতে হয়। পরমেশ্বরি, যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয়েও অন্য স্থানে মৃত্যু বরণ করে, তার পক্ষেও সংসার থেকে মুক্তি লাভ করা দুরূহ। হে গিরিরাজসুতা, এখানে আমার অনুগ্রহেই পাপ নষ্ট হয়ে যায়, মূর্খেরা আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তা দেখতে পায় না। যারা মূঢ়, অজ্ঞানে আবৃত, তারা কাশী দর্শন করতে পারে না। তাই বারবার বিষ্ঠা, মূত্র আর শুক্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। দেবি, যে ব্যক্তি শত শত বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও একবার বারাণসীতে প্রবেশ করে, সে পরমধামে গমন করে। সেখানে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকে শোক পেতে হয় না। সে সেই জন্মমৃত্যুজরারহিত পবিত্র শিবলোকে গমন করে, যেখানে গেলে আর মৃত্যু হয় না। সেটিও মুমুক্ষু ব্যক্তির একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা তা লাভ করলে নিজেদের চরিতার্থ মনে করেন। কাশীতে যেমন পরমা গতি লাভ করা যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ আর ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাও সে রকম গতি লাভ করতে পারা যায় না। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ও বর্ণবহির্ভূত ঘৃণিত চণ্ডাল প্রভৃতি যাদের দেহ আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক আর আধিদৈবিক দুঃখ এবং নানা রকম পাপে পূর্ণ, পণ্ডিতদের মতে তাদের পক্ষে কাশীই পরম ঔষধ। কাশীই পরম জ্ঞান, কাশীই পরম পদ, কাশীই পরম তত্ত্ব, কাশীই পরম শিবস্বরূপ। যারা নৈষ্ঠিক দীক্ষা সমাপ্ত করে কাশীতেই বাস করে, আমি তাদের পরম জ্ঞান ও অন্তিম কালে পরম পদ দান করি। কাশীতে মৃত্যু হলে যেমন পরম মোক্ষ লাভ হয়, প্রয়াগ, পবিত্র নৈমিষারণ্য শ্রীশৈল, হিমালয়, কেদার, ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রুদ্রকোটি, নর্মদা, হাটকেশ্বর, শালগ্রাম, কুব্জাম্র, অনুত্তম কোকামুখ, প্রভাস, বিজয়েশান, গোকর্ণ বা শঙ্কুকর্ণ—এই সব ত্রিভুবন বিখ্যাত পুণ্যস্থানেও সেই রকম হয় না। বিশেষত ত্রিপথগামিনী গঙ্গা বারাণসীতে প্রবেশ করেছেন, তিনি মানুষের শত জন্মের পাপ নাশ করেন। অন্যান্য তীর্থে গঙ্গা দুর্লভ এবং শ্রাদ্ধ, দান, জপ ও ব্রত সুলভ। কিন্তু এই সব ব্রত প্রভৃতি কাশীতে অত্যন্ত দুর্লভ। বহু ভাগ্য না করলে কাশীতে গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যকর্ম হয়ে ওঠে না। কাশীতে প্রতিদিন যাগ করবে, প্রতিদিন হোম করবে এবং প্রতিদিন দেবতার অর্চনা করবে এবং বায়ুভক্ষণ করে কাশীতে অবস্থান করবে। মানুষ যদি পাপী, প্রবঞ্চক এবং অধার্মিক হয়, তাহলেও কাশীতে এলে সে নিজের তিন কুল পবিত্র করে। যারা কাশীতে মহাদেবের স্তব করেন ও তাঁর অর্চনা করেন তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং গণেশ্বর হয়ে থাকেন বলে জানবে। অন্য স্থানে যোগ, জ্ঞান, সন্ন্যাস বা অন্য পথে যে পরমপদবী লাভ করতে সহস্র জন্ম কেটে যায়, বারাণসীতে দেবদেবেশের ভক্ত হয়ে বাস করলে সেই পরম মোক্ষ এক জন্মেই লাভ করা যায়। যেখানে এক জন্মেই যোগ, জ্ঞান, মুক্তি—এ সবই হয়ে থাকে, সেই বারাণসী পরিত্যাগ

করে কারো অন্য তপোবনে যাওয়া উচিত নয়। আমি কখনো কাশীধাম ত্যাগ করি না বলে এর নাম অবিমুক্ত। এটি সমস্ত গোপনীয় পদার্থের মধ্যে অতি গোপনীয়। এ কথা যে বুঝতে পারে, সে-ই মুক্তি লাভ করে। হে শুভ্রে, যারা জ্ঞান ও তপস্যায় একাগ্র চিত্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করতে চান, তাদের পক্ষে যে গতি বিহিত হয়েছে, অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের পক্ষেও তাই বিহিত হয়েছে। দেবগণ যে সব স্থান পরিত্যাগ করেন না বলে কথিত, বারাণসী সেই সব স্থান অপেক্ষাও অধিকতর কল্যাণদাত্রী। এখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ মহাদেব মানুষের মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম নাম ও অবিমুক্তকমন্ত্র শোনান। দেবি, অবিমুক্ত নামে যে পরতর তত্ত্বের কথা বলা হয়, সেই তত্ত্ব বারাণসীতে এক জন্মে পাওয়া যায়। ভ্রূমধ্যে, নাভিমধ্যে, হৃদয়ে, মস্তকে এবং আদিত্যলোকে যেমন অবিমুক্ত অবস্থান করেন, সেই রকম কাশীতেও অবিমুক্ত অবস্থান করছেন, বরণা এবং অসি —এই দুই নদীর মধ্যে যে বারাণসী পুরী অবস্থিত সেইখানে অবিমুক্ত নামে তত্ত্ব সতত রয়েছেন। যেমন নারায়ণের চেয়ে পরম দেবতা আর কেউ নেই, যেমন মহাদেব মহেশ্বরের চেয়ে পরম ঈশ্বর আর কেউ নেই, সেই রকম বারাণসীর চেয়ে প্রধানতর স্থান আর নেই, পরেও হবে না। সেই স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প এবং দেবদেব পিতামহ সর্বদা আমার উপাসনা করেন। যারা মহাপাতকী, আর যারা তাদের চেয়েও পাপাচারী তারাও বারাণসীতে গিয়ে পরমা গতি লাভ করে। মহাদেবি, তাই মুমুক্ষু ব্যক্তি আমরণ বারাণসীতে নিয়ত বাস করবে, তাহলেই জ্ঞান লাভ করে সে মুক্ত হবে। কাশীতে থেকেও যার মন পাপাসক্ত তাকে বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সেখানে কায়, মন বা বাক্যের দ্বারা পাপাচরণ করতে নেই।

ব্যাস বললেন, হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এই হল সমস্ত বেদপুরাণের রহস্য জ্ঞান। বারাণসী স্থিত জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞানের কথা জানি না। পরমেষ্ঠী ঋষি আর দেবতাদের সামনে মহাদেব পার্বতীকে এই সব পাপঘ্ন কথা শুনিয়েছিলেন। যেমন পুরুষোত্তম নারায়ণ সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রুদ্রদের মধ্যে যেমন মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ, সেই রকম বারাণসী সমস্ত স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে পূর্বজন্মে রুদ্রের আরাধনা করেছে, সেই ব্যক্তিই পবিত্র শিব নিকেতন অবিমুক্ত ক্ষেত্র লাভ করতে পারে।

যাদের বুদ্ধি কলির পাপে আচ্ছন্ন হয়েছে, তারা সেই পরমেষ্ঠীর স্থান দেখতে পায় না। যারা এই ধামকে প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা মহাকালকে স্মরণ করে, তাদের ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত পাপ সত্বর বিনষ্ট হয়। যারা এখানে বাস করে কোন পাপ করে ফেলে মহাকাল মহেশ্বর তাদের সে সমস্ত পাপ নাশ করেন। যারা সংসারে বার বার আগমন করছে, অথচ মুক্তি পেতে উৎসুক, তাদের এই স্থানের ভজনা করা উচিত। এখানে মৃত্যু হলে আর সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হয় না। অতএব কি পাপী কি পুণ্যবান, কি যোগী কি অযোগী—সকলেই সর্বতোভাবে বারাণসীতে বাস করবার চেষ্টা করবে। লোকের কথায়, পিতামাতার কথায়, এমন কি গুরুর কথায়ও বারাণসী যাবার সংকল্প ত্যাগ করবে না।'

সূত বললেন, শ্রেষ্ঠ বেদবিৎ ভগবান ব্যাসদেব এই কথা বলে তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের নিয়ে বারাণসীতে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, ধীমান গুরু দ্বৈপায়ণ মুনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে মুক্তিদায়ক ওংকার নামে বৃহৎ শিবলিঙ্গের কাছে গেলেন। মহামুনি ব্যাস শিষ্যদের সঙ্গে মহাদেবের পুজো করলেন এবং শুদ্ধাত্মা মুনিদের সম্মুখে সেই শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগলেন—এই সেই পবিত্র ওংকার নামে সুন্দর লিঙ্গ। একে স্মরণ করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। ইনিই সেই পরমজ্ঞানস্বরূপ উত্তম পঞ্চায়তন লিঙ্গ, যাঁকে মুনিরা বারাণসীতে প্রতিদিন অর্চনা করে থাকেন। ইনিই মুক্তিদাতা। এখানেই সাক্ষাৎ ভগবান মহাদেব রুদ্র পঞ্চায়তন বিগ্রহ ধারণ করে ক্রীড়া করছেন এবং জীবগণের মুক্তি দান করছেন। পাশুপত জ্ঞানরূপে পঞ্চার্থময় যে লিঙ্গের কথা বলা হয়, ইনিই সেই বিমল লিঙ্গ। এই ওংকার লিঙ্গেই সেই পঞ্চার্থ পাশুপত জ্ঞান নিহিত। শান্ত্যতীতা, পরা শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি—এই পাঁচটি শক্তি যথাক্রমে এই লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বলে এঁর নাম পঞ্চায়তন লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মা প্রভৃতি পাঁচজন দেবতার আশ্রয় বলেও এই ওংকার নামে লিঙ্গটি পঞ্চায়তন বলে কথিত হয়। যে ব্যক্তি অব্যয় পঞ্চায়তন নামে ঐশ্বরিক লিঙ্গকে স্মরণ করেন, তিনি দেহাবসানের পর আনন্দময় পরমজ্যোতিতে প্রবেশ করেন। পূর্বকালে দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ এখানে মহাদেবের পুজো করে পরমপদ লাভ করেছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, মৎস্যোদরীর তীরে পবিত্র, গুহ্যতম, মঙ্গলময়, উৎকৃষ্ট, গোচর্মমাত্র আয়তনের ওংকারেশ্বর লিঙ্গ। হে দ্বিজোত্তমগণ, বারাণসীর মধ্যে গুহ্য লিঙ্গগুলি হল কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ, মধ্যমেশ্বর উত্তম লিঙ্গ, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ, ওংকার লিঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ কপর্দীশ্বর লিঙ্গ। মহাদেবের অনুগ্রহ ছাড়া এ সব জানা যায় না। সূত বললেন, পরাশরতনয় মহামুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এই কথা বলে মহাদেবের কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দেখবার জন্য প্রস্থান করলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ ভগবান বেদব্যাস শিষ্যদের সঙ্গে সেই লিঙ্গের পুজো করলেন ও ব্রাহ্মণদের কাছে কৃত্তিবাসেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা বলতে লাগলেন—পূর্বে এই স্থানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিবের ভজনা করতেন, তাদের হত্যা করবার জন্য হস্তীর মতো আকৃতিবিশিষ্ট এক দৈত্য শিবলিঙ্গের কাছে এলো। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তখন ভক্তবৎসল ত্রিনয়ন মহাদেব সেই ভক্তদের রক্ষা করতে ঐ শিবলিঙ্গ থেকে আবির্ভূত হলেন। মহাদেব সেই হস্তীর মতো আকারের দৈত্যকে হেলায় শূল দিয়ে আহত করে তার চর্মকে নিজের বস্ত্র রূপে পরিধান করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল কৃত্তিবাসেশ্বর। হে মুনিগণ, এই স্থানে মুনিশ্রেষ্ঠগণ পরমা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তারা এই ভৌতিক দেহেই সেই পরমপদ লাভ করেন। যারা বিদ্যা, বিদ্যেশ্বর রুদ্র ও শিব বলে কথিত, তারা সর্বদাই এই কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন। এই কলিযুগকে ভয়ংকর ও অধর্মবহুল বলে জেনে যারা এই কৃত্তিবাসেশ্বরকে ত্যাগ করেন না, তাদের মনস্কামনা যে পূর্ণ হয় সে বিষয়ে সংশয় নেই। অন্য স্থানে লোকে সহস্র জন্মেও মুক্তিলাভ করতে পারে কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই কৃত্তিবাসেশ্বরের স্থানে মানুষ এক জন্মেই মুক্তি পায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে এই স্থানই সমস্ত সিদ্ধির নিলয়। দেবদেব মহাদেব একে সকলের সামনে থেকে গোপন করে রেখেছেন। জিতেন্দ্রিয় বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণগণ সর্বযুগেই এখানে মহাদেবের উপাসনা করেন ও শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করেন। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাণু শিবকে সতত নিজের হৃদয় মধ্যে ধ্যান করে সেই দেবদেব মহাদেবের স্তব করেন। হে

দ্বিজগণ, সিদ্ধেরা এই বলে গান করে থাকেন—যে সব ব্যক্তি বারাণসীতে বাস করেন আর কৃত্তিবাসেশ্বরের শরণ নেন, তাদের একজন্মেই মুক্তি হয়। পৃথিবীর মধ্যে ত্রিলোকবাঞ্ছিত অতি দুর্লভ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে যতিরা এখানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন-পূর্বক রুদ্রময় জপ করেন ও হৃদয়মধ্যে মহাদেবের ধ্যান করেন। বারাণসীর মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ মুনিরা আছেন, তারা প্রভু ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন, সেই শম্ভু রুদ্রকেই স্তব করেন এবং তাঁকেই প্রণাম করেন। আমি সেই বিমলজ্যোতি ভবকে প্রণাম করছি, সেই পুরাণপুরুষ স্থাণু গিরিশকে আশ্রয় করছি আর হৃদয়গুহায় নিহিত রুদ্রকে স্মরণ করছি। আমি জানি তিনি বহুরূপধারী মহাদেব।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, ধীমান বেদব্যাস মুনিদের এইভাবে সম্ভাষণ করে দেবদেব শূল-পাণির অব্যয় কপর্দীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করতে গেলেন। হে দ্বিজগণ, সেখানে তিনি পিশাচ-মোচন তীর্থে স্নান করে যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করলেন ও মহাদেবের পূজা করলেন। হে দ্বিজগণ, গুরুর সঙ্গে মুনিরা সেখানে এক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেন। তারা বুঝলেন যে এ হল স্থানমাহাত্ম্য, তাই গিরিশ হরকে প্রণাম করলেন। সেই শ্রেষ্ঠ কপর্দীশ্বরের কাছে এক ভীষণদর্শন ব্যাঘ্র এক হরিণীকে ভক্ষণ করার জন্য অত্যন্ত দ্রুত বেগে আগমন করল। তখন শঙ্কিত হয়ে হরিণী অতিশয় ব্যগ্র ভাবে এদিক সেদিক দৌড়তে দৌড়তে মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কিন্তু অবশেষে সে ব্যাঘ্রের হাতেই নিহত হল। মহাবল ব্যাঘ্র তীক্ষ্ন নখ দিয়ে মৃগীকে বিদীর্ণ করে মুনিদের দিকে তাকিয়ে দেখে অন্য নির্জন স্থানে চলে গেল। সেই কিশোরী হরিণী কপর্দীশ্বরের সম্মুখে প্রাণ-ত্যাগ করেই আকাশপথে বৃষভারূঢ়া, চন্দ্রশেখরা, নীলকণ্ঠা, ত্রিনয়না রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হল। বিপুল তার তেজ আর সূর্যের মতো তার প্রভা। ঐ রকম রূপবিশিষ্ট পুরুষেরাও এসে তার সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। তারপর তৎক্ষণাৎ সে গণেশ্বরে পরিণত হল। গগনচারী পুরুষেরা তার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। পরে কিন্তু আর তাকে দেখা গেল না। জৈমিনি প্রমুখ মুনিরা এই পরম বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে গুরু বেদ-ব্যাসকে কপর্দীশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভগবান বেদব্যাস কপর্দীশ্বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে বৃষভধ্বজকে প্রণাম করে মুনিগণের কাছে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগলেন—এই হল দেবদেব মহাদেবের শ্রেষ্ঠ কপর্দীশ্বর লিঙ্গ। যে এঁকে স্মরণ করে তার সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। হে ব্রাহ্মণগণ, বারাণসীতে বাস করে কপর্দীশ্বরের পূজা করলে মানুষের কাম ক্রোধ প্রভৃতি দোষ দূর হয়। তাই সর্বদা উত্তম কপর্দীশ্বরকে দর্শন করবে, সযত্নে তাঁর পূজা করবে এবং বৈদিক স্তোত্রে তাঁর স্তব করবে। যে যোগীরা শান্ত মনে সতত তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকেন ছয় মাসেই তাদের যোগসিদ্ধি হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁর সমীপস্থিত পিশাচমোচন কুণ্ডে স্নান করলে এবং এঁর পূজা করলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ লয় পায়। হে বিপ্রগণ, পূর্ব কালে এই তীর্থে শঙ্কুকর্ণ নামে এক প্রথিতব্রত তপস্বী মহাদেবের পূজা করতেন। সেই যোগাত্মা নৈষ্ঠিকী দীক্ষা অবলম্বন করে সেইখানেই বাস করতেন। তিনি স্তোত্র, নমস্কার,

প্রদক্ষিণ এবং পুষ্প, ধূপ প্রভৃতির দ্বারা তাঁর আরাধনা করতেন এবং দিনরাত্রি রুদ্রের ওঙ্কারমন্ত্র জপ করতেন। একদিন তাঁর চোখে পড়ল একটি প্রেত ক্ষুধায় কাতর হয়ে বারবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে করতে আসছে, তার দুই চক্ষু অস্থি ও চর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। মুনিবর তাকে দেখে অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? পিশাচ ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁকে বলতে লাগল, পূর্ব জন্মে আমি এক ব্রাহ্মণ ছিলাম—আমার ধনসম্পত্তি ছিল, অন্নসম্পদ ছিল, আমার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সবই ছিল। আমি সর্বদা আত্মীয় স্বজনদের পালন পোষণ করতে আগ্রহী ছিলাম। আমি গো, অতিথি বা দেবতার পূজো করি নি, কখনো অল্পবিস্তর পুণ্যকর্মও করে উঠতে পারি নি। একদিন বারাণসীতে বৃষভবাহন ভগবান বিশ্বেশ্বর রুদ্রকে দেখে তাঁকে প্রণাম ও স্পর্শ করলাম। হে মুনি, তার অনেক দিন পরে আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু আমাকে যমের ভীষণ মুখ দেখতে হয় নি। এখন এই পৈশাচী যোনি প্রাপ্ত হয়েছি। ক্ষুৎ পিপাসায় পীড়িত ক্লান্ত হয়ে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। প্রভু, আমি আপনাকে প্রণাম করে আপনারই শরণ নিলাম। যদি কোন উপায় থাকে তাহলে আমাকে উদ্ধার করুন। এ কথা শুনে শঙ্কুকর্ণ পিশাচকে বললেন, এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে পুণ্যবান আর কেউ নেই। কারণ তুমি ভগবান বিশ্বেশ্বর শিবকে পূর্বে দর্শন করেছ, তাঁর বন্দনা করেছ এমন কি তাঁকে স্পর্শও করেছ। জগতে তোমার তুল্য আর কে আছে? সেই কর্মের ফলেই তুমি এখানে আসতে পেরেছ। এখন সমাহিত মনে এই কুণ্ডে স্নান কর, তাহলেই এই কুৎসিত যোনি থেকে সত্বর মুক্ত হতে পারবে।

দয়ালু মুনির এই কথায় পিশাচ ত্রিনয়ন দেবদেব ঈশিতা কপর্দীশ্বরকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে স্নান করল। অবগাহনের পর পিশাচ মুনির সামনেই প্রাণত্যাগ করল। আর তৎক্ষণাৎ সূর্যের মতো এক বিমানে দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত চন্দ্রাঙ্কিতশীর্ষ রূপ ধারণ করে সে দেখা দিল। উদয়ের সময়ে অশেষদেব সূর্য বাল্যখিল্য মুনি পরিবৃত হয়ে যেমন শোভা পান, স্বর্গস্থ রুদ্রগণ ও অসংখ্য যোগীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেই পিশাচও সেই রকম শোভা পেতে লাগল। স্বর্গে দেববৃন্দ এবং সিদ্ধেরা তার স্তব করতে লাগলেন, মনোহর দিব্য অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগল এবং গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ তার উপর ভ্রমরমিশ্রিত পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। তারপর শ্রেষ্ঠ মুনিগণ এই রকম স্তব করলে সেই পিশাচ ভগবানের অনুগ্রহে পরমাত্মবোধ লাভ করে সর্বপ্রধান ত্রয়ীময় মণ্ডলে প্রবেশ করল। সেখানে রুদ্র বিরাজ করেন। সেই মুনি ভূতযোনি পিশাচকে মুক্তি পেতে দেখে পুলকিত হয়ে মনে মনে শ্রেষ্ঠ কবি রুদ্র মহেশকে চিন্তা করতে লাগলেন ও কপর্দীশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। শঙ্কুকর্ণ বললেন—যিনি প্রধানের চেয়েও প্রধান, একমাত্র ত্রাতা, সেই পুরাণপুরুষকে আমি নিত্য প্রণাম করি। আমি সেই ঈশিতা যোগেশ্বরকেই আশ্রয় করছি। তিনি আদিত্য অগ্নি ও গহনবাসী। হে দেব, তুমি ব্রহ্মপার, তুমি সকলের হৃদয়ে নিহিত। তুমি হিরন্ময়, যোগী, আদিবিহীন। আমি তোমারই শরণ নিচ্ছি। হে রুদ্র, তুমি সকলের শরণ্য, স্বর্গস্থিত মহামুনি, তুমি ব্রহ্মময় ও পবিত্র। আমি তোমারই শরণ নিলাম। হে দেব, তোমার সহস্র চরণ, সহস্র নেত্র, সহস্র মস্তক এবং সহস্র বাহু। তুমি তমোগুণের অতীত, ব্রহ্মপার, হিরণ্য গর্ভাধিপতি ও ত্রিনয়ন। হে শম্ভু, তোমাকে নমস্কার করি। যাঁর থেকে এই জগৎ জাত হয়েছে, যাঁর থেকে এই জগৎ লয় পেয়েছে, যে শিব সমস্ত পদার্থকে একত্র সঞ্চিত করেছেন, সেই ব্রহ্মপার ভগবান

মহেশ্বরকে প্রণাম করে আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করছি। তিনিই জগতের শরণ্য এবং নিত্য। হে রুদ্র, তুমি অলিঙ্গ, তুমি আলোকহীন, স্বয়ংপ্রভ, চিৎসদৃশ, একমাত্র রুদ্র। আমি তোমাকে নমস্কার করি। তোমার পারে আর কিছুই নেই। তুমি ব্রহ্মপার, পরমেশ্বর। যোগীরা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে সবীজযোগ পরিত্যাগ করে যাঁকে দর্শন করেন ও তার ফলে পরমাত্মার তুল্য হন, হে দেব, আমি তোমার সেই ব্রহ্মপার স্বরূপকে নিত্য প্রণাম করি। যাঁর নাম নেই, বিশিষ্ট তৃপ্তি নেই, স্বরূপও নেই, সেই ব্রহ্মপার শিবকে আমি নিত্য প্রণাম করি. সেই শরণ্য, স্বয়ম্ভূ, মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। যারা বৈদিক জ্ঞানে নিরত, তারা নিজেদের দেহহীন, অদ্বিতীয়, অভিন্ন ও ব্রহ্মবিজ্ঞানী বলে অনুভব করেন এবং নিজেদের নানা প্রকার স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারেন। হে দেব, তুমি ব্রহ্মপার, তোমাকে সতত প্রণাম করি। যাঁর থেকে প্রকৃতি ও পুরাণপুরুষ উৎপন্ন হয়েছেন এবং দেবতারা যাঁকে প্রণাম করেন, সেই জ্যোতি-সন্নিবিষ্ট বৃহৎ কালস্বরূপ তোমার স্বরূপকে নমস্কার করি। নিত্য, শরণ্য, মহেশ্বর. স্থাণু, পুরাতন গিরিশকে আমি আশ্রয় করি। চন্দ্রচূড়, শিব, হর, পিনাকীর আমি শরণ নিই। শঙ্কুকর্ণ ভগবান কপর্দীশ্বরকে এই ভাবে স্তব করতে করতে এবং শিবময় ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। তৎক্ষণাৎ এক অদ্বৈত জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ, কোটি কালাগ্নির সদৃশ শিবাত্মক পরমলিঙ্গ আবির্ভূত হল। তখন ধর্মাত্মা সর্বত্রগামী, নির্মল শঙ্কুকর্ণ প্রাণত্যাগপূর্বক সেই বিমল লিঙ্গে লীন হয়ে গেলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কপর্দীশ্বরের এই গোপনীয় মাহাত্ম্যের কথা বললাম। তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকার ফলে কেউই এ কথা বুঝতে পারে না। এমন কি এ কথা বুঝতে গিয়ে বিদ্বান লোকেরও মোহ উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপবিমুক্ত হয়ে মহাদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে পবিত্র হয়ে প্রতিদিন এই ব্রহ্মপার মহাস্তব পাঠ করেন, তিনি যোগ লাভ করে থাকেন। এখানেই আমি দেবদেব কপর্দীশ্বরের কাছে সর্বদা অবস্থান করব, সর্বদা তাঁকে দর্শন করব, আর ত্রিলোচনকে পূজা করব—এই কথা বলে মুক্তাত্মা, মহামুনি ভগবান বেদব্যাস শিষ্যদের সঙ্গে সেখানেই বাস করে কপর্দীশ্বরের পূজা করতে লাগলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, ভগবান প্রভু বেদব্যাস কপর্দীশ্বরের কাছে অনেক দিন কাটিয়ে মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করতে গেলেন। সেখানে সেই মহামুনি স্বচ্ছসলিলা, ঋষিগণসেবিতা, পবিত্রা মন্দাকিনীকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। দ্বৈপায়ণ মুনির অন্তর ভাবে আপ্লুত হল। তিনি স্নানের নিয়মাবলী জানতেন। মন্দাকিনীকে দেখে তিনি মুনিদের সঙ্গে সেখানে স্নান করলেন. যথাবিধি দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ শেষ করে নানা প্রকার পুষ্প দিয়ে লোকস্রষ্টা মহেশ্বরের পূজা করলেন। তারপর সত্যবতীনন্দন শিষ্যদের সঙ্গে মধ্যমেশ্বর দেবের মন্দিরে প্রবেশ করে শূলী মহেশ্বরের পূজা করলেন। তখন শান্ত ভস্মাচ্ছাদিতগাত্র পাশুপতগণ ভগবান মধ্যমেশ্বর দেবকে দেখতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কারো জটা আছে, কেউ বা মুণ্ডিত মস্তক, কারো পরনে কৌপীন, কেউ বা দিগম্বর।

কিন্তু সকলেই ওঙ্কারের প্রতি একাগ্রচিত্ত, বেদাধ্যয়ননিরত, পবিত্র যজ্ঞোপবীতধারী, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, শান্ত, সংযত ও জ্ঞাননিষ্ঠ। হে বিপ্রগণ, তারা শিষ্যপরিবৃত দ্বৈপায়ন মুনিকে দেখে যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন এবং এই কথা বলতে লাগলেন, হে মহামুনি, আপনি কে? কোথা থেকে শিষ্যদের সঙ্গে এসেছেন? তখন পৈল প্রমুখ শিষ্যগণ ব্রহ্মভাবে ভাবিত সেই ঋষিদের বললেন, যিনি চারটি বেদকে পৃথক রূপে বিন্যস্ত করেছেন, যাঁর পুত্ররূপে সাক্ষাৎ দেবদেব পিনাকপাণি মহেশ্বর শুক নামে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে পূর্ণ অনুরাগের সঙ্গে স্বয়ং মহাদেব শঙ্করকে আশ্রয় করেছেন এবং যাঁর সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান রয়েছে, ইনিই সেই সত্যবতীনন্দন স্বয়ং হৃষীকেশ প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস। তখন সেই পাশুপতগণ আনন্দে পুলকিত হয়ে সংযতচিত্ত সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবকে বললেন, আপনি পরমেষ্ঠী দেবদেবের প্রসাদে যে পরম মাহেশ্বর বিজ্ঞান লাভ করেছেন, সেই স্থির গুহ্যতম উৎকৃষ্ট রহস্য আমাদের বলুন। আপনার মুখ থেকে সে-কথা শুনলে আমরা শীঘ্রই সেই দেবদেবকে দর্শন করতে পারব। শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্ বেদব্যাস সুমন্তু প্রমুখ শিষ্যদের বিদায় দিয়ে ঐ যোগীদের কাছে সেই পরমজ্ঞানের কথা বললেন। তৎক্ষণাৎ এক অমল জ্যোতি উৎপন্ন হল এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তাতেই লীন হয়ে গেলেন। পরে ক্ষণেকের মধ্যে সেই জ্যোতির অন্তর্ধান ঘটল। তারপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ বেদব্যাস পৈল প্রমুখ শিষ্যদের আহ্বান করে মধ্যমেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা বলতে লাগলেন, স্বয়ং মহাদেব রুদ্র এখানে পার্বতী আর গণদেবতাদের সঙ্গে মিলে ক্রীড়া করেন। পূর্বে দেবকীনন্দন বিশ্বাত্মা হৃষীকেশ কৃষ্ণ পাশুপতব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভস্মলিপ্ত দেহে রুদ্রের আরাধনায় একাগ্র হয়ে পাশুপতদের সঙ্গে মহাদেবের পূজা করার মানসে এই স্থানে এক বৎসর বাস করেছিলেন। ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ বহু শিষ্য তাঁর বাক্যে জ্ঞান লাভ করে মহেশ্বরকে দর্শন করেছিল। ভগবান নীললোহিত বরদাতা মহাদেব দেখা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন, হে জগন্ময় গোবিন্দ, আমার যে সব ভক্ত বিধিমত আরাধনা করবে, তারা সেই ঐশ্বর জ্ঞান লাভ করবে। আপনিই ঈশ্বর। আমার ভক্ত দ্বিজাতিরা আমার অনুগ্রহে নিশ্চয় আপনার পূজা ও ধ্যান করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যারা স্নান করে পিনাকপাণি মহাদেবকে দর্শন করেন তাদের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ সত্বর বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রগণ, পাপাসক্ত ব্যক্তিরাও যদি এখানে প্রাণত্যাগ করে, তবে তারাও পরমপদ লাভ করে থাকে। এ কথা বিচারের অপেক্ষা রাখে না। হে বিপ্রগণ, যারা মন্দাকিনীতে স্নান করে শ্রেষ্ঠ মধ্যমেশ্বরের পূজা করেন, তারাই ধন্য। হে বিপ্রগণ, এখানে কেউ স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটির অনুষ্ঠান করলে তার সপ্তমকুল পর্যন্ত শুদ্ধ হয়। সূর্য রাহুগ্রস্ত হলে মানুষ সন্নিহতীতে স্নান করে যে ফল লাভ করে, এখানে স্নান করলে তার দশ গুণ ফল লাভ হয়। এই কথা বলে মহাযোগী মধ্যমেশ্বরের পূজা করে সেখানে দীর্ঘকাল কাটালেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

এর পর ভগবান বেদব্যাস জৈমিনি প্রমুখ শিষ্যদের সঙ্গে গোপনীয় সমস্ত তীর্থ ও মন্দিরে গমন করেছিলেন। হে দ্বিজগণ, তিনি যে সব তীর্থে গিয়েছিলেন, তাদের নাম হল পরমতীর্থ প্রয়াগ, প্রয়াগের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও শুভ বিশ্বরূপতীর্থ, শ্রেষ্ঠ কালতীর্থ, মহা-

তীর্থ আকাশ, প্রধান ঋষভতীর্থ, স্বর্লোকে লীন মহাতীর্থ, অনুত্তম গৌরীতীর্থ, প্রাজাপত্য তীর্থ, স্বর্গদ্বার তীর্থ, জম্বুকেশ্বর, উত্তম চর্মতীর্থ, গয়াতীর্থ, মহাতীর্থ, মহানদী তীর্থ, প্রধান নারায়ণ তীর্থ, শ্রেষ্ঠ বায়ুতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, অতি গোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ বারাহতীর্থ, মহাপবিত্র সমতীর্থ, পরমতীর্থ সংবর্তক, অগ্নিতীর্থ, উত্তম কালকেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, সোমতীর্থ সূর্যতীর্থ, মহাপুণ্য পর্বততীর্থ, উত্তম মণিকর্ণতীর্থ, শ্রেষ্ঠ-তীর্থ, ঘটোৎকচ, শ্রীতীর্থ, পিতামহতীর্থ, গঙ্গাতীর্থ, দেবীশতীর্থ, উত্তম যযাতি তীর্থ, কাপিল তীর্থ, সোমেশ তীর্থ ও ব্রহ্মতীর্থ। এই ব্রহ্মতীর্থে পূর্বকালে ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ এনে স্নানের জন্য গমন করলে বিষ্ণু সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। স্নানের পর ব্রহ্মা এসে হরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই লিঙ্গ আমি এনেছি, তুমি কি জন্য এর প্রতিষ্ঠা করলে? বিষ্ণু বললেন, রুদ্রের প্রতি আপনার চেয়ে আমার ভক্তি প্রগাঢ়, তাই আমি এটির প্রতিষ্ঠা করেছি। যাই হোক, এই লিঙ্গ আপনার নামেই প্রসিদ্ধ হবে। এর পর ভূতেশ্বর তীর্থ, ধর্মসমুদ্ভব তীর্থ, গন্ধর্বতীর্থ, সশুভতীর্থ, উত্তম বাহেয় তীর্থ, দৌর্বাসিক সোমতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, পুণ্য চিত্রাঙ্গদেশ্বর তীর্থ, পুণ্যদায়ক বিদ্যাধরেশ্বর তীর্থ, কেদারতীর্থ, উগ্র-তীর্থ, অনুত্তম কালঞ্জর, সারস্বত, প্রভাস, ভদ্রকর্ণ, মহাতীর্থ লৌকিক, হিমালয় হিরণ্যগর্ভ, গোপ্রখ্য, বৃষধ্বজ, উপশান্ত, শিব, শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রেশ্বর, মহাতীর্থ ত্রিলোচন, লোলার্ক, উত্তরা-হবয়, কপালমোচন নামে ব্রহ্মহত্যা বিনাশক তীর্থ, মহাপুণ্য শক্রেশ্বর, উত্তম আনন্দপুর ও অন্যান্য তীর্থে গমন করেছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, সমস্ত তীর্থের সংখ্যা বিশদভাবে বলতে পারব না। তাই প্রধান প্রধান এই সমস্ত তীর্থের নাম উল্লেখ করলাম। পরাশর-নন্দন মহামুনি বেদব্যাস উপবাস করে সেই সব তীর্থে স্নান করেছিলেন ও মহাদেবের পূজা করেছিলেন। তিনি দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমাপন করে যেখানে বিশ্বেশ্বর শিব রয়েছেন, সেখানেই গমন করলেন। ধর্মাত্মা সেই মহামুনি সেই মহালিঙ্গের পূজা করে শিষ্যদের বললেন, তোমরা এখন নিজেদের ইচ্ছামত গমন করতে পারো। পৈল প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা বেদব্যাসকে প্রণাম করে চলে গেলেন এবং মহাত্মা বেদব্যাস বারাণসীতেই চিরদিনের জন্য বাস করতে লাগলেন। শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা ও ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ হয়ে তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করতেন, মহাদেবের আরাধনা করতেন ও নিজে ভিক্ষা করে আহার করতেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, অমিততেজা বেদব্যাস কাশীতে থাকার সময় একদিন ভ্রমণ করতে করতে ভিক্ষা পেলেন না। তখন ক্রোধান্বিত দেহে বলতে লাগলেন, এখানকার সমস্ত অধিবাসীদের আমি এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করব, যাতে তাদের সব সিদ্ধি নষ্ট হয়। এমন সময় শংকরের অর্ধশরীরিণী মহাদেবী মানুষের ছদ্ম-বেশে আবির্ভূতা হয়ে প্রীতির সঙ্গে বললেন, হে মহাবুদ্ধি ব্যাস, তুমি এই নগরীকে শাপ দিও না। আমার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ কর। এই কথা বলে ভগবতী তাঁকে ভিক্ষা দিলেন এবং বললেন, মুনি, তুমি কোপনস্বভাব। এই বারাণসী ক্ষেত্রে তুমি থেকো না, কারণ তুমি সর্বদাই কৃতঘ্ন। এই কথা শুনে ভগবান বেদব্যাস ধ্যানবলে তাঁকে পরমা মহেশ্বরী বলে জানতে পারলেন। তখন তিনি প্রণত হয়ে শ্রেষ্ঠ স্তোত্র দ্বারা তাঁকে স্তব করে বললেন, হে শংকরী, চতুর্দশী আর অষ্টমী তিথিতে আমাকে বারাণসীতে প্রবেশের অনুমতি দিন। ভগবতী বললেন, তাই দিলাম—তারপর অন্তর্ধান করলেন। মহাযোগী পুরাতন পুরুষ ভগবান বেদব্যাস কাশীক্ষেত্রের সমস্ত গুণের কথা অবগত হয়ে তার এক পার্শ্বে অবস্থান করেছিলেন বলেই পণ্ডিতগণ কাশীক্ষেত্রের সেবা করে থাকেন। তাই

মানুষ মাত্রেরই সর্বপ্রথমে বারাণসীতে বাস করা উচিত। সূত বললেন, যে ব্যক্তি কাশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অথবা স্বয়ং পাঠ করে কিংবা শান্ত ব্রাহ্মণদের শ্রবণ করায় সে পরমা গতি লাভ করে। হে দ্বিজগণ, স্নানান্তে সমাহিত চিত্তে কাম-ক্রোধশূন্য হয়ে শ্রাদ্ধকালে দৈবকার্যের সময়, রাত্রিতে, দিনে, নদীতীরে বা দেবালয়ে বসে মহেশ্বরকে প্রণামপূর্বক যে ব্যক্তি কাশীমাহাত্ম্য পাঠ করে সে প্রকৃষ্ট গতি লাভ করে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বারাণসী-মাহাত্ম্য নামে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বললেন, হে সুব্রত সূত, তুমি কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের কথা যথাযথ ভাবে বলেছ। এখন প্রয়াগের মাহাত্ম্যের কথা বল। হে সূত, তুমি সর্বার্থদর্শী। তাই প্রয়াগে যে সমস্ত বিখ্যাত মহাতীর্থ রয়েছে, সেগুলির কথা আমাদের বল। সূত বললেন, যেখানে পিতামহ ব্রহ্মা বিরাজ করছেন, সেই প্রয়াগক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিশদভাবে বলছি, শুনুন। মার্কণ্ডেয় মুনি মহাত্মা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এ কথা যেভাবে বলেছিলেন, আমি সেই ভাবেই আপনাদের বলছি। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত কৌরবদের বিনাশ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর নিদারুণ শোক উপস্থিত হল। তারপর মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি অল্পকালের মধ্যেই হস্তিনাপুরে এলেন ও রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। দ্বারপাল তাঁকে আসতে দেখেই শীঘ্র গিয়ে রাজাকে জানাল, মার্কণ্ডেয় মুনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সত্বর দ্বারদেশে এসে সমাগত মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলতে লাগলেন, হে মহামুনি, আপনাকে স্বাগত জানাই। আজ আমার জন্ম সার্থক হল, আজ আমার কুলের উদ্ধার হল, আজ আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন। কারণ আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। যুধিষ্ঠির মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনিকে সিংহাসনে বসিয়ে পাদপ্রক্ষালন এবং অর্চনা প্রভৃতির দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির মুনিকে কুশল প্রশ্ন করলে মুনি রাজাকে বললেন, হে বিদ্বান, আপনি কেন মোহগ্রস্ত হয়েছেন? আমি সমস্ত জেনেই আপনার কাছে এসেছি। তখন রাজা যুধিষ্ঠির মাথা নত করে প্রণামপূর্বক তাঁকে বললেন, আমি কি উপায়ে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি সে-কথা আমাকে সংক্ষেপে বলুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমরা যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু নিরপরাধ মানুষকে কৌরবদের সঙ্গে হত্যা করেছি। সেই পার্থিব হিংসা থেকে জাত আর জন্মান্তরকৃত পাপ থেকে যাতে মুক্ত হতে পারি, আজ সেই কথাই বলুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, হে মহাভাগ রাজন ভারত, আপনি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তার উত্তরে আমি জানাতে পারি যে মানুষের পক্ষে প্রয়াগে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ। সেখানে গেলে মানুষের সব পাপ বিনষ্ট হয়। কারণ দেবগণের ঈশ্বর মহাদেব রুদ্র ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সকল দেবতার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবন, প্রয়াগ যাত্রার ফল কি, তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। যারা সেখানে মৃত্যুবরণ করে তাদেরই বা কী গতি হয়? সেখানে যারা স্নান করে ও বাস করে তাদেরই বা কী ফল হয়? এ সব কথা আমাকে বলুন। হে দেব, এ সবই আপনার জানা আছে। আমি আপনার কাছে প্রণত। আমাকে এ-সব কথা বলুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, বৎস, প্রয়াগ-স্নানের ফলের কথা বলি, শুনুন। পূর্বে মহর্ষিদের কাছে শুনেছি যে এটিই

ত্রিভুবনের মধ্যে প্রজাপতির ক্ষেত্র বলে বিখ্যাত। এখানে স্নান করলে লোকে স্বর্গে যায়। যারা এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাদের পুনর্জন্ম হয় না। সেই ক্ষেত্রে ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা সকলে মিলিত হয়ে অন্য বহু সর্বপাপনাশক তীর্থের রক্ষা করেন। শত শত বৎসরেও প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শেষ করতে পারব না। তাই সংক্ষেপে এর মাহাত্ম্যের কথা বলব। প্রয়াগের আয়তন ষাট হাজার ধনু। সেখানে প্রবাহিত হচ্ছেন গংগা ও যমুনা। সপ্তবাহন সবিতা এর রক্ষক। বিশেষত প্রয়াগক্ষেত্রে স্বয়ং ইন্দ্র বাস করেন এবং হরি সমস্ত দেবগণের সংগে মিলিত হয়ে মণ্ডল রক্ষা করেন। শূলপাণি মহেশ্বর সেখানকার বটবৃক্ষের নিত্য রক্ষা করছেন। সমস্ত দেবতা সেই পবিত্র সর্বপাপহর স্থানের রক্ষা করেন। রাজন, নিজ নিজ কর্মফলে আবৃত থাকার ফলে সব লোকই প্রয়াগ যেতে পারে না। যার পাপ অতি অল্প; সে যদি প্রয়াগতীর্থকে স্মরণ করে, তাহলে তার সব পাপ বিনষ্ট হয়। সেই তীর্থ দর্শন করলে বা তার নাম সংকীর্তন করলে আর গাত্রে তার মৃত্তিকা লেপন করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র, প্রয়াগে পাঁচটি কুণ্ড আছে। জাহ্নবী তাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন। প্রয়াগে প্রবেশ করলেই মানুষের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সহস্র যোজন দূর থেকেও গংগাকে স্মরণ করে, পাপাচারী হলেও সে সদ্গতি লাভ করে। গংগার নামকীর্তন করলে লোকে পাপ থেকে মুক্ত হয় আর গংগা দর্শন করলে মানুষের মংগল হয়। রাজেন্দ্র, যে ব্যক্তি গংগায় স্নান করে, সে দেবলোকে পূজা পায়। শ্রেষ্ঠ মুনিরা বলেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র অথবা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও যদি গংগা-যমুনার সংযোগস্থলে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে সে সর্বপ্রকার ইষ্টলাভ করে। সে উজ্জ্বল সুবর্ণতুল্য সূর্যের মতো দীপ্তিময় বহু ধ্বজায় সজ্জিত, বরনারী-শোভিত সুলক্ষণ বিমানে আরোহণ করে সুখভোগ করে। নিদ্রিত হলে সেই ব্যক্তির গীতবাদ্যের ধ্বনিতে জাগরণ হয় না। যত দিন না তার জন্মের কথা মনে পড়ে, তত দিন সে স্বর্গে পূজা পায়। সেই মানুষের কর্মফল ক্ষয় হলে সে স্বর্গচ্যুত হয়ে সুবর্ণরত্নাদিতে সমৃদ্ধ কুলে জন্মলাভ করে। কিন্তু সে আবার সেই তীর্থকেই স্মরণ করে ও তার ফলে সেইখানেই গমন করে। শ্রেষ্ঠ মুনিরা বলেন, দেশে হোক, বিদেশে হোক, গৃহে হোক, অরণ্যে হোক যে ব্যক্তি প্রয়াগতীর্থ স্মরণ করতে করতে প্রাণত্যাগ করে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। আর যেখানকার ভূতল সুবর্ণময়, যেখানে কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান, যেখানে মুনি-ঋষিরা ও সিদ্ধগণ বাস করেন, সেই লোকে সে গমন করে। নিজের সুকৃতির ফলে দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ আর গন্ধর্বদের পূজা পেয়ে সহস্র রমণীসমাকুল, পবিত্র সুন্দর মন্দাকিনী তীরে সে মুনিদের সঙ্গে ক্রীড়া করে। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে সে জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয় ও বারবার সৎকার্যের চিন্তা করতে করতে কায়মনোবাক্যে সত্যধর্মে নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও গুণবান হয়ে ওঠে। কোন ব্যক্তি যদি নিজের কার্যে, পিতৃকার্যে অথবা দেবপূজাকালে গঙ্গা-যমুনার সংগমে সুবর্ণ, ভূমি, মুক্তা বা অন্য কোন ধন গ্রহণ করে তাহলে যত দিন সেই ধন সে ভোগ করে তত দিন তার সমস্ত তীর্থকর্ম নিষ্ফল হয়। অতএব ওই পবিত্র স্থানে দান গ্রহণ করতে নেই। যে কোন কারণ ঘটুক না কেন, ব্রাহ্মণকে অপ্রমত্ত থাকতে হয়। হে সত্তম, যদি কোন ব্যক্তি এই স্থানে পাটলবর্ণা, কপিলা বা কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী গাভীর শৃংগ স্বর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করে তার গলদেশ চেলিতে আবৃত করে দান করে তাহলে সেই ধেনুর গাত্রে যত সংখ্যক

রোম থাকে, সেই ব্যক্তি তত সহস্র বৎসর রুদ্রলোকে বাস করে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যবিষয়ে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, আর্যবিধান অনুসারে যেমন তীর্থযাত্রার বিধি দেখেছি বা শুনেছি তেমন করেই আপনাকে বলছি। যদি কোন মানুষ প্রয়াগতীর্থে যাত্রার মানসে বৃষে আরোহণ করে গমন করে তার ফলের কথা বলি শুনুন। দশ হাজার একশো কল্প সে ঘোর নরকে বাস করে। তারপর যখন সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন তার প্রতি গোজাতির ভয়ংকর তীব্র ক্রোধ দেখা যায়। পিতৃগণ সেই ব্যক্তির জলগ্রহণ করেন না। ঐশ্বর্যের আধিক্যে অথবা লোভের বা মোহের বশে যে মানুষ যান আরোহণ করে তীর্থে যায়, তার সেই তীর্থযাত্রা নিষ্ফল হয়। তাই যান পরিত্যাগ করবে। যিনি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে আর্যবিধান অনুসারে সামর্থ মতো বৈভব দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন, সেই কর্মফলের দ্বারা তিনি নরক দর্শন থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। তিনি উত্তরকুরুবর্ষে গিয়ে অনন্ত আনন্দে কাল অতিবাহিত করেন। যিনি প্রয়াগের বটমূলে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি দেবলোকও অতিক্রম করে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। যেখানে ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ, দিকপালদের সঙ্গে দিকসমূহ, লোকপালগণ, পিতৃলোকস্থ পিতৃগণ, সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিগণ এবং অন্যান্য ব্রহ্মর্ষি, নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, ভগবান বিষ্ণু প্রজাপতিকে সম্মুখে রেখে যেখানে অবস্থান করছেন, হে নৃপবর, গঙ্গাযমুনার সেই সঙ্গমস্থলে রয়েছে ত্রিভুবনবিখ্যাত প্রয়াগ। তাকে পৃথিবীর জঘনস্থল বলা হয়। যিনি বিধি অনুসারে সেই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে স্নান করেন, তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা লভ্য ফল প্রাপ্ত হন। হে তাত, জননীর কথায় হোক, অন্য কারো কথায় হোক, আপনি প্রয়াগে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করবেন না। কুরুনন্দন, এই প্রয়াগে ষাট হাজার ও ষাট কোটি তীর্থের মিলন ঘটেছে। পরমাত্মার ধ্যানে একাগ্রচিত্ত সন্ন্যাসীর যে গতি লাভ হয়ে থাকে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যারা প্রাণত্যাগ করেন তাদেরও সেই গতি হয়। হে যুধিষ্ঠির, এই জগতে যেখানে সেখানে যারা বাস করছে, তারা জীবিতই নয়। যারা প্রয়াগ লাভ করতে পারে না, তারা তিন লোকেই বঞ্চিত হয়। এই পরমস্থান প্রয়াগতীর্থ দর্শনের ফলে রাহুগ্রাস থেকে চন্দ্রের মতো সর্ব পাপ থেকে মুক্তি হয়। যমুনার দক্ষিণ তীরে কম্বল ও অশ্বতর নামে দুই নাগ আছেন। সেখানে স্নান করলে, সেই জল পান করলে সর্বপাতক থেকে মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞানাধার মহাদেবের সেই স্থানে গমন করলে ঊর্ধ্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। সেখানে স্নান করলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়, প্রলয়কাল পর্যন্ত স্বর্গভোগ করে। রাজন, গঙ্গার পূর্বতীরে ত্রিভুবনপ্রথিত সর্বসামুদ্র নামে এক গহ্বর আর প্রতিষ্ঠান নামে এক নগরী আছে। ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ ব্যক্তি সেখানে তিন রাত্রি বাস করলে তার আত্মা সর্বপাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে ভাগীরথীর বাম পার্শ্বে হংসপ্রপতন নামে ত্রিজগৎ বিখ্যাত তীর্থ আছে। তাকে কেবল স্মরণ করলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয় আর যত দিন চন্দ্র সূর্য বর্তমান থাকেন তত দিন স্বর্গলোকে

পূজা পাওয়া যায়। রমণীয় উর্বশী পুলিনে সুবিস্তৃত হংসপাণ্ডুর ক্ষেত্রে যিনি প্রাণ ত্যাগ করেন তার কি ফল হয় শুনুন। রাজন, তিনি ষাট হাজার আর ষাট শত বৎসর পিতৃগণের সঙ্গে স্বর্গে বাস করেন। তারপর রমণীয় সন্ধ্যাবটে যদি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সংযতচিত্তে পবিত্র হয়ে উপাসনা করা যায়, তাহলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যিনি কোটিতীর্থে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি সহস্র কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন। সেখানে বহু তীর্থ আর তপোবনসমাকুলা ভগবতী গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছেন তাকেই সিদ্ধক্ষেত্র বলে জানবেন। এ বিষয়ে কোন বিতর্ক করবেন না। ভূমণ্ডলে মর্ত্যবাসীদের, পাতালে নাগলোককে আর সুরলোকে দেবতাদের পরিত্রাণ করেন বলে গঙ্গাকে ত্রিপথগা বলা হয়। যত দিন পুরুষের অস্থি গঙ্গায় বর্তমান থাকে, তত সহস্র বৎসর সে স্বর্গলোকে বাস করে। তীর্থগুলির মধ্যে পরমতীর্থ, নদীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠা নদী গঙ্গা সমস্ত মহাপাতকী জীবকেও মোক্ষ দান করেন। গঙ্গাকে অন্য সব স্থানে সহজে লাভ করা গেলেও হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর—এই তিন স্থানে গঙ্গা অত্যন্ত দুর্লভ। পাপাসক্ত চিত্তে যে জীবগণ গতি অন্বেষণ করে বেড়ায়, তাদের পক্ষে গঙ্গার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের উপায় আর নেই। সমস্ত পবিত্র পদার্থের চেয়েও পবিত্র, সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্যের চেয়েও মঙ্গলকারিণী শুভদা সর্বপাপনাশিনী গঙ্গা মহেশ্বরের জটা থেকে অবতরণ করেছেন। সত্যযুগে নৈমিষারণ্যই তীর্থসমূহের মধ্যে প্রধান, ত্রেতাযুগে পুষ্করই শ্রেষ্ঠ তীর্থ, দ্বাপরযুগে প্রশস্ত হল কুরুক্ষেত্র আর কলিযুগে গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বত্র গঙ্গার সেবা করবে। বিশেষ করে প্রয়াগে তো করবেই। রাজন, ভয়ানক কলিযুগে অন্য ঔষধ নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেই হোক আর ইচ্ছাপূর্বকই হোক, গঙ্গাতে যার জীবন ত্যাগ হয় তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন, তাকে আর নরকদর্শন করতে হয় না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে প্রয়াগমাহাত্ম্যবিষয়ে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় বলতে লাগলেন, হে যুধিষ্ঠির, ষাট হাজার ও ষাট শত তীর্থ মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে গমন করেন। শত সহস্র গাভী যথাবিধি দান করলে যে ফল হয়, মাঘ মাসে তিন দিন প্রয়াগে স্নান করলেও সেই একই ফল লাভ হয়ে থাকে। যিনি মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জনগণের শীত নিবারণের জন্য করীষাগ্নি অর্থাৎ ঘুটের আগুন জ্বালিয়ে দেন, তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর নীরোগ আর পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত হন। রাজন, তার শরীরে যত সংখ্যক রোমকূপ থাকে, তত সহস্র বৎসর তিনি স্বর্গলোকে পূজা পান। তারপর স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তিনি জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন এবং নানা কাম্য বস্তু উপভোগ করে পুনরায় সেই তীর্থ লাভ করেন। যিনি জগদ্বিখ্যাত গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে জলে প্রবেশ করেন, তিনি রাহুগ্রাসযুক্ত চন্দ্রের মতো সমস্ত রকম পাতক থেকে মুক্ত হন। এবং চন্দ্রলোকে গমন করে ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত বৎসর চন্দ্রের সঙ্গে সুখভোগ করেন। তারপর সেখান থেকে তিনি মুনি গন্ধর্ব অধ্যুষিত ইন্দ্রলোকে আগমন করেন। আবার সেই স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সমৃদ্ধ কুলে জন্মলাভ করেন। যিনি অধোদিকে মস্তক ও ঊর্ধ্বদিকে চরণদ্বয় স্থাপন করে জলধারা পান করেন তিনি শত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে পূজিত হন। হে রাজেন্দ্র, তারপর তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অগ্নিহোত্রী

হন। শেষে বিপুল ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে আবার সেই তীর্থসেবায় ব্রতী হন। যিনি নিজের অঙ্গ কর্তন করে পক্ষীদের দান করেন, পক্ষীরা যার মাংস ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির কি ফল হয় তাও শুনুন। তিনি শত সহস্র বৎসর চন্দ্রলোকে পূজিত হন। সেই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ধর্মশীল, গুণবান, সৌন্দর্যশালী, বিদ্বান, প্রিয়ভাষী রাজা হন। তারপর প্রচুর ভোগ্য উপভোগ করে আবার সেই তীর্থের সেবা করেন। যমুনার উত্তরে প্রয়াগের দক্ষিণে ঋণপ্রমোচন নামে এক পরম তীর্থের কথা বলা হয়েছে। সেখানে নাকি যে এক রাত্রি বাস করে স্নান করে সে ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্তি পায় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। এর ফলে সর্বদাই সে ঋণমুক্ত থাকে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে প্রয়াগমাহাত্ম্যবিষয়ে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় বললেন, সূর্যকন্যা ত্রিলোকপ্রথিতা ভগবতী যমুনা নদীরূপে এখানে এসেছেন। যে পথে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছেন যমুনাও সেই পথেই গমন করছেন। হে যুধিষ্ঠির, যাঁর নাম করলে সহস্র যোজন জুড়ে পাপের নাশ হয়, সেই যমুনায় স্নান করলে, তাঁর জল পান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়, সপ্তম কুল পর্যন্ত পবিত্র হয়। যমুনার দক্ষিণ তীরে বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ, সেখানে জীবন ত্যাগ করলে পরমা গতি লাভ হয়। যমুনার পশ্চিম ভাগে ধর্মরাজের অনবক নামে এক তীর্থের কথা বলা হয়েছে। সেখানে অবগাহন করলে স্বর্গলাভ হয়। যে সেখানে জীবন ত্যাগ করে তার পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে স্নান করে পবিত্র হয়ে যিনি ধর্মরাজের উদ্দেশে তর্পণ করেন, তিনি যে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দশ সহস্র তীর্থ আর অন্য দশ কোটি তীর্থ প্রয়াগে অবস্থান করেন এ কথা জ্ঞানীরা বলে থাকেন। স্বর্গ, ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ—এই তিন স্থানে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছেন। কিন্তু এক জাহ্নবী সেই সর্বতীর্থময়ী এ-কথা বায়ু বলেছেন। যেখানে ভগবতী গঙ্গা প্রবাহিতা, সেই দেশই প্রকৃত দেশ, সেই স্থানই তপোবন, তাই সিদ্ধক্ষেত্র। যেখানে দীপ্ত দেবাদিদেব মহেশ্বর মহাদেব লক্ষ্মীবল্লভের সঙ্গে নিত্য অবস্থান করেন, সেই গঙ্গাতীরই তীর্থ, সেই তপোবন, এই সত্য কথাটি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের, সাধুদের, নিজ পুত্রের, বন্ধুবর্গের এবং অনুগত শিষ্যের কানে জপ করবেন। এই কথাই ধন্য, এই পবিত্র কথায় স্বর্গলাভ হয়। এই কথাই মঙ্গলদায়ক, পুণ্য, রমণীয় আর পবিত্রকারী শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই গঙ্গাতীরই মহর্ষিদের অতি গোপনীয় ও পাপনাশক স্থান। এখানে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে শুচি হন, যিনি প্রতিদিন শুদ্ধ হয়ে পুণ্য তীর্থের কথা শ্রবণ করেন, তিনি জাতিস্মর হন ও স্বর্গে আনন্দে কাল অতিবাহিত করেন। শিষ্টমার্গের উপদেষ্টা সাধুরাই সেই সব তীর্থে গমন করেন। সুতরাং হে কৌরব্য, আপনি সেই সমস্ত তীর্থে স্নান করুন। আপনার যেন বিপরীত বুদ্ধি না হয়। এই কথা বলেই ভগবান মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে তাদের বর্ণনা করলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে মুনি পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতির সন্নিবেশ এবং গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থিতির কথা বলে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সূত বললেন, যিনি প্রাতঃকালে উঠে এ কথা শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিনি সর্ব পাপ

থেকে মুক্ত হয়ে রুদ্রলোকে গমন করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে প্রয়াগমাহাত্ম্যবিষয়ে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা এই কথা শুনে মহামুনি সূতকে পৃথিবী প্রভৃতির সন্নিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ হে সূত, স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টির বিষয়ে বর্ণনা করেছ, এখন এই ত্রিভুবনের কথা শুনতে ইচ্ছা হয়। যে সমস্ত সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, অরণ্য ও নদী রয়েছে যে রকম ভাবে সূর্য ও গ্রহগণ অবস্থান করছে, এরা সকলে যাকে আশ্রয় করে আছে, যে সমস্ত নৃপতি পুরাকালে এই পৃথিবী অধিকার করেছিলেন, এখন সেই সব কিছুর বৃত্তান্ত আমাদের বল। সূত বললেন, 'দেবাদিদেব প্রভাবশালী মতিমান অপ্রমেয় বিষ্ণুকে প্রণাম করে তাঁরই কথিত বৃত্তান্ত বলছি। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে যে পুত্রের কথা আগে বলেছি, তার প্রজাপতিতুল্য দশ পুত্র ছিল—আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এই নয়জন আর মহাবল পরাক্রান্ত জ্যোতিষ্মান ছিলেন তাঁদের মধ্যে দশম। তিনি ছিলেন ধার্মিক, দানশীল ও সর্বজীবে দয়াবান। মহাভাগ মেধা, অগ্নিবাহু আর পুত্র—এই তিনজন যোগনিষ্ঠ ও জাতিস্মর ছিলেন। তাই রাজ্যে তাঁদের মন বসল না। প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সাত পুত্রকে সাতটি দ্বীপে অভিষেক করলেন। রাজা আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের আর বপুষ্মানকে শাল্মলি দ্বীপের অধীশ্বর করে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। প্রভু প্রিয়ব্রত জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপের রাজা করলেন। দ্যুতিমানকে তিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজ্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। প্রিয়ব্রত ভব্যকে শাকদ্বীপের অধীশ্বর করলেন ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের সিংহাসনে বসালেন। পুষ্করাধিপতি সবনের মহাবীত ও ধাতকি নামে দুই পুত্র জন্মলাভ করেছিল। তারা দুজনেই পুত্রবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা মহাবীতের বর্ষকে মহাবীতবর্ষ এবং ধাতকির বর্ষকে ধাতকিখণ্ড বলা হয়। শাকদ্বীপের রাজা ভব্যের সাতটি পুত্র হয়েছিল—জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুশোত্তর, মোদাকি এবং মহাদ্রুম। প্রথম জন অর্থাৎ জলদের বর্ষকেই জলদবর্ষ বলা হয়, কুমারের বর্ষকে কৌমারবর্ষ বলে। তৃতীয় সুকুমারের নামে সুকুমার বর্ষ, চতুর্থ মণীচকের নামে মণীচক বর্ষ, পঞ্চম কুশোত্তরের নামে কুশোত্তর বর্ষ, ষষ্ঠ মোদাকির নামে মোদাক বর্ষ, আর সপ্তম মহাদ্রুমের নামে মহাদ্রুম বর্ষ হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর মহাদ্রুমের যে সমস্ত পুত্র হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথম কুশল, দ্বিতীয় মনোহর, তৃতীয় উষ্ণ, চতুর্থ পীবর, পঞ্চম অন্ধকার, ষষ্ঠ মুনি এবং সপ্তম দুন্দুভি।

তাদের নিজ নিজ নামে ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ শুভ বর্ষগুলি প্রসিদ্ধ হয়েছে। কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের মহাতেজস্বী সাতটি পুত্র হয়—উদ্ভেদ, বেণুমান, অশ্বরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর—এই ছয়জন আর সপ্তম হলেন কপিল।

হে সুব্রত ঋষিগণ, তাদের নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ বর্ষগুলি এই দ্বীপে বর্তমান আছে। এই ভাবেই অন্যান্য দ্বীপের বর্ষগুলিও হয়েছে বলে জানবেন। শাল্মলিদ্বীপের রাজা বপুষ্মানের যে পুত্রসমূহ জন্মলাভ করেছিল তাদের নাম—শ্বেত, হরিতা, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস—এই ছয়জন আর সপ্তম জনের নাম সুপ্রভ।

প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর মেধাতিথির সাতটি পুত্র। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়। তার অনুজেরা হলেন শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব।

প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপে ও শাকদ্বীপের কাছে বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ অনুসারে মুক্তির জন্য ধর্মের কথা বলা হয়েছে। জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর আগ্নীধ্রের মহাবল নয়টি পুত্র জন্মেছিল। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, তাদের নাম শুনুন—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাত, রম্য, হিরণ্বান, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল।

জম্বুদ্বীপের রাজা মহামতি আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে ন্যায্যভাবে নয় ভাগে বিভক্ত করে সেই পুত্রদের দিয়েছিলেন। নাভিকে পিতা দক্ষিণ দিকে হিমবর্ষ প্রদান করেন। তারপর তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূট বর্ষটি দিলেন। হরিকে পিতা তৃতীয নৈষধ বর্ষ দান করলেন। ইলাবৃতকে তিনি সুমেরু মধ্যস্থ ইলাবৃত বর্ষ ও রম্যকে নীলগিরিস্থিত নীলাচল বর্ষ দান করলেন। পিতা হিরণ্বানকে উত্তর দিকে শ্বেতবর্ষ আর কুরুকে শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ দান করলেন। সুমেরুর পূর্বভাগে যে বর্ষটি, সেটি দিলেন ভদ্রাশ্বকে, গন্ধমাদন বর্ষটি দিলেন কেতুমালকে। রাজা এই সমস্ত বর্ষে পুত্রদের অভিষিক্ত করে সংসারের অসারতা অনুভব করলেন, তারপর তপস্যার জন্য বনে গমন করলেন। যে মহাত্মা নাভি হিমবর্ষের রাজা হয়েছিলেন, তাঁর মহিষী মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে এক অতি সুদর্শন পুত্রের জন্ম হয়। ঋষভ থেকে শতপুত্রের জ্যেষ্ঠ মহাবীর ভরত জন্মলাভ করেন। সেই পৃথিবীপতি ঋষভ পুত্র ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থে গেলেন ও যথাবিধি তপশ্চর্যায় রত হলেন। তারপর নিরন্তর তীব্র তপস্যার ক্লেশে রাজা অত্যন্ত কৃশকায় হয়ে গেলেন। তিনি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে মহাপাশুপতে পরিণত হলেন। ভরতের সুমতি নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মেছিল, সুমতির তৈজস নামে এক পুত্র হয়। তার ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র হয়, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, তার পুত্র প্রতিহার, তার পুত্র বিখ্যাত প্রতিহর্তা, তার পুত্র ভব, ভবের পুত্র উদগীথ, উদগীথের পুত্র প্রস্তাবি, তার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের গয়, গয়ের বিরাট, বিরাটের মহাবীর্য, মহাবীর্যের ধীমান, ধীমানের মহান্ত, মহান্তের শৌবন নামে পুত্র হয়। তার ত্বষ্টা, ত্বষ্টার বিরজ, তার রজ, রজের শতজিৎ নামে পুত্র হয়। হে দ্বিজগণ, শতজিতের শত পুত্র, তার মধ্যে বিশ্বজ্যোতি প্রধানতম ও সবচেয়ে বিক্রমশালী বলে খ্যাত। ব্রহ্মার বরে বিশ্বজ্যোতির ক্ষেমক নামে পৃথিবীর অধীশ্বর, ধার্মিক, মহাবল ও শত্রুতাপন পুত্র লাভ হয়েছিল। পুরাকালে এই মহাবীর ও মহাতেজস্বী নরপতিদের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের বংশের রাজগণই পূর্বে এই পৃথিবী ভোগ করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসবিষয়ে
উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, এখন সংক্ষেপেই এই ত্রিভুবনের পরিমাণ বর্ণনা করব। বিশদভাবে বলবার সাধ্য আমার নেই। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক, তপোলোক, আর সত্যলোককে অণ্ডোদ্ভব বলে মনে করা হয়। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণজালে যত দূর উদ্ভাসিত হয়, তত দূর পর্যন্তই ভূলোক বলে

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডল থেকে ভূলোকও যতখানি সূর্যমণ্ডল থেকে ভূবর্লোকিও ঠিক ততখানি দূরে অবস্থিত। আকাশপথে উর্ধ্বদিকে যেখানে ধ্রুব নক্ষত্র রয়েছে, স্বর্গলোকের সীমা সেই পর্যন্তই। সেখানেই বায়ুচক্র বিদ্যমান। পর পর উর্ধ্বদিকে বায়ুর এই সাতটি চক্র রয়েছে—আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, পরাবহ ও পরিবহ। ভূমি থেকে লক্ষ যোজন উর্ধ্বদিকে সৌরমণ্ডল অবস্থিত। সূর্যমণ্ডল থেকে লক্ষ যোজন উর্ধ্বে আবার চন্দ্রমণ্ডল। তার থেকেও লক্ষ যোজন উর্ধ্বে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশিত হয়েছে। হে বিপ্রগণ, নক্ষত্রমণ্ডল থেকে দুই লক্ষ যোজন দূরে বুধমণ্ডল, তার দুই লক্ষ যোজন দূরে শুক্রমণ্ডল। ভৌমমণ্ডলও শুক্রমণ্ডল থেকে তত পরিমাণ দূরেই অবস্থিত। ভৌমমণ্ডল থেকে দুই লক্ষ যোজন দূরে দেবগুরু বৃহস্পতির মণ্ডল। গ্রহগুরুর মণ্ডল থেকে দুই লক্ষ যোজন দূরে রয়েছে সৌরি, তার থেকে এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষি-মণ্ডল। ঋষিদের এই মণ্ডল থেকে মাত্র এক লক্ষ যোজন উর্ধ্বে ধ্রুব রয়েছে। ধ্রুব সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ। সেখানে বিশ্বব্যাপী ভগবান নারায়ণ ধর্ম অবস্থান করছেন। সূর্যের ব্যাস নয় হাজার যোজন, এই ব্যাসের তিন গুণ হল মণ্ডলের পরিমাণ। সূর্যের বিস্তারের চেয়ে চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ। চন্দ্র ও সূর্যমণ্ডলের তুল্য রাহুমণ্ডল এদের নিম্নদেশে ঘূর্ণিত হয়। পৃথিবীর ছায়াকে অবলম্বন করে মণ্ডলাকারে কল্পিত রাহুর তৃতীয় যে বৃহৎ স্থানটি আছে, সেটি অন্ধকারময়। চন্দ্রের বিস্তারের ষোল ভাগের একভাগ শুক্রের বিস্তার, বৃহস্পতিব বিস্তার শুক্রের চেয়ে এক চতুর্থাংশ কম, বৃহস্পতির চেয়ে আবার এক চতুর্থাংশ কম হল শনি ও মঙ্গলের বিস্তার। এই দুটি গ্রহের চেয়ে বুধের বিস্তার এক চতুর্থাংশ কম। তারা ও নক্ষত্ররূপী জ্যোতিষ্কগুলির মণ্ডল ও বিস্তার বুধের তুল্য। তারা ও নক্ষত্ররূপী যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আছে তাদের একটির চেয়ে অন্যটি আকারে ক্ষুদ্র। তারা কেউ পাঁচ শত, কেউ চার শত, কেউ তিন শত, বা দুই শত যোজন দূরে অবস্থিত। তারামণ্ডলগুলিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাদের মণ্ডল ও বিস্তার আধ যোজন মাত্র। তাদের চেয়ে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর নেই। এদের উপরিভাগে দূরভ্রমণকারী শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল—এই তিনটি গ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহগুলির গতি ধীর। এদের নিম্নদেশে অন্য চারটি মহাগ্রহ রয়েছে—সূর্য, চন্দ্র, বুধ আর শুক্র। এরা শীঘ্রগামী গ্রহ। যে সময়ে সূর্য দক্ষিণায়ণে থাকেন, তখন পূর্ব গ্রহগুলির মধ্যে সূর্যই নিম্নদেশে ভ্রমণ করেন। তার উর্ধ্বভাগে চন্দ্র বিস্তৃত মণ্ডলের আকারে বিচরণ করেন। সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল আবার চন্দ্রের উর্ধ্বদেশে বিচরণ করে। নক্ষত্রমণ্ডলের উর্ধ্বে বুধ, বুধের উর্ধ্বে শুক্র, শুক্রের উর্ধ্বে মঙ্গল, মঙ্গলের উর্ধ্বে বৃহস্পতি ভ্রমণ করেন। তার উর্ধ্বে শনি, শনির উর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষির উপরিভাগে ধ্রুব অবস্থিত। সূর্যের রথের বিস্তার নয় হাজার যোজন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তার ঈষাদণ্ডের পরিমাণ আবার এর দ্বিগুণ। এই রথের অক্ষ পঞ্চাশলক্ষ সত্তর হাজার যোজন, তাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ঐ চক্রের তিনটি নাভি, পাঁচটি অর, ছয়টি নেমি। এইভাবে সংবৎসরময় সমগ্র কালচক্র বিরাজ করছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, রথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ হল পঞ্চষষ্টি যোজন। অক্ষের যা পরিমাণ, দুটি যুগার্ধের পরিমাণও তাই। যুগার্ধের সঙ্গে আবদ্ধ রজ্জুর হ্রস্ব অক্ষটি ধ্রুবতারার আধার। দ্বিতীয় অক্ষে মানসাচলে সেই চক্র অবস্থিত। সাতটি ছন্দই তার সাতটি অশ্ব। তাদের নাম শুনুন—গায়ত্রী, বৃহতী উষ্ণিক, জগতী, পঙ্‌ক্তি, অনুষ্টুপ, ও ত্রিষ্টুপ। এরা সূর্যের অশ্ব। মানস পর্বতের ওপরে পূর্ব দিকে ইন্দ্রের বিশাল পুরী, দক্ষিণে যমের,

পশ্চিমে বরুণের, উত্তরে সোমের পুরী। ঐ পুরীগুলির নাম বলি শুনুন—অমরাবতী, সংযমনী, সুখা ও বিভাবরী। দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মা জ্যোতিশ্চক্র নিয়ে দক্ষিণদিকে বিক্ষিপ্ত তীরের মতো ভ্রমণ করেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, সর্বকালে সমস্ত দ্বীপেই সূর্য দিবসের মধ্যে ব্যবস্থিত থাকেন। রাত্রির অর্ধ ভাগে তিনি সম্মুখভাগে অবস্থান করেন। সব সময়ই সমস্ত দিকে ও বিদিকে সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্মুখে ঘটে থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ, এই ভগবান দিবাকর কুলালচক্রের অর্থাৎ কুমোরের চাকের মতো পরিভ্রমণ করতে করতে পৃথিবীকে ছেড়ে দিবা ও রাত্রি সম্পাদন করেন। হে মুনিগণ, সূর্যের করে এই ত্রিভুবন পরিপূর্ণ। এ কথা সাধুগণ বলেছেন। এই সমস্ত ত্রিজগতের মূল আদিত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সবিতা থেকেই দেবাসুর মনুষ্যসহ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, বিপ্রশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের চেয়েও অধিকতর দীপ্তিমান এই সূর্য সর্বলোকের দ্যুতিমান সমস্ত পদার্থকে জয় করেছেন। সকলের আত্মা, সর্বলোকের ঈশ্বর, মহাদেব, প্রজাপতি এই সূর্যই ত্রিলোকের মূল ও পরম দেবতা। অন্য যে দ্বাদশ আদিত্য, তাঁরা তাঁদের অধিকার ক্রমে প্রধান আদিত্যের কর্ম সম্পাদন করেন। মনীষীরা তাঁদেরই বিষ্ণুর মূর্তি বলে থাকেন। গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই সহস্রাংশুকে নমস্কার করেন। শ্রেষ্ঠ মুনিরা নানা যজ্ঞ দ্বারা ছন্দোময় ব্রহ্মময় পুরাতন পুরুষ সূর্যের আরাধনা করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে জ্যোতিঃগণের সন্নিবেশ বিষয়ে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, ভগবান সূর্যের সেই রথে দেবতা, আদিত্য, মুনি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প আর শ্রেষ্ঠ রাক্ষসেরা অধিষ্ঠান করেন। ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান, পুষা, পর্জন্য, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই হল দ্বাদশ আদিত্যের নাম। সূর্য একে একে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে এঁদের আশ্রয় করেন। পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি আর কৌশিক—এই বারোজন ব্রহ্মবাদী ঋষি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দ্বাদশ আদিত্যের স্তুতি করেন। রথকৃৎ, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ—এই গ্রামণীরা দেবদেব সূর্যের রথের রশ্মি সংযমন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, বধ, সর্প ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত—এই রাক্ষসেরা সূর্যের আগে আগে চলেন। হে দ্বিজগণ, বাসুকি, কঙ্ক, নীল, তক্ষক, সর্পশ্রেষ্ঠ, এলাপাত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর—এই নাগেরা ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ সূর্যকে বহন করেন। হে দ্বিজগণ, তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চাবসু, চিত্রসেন, ঊর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্যবর্চা—যথাক্রমে এই দ্বাদশ গন্ধর্ব সূর্যের শ্রেষ্ঠ গায়ক। এঁরা নানা প্রকার গান দ্বারা ক্রমে ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত প্রভৃতি স্বরে সূর্যদেবের কাছে গীত পরিবেশন করেন। হে দ্বিজগণ, ঋতুস্থলা, পুঞ্জীকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্বশী, পূর্ণচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা—এরা যথাক্রমে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে নানা প্রকার নৃত্য দ্বারা মহান দেবতা

আত্মস্বরূপ সূর্যের তুষ্টিবিধান করেন। এইভাবে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে দুই মাস করে একে একে দেবগণ সূর্যে বাস করেন ও তেজোনিধি সূর্যকে তেজ দ্বারা স্ফীত করে থাকেন। মুনিরা স্বরচিত বাক্যে রবির স্তব করেন। গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি এঁকে নৃত্য-গীত দ্বারা উপাসনা করে, গ্রামণী যক্ষ প্রভৃতি ভূতগণ এর রথরশ্মি সংযমন করে। সর্পগণ এই দেবাধিপতিকে বহন করে, রাক্ষসেরা সম্মুখে গমন করে আর বালখিল্য মুনিরা রবিকে বেষ্টন করে উদয়াচল থেকে অস্তাচলে নিয়ে যান। শোনা যায় এঁরাই তাপ দেন, বৃষ্টি দেন, দীপ্তি পান, প্রবাহ দেন এবং সৃষ্টি করেন, প্রাণীদের অমঙ্গল নাশ করেন, আকাশে সূর্যের সঙ্গেই এঁরা তাঁর অনুগামী হয়ে ভ্রমণ করেন। ইচ্ছাবিহারী আর বায়ুর মতো বেগবান রথে নিত্য আরোহণ করে এঁরা বর্ষণ, তাপ দান ও আনন্দ দান করতে করতে যুগক্রমে এই জগতের সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেন। এঁদের যে রকম বীর্য, তপস্যা, যোগ আর সত্ত্ব সেই অনুযায়ী প্রভু সূর্য তাপ দান করেন। দিবারাত্রির বিভাগের কারণেই সেই প্রজাপতি সূর্য। সেই রবি পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণকে প্রীত করেন। বেদবিদদের মধ্যে দেবদেব মহাদেব তেজোময় সাক্ষাৎ মহেশ্বর নীলগ্রীব সনাতন সূর্যই দীপ্তি পেয়ে থাকেন, তিনিই দেব ভগবান পরমেষ্ঠী প্রজাপতি। বেদময় প্রজাপতি আদিত্যমণ্ডলেই অবস্থান করেন—এ কথা বেদজ্ঞেরা বলেছেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে
একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, এই যে দেবদেব কালাত্মা পিতামহ রবি, ইনিই নিয়ত ঐশ্বরী তনু সৃষ্টি করছেন। হে ব্রাহ্মণগণ, তাঁর কিরণজালই সপ্তলোককে প্রকাশিত করে। তার মধ্যে গ্রহ-গণের উৎপাদক সাতটি রশ্মিই শ্রেষ্ঠ—সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্বাবসু আর স্বরক—এই সেই সাত রশ্মির নাম। এদের মধ্যে সুষুম্ন নামে সূর্যরশ্মিই চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করে। সুষুম্ন বক্রভাবে ও ঊর্ধ্বে উদ্দীপ্ত হয়। যে রশ্মিটির নাম হরিকেশ, সেটি নক্ষত্রদের দীপ্তি দান করে। বিশ্বকর্মা নামে সূর্যরশ্মি সর্বদা বুধকে তেজোময় করে। আর বিশ্বশ্রবা রশ্মিটি শুক্রের নিত্য উদ্ভাসক। সংযতবসু নামে খ্যাত রশ্মিটি মঙ্গলকে উজ্জ্বল করে রাখে, প্রভু অর্বাবসু নামে সূর্যকিরণ বৃহস্পতিতে তেজো-দান করে পরিবর্ধিত করে। স্বরক নামে রশ্মি শনৈশ্চরকে দীপ্তিময় করে আপ্যায়িত করে। এইভাবে সূর্যের প্রভাবে সমস্ত নক্ষত্র ও তারকাগণ বর্ধিত হয় ও বর্ধিত হয়ে অন্য উদ্ভিজ্জ প্রভৃতিকে বৃদ্ধি লাভে সাহায্য করে। দিব্য, পার্থিব, নৈশ, তম আর তেজ—এইগুলিকে আদান করেন বলে সূর্যকে আদিত্য বলা হয়। তিনি সহস্র নাড়ী দ্বারা চতুর্দিক থেকে নদী, সমুদ্র, কূপ, স্থাবর, জঙ্গম আর কৃত্রিম নদী প্রভৃতির জল শোষণ করেন। তাঁর সহস্র রশ্মি থেকে শীত, বর্ষা আর গ্রীষ্ম ক্ষরিত হয়। এই নদী-গুলির মধ্যে বিচিত্র আকৃতির চারশত নাড়ী বর্ষণ করে। তাঁর চন্দ্রগ, গাছ, কাঞ্চন, শাতন ও অমৃত নামে নাড়ী বৃষ্টির সৃষ্টি করে। হিম দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেই নাড়ী-গুলি রশ্মিরূপে নিঃসৃত হয় এবং রেষী, মেষী, বাসী, হ্লাদিনী ও সর্জনা নাম গ্রহণ করে। এরাই চন্দ্রা নাড়ী, এদের বর্ণ পীত। আর শুক্লা, কুঙ্কুমা ও বিশ্বভৃৎ নামে নাড়ীর

বর্ণ শ্বেত। এই তিন প্রকার নাড়ীই উষ্ণতার সৃষ্টি করে। এরাই দ্যুতি দ্বারা সমানভাবে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোককে পালন করে। ঔষধ দ্বারা মনুষ্যদের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে এবং অমৃত দ্বারা সমগ্র দেবকুলকে পালন করে। ত্রিবিধ পদার্থের দ্বারা এই সূর্যদেব জগৎ রক্ষা করেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মে সেই প্রভু রবি ছয়টি রশ্মির সাহায্যে তাপ দান করেন, শরৎ ও বর্ষাকালে চারটি রশ্মির সাহায্যে বর্ষণ করেন আর হেমন্ত ও শীত-কালে তিনটির সাহায্যে হিম ক্ষরণ করেন। মাঘ মাসে বরুণ নামে সূর্য তাপ দান করেন, ফাল্গুন মাসে পূষা, চৈত্র মাসে অংশু, বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান, ভাদ্রমাসে ভগ, আশ্বিন মাসে ত্বষ্টা, কার্তিকে ভাস্কর, অগ্রহায়ণে মিত্র, এবং পৌষ মাসে সনাতন বিষ্ণু নামক সূর্য তাপ দান করেন। সূর্যের কাজে বরুণসূর্য পাঁচ সহস্র রশ্মি ব্যবহার করেন, পূষা ছয় সহস্র, অংশুদেব সাত সহস্র, ধাতা আট সহস্র, শতক্রতু নয় সহস্র, বিবস্বান দশ সহস্র, ভগ একাদশ সহস্র, মিত্র সাত সহস্র, ত্বষ্টা আট সহস্র, অর্যমা দশ সহস্র, পর্জন্য নয় সহস্র ও বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু সূর্য ছয় সহস্র রশ্মির সাহায্যে তাপ দান করেন। প্রভু সূর্য বসন্তে কপিল বর্ণ, গ্রীষ্মে কাঞ্চন বর্ণ, বর্ষায় শ্বেতবর্ণ, শরৎকালে পাণ্ডুবর্ণ, হেমন্তে তাম্রবর্ণ ও শীতকালে লোহিত বর্ণ হন। সূর্য ওষধিতে রশ্মি দান করেন, পিতৃলোকে স্বধা আর দেবলোকে কলা অর্থাৎ অমৃত বিতরণ করেন। এইভাবে তিনি তিনলোকে তিনটি পদার্থ দান করে থাকেন। হে বিপ্রগণ, অন্য আটটি গ্রহ সূর্যেই অধিষ্ঠিত। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, মন্দ, রাহু ও অষ্টম গ্রহ কেতু—এই সমস্ত গ্রহ বাতরশ্মির দ্বারা ধ্রুবতারায় নিবন্ধ হয়ে ভ্রমণ করতে করতে একে একে সূর্যকে অনুসরণ করেন। বায়ুচক্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে গ্রহগণ চক্রাকার অঙ্গারচক্রের মতো গমন করেন। বায়ু এঁদের বহন করেন বলে তাঁর আর এক নাম প্রবহ। চন্দ্রের রথে তিনটি চক্র, কুন্দকুসুমের মতো দশটি অশ্ব তার বামে ও দক্ষিণে যোজিত, রবি যেমন নক্ষত্রগুলিতে ভ্রমণ করেন, সেই রকম ভাবে চন্দ্রও ঐ রথে শ্রেণীবদ্ধ নক্ষত্ররাশিতে পরিভ্রমণ করেন। হে বিপ্রগণ, সূর্যের মতো চন্দ্রের কিরণেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে। শুক্লপক্ষে সূর্য পর-ভাগে অর্থাৎ ভিন্ন দিকে অবস্থিত থাকেন বলে তাঁর কিরণজালে চন্দ্রের অন্য ভাগ সর্বদা পরিপূর্ণ হয়। সেইটিই চন্দ্রের জ্যোৎস্না। এই চন্দ্রকে দেবগণ পান করার ফলে তিনি ক্ষীণ হয়ে পড়েন। সুষুম্না নামক এক রশ্মির সাহায্যে সূর্য চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করেন। সূর্যের তেজে দিনে দিনে পুষ্ট এই চন্দ্রের শরীর পূর্ণিমায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। এক পক্ষে সম্পূর্ণ সেই অমৃতময় চন্দ্রকে দেবতারা পান করেন, কারণ দেবতারা অমৃত-পায়ী। তারপর চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগরূপ শেষ যে কলাটি অবশিষ্ট থাকে, সেই চরম ভাগটিকে অপরাহ্নে পিতৃগণ ভোজন করেন। চন্দ্রের যে অমৃতময়ী পবিত্র শেষ কলাটি স্বধারূপিণী বলে খ্যাত, সেটিকে পিতৃগণ দুই লব পরিমাণ কাল ধরে ভোজন করেন। অমাবস্যায় পিতৃগণ রশ্মি থেকে নির্গত সেই স্বধারূপিণী অমৃতময়ী কলার অগ্রভাগ মাসের অবসানে লাভ করে তৃপ্ত হন। চন্দ্রের বিনাশ হয় না, তাঁর সুধাই পান করা হয়ে থাকে। হে সত্তমগণ, সূর্যই চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ।

বুধগ্রহের রথে বায়ুর মতো বেগবান জলজাত আটটি অশ্ব যোজিত। এই চন্দ্রতনয় বুধ এর সাহায্যে সর্বত্র বিচরণ করেন। শুক্র গ্রহের রথে ভূমি থেকে জাত আটটি অশ্বযুক্ত। মঙ্গল গ্রহের আছে আটটি অশ্বযুক্ত স্বর্ণময় সুন্দর এক রথ। বৃহস্পতির স্বর্ণনির্মিত রথের অশ্ব সংখ্যা আট। শনির রথ অন্ধকারময় আর লৌহনির্মিত। তার

অশ্ব আটটি। রাহু আর কেতুর রথেও আটটি করে অশ্ব। মহাগ্রহগণের এই সব রথের কথা বলা হল। সমস্ত গ্রহই বায়ু-রশ্মি দ্বারা ধ্রুবতারার সঙ্গে সংলগ্ন। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা সকলেই ধ্রুবতারায় নিবন্ধ হয়ে ভ্রমণ করছেন ও ভ্রমণ করাচ্ছেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

ধ্রুবলোকের ঊর্ধ্বে কোটি যোজন বিস্তৃত মহর্লোক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, যারা মুক্তির অধিকারী তারাই সেখানে বাস করেন। সেই রকম মহর্লোক থেকে জনলোক আবার দুই যোজন ঊর্ধ্বে, সেখানে সনক, সনাতন প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। জনলোক থেকে তপোলোক তিন কোটি যোজন ঊর্ধ্বে। সেখানে বৈরাজ নামে দেবগণ সন্তাপ পরিত্যাগ করে বসবাস করেন। এই প্রাজাপত্যলোক থেকে সত্যলোক ছয় কোটি যোজন ঊর্ধ্বে। এই লোককে অপুনর্মারক ব্রহ্মলোক বলা হয়। এখানে লোকগুরু বিশ্বাত্মা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা পরম যোগামৃত পান করতে করতে যোগীদের সঙ্গে নিত্য বাস করেন। এখানে শান্ত-স্বভাব যতিগণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ, যোগিগণ, তাপস, সিদ্ধেরা ও যাঁরা পরমেষ্ঠীর জপ করেন তাঁরা থাকেন। পরম পদলাভেচ্ছু যোগীদের পক্ষে সেটিই একমাত্র দ্বার। সেখানে গিয়ে আর শোক করতে হয় না। কারণ সেটিই বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্বরূপ। কোটি সূর্যের প্রভায় উজ্জ্বল ব্রহ্মার পুরী অত্যন্ত দুর্লভ। অগ্নিশিখার মতো প্রদীপ্ত সেই পুরীর বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই ব্রহ্মপুরে নারায়ণেরও ভবন রয়েছে। সেখানে মায়াময় পরমযোগী শ্রীমান হরি শয়ান আছেন। সেটিই পুনর্জন্মনিবারণকারী বিষ্ণুলোক বলে খ্যাত। যে সমস্ত মহাত্মা জনার্দনকে লাভ করেছেন, একমাত্র তাঁরাই সেখানে যেতে সমর্থ। ব্রহ্মার ভবনের ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময় বহ্নিবেষ্টিত যে সুন্দর নিকেতনটি আছে সেখানে ভগবান মহাদেব হর মনীষিগণ ও শত সহস্র যোগীর মননের বিষয় হয়ে দেবীর সঙ্গে বাস করেন। ভূতগণ আর রুদ্রগণ তাঁকে বেষ্টন করে থাকে। যোগনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী, মহাদেবপরায়ণ, শান্ত আর সত্যবাদী তাপসগণ সেখানে গমন করেন। মমত্ববোধশূন্য, অহঙ্কারবর্জিত, কামক্রোধরহিত, যোগ-যুক্ত ব্রাহ্মণরাই তা দেখতে পান। একেই বলা হয় রুদ্রলোক। পৃথিবী প্রভৃতি সাতটি মহালোকের কথা বলা হল। হে দ্বিজগণ, এই রকম ভাবে অধোদিকেও মহাতল প্রভৃতি সাতটি পাতাল রয়েছে। মহাতল নামে পাতাল সর্বপ্রকার রত্নের দ্বারা সুশোভিত। এখানে রয়েছে বহু শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ, দেবমন্দির প্রভৃতি। ধীমান মুচুকুন্দ ও পাতাল-স্বর্গবাসী বলিরাজ এখানে থাকেন। হে বিপ্রগণ, রসাতলে রয়েছে বহু পর্বত, তলাতলে রয়েছে কঙ্কর, সুতলের বর্ণ পীত। নিতলের বর্ণ প্রবালসদৃশ, বিতল শুক্লবর্ণ, আর তল কৃষ্ণবর্ণ। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ রসাতল নামে পাতালে অধিষ্ঠান করেন সুপর্ণ, বাসুকি আর অন্য মহাত্মারা। বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ আর তারকা যেখানে বাস করেন সেই তলাতল সর্বশোভার আধার বলে বিখ্যাত। গরুড় প্রভৃতি পক্ষী ও কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণ সকলেই বাস করেন সুতলে। তারক আর অগ্নিমুখ প্রভৃতি যবন ব্যাপ্ত করে আছেন বিতলকে। বিতল পাতালে নাগ জম্ভক প্রভৃতি অসুর, প্রহ্লাদ ও নাগশ্রেষ্ঠ কম্বল থাকেন বলে কথিত হয়। সুন্দর তল-পাতালে বীর মহাজম্ভ, ধীমান হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ

ও নমুচি প্রমুখ অসুরগণ এবং ঐ রকম নানা নাগ বাস করেন। তাদের নিচে আবার মায়া প্রভৃতি নরক অবস্থিত বলে শোনা যায়। সেই নরকগুলিতে পাপীরা যন্ত্রণা ভোগ করে। তাদের কথা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। পাতালের নিম্নদেশে শেষ নামক বিষ্ণুমূর্তি আছেন। যিনি কালাগ্নিরুদ্র, যোগাত্মা, নৃসিংহ, মাধব, অনন্তদেব, নাগরূপী জনার্দন বলে খ্যাত, তিনি এই সব কিছুর আধার হলেও কালাগ্নিকে আশ্রয় করে অবস্থান করেন। তাঁকে আশ্রয় করে কাল তাঁরই মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। গরল-শিখাময় এই কালই স্বয়ং অন্তিমকালে জগতের সংহার করেন। সহস্র মায়াযুক্ত অতুলনীয় শংকর ভবই সংহারকর্তা, তমোময়ী শম্ভুমূর্তিই কাল, তিনিই লোকের সংহার করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন—এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দশ প্রকারের বলা হয়েছে। এখন ভূলোকের কথা বলব। ভূলোকে এই জম্বুদ্বীপ প্রধান। তারপর প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ ও শাকদ্বীপ—সপ্তম দ্বীপটির নাম পুষ্কর। এই সাতটি মহাদ্বীপ সাতটি সাগরের দ্বারা বেষ্টিত। এক দ্বীপের চেয়ে অন্য দ্বীপটির আয়তন বেশি এবং এক সাগরের চেয়ে অন্য সাগরটিও বিস্তৃততর। সমুদ্রগুলির নাম হল—ক্ষারোদক, ইক্ষুদক, সুরোদক, ঘৃতোদক, দধ্যদক, ক্ষীরোদক ও স্বাদুদক। সমুদ্রমেখলা এই পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন। এর চতুর্দিকে রয়েছে সাতটি দ্বীপ। সকলের মাঝখানে জম্বুদ্বীপ। তার স্বর্ণপ্রভ মহামেরু বিখ্যাত। এর উচ্চতা চুরাশি হাজার যোজন, নিম্ন দিকে গভীরতা ষোল যোজন, ঊর্ধ্বে বিস্তার বত্রিশ যোজন। মূল দেশ থেকে তার চারদিকে বিস্তার ষোল হাজার যোজন। এই পর্বতটি যেন পৃথিবীরূপ পদ্মের কোষ। এর দক্ষিণে হিমবান, হেমকূট আর নিষধ পর্বত, উত্তরে নীল শ্বেত আর শৃঙ্গী নামে বর্ষপর্বত। প্রথম দুটির বিস্তার এক লক্ষ যোজন। অন্যান্য পর্বতের আয়তন এদের চেয়ে দশ যোজন কম। এদের উচ্চতা দু'হাজার যোজন, বিস্তারও তাই। হে দ্বিজগণ, প্রথম বর্ষটির নাম ভারত, তারপর আছে কিম্পুরুষ ও হরিবর্ষ, এদের অবস্থিতি সুমেরুর দক্ষিণে। মেরুর উত্তর ভাগে রম্যক আর হিরন্ময় বর্ষ। তারপরে উত্তরকুরু বর্ষ। এরা ভারতবর্ষেরই মতো। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এদের এক একটির বিস্তার ন' হাজার যোজন। এদের মধ্যস্থলে রয়েছে ইলাবৃত বর্ষ এবং ইলাবৃতের মধ্যেই সুমেরু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সুমেরুর বিস্তার ন' হাজার যোজন। হে মহাভাগগণ, সেখানে চারটি বর্ষপর্বত রয়েছে। এরা সুমেরুরূপ বৃত্তের ব্যাসরূপে বিরাজ করছে। এদের উচ্চতা দশ হাজার যোজন। এর পূর্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল আর উত্তরে সুপার্শ্ব পর্বত। এই পর্বতগুলিতে যথাক্রমে কদম্ব, পিপুল, আর বটবৃক্ষ আছে। হে মহর্ষিগণ, ঐ জম্বুবৃক্ষই জম্বুদ্বীপের নামের হেতু। ঐ জম্বুবৃক্ষের ফলগুলির আয়তন বৃহৎ হস্তীর মতো। সেই ফল পর্বতপৃষ্ঠের সব দিকে পতিত হয়ে শুষ্ক হয়ে যায়। তাদের রস থেকেই বিখ্যাত জম্বুনদীর উৎপত্তি। ঐ নদীর জল সেখানকার অধিবাসীরা পান করে। ঐ জল উষ্ণ বা দুর্গন্ধ নয়। ঐ জল পান করলে জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না। তাতে সমস্ত মানুষের মন সুস্থ থাকে। এই নদীর তীরবর্তী মৃত্তিকার রস বায়ুর দ্বারা শোষিত হয়ে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়, তা সিদ্ধদের ভূষণ।

মেরুর পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ আর পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ। হে মুনিবরগণ, তাদের মধ্যে রয়েছে ইলাবৃত বর্ষ। পূর্ব দিকে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন এবং উত্তরে সবিতৃবন। এখানে চারটি সদাদেবভোগ্য সরোবর রয়েছে, তাদের নাম অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ আর মানস। সিতান্ত, কুমুদবান, কুররী, মাল্যবান, বৈকঙ্ক, মণিশৈল, পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋক্ষবান, মহানীল, রুচক, বিন্দু, মন্দর, বেণুমান, মেঘ, নিষধ ও দেবপর্বত—

এই সমস্ত পর্বত দেবতাদের সৃষ্ট আর সিদ্ধগণের বাসভূমি বলে খ্যাত। আর অরুণোদ সরোবরের পূর্বে যে কেশরাচলগুলি আছে তাদের নাম—ত্রিকূট, শিখর, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, বসুধার, কলিঙ্গ, ত্রিশিখ, সমূল, বসুবেদি, কুরর, তাম্রাভ, বিশাল কুমুদ, বেণু-পর্বত, একশৃঙ্গ, মহাশৈল, গজশৈল, পিঞ্জক, পঞ্চশৈল, কৈলাস এবং পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান। দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এই পর্বতগুলিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহাভদ্র সরোবরের দক্ষিণ দিকের কেশরাচলগুলি হল-শিখিবাস, বৈদূর্য, কপিল, গন্ধমাদন, জারুধি, সমস্ত গন্ধাচলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরাম্বু, সুপার্শ্ব, সুপক্ষ, কঙ্ক, কপিল, বিরজ, ভদ্রজাল, সুরস, মহাবল, অঞ্জন, মধুমান, চিত্রশৃঙ্গ, মহালয়, কুমুদ, মুকুট পাণ্ডুর, কৃষ্ণ, পারিপাত্র, মহাশৈল, কপিলাচল, সুষেণ, পুণ্ডরীক ও মহামেঘ। এরাই পর্বতের রাজা। সিদ্ধ আর গন্ধর্বেরা এই সমস্ত পর্বতে বাস করেন। অসিতোদ সরোবরের পশ্চিমে যে কেশরাচলগুলি আছে তাদের নাম- শঙ্খকূট, বৃষভ, হংস, নাগ কালাঞ্জর, শত্রুশৈল, নীল, কমল, মহাশৈল, পারিজাত, কনকশৈল, পুস্তক, সুমেঘ, বারাহ, বিরজা, ময়ূর, কপিল এবং মহাকপিল।

এই সমস্ত পর্বতে বাস করেন দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ আর যক্ষেরা। আর এই মানস সরোবরের উত্তরে রয়েছে বহু কেশরাচল। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ পর্বতগুলির মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে অন্তরদ্রোণী, সরোবর আর কাননসমূহ। সেখানে প্রসন্ন, রজোগুণাদিবর্জিত, সর্বদুঃখমুক্ত ব্রহ্মচিন্তা তৎপর সিদ্ধ আর মুনিরা বাস করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে
পর্বতসংখ্যান বিষয়ে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, সুমেরুর উপরিভাগে দেবদেব ব্রহ্মার চৌদ্দ হাজার যোজন ব্যাপী বিশাল পুরী আছে। সেখানে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ভগবান ব্রহ্মা থাকেন, শ্রেষ্ঠ যোগী আর মুনিরা, উপেন্দ্র এবং শংকর সেখানে তাঁর উপাসনা করেন। সেখানে ভগবান সনৎকুমার দেবেশ্বরগণের প্রভু বিশ্বাত্মা প্রজাপতিকে নিত্যই উপাসনা করেন। সেই যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মা, সিদ্ধ ঋষি, গন্ধর্ব আর দেবতাদের পূজা প্রাপ্ত হয়ে আর পরম যোগামৃত পান করে অবস্থান করেন। সেখানে ব্রহ্মপুরীর সম্মুখে দেবাদিদেব অমিততেজা শম্ভুর শুভ্র উজ্জ্বল স্থান রয়েছে। সেই গৃহটির চারটি দ্বার, সেই গৃহটি মহর্ষিদের দ্বারা পূর্ণ, ব্রহ্মবিদ্‌গণও সেখানে বাস করেন। যে মহাদেবের তিনটি নয়ন চন্দ্র, সূর্য আর বহ্নি, যিনি বিশ্বেশ্বর, মদনাধিপতি, তিনি প্রমথগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেবীর সঙ্গে সেখানে বিহার করেন। সেখানে বেদজ্ঞ, শান্তপ্রকৃতি ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠ তাপসেরা মহাদেবের পূজা করেন। সাক্ষাৎ মহাদেব পরমেশ্বর পার্বতীর সঙ্গে সেই শুদ্ধাত্মা

মুনিদের পূজা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করেন। সেই পর্বতের পূর্বভাগে সর্বশোভার আধার অমরাবতী নামে ইন্দ্রপুরী আছে। সেখানে অপ্সরারা, সহস্র সহস্র গন্ধর্ব, সিদ্ধচারণ আর দেবতারা সহস্রচক্ষুর উপাসনা করেন। যাঁরা ধার্মিক বেদজ্ঞ আর যাগহোমপরায়ণ, তাঁরাই সেই দেবদুর্লভ পরম স্থানে গমন করেন। সেই পুরীর দক্ষিণ দিকে অমিততেজা বহ্নির তেজোবতী নামে পুরী আছে। তাতে রয়েছে অদ্ভুত সব স্বর্গীয় পদার্থ। সেখানে ভগবান বহ্নি নিজের তেজে চারদিক আলো করে থাকেন। জপ আর হোমে যাদের নিষ্ঠা আছে তারাই সেখানে যেতে পারেন। দানবগণের পক্ষে সেখানে যাওয়া কঠিন। পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর দক্ষিণে রয়েছে সংযমনী নামে যমপুরী। সেটি সমস্ত সৌন্দর্যের আকর। সেখানে দেবতারা সূর্যপুত্র যমের উপাসনা করেন। জগতের সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান ব্যক্তিরাই সেখানে যাবার অধিকারী। তার পশ্চিমে মহাত্মা নির্ঋতিদেবের রক্ষোবতী নামে পুরী। রাক্ষসেরা সেই পুরী ব্যাপ্ত করে রয়েছে। রাক্ষসেরা সেখানে নির্ঋতিদেবকে উপাসনা করে। যারা ধর্মানুরক্ত হয়েও মোহগ্রস্ত তারাই এই পুরীতে গমন করেন। পর্বতরাজের পশ্চিমে বরুণের শুদ্ধবতী নামে পবিত্র বিশাল পুরী। সেখানে রয়েছে যাবতীয় কাম্য বস্তু ও সম্পদ। এই পুরীতে বরুণরাজ থাকেন। অপ্সরা, সিদ্ধ আর দেবগণ তাঁর সেবা করেন। যারা অন্নদান করেন, তারা সেই স্থানে গমন করেন। বরুণপুরীর উত্তরে বায়ুর পবিত্র পুরী। এই বিশাল পুরীর নাম গন্ধবতী। সেই দেবপ্রভঞ্জন মহাপ্রভু বায়ু অপ্সরা আর গন্ধর্বদের সেবা গ্রহণ করে সেখানে থাকেন। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সেই নিত্যধামে গমন করেন। তার পূর্ব দিকে শ্বেতবর্ণ এক পুরী। এটি সোমের পুরী, নাম কান্তিমতী। সেখানে থাকেন সোমদেব। যারা ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর তারাই সেখানে যাবার অধিকারী। তার পূর্ব দিকে শংকরের বিশাল সুন্দর পুরী। এর নাম যশোবতী। পুরীটি অত্যন্ত পবিত্র, আর এটি সকলের পক্ষে সুলভ নয়। সেখানে গণাধিপ ঈশানের অতি বিশাল সৌন্দর্যময় মন্দির রয়েছে। সেখানে অধিষ্ঠান করেন রুদ্র। সেখানে তিনি প্রমথগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাস করেন। ভগবান শূলী এই রকম ব্যবস্থা করেছেন যে, যারা সেই পরমেষ্ঠীর ভক্ত অথচ ভোগ্য বস্তু লাভে ইচ্ছুক তারাই সেই পুরীতে বাস করতে পারে। বিষ্ণু পাদপদ্ম থেকে নিঃসৃতা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে সেই ব্রহ্মপুরীর চারদিকে ঝরে পড়ছেন। হে দ্বিজগণ, গঙ্গা চারদিকে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে সীতা, অলকানন্দা, সুবংক্ষু আর ভদ্রা নামে পরিচিত হয়েছেন। আকাশচারিণী সীতা গঙ্গা এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে গমন করতে করতে পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, সেই রকম অলকানন্দা দক্ষিণ দিক দিয়ে ভারতবর্ষে এসে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

সুবক্ষু গঙ্গা সেই ভাবেই সমগ্র পশ্চিম গিরিকে অতিক্রম করে পশ্চিম দিকস্থিত কেতুমালবর্ষ দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছেন। হে মহর্ষিগণ, ভদ্রা গঙ্গাও ঐভাবে উত্তরের পর্বতগুলি আর উত্তরকুরুবর্ষ পার হয়ে উত্তর সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চারটি পর্বতের মধ্যে কর্ণিকার আকারে শোভা পাচ্ছে সুমেরু। ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ আর কুরুবর্ষ—এরা প্রত্যন্ত পর্বতের বাইরে যেন পৃথিবী পদ্মের পাপড়ির মতো শোভা পাচ্ছে। জঠর আর দেবকূট—এই দুটি প্রত্যন্ত পর্বত নীল থেকে নিষধ পর্বত পর্যন্ত দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত।

গন্ধমাদন আর কৈলাস—এই দুটি পর্বত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, আশি যোজন ব্যাপ্ত করে সমুদ্র পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। নিষধ এবং পারিপাত্র—এই দুটি প্রত্যন্ত পর্বত সুমেরুর পশ্চিমভাগে এই ভাবেই বিরাজ করছে। ত্রিশৃঙ্গ আর জারুধি নামে দুটি প্রত্যন্ত পর্বত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত অবস্থিত। হে দ্বিজগণ, আমি এখানে আটটি প্রত্যন্ত পর্বতের কথা বললাম। হে মহর্ষিরা, সুমেরুর চারদিকে জঠর প্রভৃতি বর্ষ পর্বতও রয়েছে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

সুত বললেন, কেতুমাল বর্ষের অধিবাসী মানুষেরা কৃষ্ণকায়। এরা কাঁঠাল ফল ভোজন করে। এখানকার রমণীদের গাত্রবর্ণে পদ্মপত্রের আভা। এদের আয়ুষ্কাল দশ হাজার বছর। ভদ্রাশ্ব বর্ষের পুরুষেরা শ্বেতকায়, আর সেখানকার রমণীদের কান্তি চন্দ্রের মতো। এরা আম্রভোজী আর দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে। রম্যক বর্ষে যে সব নারী পুরুষ বিহার করে তাদের গাত্রবর্ণ রজতের মতো। তাদের আয়ুষ্কাল দশ হাজার পাঁচশো বছর। এরা সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে এবং ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ফল খেয়ে জীবনধারণ করে। হিরন্ময় বর্ষের নরনারীরা কাঞ্চনবর্ণ, এরা বিল্বফল ভক্ষণ করে এবং দেবলোকবাসীদের মতো এগার হাজার পাঁচশো বছর জীবিত থাকে। কুরুবর্ষে যে মানবমানবীরা আছে তারা শ্যাম-বর্ণ, ক্ষীরই তাদের খাদ্য। তাদের আয়ু তেরো হাজার পাঁচশো বছর। সকলেই সর্বদা সুখে থাকে আর দম্পতী রূপেই জন্মগ্রহণ করে। তারা চন্দ্র দ্বীপে মহাদেব শিবকে নিত্য পূজা করে। হে বিপ্রগণ, সেই রকম কিম্পুরুষ বর্ষে হেমকান্তি মানুষেরা অশ্বত্থফল ভোজন করে দশ হাজার বৎসর জীবন ধারণ করে। এরা ধ্যানে চিত্ত অর্পণ করে ভক্তিসহকারে চতুর্মস্তক, চতুর্ভুজ দেবতাকে সাদরে পুজা করে। এই ভাবে হরি বর্ষে ধূসর বর্ণ নরনারীগণ ইক্ষুরস পান করে দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে। সেখানে বিষ্ণুভক্ত মানবগণ সর্বদা বিশ্বযোনি সনাতন দেব নারায়ণ বিষ্ণুকে উপাসনা করে। সেখানে পারি-জাত বনে বাসুদেবের এক প্রাসাদ আছে। চন্দ্রকান্তি এই প্রাসাদ স্ফটিকের মতো শুভ্র ও স্বচ্ছ। এর চারটি দ্বার। অনুপম সুন্দর চারটি তোরণ একে শোভিত করছে। দশটি প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এই প্রাসাদ আক্রমণ করা বা এখানে গমন করা কঠিন। স্ফটিকময় মণ্ডপ থাকায় ঐ প্রাসাদকে দেখতে রাজপুরীর মতো হয়েছে। তার চারদিক অলংকৃত করে আছে সহস্র সোনার স্তম্ভ। এই প্রাসাদের সোপানগুলি সোনার তৈরি, নানা রকম রত্নে খচিত। দিব্য সিংহাসন রয়েছে এখানে। এই প্রাসাদ সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের আকর। একে শোভিত করে আছে স্বাদু পানীয় জলের সরোবর আর নদী। এখানে বিষ্ণুভক্ত, বেদাধ্যয়ননিষ্ঠ, ব্রহ্মনিরত, প্রাণায়াম অভ্যাসকারী শুদ্ধ যোগীরা সর্বদা দেবাদিদেব অমিততেজা বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করছেন। সর্বদা বসন ভূষণে তৎপর লাস্যময়ী রমণীরা এই স্থানে নৃত্য গীত পরিবেশন করছে। ইলাবৃত বর্ষে পদ্মকান্তি নরনারীরা জম্বুফলের রস পান করে ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ভারত বর্ষের স্ত্রীপুরুষ গণের বর্ণ নানা প্রকার। তারা নানা দেবতার পুজা করে, তাই তাদের কর্মও নানা প্রকার। হে সুব্রতগণ, এদের আয়ু একশত বৎসর। এই ভারত বর্ষের পরিমাণ নয় হাজার

যোজন। হে বিপ্রগণ, এই ভারত বর্ষে অধিকারী ব্যক্তিদেরই কর্মের জন্য জন্ম হয়। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটি কুলপর্বত আছে। এর নয়টি দ্বীপ আছে—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান, তাম্রপর্ণী, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, গন্ধর্বদ্বীপ, সৌম্যদ্বীপ, বারুণদ্বীপ আর নবমটি হল সাগরবেষ্টিত এই ভারতদ্বীপ। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। এর পূর্ব দিকে কিরাতদের আর পশ্চিম সীমায় যবনদের বাস। এই ভারত বর্ষের মধ্যভাগে যে মানুষেরা বাস করে তারা যথাক্রমে যজ্ঞ, সংগ্রাম, বাণিজ্য আর সেবারূপ উপজীবিকার ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার প্রকার হয়ে থাকে। এই ভারত বর্ষে বহু পুণ্যতোয়া নদী পর্বতগুলি থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরযূ, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী ও লোহিনী—এই নদীগুলি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। বেদস্মৃতি, বেদমতী, ব্রতঘ্নী, ত্রিদিবা, পর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মনোরমা, চর্মণ্বতী, দূর্মা, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রু আর সুশিল্পা—

এই নদীগুলি পরিপাত্র পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে। নর্মদা, সুরসা, শোণ, দশার্ণা, মহানদী, মন্দাকিনী, চিত্রকূটা, তামসী, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, মঞ্জুলা ও বালুবাহিনী—

এই নদীগুলি ঋক্ষবান পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরা মানুষের সব পাপ হরণ করে। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, মহানদী শীঘ্রোমা, বেণ্বা, বৈতরণী, বলাকা, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহী, গৌরী, দুর্গা আর অন্তঃশীলা এই পাপনাশিনী নদীগুলি বিন্ধ্যপর্বত থেকে নির্গত হয়েছে। হে দ্বিজোত্তমগণ, গোদাবরী, ভীমরক্ষী, কৃষ্ণা, বেণা, বশ্যতা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা আর কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের এই নদীগুলি সহ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে নিঃসৃত। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পবতী আর উৎপলাবতী—এই সমস্ত নদীর জন্ম মলয় পর্বতে। এদের জল অতি শীতল। ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, গন্ধমাদনগামিনী, ক্ষিপ্রা, পলাশিনী, ঋষিকা ও বংশধারিণী—এই নদীগুলি গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরা মানুষের সর্ব পাপ নাশ করে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এই সমস্ত নদী থেকে নির্গত শত শত উপনদী আছে। সেই সব পূতসলীলা নদীতে স্নান, দান, প্রভৃতি কর্ম করলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। কুরু, পাঞ্চাল, মধ্যদেশ, কামরূপ—এই দেশগুলি ভারতের পূর্ব দিকে অবস্থিত। পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশগুলি নিয়ে দাক্ষিণাত্য। সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্বুদ, মালক মালব। পরিপাত্রের অধিবাসী সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব, কান্য নিবাসী মদ্রদেশীয় রামগণ, অম্বষ্ঠদেশীয় ও পারসীক- এরা পশ্চিম প্রান্তীয়। এরা সকলেই ভারতের নদীগুলির জলপান করে ও তাদের তীরে সর্বদা বাস করে। ভারত বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগের বিভাগ কবিগণ করেছেন। অন্য কোথাও এই রকম যুগ নেই। হে মহর্ষিগণ, কিম্পুরুষ প্রভৃতি যে আটটি বর্ষ আছে, সেই সমস্ত বর্ষে শোক, পরিশ্রম, উদ্বেগ বা ক্ষুধার ভয় নেই। সেই সমস্ত বর্ষের প্রজারা সুস্থ, নিঃশঙ্ক, সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত এবং সকলেই অচঞ্চল যৌবনের অধিকারী হয়ে সুখে বিচরণ করে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, হেমকূটগিরির শিখরে দেবদেব ব্রহ্মার মহাকূট নামে স্ফটিক নির্মিত এক সুন্দর বিমান আছে। সেখানে দেবগণ, ঋষিমণ্ডল আর সিদ্ধগণ, দেবাদিদেব ভূতপতি ত্রিশূলধারী মহাদেবকে নিত্যপূজা করে থাকেন। সেই দেব গিরিশ পিনাকী মহেশ্বর ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহাদেবীর সঙ্গে সেখানে নিত্য বিরাজ করেন, যেখানে কৈলাস পর্বতকে তার মনোহর শিখরটি দুই ভাগে ভাগ করেছে, যেখানে কোটি যক্ষ আর ধীমান কুবেরের নিবাস, সেখানেও দেবদেব মহাদেবের বিশাল মন্দির আছে। সেখানে পবিত্রকারিণী, রমণীয়া, স্বচ্ছতোয়া, নানা প্রকারের অসংখ্য পদ্মে শোভিত, মনোরমা মন্দাকিনী প্রবাহিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এর জল পান করেন। সেখানে সুবর্ণ পদ্মে শোভিত অন্য শত শত নদীও প্রবাহিত। এদের তীরে দেব ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্থান রয়েছে। দেবর্ষিরা সেখানে বাস করেন। এর সম্মুখে শুভ্র সুন্দর পারিজাত বন। সেখানে সুবিশাল, স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত সোনার সিংহ-দ্বারে শোভিত শুক্রভবন আছে। এই স্থানেই আবার দেবদেব বিশ্বাত্মা বিষ্ণুরও পবিত্র রমণীয় সর্বরত্ন-মণ্ডিত গৃহ রয়েছে। এই গৃহে জগৎপতি সর্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ পূজনীয় সনাতন নারায়ণ শ্রীময়ী লক্ষ্মীর সঙ্গে বাস করেন। সেই রকম বসুধার পর্বতে রত্নমণ্ডিত পবিত্র অষ্টবসুর ভবন আছে। একে অসুরেরাও আক্রমণ করতে পারে না। রত্নধার নামে শ্রেষ্ঠ পর্বতে মহাত্মা সপ্তর্ষিদের সাতটি পুণ্যাশ্রম আছে। সেখানে সিদ্ধদের আবাসভূমি। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সুবর্ণনির্মিত, চারটি দ্বারে শোভিত, সুপবিত্র ও সুন্দর একটি স্থানও ঐ পর্বতে রয়েছে। সেখানে দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি আর অন্যেরা দেবদেব অজ পিতামহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন। শান্তদের পরমগতি সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা লোকহিতের জন্য তাঁদের নিত্য পূজা গ্রহণ করে দেবীর সঙ্গে বাস করেন। ঐ পর্বতের একটি শৃঙ্গে রয়েছে এক বিশাল সরোবর। সেটি বহু বিশাল পদ্মে শোভিত। তার জল পবিত্র, স্বচ্ছ, স্বাদু আর সুগন্ধ। সেখানে রয়েছে যোগিসেবিত জৈগীষব্যের পুণ্যাশ্রম। ঐ আশ্রমে ভগবান জৈগীষব্য নিষ্পাপ উদারহৃদয় ব্রহ্মার মতো মহানুভব শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিত্য অধিষ্ঠান করেন। তাঁর প্রধান শিষ্যেরা হলেন শঙ্খ, মনোহর, কৌশিক, কৃষ্ণ সুমনা আর বেদবাদ। সর্বযোগে নিরত আর শান্ত স্বভাব ভস্ম-শোভিত-কলেবর ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ পূজনীয় আচার্যগণ তাঁকে উপাসনা করেন। সেই শান্ত চিত্ত যতিদের অনুগ্রহের জন্য মহেশ্বর দেবীর সঙ্গে সর্বদা তার সমীপে অবস্থান করেন। সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে যোগযুক্ত মুনিদের অনেক আশ্রম, সরোবর আর নদী আছে। যোগনিরত, জপ-পরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠাবান, জ্ঞানতৎপর ব্রাহ্মণগণ সেখানে বিহার করেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করে জগতের উৎপত্তির হেতু সেই মহাদেব ঈশানকে ধ্যান করেন। সেখানে সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল সুমেঘ নামে বাসবের একটি স্থান আছে। সেখানে সুরেশ্বর ভগবান ইন্দ্র শচীর সঙ্গে বাস করেন। গজশৈলে আছে মণিময় তোরণে অলংকৃত দুর্গাভবন। সেখানে সাক্ষাৎ মহেশ্বরী ভগবতী দুর্গা অধিষ্ঠান করেন। বিবিধ শক্তি সাক্ষাৎ ঐশ্বরিক যোগামৃত পান করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপাসনা করেন। নানা প্রকার ধাতু দ্বারা উজ্জ্বল সুশীল নামে গিরিশৃঙ্গে রাক্ষসদের অনেক নগরী আর শত শত সরোবর আছে। হে দ্বিজগণ, সেই রকম শতশৃঙ্গ

নামক বিশাল পর্বতে অমিতবিক্রম যক্ষদের স্ফটিক স্তম্ভযুক্ত শত শত নগরী আছে। শ্বেতোদর গিরির শৃঙ্গে মহাত্মা সুপর্ণের স্থান আছে। এই স্থানকে প্রাচীর আর পুরুদ্বার বেষ্টন করে আছে, মণিময় তোরণে এটি সজ্জিত। সেখানে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি শ্রীমান গরুড় সেই অব্যয় পরমজ্যোতিকে ধ্যান করেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, শ্রীশৃঙ্গ পর্বতে শ্রীদেবীর সর্বরত্নের আকর স্বরূপ সুবর্ণনির্মিত, মণিময় তোরণে অলংকৃত আর একটি পবিত্র ভবন আছে। সেখানে সেই বিষ্ণুর পরমাশক্তি অতি মনোরমা, অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী, জগৎপ্রসূতি স্বকীয় শক্তি প্রভাবে প্রকাশমানা লক্ষ্মী বাস করেন। তিনি জগতের সম্মোহন কার্যে ব্যস্ত। দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ আর চারণেরা তাঁকে আরাধনা করে, চিন্তা করে। সেইখানে দেবদেব বিষ্ণুর বৃহৎ মন্দির আর বিচিত্র পদ্মে শোভিত চারটি সরোবর আছে। সেই রকম সহস্রশিখর পর্বতে রত্নসোপানযুক্ত সরোবরে শোভিত আটটি বিদ্যাধরপুর আর বিচিত্র নীলোৎপলে পূর্ণ স্বচ্ছতোয়া বহু নদী এবং দিব্য স্থলপদ্মের বন আছে। সেখানে স্বয়ং শংকর বিরাজ করেন। বিশাল পারিপাত্র পর্বতটি মনোরম প্রাসাদযুক্ত মহালক্ষ্মীপুর দ্বারা শোভিত। এই পুর ঘণ্টা আর চামরে সজ্জিত। এর কোন স্থানে অপ্সরারা নৃত্য করছে, কোথাও মৃদঙ্গ আর পটাহের নিনাদ শোনা যাচ্ছে, কোথাও বা বেণুবীণার নিঃস্বন। গন্ধর্ব, কিন্নর আর শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ সর্বদা এখানে বিহার করেন। উজ্জ্বল দেয়াল আর বিশাল বিশাল প্রাসাদের মালায় এই স্থান সজ্জিত। মহাগণেশ্বর এখানে বাস করেন, ধার্মিকগণ এই স্থান দেখলে আনন্দিত হন। এখানে নিত্য যোগপরায়ণা মহাদেবী বৃহৎ ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না, শক্তিগণের দ্বারা বেষ্টিতা নিত্যানিত্যময়ী মহালক্ষ্মী বিরাজ করেন। সিদ্ধ ব্রহ্মবাদী মুনিরাই কেবল তাঁকে দর্শন করতে সমর্থ হন। হে সাধুগণ, সুপার্শ্ব পর্বতের উত্তরে দেবী সরস্বতীর সুন্দর প্রাসাদ আর সিদ্ধদের দ্বারা অধ্যুষিত দেবভোগ্য বহু সরোবর বিদমান। বিচিত্র নানা বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত পাণ্ডুর পর্বতের শিখরে রয়েছে দিব্যাঙ্গনাদের দ্বারা ব্যাপ্ত শত শত গন্ধর্বপুরী। সেই সব পুরীতে নারী ও পুরুষগণ সর্বদা মদ্যপান করে আর প্রত্যহ ভোগবিলাসে নিমগ্ন হয়ে আনন্দে বিহার করে। অঞ্জনগিরির শৃঙ্গে আছে একটি অতি সুন্দর সুরম্য নগর। সেখানে রম্ভা প্রমুখ অপ্সরারা রতিসুখে বাস করে থাকে। রত্নের আকর স্বরূপ বহু প্রস্রবণে শোভিত সেই পুরীতে চিত্রসেন প্রমুখ সর্বদাই যাচক রূপে উপস্থিত হন। হে সাধুগণ, কৌমুদ গিরিতে রজোগুণবিহীন ঈশ্বরানুরক্তচিত্ত রুদ্রদের অনেক পুরী আছে। সেই সব পুরীতে মহাযোগপরায়ণ মহেশের অন্তরবিহারী রুদ্রগণ ঐশ্বরিক পরম জ্যোতি আশ্রয় করে সমাহিত থাকেন। পিঞ্জরগিরির শৃঙ্গে গণাধিপদের তিনটি পুরী আর নন্দীশ্বরের কপিলা নগরী আছে। সেখানে সেই মহামতি পুরুষ বাস করেন। সেই রকম জারুধিগিরির শিখরে দেবদেব ধীমান অমিততেজা ভাস্করের পূত ভাস্বর স্থান রয়েছে। এর উত্তরে চন্দ্রের অত্যুত্তম স্থান। সেই সুন্দর স্থানে ভগবান শীতাংশু বাস করেন। হে মহর্ষিগণ, হংস পর্বতে সহস্র যোজন বিস্তৃত সুবর্ণ মণিময় তোরণে অলংকৃত আরেকটি দিব্য ভবন আছে, সেখানে বিশ্বাত্মা ভগবান ব্রহ্মা সিদ্ধগণের দ্বারা স্তুত ও দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে বাস করেন। তার দক্ষিণে সিদ্ধদের একটি সুন্দর পুরী আছে। সেখানে সনন্দন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বাস করেন। পঞ্চশৈলের শিখরে দানবদের তিনটি পুরী আছে। আর অল্প দূরে ধীমান দৈত্যাচার্য শুক্রের পুর বিদ্যমান। সুগন্ধ পর্বতের শিখরে নদীতরঙ্গে মনোরম একটি পুণ্যাশ্রম আছে, আশ্রমটি

ঋষি কর্দমের, সেখানে ভগবান কর্দম ঋষি থাকেন। তারই পূর্বে সামান্য দক্ষিণ ঘেঁষে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ ভগবান সনৎকুমারের বাস। হে মুনীশ্বরগণ, এইগুলি ছাড়াও অন্য অনেক পর্বতে সরোবর, স্বচ্ছসলিলা নদী আর দেবমন্দির আছে। মুনিদের স্থাপিত আর সিদ্ধদের দ্বারা চিহ্নিত যে সব পুণ্য বনভূমি আর আশ্রম আছে তাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। জম্বুদ্বীপের বিস্তারের কথা সংক্ষেপে বললাম। শত শত বৎসর ধরেও এর বিশদ বিবরণ আমি দিতে সমর্থ হব না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপবর্ণন নামে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তনের প্লক্ষ দ্বীপ চারদিকে ক্ষীর সমুদ্রকে ঘিরে আছে। হে শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ, প্লক্ষ দ্বীপে ঋজু আর বিস্তৃত সুন্দর পর্বত-বিশিষ্ট, সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত সাতটি কুলপর্বত আছে। তাদের মধ্যে প্রথমটির নাম গোমেদ, দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্র, তারপর রয়েছে নারদ, দুন্দুভি, মণিমান, মেঘ নিঃস্বন, আর সপ্তমটির নাম বৈভ্রাজ। শেষোক্ত পর্বতটি ব্রহ্মার অত্যন্ত প্রিয়। সেখানে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব আর সিদ্ধেরা সেই বিশ্বাত্মা সর্বসাক্ষী বিশ্বদর্শী ভগবান অজ ব্রহ্মাকে উপাসনা করে থাকেন। সেই সবগুলিতে অতি পবিত্র সব জনপদ আছে। সেখানে মানসিক পীড়া বা রোগ নেই, সেখানকার কোন নর-নারী পাপকর্ম করে না। সেই সাতটি বর্ষ পর্বতে সাতটি সমুদ্রগামিনী নদী আছে। ঐ নদীগুলিতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিত্য পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ঐ সাতটি নদীর নাম অনুতপ্তা, শিখা, বিপাশা, ত্রিদিবা, কুভা, অমৃতা ও সুকৃতা। এ ছাড়া বহু ক্ষুদ্র নদী আর সরোবরও সেখানে আছে। এই সব স্থানে যুগধর্ম বলে কিছু নেই, আর এখানকার নরনারীরা চিরজীবী। ঐ প্লক্ষদ্বীপে আর্য, কুবর, বিদেহ, আর ভাবী নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করে। সেখানকার নানা বর্ণের অধিবাসীরা ভগবান সোমকে পূজা করে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, তারা সোমের সঙ্গে সাযুজ্য আর সারূপ্য প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভ করে। সেখানকার সকল অধিবাসীই ধর্মনিরত ও আনন্দচিত্ত। তারা নীরোগ শরীরে সকলেই পাঁচ হাজার বৎসর জীবনধারণ করে।

শাল্মলি দ্বীপের আয়তন প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। সেটি চারদিক দিয়ে ইক্ষু সমুদ্রকে বেষ্টন করে আছে। ঐ শাল্মলি দ্বীপেও সাতটি বর্ষ ও সরল, আয়ত, সুন্দর পর্ববিশিষ্ট সাতটি কুলপর্বত আছে। সাতটি নদীও সেখানে প্রবাহিত। সাতটি কুলপর্বতের নাম যথাক্রমে—কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ আর ককুদ্মান। পাপনাশিনী সাতটি নদীর নাম—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, সেই সমস্ত বর্ষে লোভ, ক্রোধ বা যুগধর্ম নেই, লোকে রোগশূন্য শরীরে জীবনযাপন করে। সেখানে সমস্ত বর্ণের মানুষ সনাতন দেব বায়ুকে সর্বদা আরাধনা করে। তাতে তাদের বায়ুসাযুজ্য, বায়ুসারূপ্য আর বায়ুসালোক্য লাভ হয়। হে দ্বিজগণ, এই দ্বীপে ব্রাহ্মণেরা কপিলবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ আর শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে থাকে।

কুশদ্বীপের বিস্তার শাল্মলি দ্বীপের দ্বিগুণ। এটি ক্ষীর সমুদ্রকে চারদিকে বেষ্টন করে আছে। এখানে বিদ্রুম, হেম, দ্যুতিমান, পুষ্পবান, কুশেশয়, হরি ও মন্দর—এই সাতটি কুলপর্বত বিদ্যমান। ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মিতা, বিদ্যুৎপ্রভা, রামা ও মহী—এই সাতটি নদী এখানে প্রবাহিত হচ্ছে। হে বিপ্রগণ, অন্য শত শত মণিতুল্য স্বচ্ছতোয়া সুন্দর সুন্দর নদীও বয়ে যাচ্ছে। সেই সব নদীতে দেবতারা ব্রহ্মা ও ঈশানকে উপাসনা করেন। সেই কুশ দ্বীপের ব্রাহ্মণেরা সম্পদশালী, ক্ষত্রিয়েরা পরাক্রান্ত, বৈশ্যেরা ধনধান্যে সমৃদ্ধ, আর সেখানে শূদ্রদের কোন উদ্যমই দেখা যায় না। মর্ত্যলোকেও যারা জ্ঞানসম্পন্ন, মৈত্রী প্রভৃতি গুণযুক্ত, যথানিয়মে যারা কর্মানুষ্ঠান করেন, সকল প্রাণীর হিত-কার্যে নিরত থাকেন এবং নানা প্রকার যজ্ঞ দ্বারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন, তাদের ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মসারূপ্য ও ব্রহ্মসালোক্যরূপ মুক্তিলাভ হয়।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপ আয়তনে কুশ দ্বীপের দ্বিগুণ। হে বিপ্রগণ, এই দ্বীপ ঘৃত সমুদ্রকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে। ক্রৌঞ্চ, বামনক, অধিকারিক, দেবাবৃৎ, বিবিন্দ, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভিস্বন। এই সাতটি হল এর কুলপর্বত। এর প্রধান নদীগুলির নাম—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা।

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পুষ্কল, পুষ্কর, ধন্য ও তিষ্য নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই সব বর্ণের মানুষ সেখানে বাস করে। তারা যজ্ঞ, দান, শম, দম, ব্রত, উপবাস ও নানাপ্রকার হোম দ্বারা মহাদেবকে উপাসনা করে এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে। সেই মহাদেবের প্রসাদে তাদের রুদ্রের সঙ্গে সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্যরূপ অতি দুর্লভ মুক্তিলাভ হয়।

শাক দ্বীপটির বিস্তার ক্রৌঞ্চ দ্বীপের দ্বিগুণ। হে বিপ্রগণ, এটি দধি সমুদ্রকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে রয়েছে। সেখানকার সাতটি কুলপর্বতের নাম—উদয়, রৈবত, শ্যামক, অস্তগিরি, আম্বিকেয়, রম্য ও কেশরী। এখানে সাতটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে—সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষুকা, ধেনুকা ও গভস্তি। সেখানকার মানুষেরা এই সমস্ত নদীর জল পান করে নীরোগ দেহে শোকশূন্য ও রাগদ্বেষবর্জিত হয়ে জীবনযাপন করে। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রদের যথাক্রমে মগ, মগধ, মানস আর মন্দগ বলা হয়। তারা সর্বলোকের একমাত্র সাক্ষী দেবদেব দিবাকরকে নানা প্রকার ব্রত ও উপবাস দ্বারা সর্বদা অর্চনা করে থাকে। সেই সূর্যের প্রসাদে তাদের সূর্যসাযুজ্য, সূর্যসামীপ্য, সূর্যসারূপ্য ও সূর্যসালোক্যরূপ মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। শাক দ্বীপকে বেষ্টন করে আছে শ্বেত দ্বীপ, সেই দ্বীপে পবিত্র এবং নানা অদ্ভুত বস্তু-সমন্বিত জনপদসমূহ রয়েছে। সেখানে নারায়ণে সমর্পিতচিত্ত বিষ্ণুভক্ত শ্বেতকায় মানবগণ জন্মগ্রহণ করে। সেখানে মনঃপীড়া, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ভয় নেই। সেখানকার লোকেরা সকলেই ক্রোধ-লোভ শূন্য, মায়া ও পরশ্রীকাতরতাবর্জিত, নিত্য পরিপুষ্ট, আতঙ্কহীন, সদানন্দময়, ভোগবিলাসপরায়ণ, নারায়ণতুল্য, ধ্যানতৎপর, সংযতেন্দ্রিয় ও যোগী। তাদের কেউ জপ করছে, কেউ তপস্যা করছে, কেউ বিজ্ঞাননিরত, কেউ বা নিষ্কাম যোগ দ্বারা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে সেই পরব্রহ্ম সনাতন বাসুদেবকে ধ্যান করছে। কেউ বা ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন, আশ্রয়শূন্য ও মহাভাগবত। তারা বিষ্ণু নামক পরমজ্যোতি-স্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করে থাকে। তারা সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধারী, পীতবসন, তাদের বক্ষস্থলে আঁকা আছে শ্রীবৎসচিহ্ন। কেউ মহেশ্বর-পরায়ণ, মস্তকে তাদের ত্রিপুণ্ড্র-চিহ্ন, যোগাবলম্বন

করার ফলে তাদের শরীর অদ্ভুত দেখতে। তারা মহাগরুড়ে আরোহণ করে আছে। শক্তিযুক্ত, নিত্যানন্দ, নির্মল আর বিষ্ণুর হৃদয়বিহারী পুরুষেরাই সেখানে বাস করেন। সেস্থান অন্যের অগম্য আর দুরতিক্রম্য প্রাসাদমালায় সজ্জিত, সুবর্ণ প্রাচীরযুক্ত, স্ফটিকময় মণ্ডপে শোভিত, সহস্র-প্রভায় উজ্জ্বল নারায়ণ নামক সুন্দর পুরী আছে। সেখানে অসংখ্য বিশাল বিশাল গৃহ, প্রাসাদ আর অট্টালিকা। নানা রত্নে শোভিত, শুভ্র আস্তরণযুক্ত, বিচিত্র ও আনন্দজনক স্বর্ণনির্মিত সহস্র সহস্র গোপুর ঐ পুরীর সৌন্দর্য বর্ধন করছে। তার মধ্যে কোথাও নদী, কোথাও সরোবর শোভা পাচ্ছে। কোন স্থান বেণু ও বীণার শব্দে মুখর। কোথাও মনোরম সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। বহু বিচিত্র পতাকা, বীথী, রত্নসোপান, শত শত নদী, হংস, কারণ্ডব আর চক্রবাক প্রভৃতি তার শোভা বর্ধন করছে। এই পুরীর চারটি দ্বার। এই অনুপম পুরীতে অসুররা প্রবেশ করতে প্যারে না। নানা প্রকার সঙ্গীতে নিপুণা, নানা বিলাসসম্পন্ন, কামুক, অতি কোমল আর দেবদুর্লভ অপ্সরাগণ সেখানে স্থানে স্থানে নৃত্য করছে। ঐ অপ্সরাদের মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের মতো, ওষ্ঠ বিম্বের মতো, চোখ দুটি মুগ্ধ কিশোর হরিণের চোখ দুটির মতো। তাদের ঐশ্বর্যের সীমা নেই, তাদের শরীরের মধ্যদেশ ভূষিত, তাদের গতি রাজহংসের মতো, তাদের বেশ অতি সুন্দর, কণ্ঠস্বর মধুর এবং তারা রহস্যালাপে নিপুণ। তাদের মধ্যভাগ স্তনভারে বিনম্র, চক্ষু দুটি মদাবেশে চঞ্চল, অঙ্গগুলি নানা বর্ণে বিচিত্র। ঐ অপ্সরারা নানা প্রকার ভোগে ও রতির বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী। এই রকম অপ্সরারা ঐ নারায়ণপুরীর মধ্যে ইতস্তত নৃত্য করছে। ঐ পুরীর কোন স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমযুক্ত বহু উদ্যান ইতস্তত শোভা বিস্তার করছে। এর অসংখ্য গুণ। তা শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দরও দেবতাদেরও অগম্য। সেই অমিততেজা দেবদেব শ্রীপতির ঐ পুরীর মধ্যে আছে আতি দীপ্তিময়, ঈষৎ উচ্চ প্রাকার ও তোরণসমূহে সজ্জিত, যোগীদের সিদ্ধিদায়ক এক দিব্যস্থান। সেটিই সেই বৈষ্ণব স্থান। সমগ্র জগতের স্রষ্টা, পদ্মকান্তি, অদ্বিতীয় ভগবান হরি নিজের আত্মানন্দরূপ অমৃত পান করে সনন্দন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ যোগীদের মননের বিষয়ীভূত হয়ে সেই স্থানে শেষনাগশয্যায় শয়ন করেন। তিনি অন্ধকারের পারে স্থিত, পীতবসন, বিশালবক্ষ, মহামায়াযুক্ত, মহাভুজ। ক্ষীরসাগরকন্যা ভগবতী লক্ষ্মী তাঁর চরণ দুটি ধরে আছেন। জগতের বন্দনীয়া হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী নারায়ণরূপ অমৃত পান করে তদ্‌গতচিত্তে তাঁর পদমূলে অবস্থান করছেন। সেখানে অধার্মিকরা যেতে পারে না, আর দেবপুরবাসী ছাড়া অন্য কেউও যেতে পারে না। সেই স্থানের নাম বৈকুণ্ঠধাম। একে দেবতারাও পূজা করে থাকেন। শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারি, আমার এত ধীশক্তি নেই। নারায়ণপুরীর বিষয়ে এইটুকুই বলতে আমি সমর্থ। সেই পরব্রহ্ম শ্রীমান বাসুদেব সনাতন নারায়ণ মায়ায় জগৎকে মুগ্ধ করে শয়ন করেন। নারায়ণ থেকেই এই জগৎ উৎপন্ন, তাঁরই মধ্যে অবস্থিত আর মহাপ্রলয়ের সময়ে জগৎ তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করবে। অতএব তিনিই একমাত্র পরম গতি।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসপ্রসঙ্গে প্লক্ষদ্বীপাদিকথন নামে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, পুষ্কর দ্বীপের বিস্তার শাক দ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। এটি ক্ষীরোদ সমুদ্রকে বেষ্টন করে আছে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এই দ্বীপে একটিই পর্বত—তার নাম মানসোত্তর। এর বিস্তার সহস্র যোজন, উচ্চতা পঞ্চাশ যোজন, চারদিকের পরিমণ্ডলের বিস্তারও তাই। সেই দ্বীপের অর্ধেক অংশকে মানসোত্তর বলে। একমাত্র সেই মহাদ্বীপটিই সন্নিবেশের পার্থক্য অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত। এই দ্বীপে আরো দুটি সুন্দর জনপদ আছে। মানস পর্বতের মতো সেই দুটিও মণ্ডলাকৃতি। এতে দুটি বর্ষ আছে একটির নাম মহাবীত বর্ষ অন্যটির নাম ধাতকীখণ্ড বর্ষ। পুষ্কর দ্বীপকে বেষ্টন করে আছে সুস্বাদু জলের সমুদ্র। সেই দ্বীপে দেবতাদেরও পূজিত একটি বিশাল বটবৃক্ষ আছে। তাতে বাস করেন বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ব্রহ্মা। হে শ্রেষ্ঠ মুনিরা, সেখানে শিব নারায়ণের মন্দির আছে। তাতে মহাদেব হরিহর মূর্তিতে বিরাজ করেন। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা, কুমার প্রমুখ যোগী আর গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা তাঁর পূজা করেন। সেই ঈশ্বরই অব্যয় আর কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণধারী। সেখানে ব্রহ্মার তুল্য রূপবান প্রজারা সুস্থ, নীরোগ, শোকহীন আর রাগদ্বেষবিহীন। সেখানে সত্য-মিথ্যা নেই, উত্তম-মধ্যম-অধম-ভেদ নেই, বর্ণাশ্রম ধর্ম নেই। সেখানে নদী বা পর্বতও দেখতে পাওয়া যায় না। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, বিশাল স্বাদুজলের সমুদ্র পুষ্কর দ্বীপকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। তার পরে বিপুল লোকবসতি দেখা যায়। তার দ্বিগুণ সুবর্ণময়ী ভূমি যেন এক শিলাখণ্ডের মতো বর্তমান রয়েছে। তার পরে রয়েছে গগনচুম্বী একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত—যার অর্ধেক অংশ প্রকাশিত আর বাকী অর্ধেক অপ্রকাশিত। সেই পর্বতের নামই লোকালোক। ঐ লোকালোক পর্বতের উচ্চতা দশহাজার যোজন, বিস্তারও তাই। তার পরে অণ্ডকটাহের দ্বারা বেষ্টিত অন্ধকার ঐ পর্বতের চারদিক আবৃত করে আছে।

এই সাত মহালোক আর পাতালের কথা বল হল। ব্রহ্মাণ্ডের অসীম বিস্তারের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সেই সর্বগামী মূলপ্রকৃতি কারণরূপী অব্যয়াত্মা ভগবানের এই রকম অণ্ড হাজার হাজার কোটি কোটি আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই চোদ্দটি করে ভুবন আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, রুদ্র, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই আছেন। হে ব্রাহ্মণগণ, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি ও মহৎ তত্ত্ব—এই যে সাতটি আবরণ ব্রহ্মাণ্ডকে সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, তারা পর পর একে অন্যের চেয়ে দশগুণ বেশী বিস্তৃত। সেখানে জ্ঞানীরাই যেতে পারেন। অনন্ত, অদ্বিতীয়, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, মহৎ, জগতের প্রকৃতিস্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্মই এই সমস্ত কিছু অতিক্রম করেও বিরাজ করছেন। অনন্তের সংখ্যা নেই, তাই তিনি অনন্ত। সেই কারণে সেই পরমধ্রুব ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলে জানবেন। সর্বত্র সমস্ত স্থানেই এই পরমধ্রুব ব্রহ্মকে অনন্ত নাম দেওয়া হয়েছে। আমিও এর আগে তাঁর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যের কথা বলেছি। এই মহান তেজঃস্বরূপ সর্বত্রগামী ব্রহ্ম সর্বস্থানেই পূজিত হন। তিনি যে ভূমি, রসাতল, আকাশ, পবন, অনল, সমুদ্র, স্বর্গ, অন্ধকার আর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পুরুষোত্তমই অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে লীলা করে থাকেন। সেই মহেশ্বরই অব্যক্তেরও পরস্থিত। অব্যক্ত থেকেই অণ্ড উৎপন্ন, অণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়েছেন ব্রহ্মা আর তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে ভুবনকোষ বিন্যাসনামে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, অতীত এবং ভবিষ্যৎকালে যে সব মনুর অধিকার ছিল ও হবে, সেই কথা এবং দ্বাপরযুগের ব্যাসেদের কথা আমাদের বল। আর, বেদশাখাপ্রণয়নকারী, দেবদেব ধীমান ঈশানের ধর্মরক্ষার জন্য কলিযুগে যে সব অবতার হয়, সে-কথাও এই সঙ্গে বল। কলিযুগে দেবদেবের শিষ্য সংখ্যা কত? সূত, এই সব কথা সংক্ষেপে বল।

সূত বললেন, এ পর্যন্ত ছ'জন মনুর অধিকার অতীত হয়েছে। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু ও তারপর স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ—এই সেই ছ'জনের নাম। এর পরে বৈবস্বত মনু—যিনি এই সপ্তম মন্বন্তরের অধিকর্তা। কল্পের শুরুতে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারের কথা বলেছি। তারপর স্বারোচিষ মন্বন্তরের কথা শুনুন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত তুষিতেরা দেবতা। এই সময়ে বিপশ্চিৎ নামে দেবরাজ অসুর বিনাশ করেছিলেন। ঊর্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দম্ভোলি, বৃষভ, তিমির আর অর্চরীবান—এই সাতজন এই সময়কার ঋষি। স্বারোচিষের চৈত্র, কিংপুরুষ প্রভৃতি পুত্র জন্মেছিল। এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা বলা হল।

এখন উত্তম মনুর অধিকারের কথা শুনুন। তৃতীয় মন্বন্তরের মনুর নাম উত্তম। এই মন্বন্তরে শত্রুনাশক সুশান্তি নামে দেবরাজ। দেবতারা এই সময়ে পাঁচভাগে দ্বাদশ গণে বিভক্ত—সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দন আর বশবর্তী। এই সময়ে যে সাতজন ঋষি হয়েছিলেন তাঁদের নাম—রজঃ, গোত্র, ঊর্ধ্ববাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। তামস মন্বন্তরে সুরাব, হরি, সত্য, সুধী প্রভৃতি সাতাশটি গণদেবতা। শতযজ্ঞকারী, শংকর-ভক্ত, মহাদেবের পূজায় নিরত শিবি এই সময়ে ইন্দ্রপদ লাভ করেন। জ্যোতির্ধাম, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর—এই মন্বন্তরে এই হল সাতজন ঋষির নাম। হে ব্রাহ্মণগণ, পঞ্চম মন্বন্তরে মনুর নাম রৈবত, দেবরাজের নাম বিভু। ইনি অসুর মর্দন করেছিলেন। এই সময়ে অমিতভূতি আর বৈকুণ্ঠ নামে চতুর্দশভাগে বিভক্ত চতুর্দশটি গণদেবতা। হে বিপ্রগণ, রৈবত মন্বন্তরে সাতজন ঋষির নাম হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্ধ্ববাহু, বেদবাহু, সুবাহু আর সুপর্জন্য। স্বারোচিষ, উত্তম, তামস আর রৈবত—এই চার মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে দ্বিজগণ, ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু এবং মনোজব নামে দেবরাজ। দেবতাদের কথাও শুনুন। এই সময়ে আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুক আর লেখ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত মহানুভব দেবতা এবং এঁদের প্রত্যেকের আটটি করে গণ। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অভিমান আর সহিষ্ণু। হে বিপ্রগণ, এখন সপ্তম মন্বন্তরে মহাদ্যুতি, শ্রীমান, সূর্যপুত্র শ্রাদ্ধদেবই মনু। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দেবতা এবং শত্রুসংহারক পুরন্দর ইন্দ্র। বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—এই সাতজন ঋষি। এই মন্বন্তরে অতুলনীয় ও সত্ত্ব-গুণাবলম্বী বিষ্ণুশক্তি রক্ষার জন্য অবস্থিত। সমস্ত রাজা ও দেবতারা তাঁর অংশ থেকে উৎপন্ন। হে দ্বিজগণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পুরাকালে আকূতির গর্ভে রুচি প্রজাপতির এক মানসপুত্রের জন্ম হয়, তাঁরই অংশে রৌচ্য মনুর জন্ম। তারপর আবার স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হলে তুষিতার গর্ভে তুষিত দেবতাদের সঙ্গে তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। উত্তম মন্বন্তরে শ্রেষ্ঠ দেব সত্যরূপ জনার্দন বিষ্ণু সত্যার গর্ভে সত্য নামে উৎপন্ন হন। তামস মন্বন্তর উপস্থিত হলে তিনি আবার হর্যার গর্ভে হরিরূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

রৈবত মন্বন্তরে সংকল্পার গর্ভে মহাদ্যুতি হরি মানস দেবতাদের সঙ্গে মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ দেবগণের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হলে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই মহাত্মাই তিনটি পাদক্ষেপ করে এই সমগ্রলোক জয় করেন ও নিষ্কণ্টক তিনটি লোক ইন্দ্রকে দান করেন। হে ব্রাহ্মণগণ, এই ভাবে যথাক্রমে সাত মন্বন্তরে ভগবান সাত রকম শরীর ধারণ করেছিলেন। এর ফলেই প্রজারা রক্ষা পেয়েছিল। মহাত্মা বামনের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বই আক্রান্ত হয়েছিল—এই জন্য প্রবেশার্থক 'বিশ্' ধাতু থেকে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে—এ-কথাই সকলে বলে থাকেন। এই সর্বভূতের অন্তরাত্মা নারায়ণ ভগবান কেশবই প্রথমে সকলের সৃষ্টি করেন, তার পরে পালন এবং শেষে সকলের ধ্বংস করেন। এ-কথা শ্রুতিতে বলা হয়েছে। এই নারায়ণই এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন এবং ইনি নির্গুণ হয়েও সগুণ আর সেই ভাবেই চারভাগে বিভক্ত হয়ে জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছেন। তাঁর একটি মূর্তি জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িণী, নির্মলা, কলারহিতা ও গুণাতীতা। এই মূর্তিকেই 'বাসুদেব' নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় মূর্তিটি তামসী। এরই নাম শিব। এরই অন্য নাম কাল। এই বৈষ্ণবী পরমা তনুই প্রলয়কালে সকলের নিধন করে থাকে। তাঁর সত্ত্বগণময়ী তৃতীয়া ভাগবতী মূর্তির নাম প্রদ্যুম্ন। এই প্রদ্যুম্ন নাম্নী ভগবতী নিত্যা প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ সংস্থাপন করেন। বাসুদেবের চতুর্থী মূর্তিটি রজো-গুণাশ্রিতা। এটিই প্রদ্যুম্নের সৃষ্টিকারিণী 'অনিরুদ্ধ' বলে কীর্তিত হয়। একেই 'ব্রহ্মা' নামেও অভিহিত করা হয়। যে প্রভু সব কিছু ধ্বংস করে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে নিদ্রা যান, সেই নারায়ণ নামক ব্রহ্মাই প্রজা সৃষ্টি করে থাকেন। প্রদ্যুম্নরূপিণী মঙ্গলময়ী নারায়ণ তনুই দেব-অসুর-মনুষ্য প্রভৃতির সঙ্গে বর্তমান সমস্ত বিশ্বকে মোহিত করেন। সেই একমাত্র অনন্তমূর্তি নির্গুণ বাসুদেব হরিই সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থানরূপা প্রকৃতি। প্রধান, পুরুষ, কাল এবং তিনটি অতুলনীয় তত্ত্ব—এই সব বাসুদেবাত্মক নিত্য বিষয় যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। সেই অচ্যুত, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, ভগবান হরি চতুষ্পাদ বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিষ্ণু নারায়ণ স্বয়ং হরিই স্বেচ্ছায় বিশুদ্ধচিত্ত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঋষি বা দেবতা কেউই সেই অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্মকে জানেন না। একমাত্র সেই নারায়ণরূপী ব্যাসই তাঁকে জানতে পেরেছেন।

হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, এই সেই ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের কথা বলা হল। এ কথা সত্য—অবশ্যই সত্য। এ-কথা জানলেই মুক্তি লাভ হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে মন্বন্তরকীর্তনপ্রসঙ্গে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বিষয়ে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন, এই যে মন্বন্তর চলেছে, এতে পুরাকালে প্রথম দ্বাপরযুগে প্রভু মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু 'ব্যাস' হয়েছিলেন। প্রভু ব্রহ্মার নিয়োগ অনুসারে তিনি বেদকে বহু ভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রজাপতি ব্যাস হয়েছিলেন। তৃতীয় দ্বাপরে উশনা ব্যাস হয়েছিলেন। চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা,

ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু, সপ্তম দ্বাপরে ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ঋষভ, দ্বাদশে সুতেজা, ত্রয়োদশে ধর্ম, চতুর্দশে সচক্ষু, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণি, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋতঞ্জয়, ঊনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে বাচশ্রবা, দ্বাবিংশে নারায়ণ, ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু, চতুর্বিংশে বাল্মীকি, পঞ্চবিংশে শক্তি, ষড়বিংশে পরাশর আর সপ্তবিংশ দ্বাপরে মহামুনি জাতুকর্ণ্য ব্যাস হয়েছিলেন। হে দ্বিজগণ, তারপর এই অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগ এলে পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হয়েছেন। ইনিই সমস্ত বেদ আর পুরাণ প্রদর্শন করেছেন। নারায়ণের অংশ, পরাশরনন্দন, মহাযোগী প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দেবদেব ঈশানের আরাধনা করে তাঁর প্রসাদেই বেদসমূহের বিভাগ করেছেন। তারপর তিনি জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন আর পৈল নামে বেদ-পারঙ্গম চারজন শিষ্যকে যথাক্রমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর পঞ্চম শিষ্য হলাম আমি। তাঁদের মধ্যে পৈল ঋগ্বেদ পাঠক, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের বক্তা, জৈমিনি সামবেদ পাঠক, শ্রেষ্ঠ ঋষি সুমন্তু অথর্ববেদের বক্তা হয়েছেন। আর আমি হয়েছি ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির বক্তা। যজুর্বেদ এক ছিল, তাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই জন্যই তার দ্বারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞ হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, যজুসমূহের দ্বারাই আবার আধ্বর্য্য হয়েছে এবং ঋকমন্ত্র দ্বারা হয়েছে হোত্র। সামের দ্বারা ঔদ্গাত্র এবং অথর্বমন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মত্ব কল্পিত হয়েছে। তার পরে প্রভু বেদব্যাস ঋক দ্বারা ঋগ্বেদ উদ্ধার করেছেন, যজুর্বেদকে উদ্ধার করেছেন যজুঃ দিয়ে আর সামবেদকে সাম দিয়ে। প্রথমে তিনি ঋগ্বেদকে একুশটি ভাগে ভাগ করেছেন, যজুর্বেদকে ভাগ করেছেন একশোটি শাখায়, সামবেদকে একহাজার শাখায় ও অথর্ববেদকে নটি শাখায়। ব্যাস পুরাণকে ভাগ করেছেন আঠারোটি ভাগে। এইমাত্র সর্বদোষের বিশোধক ওংকারই সেই পুরাতন চতুষ্পাদ বেদ। এরা আগেই ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। ভগবান সনাতন বাসুদেবকেই একমাত্র বেদসমূহের দ্বারা জানা যায়। তাঁর কথাই বেদে বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এই যে ভগবান বাসুদেব, ইনিই পরতর ব্রহ্ম, আনন্দময় উত্তম জ্যোতি, বেদবাক্যের দ্বারা বোধিত পরম তত্ত্ব এবং পরম পদ। বেদনিষ্ঠ মুনিরা এই বেদকে বা বেদবিদ্যাকে জানেন। কিন্তু যা উৎকৃষ্ট ও জ্ঞানের অগোচর, তা সদা বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরই জানেন। সুতরাং সেই বেদবেদ্য ভগবান বেদমূর্তি মহেশ্বরই একমাত্র জ্ঞেয় ও বেদস্বরূপ। তাঁকে আশ্রয় করলেই মুক্তি হয়। পরাশরতনয় মহামুনি ব্যাসদেব এই অক্ষর, বেদ্য, ওঙ্কাররূপী, অব্যয় বেদ এবং অবিজ্ঞের তত্ত্বকেও জানেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে বেদব্যাসকথনপ্রসঙ্গে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ, দ্বাপর যুগে বেদব্যাসের অবতারদের কথা বলা হল। এখন কলিযুগে মহাদেবের অবতারদের কথা বলি, শুনুন। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রথম কলিযুগে ব্রাহ্মণের হিতের জন্য সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হিমালয়ের চূড়ায় মহাদ্যুতি দেবদেব শ্বেত নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বহু অমিতদীপ্ত শিষ্য প্রশিষ্য হয়। সেই সময়ে শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাস্য ও শ্বেতলোহিত নামে চারজন মহাত্মা বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্যন্ত যথাক্রমে সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কণ, যোগীন্দ্র আর লোকাক্ষি মহাদেবের অবতার হয়েছিলেন। সপ্তম কলিযুগে মহা-

দেবের অবতার হয়েছিলেন জৈগীষব্য, অষ্টমে দধিবাহ, নবমে প্রভু ঋষভ, দশমে ভৃগু, একাদশে উগ্র, দ্বাদশে অত্রি, ত্রয়োদশে বালী, চতুর্দশে গৌতম, পঞ্চদশে বেদশীর্ষা, ষোড়শে গোকর্ণ, সপ্তদশে গুহাবাসী শিখণ্ডধৃক, অষ্টাদশে জটামালী, উনবিংশে অট্টহাস, বিংশে দারুক, একবিংশে লাঙ্গলী, দ্বাবিংশে মহায়াম, ত্রয়োবিংশে মুনি, চতুর্বিংশে শূলী, পঞ্চবিংশে পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, ষড়বিংশে সহিষ্ণু, সপ্তবিংশে সোমশর্মা, আর অষ্টাবিংশ কলিযুগে স্বয়ং নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার। বৈবস্বত মন্বন্তরে শেষ কলিযুগে কায়াবতার তীর্থে দেবেশ নকুলীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবের অষ্টাবিংশ অবতার হবেন। তখন দেবাদিদেবের চারজন শিষ্য হবেন। তারা সকলেই তপোনিধি আর মুনিশ্রেষ্ঠ হবেন। তারা সকলেই প্রসন্নমনা, সংযত ও ঐশ্বর ভক্তিপরায়ণ হবেন। সেই যোগী আর শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্দের নাম যথাক্রমে বলছি—

দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, কেতুমান, বিশোক, বিকেশ, বিশাখ, শাপনাশন, সুমুখ, দুর্মুখ, দুর্দম, দুরতিক্রম, সনক, সনন্দ, কুমার, সনাতন, মহাযোগী বাষ্কল—এঁরা ধর্মাত্মা ও অতি তেজস্বী। সুনামা, বিরজা, শঙ্খবাণী, অজ, সারস্বত, মেঘ, ঘনবাহ, সুবাহন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, পরাশর, গর্গ, ভার্গব, অঙ্গিরা, চলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশক, সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যাসাধ্য, সুধামা, কাশ্যপ, বিরজা, বশিষ্ঠ, অত্রি, উগ্র, শ্রবণ, বৈদ্য, কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর, কুনেত্র, কশ্যপ, উশনা, চ্যবন, বৃহস্পতি, উতথ্য, বামদেব, মহাকায়, মহানিল, বাচঃশ্রবা, সুকেশ, শ্যাবাশ্ব, শপথীশ্বর, হিরণ্যনাভ, কৌশিল্য, লোকাক্ষি, কুথুমি, সুমন্তবর্চস, বিদ্বান কবন্ধ, কুশিকন্ধর, প্লক্ষ, দার্বায়ণি, কেতুমান, গৌতম, তল্লাচী, মধুপিঙ্গ, শ্বেতকেতু, উষিজ, বৃহদক্ষ, দেবল, কবি, শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব, শরদ্বসু, ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুন্ত, প্রবাহক, উলক, বিদ্যুৎ, সার্দ্রক, আশ্বলায়ন অক্ষপাদ, কুমার, উলূক, বসুবাহন, কুণিক, গর্গ, মিত্রক আর রুরু—এই সব মহাত্মা যোগীদের সম্পূর্ণ আবর্তে শিষ্য হবেন। এঁরা সকলেই নির্মল, ব্রহ্মভূমি স্থিত ও জ্ঞানযোগপরায়ণ। এঁরা ব্রাহ্মণদের হিতের জন্য ও বেদের স্থাপনের জন্য যোগেশ্বরদের আদেশে অবতার করবেন। যে সব ব্রাহ্মণ এঁদের স্মরণ বা নমস্কার করবেন, এঁদের উদ্দেশে তর্পণ করবেন, তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবেন।

এই বৈবস্বত মন্বন্তরের কথা সবিস্তারে বললাম। তারপর হবে সাবর্ণ ও দক্ষসাবর্ণ মন্বন্তর। তারও পরে ব্রহ্মসাবর্ণ মন্বন্তর হবে। এটি দশম মন্বন্তর। একাদশ মন্বন্তরের নাম ধর্মসাবর্ণ, দ্বাদশ মন্বন্তরের নাম রুদ্রসাবর্ণ, ত্রয়োদশ মন্বন্তরের নাম রৌচ্য, চতুর্দশ মন্বন্তরের নাম ভৌত্য। এই সব মন্বন্তরেই মনুর নাম ভবিষ্যৎ। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের আখ্যানের দ্বারা বিস্তারিত, নারায়ণ কথিত কূর্মপুরাণের পূর্বভাগ আপনাদের কাছে বলা শেষ হল।

যে ব্যক্তি এটি পাঠ করে বা ব্রাহ্মণদের শ্রবণ করায় সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে। স্নানের পর দেবালয় বা নদীতীরে এটি পাঠ করতে হয়। এই পাঠ শুরু করার আগে 'দেবদেবাধিদেব, পরমাত্মা, পুরাণপুরুষ, কূর্মরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার' এই বলে পুরুষোত্তম নারায়ণকে নমস্কার করবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই সঙ্গে পূর্বভাগও সমাপ্ত হল।

উপরিভাগ

ঈশ্বরগীতা

প্রথম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, সূত, তুমি আমাদের কাছে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টির কথা বলেছ, এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার আর বিভিন্ন মনুর অধিকারকালের কথাও বর্ণনা করেছ, তাতে যে ঈশ্বরেশ্বর দেবকেই ধর্মনিষ্ঠ জ্ঞানযোগী বর্ণিগণের আরাধনা করা উচিত সে-কথাও বলা হয়ে গিয়েছে ; আবার সমস্ত সংসারের আর্তিনাশক পরম তত্ত্বসমূহের কথাও তুমি বলেছ। এর সাহায্যে আমরা সেই ব্রহ্মবিষয়ক পরম জ্ঞান লাভ করতে পারি। হে প্রভু, তুমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কাছ থেকে সমস্ত বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছ। তার ফলে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছ। তাই আমরা আবার তোমার কাছে কিছু প্রশ্ন রাখব।

পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত মুনিদের এই কথা শুনে প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে স্মরণ করে বলবার উপক্রম করলেন। এমন সময়ে ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস স্বয়ং সেই মুনিদের যজ্ঞস্থলীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেই বেদবিৎ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতো দ্যুতিমান, পদ্মপলাশলোচন ব্যাসকে দেখে ব্রাহ্মণগণ প্রণাম জানালেন। সূত লোমহর্ষণ ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হলেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর পাশে অবস্থান করতে লাগলেন। শৌনক প্রমুখ মুনিগণ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং কাছে এসে উপযুক্ত আসনে তাঁকে বসতে দিলেন।

তারপর পরাশরনন্দন প্রভু ব্যাস তাঁদের বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ, তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শ্রুতিবিষয়ে আপনাদের কোন বিঘ্ন হচ্ছে না তো ? তখন সূত তাঁর গুরু মহামুনি ব্যাসকে প্রণাম করে বললেন, হে গুরু, এই মুনিদের কাছে সেই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করবার আপনিই উপযুক্ত আচার্য। কারণ এঁরা সকলেই শান্ত, তপস্যানিষ্ঠ, ধার্মিক এবং উপদেশ শোনার ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় অভিলাষী। তাই আপনি যথার্থ ভাবে সেই কথা বলতে পারেন। পুরাকালে কূর্মরূপী বিষ্ণু মুনিদের কাছে যে মোক্ষদায়ক দিব্যজ্ঞানের কথা বলেছিলেন, তাই এঁদের কাছে প্রকৃতরূপে বলতে আপনিই যোগ্য। এই দিব্যজ্ঞানের উপদেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। সত্যবতীপুত্র মুনি ব্যাস সূতের কথা শুনে রুদ্রদেবকে প্রণাম করে সুন্দর বাক্যে বলতে শুরু করলেন ঃ

পুরাকালে সনৎকুমার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ যোগীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বয়ং মহাদেব যা বলেছিলেন, সেই কথাই আমি বলব। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, অঙ্গিরা, রুদ্র, পরম-ধর্মজ্ঞ ভৃগু, কণাদ, কপিল, গর্গ, মহামুনি বামদেব, শুক্র ও বশিষ্ঠ প্রমুখ সংযতচিত্ত মুনিরা পরস্পর নানা রকম তর্কবিতর্ক করেও যখন চিত্তের সংশয় নিরসন করতে পারলেন না, তখন তাঁরা পুণ্যদায়ক বদরিকাশ্রমে ঘোর তপস্যা করলেন। তার ফলে তাঁরা দেখতে পেলেন মহাযোগী ঋষিশ্রেষ্ঠ, ধর্মসূত, অনাদি, অনন্ত, মুনিবর নরনারায়ণকে। সেই ভক্তিসমন্বিত যোগীরা সমস্ত বেদের নানা স্তোত্রে স্তব করে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ নরনারায়ণকে প্রণাম করলেন। তখন সর্বজ্ঞ ভগবান নারায়ণ তাঁদের মনোবাঞ্ছা জেনেও গম্ভীর বাক্যে প্রশ্ন করলেন, কেন আপনারা তপস্যা করছেন ? মুনিরা সম্মুখে আগত সিদ্ধিসূচক

বিশ্বাত্মা সনাতন দেব নারায়ণকে হৃষ্টচিত্তে বললেন, আমরা সকলে ব্রহ্মবাদী হলেও অত্যন্ত সংশয়ে আকুল হয়ে পুরুষোত্তম আপনার শরণ নিয়েছি। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণ অব্যক্ত পুরুষ ভগবান ঋষি নারায়ণ। পরম গুহ্য তত্ত্বগুলি আপনারই জ্ঞানগোচর। আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে জানে না। তাই আপনিই আমাদের এই অচল সংশয় নিরসন করুন। এই যে সমস্ত পদার্থ, এদের কারণ কি ? কে সর্বদা সংসারী ? আত্মা কে ? মুক্তি কি ? সংসারের হেতু কি ? সংসারের পতি ঈশ্বরই বা কে ? কে সমস্ত কিছু দর্শন করে ? সেই পরতর ব্রহ্মই বা কে ? হে দেব, এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথ বলুন। এই কথা বলে সনৎকুমার প্রমুখ মুনিরা দেখলেন যে সেই পুরুষোত্তম তাপস-বেশ পরিত্যাগ করে স্বকীয় তেজোমণ্ডলে বিরাজ করছেন। একটি জ্যোতিশ্চক্র তাঁর শোভা বর্ধন করছে। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, তপ্ত কাঞ্চনের মতো সেই দেবের প্রভা। শংখ, চক্র আর গদা রয়েছে তাঁর হাতে। নিকটেই দেবী লক্ষ্মী বর্তমান রয়েছেন। কিন্তু সেই সময় তাঁর বিপুল তেজে নরঋষিকে তাঁর কাছে দেখা গেল না। এমন সময়ে চন্দ্রশেখর মহাদেব রুদ্র মহেশ্বর প্রসাদ দানে উন্মুখ হয়ে সেই স্থানে আবির্ভূত হলেন। সনৎকুমার প্রমুখ মুনিগণ সেই ত্রিনয়ন, চন্দ্রভূষণ, জগৎপতি পরমেশ্বরকে দর্শন করে আনন্দিতচিত্তে ভক্তিসহকারে এইভাবে তাঁর স্তব করলেন: হে ঈশ্বর মহাদেব, আপনার জয় হোক। হে ভূতপতি শিব, আপনার জয় হোক। আপনি সমস্ত মুনিবৃন্দের ঈশ্বর। আপনাকে তপস্যার দ্বারা পূজা করা হয়। আপনার জয় হোক। আপনি সহস্র-মূর্তি, বিশ্বাত্মা, এই জগৎরূপ যন্ত্রের স্রষ্টা ; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আপনারই হাতে। হে অনন্ত, আপনার জয় হোক। হে সহস্রচরণ, ঈশান, শম্ভু, আপনাকে শ্রেষ্ঠ যোগীরা বন্দনা করে। আপনি অম্বিকাপতি। আপনার জয় হোক। হে দেব পরমেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। ভগবান ভক্তবৎসল মহাদেব এই ভাবে স্তুত হয়ে হৃষীকেশকে আলিঙ্গন করে গম্ভীর বাক্যে বললেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, এই ব্রহ্মবাদী মুনিরা কেন এখানে এসেছেন ? আমাকেই বা কী করতে হবে ? দেবদেব জনার্দন এই কথা শুনে অনুগ্রহ প্রদর্শনে উৎসুক মহাদেবকে বললেন, হে দেব, এই মুনিরা সকলেই তপস্বী। এঁদের পাপ ক্ষয় হয়েছে। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, তাঁরা এঁদের শরণ নেন। ভগবান যদি এই শুদ্ধচেতা মুনিদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সমক্ষে এঁদের সেই দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। হে শিব, একমাত্র আপনিই নিজের আত্মাকে জানেন। আপনি ছাড়া আর কেউই তা জানে না। তাই আপনি নিজে সেই আত্মাকে এই শ্রেষ্ঠ মুনিদের কাছে প্রদর্শন করুন। হৃষীকেশ এই কথা শুনে বৃষধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করে যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করলেন। তারপর মুনিবরদের বললেন, শূলধারী শংকর মহাদেবের দর্শন পেয়েছেন বলে আপনারা নিজেদের ধন্য মনে করুন। এখন আপনারা যথার্থ জ্ঞানলাভের অধিকারী হলেন। প্রত্যক্ষরূপে আপনাদের সামনে যে বিশ্বেশ্বর রয়েছেন, তাঁকে প্রশ্ন করুন ! ইনি আমার সামনে যথাযথভাবে সব কিছুই বলবেন। সনৎকুমার প্রমুখ মুনিরা বিষ্ণুর কথা শুনে বৃষধ্বজ মহেশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর কাছে নিজের নিজের প্রশ্ন রাখলেন। এমন সময়ে আকাশ থেকে একটি অচিন্ত্য, পবিত্র, মঙ্গলময়, দিব্য আসন ঈশ্বরের জন্য আবির্ভূত হল। বিশ্বস্রষ্টা যোগাত্মা মহেশ্বর নিজ তেজে চারদিক আলো করে বিষ্ণুর সঙ্গে সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিরা দেখলেন সেই উজ্জ্বল আসনের উপর দেবাদিদেব শংকরের কী অপূর্ব দীপ্তি ! যোগমগ্ন যোগীরা নিজ আত্মাতে আত্ম-

স্বরূপ যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, সেই বিপুলতেজা শান্ত শিবকে তাঁরা দেখতে পেলেন। যাঁর থেকে প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, যাঁর মধ্যেই আবার প্রাণীরা বিলীন হয়ে যায়, সেই ভূতনাথ ঈশ্বরকেই মুনিরা আসনে উপবিষ্ট দেখলেন। এই সমগ্র জগৎ যাঁর মধ্যে বিরাজ করছে এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁর থেকে অভিন্ন, সেই পরম ঈশান-মহেশ্বরই বাসুদেবের সঙ্গে মুনিদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। ভগবান মহেশ্বর সনৎকুমার প্রমুখ মুনিদের প্রশ্নে পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে যে শ্রেষ্ঠ স্বাত্মযোগের কথা মুনিদের কাছে বলেছিলেন, তাই আমি বলছি। হে নিষ্পাপ মুনিগণ, আপনারা শান্ত মনে ঈশ্বরপ্রোক্ত সেই জ্ঞানের কথা শুনুন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্‌ভগবদঈশ্বরগীতা উপনিষদ্‌গুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে ঋষ্যাদিসংবাদে জ্ঞানযোগ নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর বলতে শুরু করলেন ঃ হে দ্বিজগণ, দেবতারা চেষ্টা করেও এই আত্মগুহ্য সনাতন বিজ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। তাই এই বিজ্ঞান কারো কাছে বলা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করলেই দ্বিজাতিরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এর পূর্বে দ্বিজেরা এই জ্ঞানের বলেই ব্রহ্মবাদী হয়েছেন, তাঁদের সংসারে জড়িয়ে পড়তে হয় নি। এই বিজ্ঞান গুহ্য থেকেও গুহ্যতম, একে অতি যত্নে গোপন করে রাখতে হয়। কিন্তু তোমরা অত্যন্ত ভক্তিমান ও ব্রহ্মবাদী। তাই আজ তোমাদের কাছে এ কথা বলব।

এই আত্মা, অদ্বিতীয়, নির্মল, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সনাতন, সর্বভূতের অন্তরস্থিত, সাক্ষাৎ চেতনামাত্র আর তমোগুণের অতীত। এই আত্মাই অন্তর্যামী, ইনিই পুরুষ, প্রাণ, মহেশ্বর, কাল, অব্যক্ত ব্রহ্ম, বেদ আর শ্রুতি। এই আত্মা থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি, আবার এই আত্মাতেই বিশ্বের লয়। মায়ার আধার এই আত্মাই যখন মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন, তখনই তিনি নানা প্রকার দেহের সৃষ্টি করেন। এই স্বাধীন আত্মা কোথাও যান না, সংসারেও জড়িয়ে পড়েন না। ইনি পৃথিবী নন, জল, তেজ, বায়ু বা আকাশও নন। ইনি প্রাণ, মন, অব্যক্ত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নন, এদের কর্তাও নন। ইনি বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু বা উপাস্থও নন। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, এই আত্মা কর্তাও নন, ভোক্তাও নন। ইনি প্রকৃতিও নন, পুরুষও নন। ইনি মায়া নন, প্রাণ বা পরমার্থও নন। আলোক আর অন্ধকারের যেমন পরস্পর সম্পর্ক নেই, সেই রকম প্রপঞ্চ আর পরমাত্মারও পরস্পর কোন সম্বন্ধ নেই। জগতে যেমন ছায়া আর রৌদ্রের স্বভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ, সেই রকম প্রপঞ্চ আর পুরুষও একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জলের মতো স্বচ্ছ এই আত্মার যদি একবার স্বরূপত বিকার ঘটে তাহলে শত শত জন্মেও তার মুক্তি হয় না। যাঁরা মুক্ত সেই মুনিরাই অবিকারী অদ্বিতীয় আনন্দরূপ ও অব্যক্ত স্বকীয় আত্মাকে যথার্থরূপে দর্শন করেন। আমি কর্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি স্থূল—এই রকম যে সব বুদ্ধি আছে, সেগুলি কেবল অহংকার বশে আত্মাতে আরোপিত। বেদবিদ্বানগণ বলেন যে আত্মাই সব কিছুর সাক্ষী, প্রকৃতির পরস্থিত, ভোক্তা, অক্ষর, চেতন আর সর্বত্র অবস্থিত। তাই সব দেহীর পক্ষেই সংসারের মূল হল অজ্ঞান। অজ্ঞান বা অন্য রকম জ্ঞান থেকেই তত্ত্বগুলির প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ঘটে। জ্যোতির্ময় আত্মা স্বয়ং নিত্যউদিত, সর্বত্র-

গামী আর পরমপুরুষ। তা সত্ত্বেও যে লোক মনে করে আমিই কর্তা তার একমাত্র কারণ হল অহংকারজনিত বিচারবুদ্ধির অভাব। এই অব্যক্ত, নিত্য, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার, প্রধান, প্রকৃতি আর বুদ্ধির কারণভূত আত্মাকে ব্রহ্মবাদী ঋষিরাই দর্শন করে থাকেন। সেই জন্যই স্বীয় আত্মা কূটস্থ বা কলুষরহিত হলেও প্রকৃতির সঙ্গে তার সঙ্গম ঘটে। তার ফলেই নিজের অক্ষয় আত্মাকে ব্রহ্ম বলে যথার্থরূপে মানুষ চিনতে পারে না। যা আত্মা নয়, তাকে আত্মা বলে জানলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, আর এই ভ্রান্তি থেকে জন্ম নেয় রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষ। কর্মই এর দোষ, এটা পুণ্য, এটা পাপ এই হল এর স্থিতি। তারই বশে দেহের উৎপত্তি হয়। নিত্য, সর্বত্রগামী, কূটস্থ আর দোষরহিত আত্মা নিজের শক্তির বশে একাকী অবস্থান করেন, মায়ার সঙ্গে থাকেন না। তাই মুনিরা আত্মাকে বস্তুত অদ্বিতীয় বলেন। অব্যক্তের স্বভাব বলে যে মদ উৎপন্ন হয়, তাই হল আত্মাশ্রয়ী মায়া। ধূমের সংসর্গে যেমন আকাশ মলিন হয় না, তেমনি অন্তঃকরণে জাত ভাবগুলি আত্মাকে প্রভাবিত করে না। স্ফটিক পাথর যেমন আপন প্রভায় দীপ্তি পায়, তেমনি আত্মাও উপাধিমুক্ত ও নির্মল হয়ে প্রকাশিত হন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জগৎকে জ্ঞানস্বরূপই বলেন। কিন্তু যাদের দৃষ্টি কলুষিত তারা বলে জগৎ অর্থস্বরূপ। কূটস্থ, নির্গুণ, ব্যাপক আর স্বভাবত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যারা অর্থরূপে দর্শন করে তাদের দৃষ্টিই ভ্রান্ত। কুঁচ-ফল ইত্যাদি উপাধির প্রভাবে স্ফটিককেও রক্তবর্ণ বলে লোকের মনে হয়। সেই রকম পরমপুরুষ আত্মাও অন্য বস্তুর আরোপের ফলে রাগ প্রভৃতি যুক্ত বলে প্রতিভাত হন। তাই অক্ষর, শুদ্ধ, নিত্য, সর্বত্রগামী আর অব্যয় আত্মাকেই মুমুক্ষুদের মনন, শ্রবণ আর নিদিধ্যাসনের বিষয় করা উচিত। সর্বত্র সর্বকালে শ্রদ্ধাসম্পন্ন যোগীর মনে যখন চৈতন্যের উদয় হয়, তখনই যোগী স্বয়ং আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট হন। নিজের আত্মাতে সমস্ত ভূতকে এবং সমস্ত ভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করতে পারলে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আর যখন সমাধিমগ্ন হয়ে সমস্ত ভূতকে আর দর্শন করতে পারেন না, তখন সেই পরমের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে তিনি কৈবল্য লাভ করেন। যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনা নিঃশেষে গত হয়, তখন পণ্ডিত অমৃত হয়ে গিয়ে ক্ষেম লাভ করেন। যখন সমস্ত ভূতের পৃথক পৃথক ভাবকে একই স্থানে সমবেত বলে অনুভব করেন, তখন থেকেই তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের বিস্তার ঘটে। আর যখন কেবল আত্মাকে পরমার্থরূপে ও সমস্ত জগৎকে মায়ামাত্র বলে উপলব্ধি করা যায়, তখন আসে নিবৃত্তি। জন্ম, জরা, ব্যাধি, দুঃখ—এই সব কিছুর একমাত্র ঔষধ রূপে যখন ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন শিবত্বলাভ হয়। পৃথিবীতে যেমন সমস্ত নদ নদী সাগরে গিয়ে মিশে সাগরের সঙ্গেই অভিন্ন হয়ে যায়, সেই রকম আত্মাও সেই নিষ্ফল অক্ষরের সঙ্গে একীভূত হয়। তাই বিজ্ঞানই সত্য, প্রপঞ্চও নয়, সংস্থিতিও নয়। অজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান আবৃত হলে মোহ উপস্থিত হয়। যা সূক্ষ্ম, নির্মল, অব্যয় আর নির্বিকল্প তাই বিজ্ঞান। তার থেকে ভিন্ন যা কিছু সে সবই অজ্ঞান। অজ্ঞান না থাকলে তবেই বিজ্ঞান হয়। তোমাদের কাছে এই পরম সাংখ্যজ্ঞানের কথা বিশদ ভাবে বললাম। এ হল বেদান্তের সার কথা। এতে একাগ্র হওয়ার নামই যোগ। যোগ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তেমনি আবার জ্ঞান থেকেও যোগ শুরু হতে পারে। তাই যোগ আর জ্ঞানে যিনি একনিষ্ঠ তাঁর অপ্রাপ্য কী আছে? যোগীরা যা পেয়ে থাকেন, সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞানীরাও তাই পেয়ে থাকেন। তাই যিনি সাংখ্য আর যোগকে এক বলে জানেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। হে ব্রাহ্মণ-গণ, অন্য যে যোগীরা ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে তাতেই মগ্ন হয়, তাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ।

জ্ঞানযোগমুক্ত ব্যক্তিরা দেহাবসানে অমল, মহৎ আর সর্বসম্মত দিব্য ঐশ্বর্য পেয়ে থাকেন। সমস্ত বেদেই বলা হয়েছে যে এই আমিই আত্মা। আমি অব্যক্ত, মায়াবী, পরমেশ্বর, সর্বাত্মা, সর্বতোমুখ, সর্বরূপ, সর্বরস, সর্বগন্ধ, অজর, অমর অন্তর্যামী ও সনাতন। আমার পাণিপাদ সারা বিশ্বে বিস্তৃত। অথচ আমার হস্ত পদ কিছুই নেই। আমি বেগবান, গ্রহীতা, হৃদিস্থিত। আমার চক্ষু নেই, অথচ আমি দেখি ; আমার কর্ণ নেই, তবু আমি শুনি। আমি সব কিছুই জানি। কিন্তু আমাকেকেউ জানে না। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আমি এক, পুরুষ ও মহান। নির্গুণ নির্মল আত্মার হেতুস্বরূপ যে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, তাকে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরাই দেখতে পান। আমার মায়ায় মোহিত হয়ে দেবগণও যা জানতে পারেন না, তোমরা ব্রহ্মবাদী বলেই সে-কথা তোমাদের কাছে বলছি। মন দিয়ে শোন। আমি সকলের শাসক নই, স্বভাবতই আমি মায়ার অতীত। তবু আমিই প্রেরয়িতা। এর কারণ জানেন পণ্ডিতেরা। যে তত্ত্বজ্ঞানী যোগীরা আমার সর্বত্রগামী গুহ্য দেহে প্রবেশ করেছেন, তারাই আমার সঙ্গে অব্যয় সাযুজ্য লাভ করেছেন। আমার বিশ্বরূপিণী মায়াকে যারা অতিক্রম করতে পেরেছেন, তারাই আমার সঙ্গে শুদ্ধ, পরম নির্বাণ লাভ করেছেন। আমার অনুগ্রহে শত কোটি কল্পেও তাদের আর সংসারে ফিরতে হয় না। হে শ্রেষ্ঠ যোগীরা, এই হল বেদের অনুশাসন। ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা কথিত এই যে সাংখ্যযোগাশ্রিত বিজ্ঞানের কথা বললাম, এই বিজ্ঞান পুত্র, শিষ্য আর যোগীদের প্রদান করতে হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যযোগ নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়েছে কাল, প্রধান আর পরমপুরুষ। কাল প্রভৃতি থেকেই আবার এই সমগ্র জগতের জন্ম। তাই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। যাঁর পাণিপাদের অন্ত সর্বত্র বিস্তৃত, যাঁর চক্ষু, মস্তক আর মুখ সর্বত্র অবস্থিত, সর্বত্র যাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় প্রসারিত, যিনি জগতের সব কিছু আবৃত করে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। সমস্ত ইন্দ্রিয় আর গুণের প্রতিবিম্ব তাঁর থেকেই জন্ম নেয়, অথচ তিনি নিজে সর্বেন্দ্রিয়রহিত, সকলের আধার, সদানন্দ, দ্বৈতশূন্য, অব্যক্ত। তাঁর কোন উপমান হয় না, তিনি প্রমাণের অতীত, অথচ প্রমাণগোচর, তিনি নির্বিকল্প, আভাসরহিত অথচ সর্বাভাস, পরম অমৃত, অভিন্ন হয়েও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংস্থিত, শাশ্বত, ধ্রুব, অব্যয়, নির্গুণ আর পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। পণ্ডিতরা এঁকেই জ্ঞান বলে নির্ণয় করেছেন। তিনিই সর্বভূতের আত্মা, তিনিই বাহ্য হয়েও আন্তর, তিনিই প্রধান, তিনিই আমি, তিনিই সর্বত্রগামী, শান্ত ও জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বকে আমিই ব্যাপ্ত করে আছি, সমস্ত ভূত আমারই মধ্যে অবস্থিত—এই রকম জ্ঞান যাঁর আছে, তিনিই বেদজ্ঞ। তত্ত্ব দুটি বলা হয়েছে—প্রধান আর পুরুষ। কিন্তু যে পরম কাল অনাদি বলে উদ্দিষ্ট হয়েছে, তা প্রধান আর পুরুষের সংযোগ থেকে উৎপন্ন। তাই এই তিনটি তত্ত্বই অনাদি অনন্ত রূপে অব্যক্তে অবস্থিত। কিন্তু আমার সেই রূপ তার সঙ্গে অভিন্ন হয়েও তার থেকে পৃথক। এ কথা জানেন পণ্ডিতরা। মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সমগ্র জগৎকে যিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি সমস্ত জীবের মোহ সৃষ্টি করেন। পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলে

প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করেন। কিন্তু অহংকারমুক্ত হওয়ার ফলে তিনিই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকারকে মহান বলে। কিন্তু বিজ্ঞাতার শক্তিবিজ্ঞানের ফলে তার থেকেই অহঙ্কার উৎপন্ন হয়েছে। একমাত্র মহানই আত্মা। তাকেই অহঙ্কার বলে। তত্ত্বচিন্তকগণ বলেন সেটিই জীব আর অন্তরাত্মা। জীবনের যে সুখ-দুঃখ, তাকে জানিয়ে দেয় অহঙ্কারই। তাই অহংকার বিজ্ঞানস্বরূপ। মন তার সাহায্যকারী। তাই অবিবেকের বশবর্তী হয়ে পুরুষ সংসারে প্রবেশ করে। প্রকৃতির সঙ্গে কালের মিলন ঘটলে অবিবেকের উৎপত্তি হয়। যেহেতু কালই ভূতগণের সৃষ্টি হেতু, কালই প্রজাদের সংহারক, তাই সকলেই কালের বশীভূত। কালকে কিন্তু কেউ বশীভূত করতে পারে না। সেই সনাতন কালই সকলের মধ্যগত হয়ে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কালকেই ভগবান প্রাণ, সর্বজ্ঞ আর পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। পণ্ডিতরা বলেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান। আবার মনের চেয়ে অহংকার শ্রেষ্ঠ, অহংকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহান, মহানের চেয়ে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তর চেয়ে পুরুষ আর পুরুষের চেয়ে প্রাণাত্মক ভগবান কালই শ্রেষ্ঠ। তাই সমস্ত জগৎ সেই কালেরই অধিকারে। প্রাণের চেয়ে আবার আকাশ শ্রেষ্ঠ, আকাশের চেয়ে ঈশ্বর অগ্নি। কিন্তু আমি শান্ত, অব্যয়, ব্রহ্ম আর মায়াতীত। এই সমগ্র জগৎ আমিময়। তাই আমার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নেই। সেজন্য আমাকে জানতে পারলেই মুক্তি হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের মধ্যে কিছুই নিত্য নয়—একমাত্র অব্যক্ত, ব্যোমরূপী, মহেশ্বর আমিই নিত্য। মায়াবী ও মায়াস্বরূপ সেই আমিই কালের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে সর্বদা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে চলেছি, আবার সংহারও করছি। তাই আমার সান্নিধ্য হেতুই সেই কাল সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং অনন্তাত্মা হয়ে নিয়োজিতও করে। এই হল বেদের অনুশাসন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে অব্যক্তাদিজ্ঞানযোগ নামে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বর বলতে লাগলেন, হে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, তোমরা সমাহিত হয়ে শোন। আমি এখন দেবদেবের মাহাত্ম্য-কীর্তন করব। এঁর দ্বারাই সমস্ত প্রবৃত্তি সংঘটিত হয়। নানা প্রকার তপস্যা, দান, যজ্ঞ—কিছুর দ্বারাই আমাকে জানা যায় না। একমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানা যায়। আমিই সমস্ত ভূতের অন্তরস্থিত হয়ে সর্বত্রগামী রূপে অবস্থান করি। কিন্তু হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সর্বসাক্ষী আমাকে জগতের কেউ জানতে পারে না। এই সব কিছুই যাঁর অভ্যন্তরে রয়েছে, আবার যিনি নিজেও সকলের অভ্যন্তরে রয়েছেন, আমিই সেই ধাতা, বিধাতা, কালাগ্নি, বিশ্বতোমুখ। মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মনুগণ, ব্রহ্মা, শক্র আর অন্য যাঁদের তেজ প্রসিদ্ধ, তাঁরা কেউই আমাকে দেখতে পান না। বেদসমূহে এই পরমেশ্বর আমিই নিত্যপ্রকাশিত। ব্রাহ্মণরা নানা প্রকার বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা একমাত্র আমারই যজন করেন। সমগ্র জগৎ, এমন কি পিতামহ ব্রহ্মারও আমি দৃষ্টিগোচর নই। কিন্তু সমস্ত ভূতের অধিপতি দেব ঈশ্বর আমাকেই যোগীরা ধ্যান করেন। সমস্ত হবিঃ আমিই ভক্ষণ করি, আমিই তার ফল প্রদান করি। আমিই সমস্ত দেবতার শরীর হয়ে সকলের আত্মারূপে সর্বত্র অবস্থান করছি। বেদবাদী ধার্মিক বিদ্বানগণ

ইহলোকেই আমাকে দেখতে পান। যারা নিরন্তর আমার উপাসনা করে, আমি সর্বদা তাদের সমীপে থাকি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের ধার্মিক ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করলে তাদের আমি সেই আনন্দময় পরম পদ দান করি। অন্য যে সব শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতি আছে, তারাও যদি নিজ-ধর্ম পালন করে ভক্তির সঙ্গে আমার উপাসনা করে তাহলে তারাও যথা সময়ে মুক্তি পায়। আমার ভক্তদের কখনও বিনাশ হয় না, আমার ভক্তদের সমস্ত পাপ দূর হয়। আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমার ভক্তের কখনই বিনাশ হবে না। আমার ভক্তকে যে নিন্দা করে সে দেবদেবেরই নিন্দা করে। যে তাকে ভক্তির সঙ্গে পূজো করে সে আমারই পূজো করে। যে ব্যক্তি আমার আরাধনার জন্য পত্র, পুষ্প, ফল আর জল আহরণ করে আমাকে অর্পণ করে সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় ভক্ত। আমিই জগতের আদিতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার থেকেই নিঃসৃত সমস্ত বেদরাশি তাঁকে দান করেছি। আমিই যোগীদের অব্যয়গুরু, ধার্মিকদের রক্ষাকর্তা আর বিদ্বেষীদের নিধনকর্তা। আমিই যোগীদের সংসার থেকে মুক্তি দিই, আবার আমিই তাদের সংসারে জড়াই। আমি নিজে কিন্তু সংসারের বাইরে। আমিই সকলের সংহার করি, সৃষ্টি করি ও পরিপালন করি। আমার শক্তিই লোকগণের মোহিনী মায়া, আমার প্রধানা শক্তিকেই বিদ্যা বলা হয়। আমি যোগীদের হৃদয়স্থ হয়ে সেই বিদ্যার দ্বারাই মায়ার ধ্বংস করি। আমিই সমস্ত শক্তির প্রবর্তক, নিবর্তক আর আশ্রয়। আমাতেই নিহিত আছে অমৃত। সকলের মধ্যেই মৎস্বরূপা ও আমাতে অধিষ্ঠিতা যে শক্তি আছে, সেটিই ব্রহ্মার রূপ ধরে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করে। আমার যে দ্বিতীয়া বিপুলা শক্তি, সেটিই নারায়ণ, অনন্ত, জগন্নাথ আর জগন্ময় হয়ে সর্ব জগৎ পালন করে। আমার যে তৃতীয়া মহতী শক্তি, সেটি তামসী। সেই শক্তিই কাল ও রুদ্ররূপিণী। সে জগতের সংহার করে। কেউ আমাকে ধ্যানে দর্শন করে, কেউ বা জ্ঞানের দ্বারা আমাকে জানতে পারে, কেউ আবার কর্মযোগের পথে আমাকে পায়, কেউ বা ভক্তিযোগ অবলম্বন করে আমাকে লাভ করে। কিন্তু যারা জ্ঞানপূর্বক সর্বদা আমার অর্চনা করে, সেই সমস্ত ভক্তেরই আমি ইষ্ট ও প্রিয়তম। যারা আমার আরাধনা করতে চেয়ে হরির প্রতি ভক্তি পোষণ করে তারাও আমাকে পায় এবং সংসারে আর ফিরে আসে না। আমিই প্রধান আর পুরুষরূপ সমস্ত জগৎকে বিস্তারিত করেছি। সমস্ত বিশ্ব আমারই মধ্যে অবস্থিত, আমিই সমগ্র জগৎকে সম্যকভাবে পরিচালিত করি। এ কথা যে জানে, সে-ই মুক্ত। স্বভাবত বর্তমান এই যে সমগ্র জগৎ, একে আমিই দেখছি আর ভগবান মহাযোগেশ্বর কাল এর কর্তা। স্বয়ং ভগবান ও মহাযোগেশ্বর আমাকেই যোগী আর মায়ী বলে শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেছেন। পরমেষ্ঠী পরম বলে সর্বতত্ত্বের যে মহত্ত্ব, তাই মহাব্রহ্মময়, অমল আর ভগবান ব্রহ্মা বলে কীর্তিত হয়। মহাযোগেশ্বরেশ্বর আমাকে যে এই রকম ভাবে জানে, সেই নির্বিকল্প যোগ লাভ করে। এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সেই আমি সকলের প্রেরয়িতা, লীলাময়, পরমানন্দসংশ্রিত আর যোগী হয়ে সর্বদা নৃত্য করে থাকি। যে এ কথা জানে সে-ই যোগবিৎ। এই সর্ববেদবিনিশ্চিত গুহ্যতম জ্ঞান যাকে তাকে দান করতে নেই। যে ব্যক্তির চিত্ত নির্মল, যে অগ্ন্যাধান করেছে আর যে ধার্মিক, তাকেই এই জ্ঞান দান করা উচিত।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে দেবদেবমাহাত্ম্য জ্ঞানযোগ নামে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাস বললেন, ভগবান পরমেশ্বর যোগীদের এই কথা বলে পরম ঐশ্বর ভাব প্রদর্শন করে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। সেই ঈশান পরম তেজোনিধি মহাদেবকে যারা নির্মল আকাশে বিষ্ণুর সঙ্গে নৃত্য করতে দেখেছেন, সেই সংযতচিত্ত যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগীরাই তাঁকে জানেন। আর তারাই সেই ভূতপতিকে আকাশে যথার্থরূপে দর্শন করেছেন। যাঁর সব কিছুই মায়াময়, যিনি এই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছেন, স্বয়ং নৃত্যমান সেই বিশ্বেশ্বরকে বিপ্রেরা দেখেছিলেন। যাঁর পাদপদ্ম স্মরণ করে পুরুষগণ অজ্ঞান থেকে জাত ভয়কে পরিত্যাগ করেন, সেই ভূতেশকেই তখন নৃত্যপর অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। শান্ত, অতন্দ্র, জিতশ্বাস আর ভক্তিমানেরা যে জ্যোতির্ময়কে দর্শন করেন, সেই যোগীকেই সেই সময় দেখা গিয়েছিল। যে ভক্তবৎসল দেব প্রসন্ন হলে সত্বর অজ্ঞানমুক্তি ঘটান, সেই একমাত্র মুক্তিপ্রদ রুদ্রই আকাশে দৃষ্ট হলেন। যাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র আকার ও সহস্র বাহু, যিনি জটাজুটধারী, অর্ধেন্দুশেখর, ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, যাঁর বিশাল ভুজে ধৃত রয়েছে শূল, যিনি দণ্ডপাণি, ত্রয়ীনেত্র, সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নি যাঁর তিনটি নয়ন, যিনি নিজ তেজে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করে রয়েছেন, যিনি দংষ্ট্রা-করাল, দুর্ধর্ষ, কোটি সূর্যের মতো প্রভাযুক্ত আর যিনি বহ্নিজ্বালা সৃষ্টি করছেন, সমস্ত জগৎ দগ্ধ করছেন, ব্রহ্মবাদী মুনিরা সেই বিশ্বকর্মা দেবকে নৃত্যপর দেখলেন। যিনি মহাদেব, মহাযোগ, দেবগণেরও দেব, পশুপতি, ঈশান, জ্যোতিসমূহের মধ্যে অব্যয় জ্যোতি, পিনাকী, বিশাললোচন, ভবরোগের ঔষধ, কালাত্মা, কালের কাল, দেবদেব, মহেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, যোগানন্দময়, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবৈরাগ্যের আলয়, জ্ঞানযোগ, সনাতন, শাশ্বত ঐশ্বর্যের বিটপ, ধর্মের আধার, দুষ্প্রাপ্য, মহেন্দ্র আর উপেন্দ্রর নমস্য, মহর্ষিদের বন্দিত, সর্বশক্তির আধার, মহাযোগেশ্বরেশ্বর, মহাযোগীদের পরমব্রহ্ম, যোগী, যোগিবন্দিত, যোগীদের হৃদিস্থিত, যোগমায়াসমাবৃত, জগদ্‌যোনি, নারায়ণ, অনাময় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তাঁকেই ব্রহ্মবাদী মুনিরা দর্শন করেছিলেন। সেই ঈশ্বরের নারায়ণাত্মক রুদ্ররূপ দর্শন করে ব্রহ্মবাদী সাধু মুনিগণ নিজেদের কৃতার্থ মনে করলেন। যাঁর বামভাগে পদ্মনাভ সেই জগদীশ্বর রুদ্রকে দেখে সনৎকুমার, সনক, ভৃগু, সনাতন, সনন্দন, রৈভ্য, অঙ্গিরা, বামদেব, শুক্র, অত্রি, কপিল আর মরীচি ঋষি মনে মনে তাঁকে চিন্তা করলেন। তারপর ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে প্রণামপূর্বক নিজ নিজ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করলেন। পরে ওংকার উচ্চারণ করে গুহাহিত অন্তঃশরীর দেখে আনন্দিত আর ধ্যানমগ্ন চিত্তে ব্রহ্মময় বাক্য দ্বারা তাঁর স্তব করলেন: যিনি ঈশ্বর, পুরাণপুরুষ, প্রাণেশ্বর, রুদ্র, অনন্তযোগ, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, প্রচেতা, ব্রহ্মময় ও পবিত্র তাঁকে আমরা সকলে প্রণাম করি। শান্ত সংযত মুনিরা নিজ শরীরে ধ্যান করে ব্রহ্মসম্ভব, নির্মল, স্বর্ণবর্ণ, কবি, পরমের চেয়েও পরাৎপর তোমাকেই দর্শন করেন। জগতের প্রসূতিকে তুমিই সৃষ্টি করেছ, তুমিই পরমাণুরূপে সকলের অনুভবস্থান, তুমিই অণুর চেয়েও অণুতর, মহতের চেয়েও মহত্তর। সাধুরা তোমাকেই সব কিছু বলে জানেন। হিরণ্যগর্ভ, জগতের অন্তরাত্মা পুরাণপুরুষ তোমার থেকেই জন্মেছেন। সেই জায়মান পুরাণ-পুরুষ তোমার মধ্যস্থতাতেই যথাবিধি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। বেদসমূহ তোমার থেকেই সম্যক্ প্রসূত হয়েছে এবং অন্তকালে তারা তোমারই মধ্যে লীন হয়ে যাবে।

জগৎকারণ তোমাকেই হৃদিমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে দেখছি। এই ব্রহ্মচক্রকে তুমিই ঘোরাচ্ছ। তুমিই জগতের একমাত্র নাথ ও মায়াবী। তুমি যোগাত্মা, চেতনার প্রভু দিব্য তোমার নৃত্য। আমরা তোমারই শরণ নিলাম। তোমাকে নমস্কার। আমরা দেখছি তুমিই আকাশমধ্যে নৃত্য করছ। সকলের আত্মা হয়েও তুমি বহুভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছ। তুমিই ব্রহ্মানন্দময়, আমরা পদে পদে তোমাকেই অনুভব করি, তোমারই মহিমা স্মরণ করি। তুমি ওঙ্কারের বাচ্য। তুমি মুক্তিবীজ, অক্ষর ও গূঢ়রূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত। তাই সাধুগণ ইহজগতে তোমাকে আর তোমার স্বয়ংপ্রভ প্রভাবকেই সত্য বলে কীর্তন করেন। বেদসমূহে সতত তোমারই স্তব করা হয়েছে, যে ঋষিদের দোষক্ষয় হয়েছে তারা তোমাকে প্রণাম করেন এবং শান্তাত্মা, সত্যসন্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিরা বরিষ্ঠ বলে তোমাতেই প্রবেশ করেন। তুমিই ঈশ্বর, অনাদি, বিশ্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পরমেষ্ঠী, বরণীয়তম। একাগ্রচিত্তে নিত্যমুক্ত ঋষিরা স্বাত্মানন্দরূপ তোমাকেই অনুভব করে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাতেই প্রবেশ করেন। অদ্বিতীয় রুদ্ররূপী তুমিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করছ, বিশ্বরূপ হয়ে সব কিছু পালন করছ, অন্তকালে সমগ্র জগৎ তোমাতেই লীন হয়। তাই তোমারই শরণ নিলাম; তোমাকে নমস্কার। একমাত্র বেদের বহু শাখা থাকলেও, তা অনন্ত হলেও একরূপী অদ্বিতীয় তোমারই কথা তাতে বলা হয়েছে। অবশ্যজ্ঞাতব্য তোমার শরণ যারা প্রাপ্ত হন, সেই বিপ্রগণই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। তুমিই পরম রুদ্র, প্রাণ, বৃহৎ, হরি, অগ্নি, ঈশ্বর, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চৈতন্য, ধাতা, আদিত্য—এই ভাবে বহুরূপধারী হয়েও এক বলে কীর্তিত হও। তুমি অক্ষর, পরমবেদনীয়, তুমিই বিশ্বেশ্বর, পরম নিধান, তুমি অব্যয়, নিত্যধর্মের রক্ষক, তুমিই সনাতন আর পুরুষোত্তম। তুমিই বিষ্ণু, তুমিই চতুর্মুখ, তুমিই ভগবান ঈশ্বর, তুমিই বিশ্বনাথ, প্রকৃতি আর প্রতিষ্ঠা, তুমিই সর্বেশ্বর আর পরমেশ্বর। সকলেই বলে থাকেন তুমি অদ্বিতীয়, পুরাণপুরুষ, আদিত্যবর্ণ আর অন্ধকারের পরপারে তুমি থাক। তুমিই চিন্মাত্র, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ, আকাশ, ব্রহ্ম, শূন্য, প্রকৃতি আর গুণ। যার মধ্যে এই সব কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা অব্যয়, নির্মল আর একরূপ, তোমারই রয়েছে সেই অবর্ণনীয় অপূর্ব রূপ। তাতেই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত। তুমি যোগেশ্বর, কল্যাণদায়ক, অনন্তশক্তি, প্রধানগতি, ব্রহ্মশরীর, পুরাণপুরুষ। আমরা তোমার শরণ চেয়ে তোমাকেই প্রণাম করি। হে মহেশ, হে ভূতাধিপতি, তুমি প্রসন্ন হও। তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করলে সংসারের বীজ লয় পায়। তাই আমরা মনকে সংযমে বেঁধে, দেহকে একাগ্র করে একমাত্র ঈশ্বর তোমাকেই প্রসাদিত করছি। তুমি ভব, ভবের কারণ, কাল, সর্ব আর হর। তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র আর কপর্দী, তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি অগ্নি, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিব, তোমাকে নমস্কার।

অনন্তর ভগবান বৃষবাহন কপর্দী ভব প্রীতি লাভ করে পরম রূপকে সংকুচিত করলেন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তখন মুনিরা অতীত আর ভবিষ্যতের ঈশ্বর ভবকে পূর্বের মতো অবস্থান করতে দেখে আর নারায়ণকেও সেই ভাবে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন, ভগবন, তুমি ভূতভব্যপতি, গোবৃষাঙ্কিতশাসন, সনাতন। আমরা তোমার পরমরূপ দেখে নির্বৃতি লাভ করেছি। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রসাদে অমল আর পররূপী তোমাতেই আমাদের অবিচল ভক্তি জন্মেছে। হে শঙ্কর, এখন তোমার মাহাত্ম্যের কথা শুনতে ইচ্ছা করি, আর পরমেষ্ঠীর নিত্য আত্মভাবের

কথা শোনার অভিলাষও আমাদের হচ্ছে। তখন যোগীদের যোগসিদ্ধিপ্রদ ভগবান তাদের কথা শুনে মাধবের দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর বাক্যে বলতে শুরু করলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদসমূহে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে দেবদেবনৃত্যদর্শন ভক্তিযোগ নামে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বর বলতে লাগলেন, হে ঋষিগণ, যা বেদবিদ্‌গণের জ্ঞাতব্য, পরমেষ্ঠী ঈশ্বরের সেই মাহাত্ম্য যথাযথ বর্ণনা করছি, শোন। আমি সমস্ত লোকের একমাত্র নির্মাতা, একমাত্র রক্ষাকর্তা, একমাত্র সংহারকর্তা। আমি সকলের আত্মা এবং সনাতন। আমি সমস্ত বস্তুরই অন্তর্যামী মহেশ্বর। অন্তকালে সমস্ত বস্তু আমাতেই অবস্থিত থাকে, আমি কিন্তু সর্বত্র অবস্থান করি না। তোমরা যে আমার অদ্ভুত রূপ দর্শন করেছ, তাই আমার উপমা। তোমাদের কেবল মায়াটুকুই দেখানো হয়েছে। আমিই যাবতীয় ভাবের অন্তবর্তী হয়ে সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করি। এ হল আমার ক্রিয়াশক্তি। আমার অস্তিত্বের অনুবর্তন-কারী বিশ্ব আমার দ্বারাই কর্মে প্রেরিত হয়। কালরূপ আমিই আমার কালাত্মক সমগ্র জগৎকে চালিত করে থাকি। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, আমি একদিকে জগতের সৃষ্টি করি, অন্যদিকে তার সংহার করি। আমার এই দুরকম অবস্থা। আমার না আছে আদি, না আছে অন্ত। অথচ আমিই মায়াতত্ত্বের স্রষ্টা। সৃষ্টির আদিতে আমিই প্রধান ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে আলোড়ন তুলি। সেই প্রকৃতি আর পুরুষ পরস্পর মিলিত হলেই মহৎ প্রভৃতি ক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। তাতেই আমার তেজ প্রকাশ পায়। যিনি সমস্ত জগতের সাক্ষী এবং কালরূপ চক্রের প্রবর্তক, সেই হিরণ্যগর্ভ মার্তণ্ডও আমার দেহ থেকে উদ্ভূত। আমি কল্পের শুরুতে দিব্য স্বকীয় ঐশ্বর্য, সনাতন জ্ঞানযোগ আর চারটি পুত্রের তুল্য বেদ তাকে দান করেছি। সেই ব্রহ্মা আমারই নিয়োগ অনুসারে আমার ভাবে ভাবিত সেই বেদময় দিব্য ঐশ্বর্য সর্বদা নিজের কাছে রাখেন। আত্মসম্ভব চতুর্মুখ সেই ব্রহ্মা আমার আদেশেই সর্বজ্ঞ ও সর্বলোকের নির্মাণকর্তা হয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। যিনি লোকসমূহের উৎপত্তির কারণ, অব্যয় আর লোকসমূহের পরিপালক, সেই অনন্ত নারায়ণও আমারই পরম মূর্তি। আর যিনি প্রভু কালান্তক রুদ্র, সর্বভূতের শেষ যাঁর হাতে, যিনি আমারই আজ্ঞায় সর্বদা সংহার করে চলেছেন, তিনিও আমারই শরীর। যিনি দেবগণের হব্য বহন করেন, পিতৃগণের কব্য বহন করেন, পাকক্রিয়া নির্বাহ করেন, সেই বহ্নিও আমারই শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছেন। আবার যিনি ভুক্ত আহারগুলিকে দিবারাত্র পাক করে চলেছেন, সেই ভগবান বৈশ্বানর অগ্নিকেও আমিই চালনা করি। যে দেবশ্রেষ্ঠ বরুণ সমস্ত জলের উৎপত্তিস্থান, তিনিও আমারই আদেশে সব কিছু সঞ্জীবিত করছেন। যে দেব প্রভঞ্জন প্রাণীদের অভ্যন্তরে আর বাইরে অবস্থিত তিনি আমারই আজ্ঞায় ভূত-গণের শরীরগুলিকে ধারণ করে আছেন। যিনি মানুষের সঞ্জীবনরূপ আর দেবতাদের অমৃতের আকর, সেই সোমও আমারই আদেশে প্রেরিত হয়ে বর্তমান রয়েছেন। যিনি নিজের রশ্মিজালে সর্বত্র সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেই সূর্যও আমারই আজ্ঞায় নিজ কিরণ দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার করেন। যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা, সমস্ত দেবগণের অধিপতি এবং যাজ্ঞিকদের ফলদাতা, সেই শত্রু আমারই আজ্ঞায় রয়েছেন। বিবস্বানপুত্র

দেব যমরাজ আমারই আদেশে নিয়ম করে অসাধুদের শাসন করছেন। যিনি সমস্ত ধন সম্যকরূপে দান করেন, যিনি যাবতীয় ধনের অধ্যক্ষ, সেই কুবের আমার শাসনেই সর্বদা অবস্থিত। সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি এবং তামস কর্মের ফলদাতা নিঋতি দেব আমার অধীনে বর্তমান। বেতাল আর ভূতগণের স্বামী, ভক্তদের ভোগফলের দাতা দেব ঈশানও আমার শাসনেই আছেন। অঙ্গিরার শিষ্য ও রুদ্রগণের অগ্রণী বামদেব আমারই আদেশে যোগীদের রক্ষাকর্তা হয়ে রয়েছেন। যিনি সর্বজগতের পূজনীয়, বিঘ্ননায়ক বিনায়ক, তিনিও আমারই বাক্যে ধর্মে নিরত রয়েছেন। যিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেব-সেনাপতি, সেই প্রভু স্বয়ম্ভু স্কন্দও আমারই আজ্ঞাধীন। আমার আজ্ঞাতেই মরীচি প্রমুখ মহর্ষি প্রজাপতিরা নানা লোক সৃষ্টি করছেন। যিনি সমস্ত জীবকে বিপুল সম্পত্তি প্রদান করেন, সেই নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীও আমার অনুগ্রহেই বিদ্যমান। যিনি বিপুল বাক্য দান করেন, সেই দেবী সরস্বতীও আমার নিয়োগাধীন। যাঁকে স্মরণ করলে সমস্ত ঘোর পাপী মানুষ নরক থেকে উদ্ধার পায়, সেই সাবিত্রী দেবীও আমারই আজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করেন। যে পরমা দেবীকে স্মরণ করলে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন, সেই দেবী পার্বতী আমারই বচনের অনুগামিনী। যাঁর মহিমার শেষ নেই, যাঁর নিজেরও শেষ নেই, যিনি সমস্ত দেবতাদের প্রভু এবং নিজ মস্তকে যিনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, সেই শেষ নাগও আমার আজ্ঞার বশীভূত। যে সংবর্তক অগ্নি বড়বারূপে অবস্থিত হয়ে সর্বদা সমুদ্রের জল পান করে, সেই অগ্নিও আমার আদেশের অনুবর্তী। যে চতুর্দশ মনু এই জগতে প্রথিততেজা হয়ে প্রজাপালন করছেন, তাঁরাও সেই ঈশ্বরের বশবর্তী। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য সমস্ত দেবতাই আমার শাসনে অবস্থিত। গন্ধর্ব, গরুড়, সিদ্ধ, সাধ্য, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি সকলকেই সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টি করেছেন। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, মুহূর্ত, দিবস, রাত্রি, ঋতু, পক্ষ, মাস, যুগ, মন্বন্তর, পর, পরার্ধ প্রভৃতি যা কিছু কালভেদ প্রজাপতির শাস্ত্রে আছে, সে সবই আমার শাসনে অবস্থিত। স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি চার রকম প্রাণীই মহাত্মা দেবদেবের নিয়োগাধীন। সাতটি পাতাল প্রভৃতি সমস্ত ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সেই স্বয়ম্ভুর আজ্ঞায় বর্তমান। যে সমস্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অতীত হয়েছে, বিভিন্ন পদার্থে চারদিক থেকে মিলিত হয়ে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান রয়েছে আর আত্মায় স্থিত বস্তুগুলির সাহায্যে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হবে, তারা সকলেই সেই ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আদি প্রকৃতি—এ সবই আমার নিয়োগের অপেক্ষা রাখে। সমস্ত জগতের উৎসরূপা, সমস্ত জীবের সম্মোহনকারিণী মায়া আমারই আজ্ঞায় নিত্য বিবর্তিত হচ্ছে। যে দেব দেহধারীদের মধ্যে পরমপুরুষ বলে কথিত হন, সেই আত্মাও আমারই আদেশে অবস্থান করেন। যার দ্বারা মোহের জটিল পাশ ছিন্ন করে পরম পদ দর্শন করা যায়, সেই পরমা বিদ্যাও আমারই আদেশে অধিষ্ঠিত। বেশি আর কী বলব, সমস্ত জগৎই আমার শক্তিস্বরূপ। আমিই একে সৃষ্টি করি, আবার অন্তিম সময়ে আমাতেই তা বিলীন হয়। আমিই ভগবান, ঈশ্বর, স্বয়ংজ্যোতিঃ, সনাতন, পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। হে দ্বিজগণ, তোমাদের এই পরম জ্ঞানের কথা বললাম। প্রাণীরা এই তত্ত্ব জানলেই সংসার বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে পরমেশ্বরনৃত্যদর্শনজ্ঞানযোগ নামে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, হে ঋষিগণ, তোমরা সকলে পরমেষ্ঠীর প্রভাবের কথা শোন। এ কথা শুনলে পুরুষ মুক্ত হয়, তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। যা পরাৎপরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম, শাশ্বত, ধ্রুব, অব্যয়, নিত্যানন্দ আর নির্বিকল্প, সেটিই আমার পরম ধাম। ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে আমি স্বয়ম্ভু আর বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মা। মায়াবীদের মধ্যে আমি পুরাণদেব অব্যয় হরি। যোগীদের মধ্যে আমি শম্ভু, স্ত্রীদের মধ্যে পার্বতী, আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, বসুদের মধ্যে পাবক, রুদ্রদের মধ্যে শঙ্কর, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, হস্তীদের মধ্যে ঐরাবত, শস্ত্রধারীদের মধ্যে পরশুরাম, ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, শিল্পীদের মধ্যে বিশ্বকর্মা, অসুরদের মধ্যে প্রহ্লাদ। হে বিপ্রগণ, আমি মুনিদের মধ্যে ব্যাস, গণের মধ্যে বিনায়ক, বীরদের মধ্যে বীরভদ্র, সিদ্ধদের মধ্যে কপিলমুনি, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্রমা, অস্ত্রগুলির মধ্যে বজ্র, ব্রতের মধ্যে সত্য, সর্পগণের মধ্যে অনন্ত, সেনানীর মধ্যে কার্তিকেয়, আশ্রমগুলির মধ্যে গার্হস্থ্য, ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর, কল্পগুলির মধ্যে মহাকল্প, যুগসমূহের মধ্যে সত্যযুগ, যক্ষদের মধ্যে কুবের আর তৃণমধ্যে বীরুধ। আমি প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ, রাক্ষসদের মধ্যে নিঋর্তি, বলবান-দের মধ্যে বায়ু, দ্বীপসমূহের মধ্যে পুষ্কর, মৃগপতিদের মধ্যে সিংহ, যন্ত্রসমূহের মধ্যে ধনু, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সাম, যজুঃসমূহের মধ্যে শতরুদ্রিয়, জপনীয়ের মধ্যে সাবিত্রী, গোপনীয়ের মধ্যে প্রণব, সূক্তসমূহের মধ্যে পুরুষসূক্ত, সামগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাম, বেদার্থজ্ঞদের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, দেশসমূহের মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত, ক্ষেত্রের মধ্যে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম। আমি বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা, জ্ঞানের মধ্যে ঐশ্বর জ্ঞান, ভূতসমূহের মধ্যে আকাশ, সংহারকদের মধ্যে মৃত্যু, পাশসমূহের মধ্যে মায়া, বিনেতাদের মধ্যে কাল, গতির মধ্যে মুক্তি, শ্রেষ্ঠ সব কিছুর মধ্যে পরমেশ্বর। হে ঋষিরা, যে দ্রব্যই জগতে তেজ আর বলে শ্রেষ্ঠ, সেটিতেই আমার তেজের বিকাশ ঘটেছে বলে জেনো। সংসারের সমস্ত আত্মাকেই পশু বলা হয়, আমি তাদের ঈশ্বর বলে লোকে আমায় পশুপতি বলে। আমি নিজের লীলায় মায়াপাশে ঐ পশুদের বন্ধন করি আর ভূতপতি পরমাত্মা অব্যয় আমি ছাড়া মায়াপাশে আবন্ধ পশুদের আর কোন মোচনকর্তা নেই। তাই বেদবিদগণ আমাকে পরম মুক্তিদাতা বলে থাকেন। চব্বিশটি তত্ত্ব মায়াকর্মের গুণ, এরাই পশুপতির পাশ, আর ক্লেশই হল পশুদের বন্ধন। মন, বুদ্ধি, অহংকার, আকাশ, অনিল, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই আটটি প্রকৃতি। বাকী সবই বিকার। কর্ণ, চক্ষুদ্বয়, জিহবা, নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; আর পায়ু, উপস্থ, কর, চরণ ও বাক্য—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ এদেরও ধরলে মোট তেইশটি পদার্থ প্রাকৃত তত্ত্ব। আর যিনি অব্যক্ত, প্রধান, গুণলক্ষণ, আদি মধ্য-আর-অন্তহীন, জগতের পরম কারণ, তিনিই চতুর্বিংশ তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ—এই হল তিনটি গুণ। এদের সাম্য অবস্থাকেই অব্যক্ত প্রকৃতি বলে। সত্ত্বজ্ঞান, তমোজ্ঞান আর রাজসজ্ঞান—এই তিনটি জ্ঞান বুদ্ধির বৈষম্যবশত ঘটে থাকে। এটাই পণ্ডিতদের মত। ধর্ম আর অধর্ম নামে কর্মসংজ্ঞক দুটি পাশ আছে। কর্মসমূহ আমাতে সমর্পণ করলে তা আর বন্ধনের কারণ হয় না, বস্তুত তা মুক্তিরই সাধক হয়। অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই গুলিই আত্মার বন্ধনের কারণ বলে এদের পাশ বলে। মায়াই এই পাশসমূহের কারণ। এই মায়া আবার

অব্যক্ত মূল প্রকৃতি রূপে আমাতেই অবস্থিত। সেই মূল প্রকৃতিকেই প্রধান ও পুরুষ বলা হয়। ইনিই মহৎ প্রভৃতি বিকার ও দেবদেব সনাতন। সেই তিনিই বন্ধন, তিনিই কর্মকর্তা, তিনিই পাশ, তিনিই পশু, তিনিই সর্বজ্ঞ, অথচ তাঁকে কেউ জানে না। সকলে তাঁকেই আদ্য ও পুরাণপুরুষ বলে থাকে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে বিভূতিযোগ নামে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এখন আর একটি গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলছি। এ কথা জানলে প্রাণীরা ঘোর সংসার সাগর পার হতে পারে। এই যে ব্রহ্মময় ভগবান, ইনি শান্ত, শাশ্বত, কেবল, নির্মল, অব্যয়, একাকী আর পরমেশ্বর। মহদ্‌ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ। আমি তাঁরই মধ্যে গর্ভধারণ করে থাকি, তারই নাম মায়া। তার থেকেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। তার থেকেই প্রধান, পুরুষ, আত্মা, ভূতাদি, মহান, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়গুলি উৎপন্ন হয়। তার থেকেই কোটি সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট সোনার অণ্ড উৎপন্ন হয়। আমার শক্তির দ্বারা বর্ধিত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাতেই জন্মগ্রহণ করেন। অন্য যে বহুসংখ্যক জীব আছে, তারা সকলেই তাঁরই দ্বারা ব্যাপ্ত। তারা আমার মায়ায় মোহিত হয়ে পিতৃস্বরূপ আমাকে দেখতে পায় না। নানা যোনিতে যে অন্য সব মূর্তি উৎপন্ন হয়, আমাকেই তাদের পিতৃস্বরূপ আর মায়াকে তাদের পরমযোনি বলে জানবে। যে ব্যক্তি আমাকে এই রকম পিতা, প্রভু আর বীজ বলে জানে, সেই বীর সমস্ত লোকের মধ্যে মোহ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। আমিই সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, ভূতগণের পরমেশ্বর, ওংকারমূর্তি, ভগবান, ব্রহ্মা আর প্রজাপতি। আমি সমস্ত ভূতেই সমানভাবে অবস্থান করি। আমিই পরমেশ্বর। সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হলেও আমি বিনষ্ট হই না। যে ব্যক্তি এই রকম দর্শন করে সে-ই যথার্থ দর্শনকারী। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সমস্ত পদার্থে সমান-ভাবে অবস্থিত বলে দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে নিজেকে নিজে হিংসা করে না। তাই সে পরমা গতি লাভ করে। সাতটি সূক্ষ্ম পদার্থ ও ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে অবগত হয়ে যে ব্যক্তি প্রধান বিনিয়োগ অবগত হয়, সে পরমব্রহ্ম লাভ করে। সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বচ্ছন্দতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি আর অনন্ত শক্তি—বিভু মহেশ্বরের এই ছয়টি অঙ্গ জানবে। পাঁচটি তন্মাত্র, মন আর আত্মা—এই হল সাতটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই সব কিছুর হেতু সেই প্রকৃতিই প্রধান। প্রধানের দ্বারা যে বন্ধন, তাই বিনিয়োগ। মহেশ্বরের যে শক্তি প্রকৃতিতে লীন হয়ে আছে তাকেই বেদে ব্রহ্মযোনি আর কারণ বলা হয়েছে। পরমেষ্ঠী, পরতঃ স্থিত, সত্যরূপী মহেশ্বর পুরুষই তার একমাত্র পুরুষ। সেই পুরুষই ব্রহ্মা, যোগী, পরমাত্মা, মহীয়ান, ব্যোমরূপী, বেদবেদ্য আর পুরাণ। সেই একমাত্র দেব রুদ্রই মৃত্যু, অব্যক্ত, অদ্বিতীয়, বীজ আর বিশ্ব। কেউ তাঁকে এক বলে, কেউ বা অনেক বলে। কেউ তাঁকে আত্মা বলে, কেউ বা বলে তিনি অন্য। কিন্তু তিনি অণুর চেয়েও অণুতর, মহতের চেয়েও মহত্তর। তিনিই বিশ্বরূপী মহাদেব বলে কথিত হন। যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বরকে এই ভাবে গুহাহিত পরম প্রভু পুরাণপুরুষ, বিশ্বরূপ আর হিরন্ময় বলে জানে, সেই

বুদ্ধিমানই বুদ্ধিকে অতিক্রম করে পরম পদে প্রতিষ্ঠা পায়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে সংসারসাগরতারণগুহ্যতম জ্ঞানযোগ নামে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, যদি পরমেশ্বর নিষ্কল, নির্মল, নিত্য আর নিষ্ক্রিয় হন, তাহলে, হে মহাদেব, আপনি কি করে বিশ্বরূপী হলেন? ঈশ্বর বললেন, হে দ্বিজগণ, আমি বিশ্ব নই, কিন্তু বিশ্বও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। মায়াই এর কারণ, আমি মায়াকেই আত্মাতে আশ্রয় দিয়েছি। প্রকাশকে সমাশ্রয় করে আছে যে শক্তি তাই মায়া—তার আদি বা অন্ত নেই। সেই জন্যই এই প্রপঞ্চ অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়। তাই অব্যক্তই এর কারণ। তিনি আনন্দ আর অক্ষর জ্যোতিঃস্বরূপ। আমিই পরমব্রহ্ম। আমার থেকে অন্য কিছু নেই। এই জন্যই ব্রহ্মবাদী মুনিরা আমার বিশ্বরূপত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। একত্ব বা পার্থক্য—এই দু'ভাগেই এই নিদর্শনের কথা বলা হয়। সুতরাং আমিই সনাতন পরমাত্মা কারণহীন পরমব্রহ্ম। হে দ্বিজগণ, তাতে আত্মার কোন দোষ নেই। কারণ শক্তিগুলি অনন্ত, অব্যক্ত আর মায়া তাতে সংস্থিত। তাই তারা ধ্রুব। তাতেই কেবল দ্যুলোকে স্থিত নিত্য অব্যক্ত প্রকাশিত হন। তিনি বস্তুত অভিন্ন হলেও ঐ সমস্ত শক্তি দ্বারা তাঁকে ভিন্ন বলে বোধ হয়। কারণ তিনি একমাত্র মায়া দ্বারা যুক্ত। আসলে তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তাই তিনি নিত্য। পুরুষের যখন ঐশ্বর্য হয় ও যখন তার ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়, তখন যেমন ঐশ্বর্যের পার্থক্য থাকে না, সেই রকম তিনি অনাদিমধ্যনিষ্ঠ। মায়া কেবল তাঁকে সক্রিয় করে। সুতরাং এই পরম অব্যক্ত প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত, অক্ষর ও পরম জ্যোতিই বিষ্ণুর পরম পদ। তাতেই এই অখিল জগৎ ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান। এই জগৎ সম্পূর্ণভাবে অবগত হলে মুক্তিলাভ হয়। মনের সঙ্গে বাক্যসমূহ যাঁকে না পেয়ে নিবৃত্ত হয়, সেই আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাতা ব্যক্তি কোথাও থেকে ভয় পান না। এই আদিত্যবর্ণ, অন্ধকারের পরপারে স্থিত মহান পুরুষকে আমি জানি। বিদ্বানগণ তাঁকে জানতে পারলেই মুক্তি লাভ করে এবং ব্রহ্মই হয়ে গিয়ে নিত্যানন্দী হয়। যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, যিনি সমস্ত জ্যোতির মধ্যে একমাত্র দ্যুলোকস্থ জ্যোতি, বিদ্বানগণ তাঁকেই আত্মা বলে জানলে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে নিত্য আনন্দময় হন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বলেন যে তিনিই অব্যয়, গূঢ়, গোপিতশরীর, ব্রহ্মানন্দ, অমৃত ও বিশ্বধাম। তাঁকে লাভ করলে আর ফিরে আসতে হয় না। হিরন্ময় পরম আকাশতত্ত্বে স্বর্গমধ্যে যে তেজ প্রকাশিত হয়, ধীরগণ তাকেই উজ্জ্বল নির্মল আকাশধাম বলে তাদের জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেন। আত্মাতে আপনাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেই ধীরগণ দেখেন যে ইনিই স্বয়ং প্রভু পরমেষ্ঠী মহীয়ান ব্রহ্মানন্দময় ভগবান ঈশ্বর। তিনি একমাত্র ক্রীড়াময় ও সকল ভূতেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যে ধীরগণ তাঁকে এইভাবে দর্শন করেন, তাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়, অন্যের হয় না। সেই পুরুষের মস্তক ও গ্রীবা সর্বদিকেই বিদ্যমান, তিনি সকল ভূতেরই গুহায় নিহিত, তিনি সর্বব্যাপী ও ভগবান। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, এই সেই ঐশ্বর জ্ঞানের কথা

তোমাদের বললাম। এ অত্যন্ত গোপনীয়। কারণ যোগীরাও একে সহজে লাভ করতে পারেন না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদ্‌গুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে নির্গুণব্রহ্মের বিশ্বরূপকারণজ্ঞানযোগ নামে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, যিনি পরমব্রহ্ম, তিনি অলিঙ্গ, এক, অব্যক্তলিঙ্গ, ধ্রুব। তিনিই স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, পরম তত্ত্ব ও পরম আকাশে অবস্থিত। যা অব্যক্ত কারণ সেটি অক্ষর, পরম পদ, নির্গুণ ও শুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ। পণ্ডিতরাই একে দর্শন করেন। যাকে কারণ বলা হয়, তাতে স্থিত, শান্তসঙ্কল্প আর নিত্য তাঁর ভাবে ভাবিত মুনিরাই সেই পরমব্রহ্মকে দেখতে পান। অন্য কোন ভাবেই আমাকে দেখা যায় না এবং এমন কোন জ্ঞানই নেই যার দ্বারা তা জানা যায়। এই যে পরম জ্ঞান, একে কেবল পণ্ডিতরা লাভ করেন, অন্যে পারে না। যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে আর জগৎও মায়াময়। সেই জ্ঞানই কেবল নির্মল, শুদ্ধ, নির্বিকল্প ও নিরঞ্জন। পরম নিষ্ঠার আশ্রয়ে অব্যয় তত্ত্বকে ঐক্যরূপে জ্ঞান করে যারা সেই প্রধান পরম পদকে অনেক ভাব জানতে পারেন, সেই বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন সেটিই আমার আত্মা। আর যারা সেই পরম তত্ত্বকে এক বা অনেক বলে ঈশ্বরভাবে ভক্তিসহকারে আমাকে দর্শন করে তাদের সেটিই আত্মা বলে জেনো। নিজের আত্মাকে লীলাময় পরমেশ্বর বলে তারা দর্শন করে এবং আত্মাকে নিত্যানন্দ, নির্বিকল্প ও সত্যরূপ বলে থাকে। যারা স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তাব্যক্ত প্রধান শান্ত মুনিগণ পরমানন্দময় জগদাত্মা সর্বগত ঈশ্বরের ভজনা করেন। এই হল পরম বিমুক্তি আর আমার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সাযুজ্য। পণ্ডিতেরা জানেন যে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বের নাম নির্বাণ বা কৈবল্য। তাই একমাত্র শিবই আদি-মধ্য ও অন্তশূন্য পরম বস্তু, তিনিই ঈশ্বর। তাঁকে জানতে পারলেই মুক্তি হয়। সেখানে সূর্য বা চন্দ্রের দীপ্তি নেই, সেখানে নক্ষত্র, তপন বা বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু তাঁরই জ্যোতিতে সমস্ত বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়। তাই সেই নিত্য দীপ্তিময় নিত্য অস্তিত্ববানই প্রকাশ পান। যা নিত্যোদিত, নিষ্কল, নির্বিকল্প, শুদ্ধ, পরম ও বৃহৎ রূপে শোভিত হয়, ব্রহ্মবিদেরা তারই মধ্যে নিত্য, অচল যে তত্ত্ব দর্শন করেন, তাই ঈশ্বর। বেদসমূহে বলা হয়েছে যে সেই পরমপুরুষ শুদ্ধ, নিত্যানন্দ, অমৃত ও সত্যরূপী। তিনি প্রণবরূপে রক্ষাকর্তা, তাঁকে প্রাণ বলে সকলে ধ্যান করে। এই হল বেদসমূহের নির্ণীত তত্ত্ব। তিনি ভূমি, জল, মন, অগ্নি, প্রাণ, বায়ু, গগন, বুদ্ধি, চেতন বা অচেতন কিছুই নন। তিনি ক্রীড়াময়, কেবলমাত্র শিবরূপে শোভিত হয়ে থাকেন। হে দ্বিজগণ, বেদের গূঢ় জ্ঞানামৃতরূপ পরম রহস্য উন্মোচিত করলাম। এ কথা যোগীরাই জানেন। তাই যোগী হয়ে নির্জন দেশে প্রযত্নের সঙ্গে নিরন্তর যোগাভ্যাস করা উচিত।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে লিঙ্গব্রহ্মজ্ঞানযোগ নামে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, যে যোগ জানলে আত্মাকে সূর্যের মতো ঈশ্বররূপে দর্শন করতে পারা যায়, এর পর সেই পরম দুর্লভ যোগের কথা বলব। যোগরূপ অগ্নি শীঘ্রই সমস্ত পাপ-রাশি দগ্ধ করে। তার ফলে যে নির্মল জ্ঞান জন্মায় তাতে মুক্তি লাভ হয়। যোগ থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আবার জ্ঞান থেকেও যোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির মধ্যে যোগ আর জ্ঞান এই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে তার প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হন। যাঁরা প্রত্যহ একবার, দুবার বা তিনবার অথবা সর্বদা মহাযোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের মহেশ্বর বলেই জানবে। যোগ দু'রকম। একটির নাম অভাবযোগ, আরেকটি হল সমস্ত যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাযোগ। যাতে শূন্য ও সমস্ত সাদৃশ্যবিহীন স্বরূপের চিন্তা হয় এবং যে যোগ দ্বারা আত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় তাকে অভাবযোগ বলে। আর যে যোগানুষ্ঠান করলে সদানন্দ নির্মল আত্মাকে আমার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে দেখা যায়, তাকেই স্বয়ং ঈশ্বর পরম মহাযোগ বলেছেন। অন্য সব গ্রন্থে যোগীদের যে অন্য সমস্ত যোগের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ব্রহ্মযোগের ষোল ভাগের একভাগ বলেও গণ্য নয়। মুক্ত পুরুষেরা যে যোগে এই বিশ্বকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে দেখতে পান, সমস্ত যোগের মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। যারা ঈশ্বরকে বিভিন্ন বলে মনে করে তারা বহু সহস্রবার চিত্তসংযোগ করে যোগী হলেও একমাত্র আমাকে দর্শন করতে পারে না। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ—অন্য বৃত্তি নিরোধ করে কেবল আমার প্রতি একাগ্রচিত্তরূপ যোগের আট প্রকার সাধনের কথা তোমাদের বলছি—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি, যম, নিয়ম ও আসন। মানুষের চিত্তশুদ্ধিদায়ক পাঁচ প্রকার যমের কথা বলি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। কর্ম, মন আর বাক্যের দ্বারা কোন প্রাণীরই কোন সময় ক্লেশ উৎপাদন না করাকে ঋষিরা অহিংসা বলেছেন, অহিংসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। অহিংসাই পরম সুখ। কিন্তু বিধিপূর্বক হিংসাকেও অহিংসা বলা হয়। যথার্থ কথা বলাকেই দ্বিজাতিরা সত্য বলেছেন। এই সত্য দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায় এবং এই সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। চৌর্য বা বলের দ্বারা পরদ্রব্য হরণকেই স্তেয় বলে, তা না করাকেই বলে অস্তেয়, এটি হল ধর্মপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ। কর্ম, মন বা বাক্য দ্বারা সমস্ত অবস্থাতে সকল সময়ে সর্বত্র মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য বলে। বিপদের সময়েও ইচ্ছাপূর্বক দ্রব্যগ্রহণ না করাকেই মুনিরা অপরিগ্রহ বলেছেন। সেই অপরিগ্রহ ধর্মকে সযত্নে পালন করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সন্তোষ, শৌচ, ঈশ্বরের অর্চনা—এই পাঁচটির নাম নিয়ম। এই নিয়মই যোগসিদ্ধি প্রদান করে। উপবাস, পরাক প্রভৃতি কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর-শোষণকে তাপসগণ উত্তম তপস্যা বলে থাকেন। বেদান্তের শতরুদ্রীয় বা প্রণবাদি জপই পুরুষদের সত্ত্বসিদ্ধিকর স্বাধ্যায়—এ কথা পণ্ডিতরা বলে থাকেন। বেদাধ্যয়নের তিনটি ভেদ—বাচিক, উপাংশু আর মানস। বেদার্থবিদ্গণ এই রকম বেদাধ্যয়নের মধ্যে একটির চেয়ে অপরটিকে উৎকৃষ্টতর বলেছেন। যে বেদাধ্যয়নে অন্য শ্রোতাদের শব্দবোধ জন্মে তাকে বাচিক বেদাধ্যয়ন বলে। এখন উপাংশুর লক্ষণ বলি। যে বেদাধ্যয়নে ওষ্ঠমাত্রস্পন্দিত হওয়ার ফলে অন্যের শব্দবোধ জন্মে না তাকে উপাংশু বেদাধ্যয়ন বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এটি বাচিকের চেয়ে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। কেবল অন্য পদের সঙ্গতির দ্বারা শব্দসমূহের পরিস্পন্দন রহিত

চিন্তাকে মানস জপ বলা হয়। যেমন হোক লাভ হলেই তাকে পর্যাপ্ত মনে করা—সর্বদা পুরুষের এই রকম যে উদারতা তাকে ঋষিরা সুখলক্ষণযুক্ত সন্তোষ বলেছেন। হে দ্বিজগণ, বাহ্য ও আভ্যন্তর—এই দুই প্রকার শৌচ আছে। তার মধ্যে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শৌচকে বাহ্য শৌচ এবং চিত্তশুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলা যায়। স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ বাক্য, মন ও কায়কৃত কর্ম দ্বারা মহাদেবে সুনিশ্চল ভক্তিকেই ঈশ্বরার্চনা বলা হয়েছে।

যম আর নিয়মের কথা বললাম। এখন, যোগসিদ্ধির আট রকম উপায়ের মধ্যে প্রাণায়াম কি, তা শোন। প্রাণ শব্দের অর্থ নিজ দেহে উৎপন্ন বায়ু ও আয়াম শব্দের অর্থ নিরোধ। সুতরাং নিজ দেহে জাত বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম বলে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে প্রাণায়াম তিন রকম, আবার সগর্ভ আর অগর্ভ ভেদে এটি দু' প্রকার হয়ে থাকে। অধম প্রাণায়ামের বারোটি মাত্রা, মধ্যম প্রাণায়ামের মাত্রা চব্বিশটি, আর উত্তম প্রাণায়ামের মাত্রা ছত্রিশটি। অধম প্রাণায়ামে প্রস্বেদ জন্মে, মধ্যম প্রাণায়ামে জন্মে কম্পন, উত্তম প্রাণায়ামে হয় উত্থান। আনন্দের তারতম্য অনুসারে এদের একটির চেয়ে অপরটির উৎকর্ষ জানা যায়। পণ্ডিতগণ জপযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপরহিত প্রাণায়ামকে অগর্ভ বলেন। যোগীদের প্রাণায়ামের এই রকম লক্ষণ বলা হয়েছে। ব্যাহৃতি আর প্রণবের সঙ্গে গায়ত্রীকে শিরোমন্ত্রসহ প্রাণনিরোধপূর্বক যদি তিনবার জপ করা যায়, তাহলে তাকে বলে প্রাণায়াম। সংযতচিত্ত যোগীরা রেচক, পূরক আর কুম্ভক—এই তিনটিকেই প্রাণায়াম বলেছেন। নিশ্বাস বার করার নাম রেচক, নিশ্বাস নিরোধের নাম পূরক এবং সাম্য ভাবে থাকাকে কুম্ভক বলে। হে সাধুগণ, স্বভাবতই বিষয়ের প্রতি আসক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের নাম প্রত্যাহার। এ কথা সাধুরাই বলেছেন। হৃৎপদ্ম, নাভি, মূর্ধা, পর্বস্থান, সন্ধি-স্থান, মস্তক ইত্যাদি স্থানে চিত্তবন্ধনের নাম ধারণা। পূর্বোক্ত স্থানগুলিতে স্থিরীকৃত বুদ্ধি বৃত্তির যদি অন্য বৃত্তির সঙ্গে মিশ্রণ না ঘটে বিস্তার ঘটে, তবে সেই বিস্তারকে পণ্ডিতগণ ধ্যান বলেন। যে কোন বিষয়ের চিন্তায় দেশরূপ আলম্বন শূন্য হয়ে একাকার হওয়াকেই সমাধি বলে। এই হল উত্তম যোগশাসন। বারোটি প্রাণায়ামের নাম ধারণা, বারোটি ধারণার নাম ধ্যান এবং বারোটি ধ্যানকে বলে সমাধি।

আসন তিন প্রকার—স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্ধাসন। সমস্ত সাধনের মধ্যে ঐ আসনই উত্তম সাধন। হে উত্তম বিপ্রগণ, ঊরুদ্বয়ের উপর নিজের পদদ্বয় রেখে উপবেশন করাকে উত্তম পদ্মাসন বলে। দুটি পদতল নিজের জানু ও ঊরুতে রেখে উপবেশন করলে হয় স্বস্তিকাসন। হে সাধু সত্তমগণ, এক পদ অন্য ঊরুতে বিন্যাস করে উপবেশন করবে, এটিই হল উত্তম যোগসাধন অর্ধাসন। আগুনের কাছে, জলে, শুকনো পাতার উপর, জীব জন্তু সমাকুল স্থানে, শ্মশানে, পরাতন গোচারণ ভূমিতে, চার পথের সংযোগস্থলে, শব্দ বা ভয়যুক্ত স্থানে, যজ্ঞশালায়, উইঢিপিতে, অশুভ স্থানে, দুর্জন ব্যক্তিরা যেখানে থাকে সেই স্থানে, মশক প্রভৃতি সমাকুল স্থানে, দেহের পীড়া ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নিয়ে যোগাভ্যাস করবে না। উত্তম, গোপনীয়, পবিত্র স্থানে, পর্বতগুহায়, নদীতীরে, পুণ্যক্ষেত্রে, দেবালয়ে, গৃহমধ্যে এবং পবিত্র, নির্জন ও প্রাণীশূন্য স্থানে যোগী সর্বদা ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে যোগাভ্যাস করবে। শিষ্যের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ যোগীদের এবং গণেশ, গুরু ও আমাকে প্রণাম করে উত্তম রূপে সমাধিনিষ্ঠ হয়ে যোগ করবে। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন বা অর্ধাসন করে চক্ষু ঈষৎ উন্মীলনপূর্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নির্ভয় ও শান্ত হয়ে মায়াময়

জগৎকে পরিত্যাগ করে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেব পরমেশ্বরকে চিন্তা করবে। দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত শিখার অগ্রভাগে ধর্মরূপ কন্দ সমুদ্ভূত, উত্তম জ্ঞানরূপ নালবিশিষ্ট, ঐশ্বর্যরূপ অষ্টদলযুক্ত অতি শুভ্র ও বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকাযুক্ত পদ্ম কল্পনা করে তার কর্ণিকায় সেই হিরন্ময় পরম কোষের চিন্তা করবে যাঁকে সর্বশক্তিময় সাক্ষাৎ অক্ষয় স্বর্গ-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। সেই হিরন্ময় কোষে ওঙ্কারবাচ্য অব্যক্ত, কিরণজালে মণ্ডিত, নির্মল, অবিনাশী পরম জ্যোতির কথা চিন্তা করবে। সেই জ্যোতিপুঞ্জরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন রূপে মিলিত করে কোষমধ্যস্থ পরম কারণ ঈশ্বরকে ধ্যান করবে। ধ্যানকালে তন্ময় আর সর্বগ হয়ে থাকবে, অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। এ অতি গুহ্যতম জ্ঞান।

এখন অন্য ধ্যানের কথা বলছি। পূর্বোক্ত উত্তম পদ্মকে হৃদয়ে চিন্তা করে সেই পদ্মে বহ্নিতুল্য জ্যোতির্বিশিষ্ট কান্তার স্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করবে। পদ্মমধ্যে অগ্নিশিখা সদৃশ পঞ্চবিংশক পুরুষস্বরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করবে এবং তার মধ্যে পরম আকাশ-স্বরূপ, ওঙ্কারবোধিত তত্ত্ব, সনাতন, অবিনাশী, মঙ্গলময়, অব্যক্ত, প্রকৃতিশীল, উৎকৃষ্ট, অনুত্তম জ্যোতিকে চিন্তা করবে। তার মধ্যে আবার পরম তত্ত্ব, আত্মার আধার স্বরূপ, নিরঞ্জন, নিত্য ও একরূপ মহেশ্বরকে ধ্যান করবে। অথবা সমস্ত তত্ত্বকে প্রণব দ্বারা বিশোধন করে নির্মল পরমপদস্বরূপ আমাতে আত্মা সংস্থাপন করবে। পরে সেই জ্ঞান-বারি দ্বারা শরীর ধৌত করে আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক অগ্নিহোত্র থেকে পাওয়া ভস্ম গ্রহণ করবে এবং সেই ভস্ম দ্বারা 'অগ্নিরাদিত্য' এই মন্ত্রে সর্বাঙ্গ ভূষিত করে জ্যোতিস্বরূপ ঈশানকে নিজ আত্মাতে চিন্তা করবে। এই পাশুপত যোগ দ্বারা পশুপাশ থেকে মুক্তি ঘটে। এই যোগ সমস্ত বেদান্তের সার, এ হল যতিদের আশ্রমস্বরূপ। এ কথা বেদে প্রসিদ্ধ। এই যে অতি গোপনীয় পাশুপত ব্রত ভক্ত ব্রহ্মচারী দ্বিজাতিদের আমার সঙ্গে সাযুজ্য দান করে, তার কথা বললাম। নয়টি বিশেষ ব্রতাঙ্গ আছে—ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, ক্ষমা, শৌচ, তপস্যা, দম, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য। এই নটি ব্রতাঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ না থাকলেই ব্রত নষ্ট হয়। তাই আত্ম-গুণযুক্ত হয়ে আমার ব্রত বহন করা উচিত। বিষয়া-ভিলাষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার শরণ নিয়ে, আমাতেই নিষ্ঠাবান হয়ে আমাতে ভক্তির দ্বারা অনেকেই পবিত্র হয়েছে। যারা যেমন ভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেই ভাবেই তাদের কাছে যাই। আমি পরমেশ্বর, সেই হেতু জ্ঞানযোগ দ্বারা আমাকে উপাসনা করবে। অথবা পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করে সর্বদা শুচি হয়ে ভক্তিযোগ দ্বারা বোধযুক্ত চিত্তে আমার পূজা করবে। সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষাভোজী ও পরিগ্রহশূন্য হলে মানুষ আমার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে। এই গোপনীয় বিষয় বললাম।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করে, তাদের উপর দয়াবান হয়, মমত্বশূন্য ও অহংকারবর্জিত হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। যে সদাসন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতেই সমর্পিত বুদ্ধি ও সমর্পিত চিত্ত, সে-ই আমার ভক্ত আর সে-ই আমার প্রিয়। যে লোককে উত্তেজিত করে না, লোকগণ যাকে উত্তেজিত করতে পারে না, হর্ষ, অমর্ষ, ভয় আর উদ্বেগে যে ব্যক্তি বিচলিত হয় না, সে-ই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য, সমস্ত প্রচেষ্টাকে যে ত্যাগ করেছে অথচ যার ভক্তি আছে সে-ই আমার প্রিয়। নিন্দা আর স্তুতি যার কাছে সমান, যে মৌন অবলম্বন করেছে, যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট, যার কোথাও গৃহ নেই, যে

ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি সে-ই আমার ভক্ত, সে-ই আমাকে পায়। সর্বদা আমাতে সমর্পিত হয়ে সমস্ত কর্ম করতে পারলে আমার অনুগ্রহে সনাতন উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। মনে মনে সমস্ত কর্মই আমাতে ন্যস্ত করে, বিষয়ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য ও মদ্ভক্ত হয়ে কেবল আমাকেই আশ্রয় করবে। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে সদা সন্তুষ্ট ও নিরাশ্রয় হতে পারলে, কর্মে প্রবৃত্তিও সেই ব্যক্তিকে কর্মে আবদ্ধ করতে পারে না। আত্মা ও মনকে সংযত করে আশ্রয় শূন্য হয়ে সমস্ত পরিগ্রহ ত্যাগ করে কেবল শারীরিক কর্ম করলে লোকে ঈশ্বর স্থান লাভ করতে পারে। যে লোক যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করতে পারে আর আমার সন্তোষের জন্য কর্ম করে, তাকে আর সংসারে আসতে হয় না। যার আমাতেই মন, যে আমাকেই নমস্কার করে, আমাকেই পূজা করে, আমাতেই যার চিত্ত একাগ্র, সেই যোগিশ্রেষ্ঠই পরমেশ্বররূপ আমাকে জানতে পারে, আমাকেই লাভ করতে পারে। আমাকে পরমজ্যোতিস্বরূপ বলে যারা পরস্পরকে বুঝিয়ে থাকে এবং আমাকেই সনাতন বলে, তারাই আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যারা এই রকম সাত্ত্বিক কর্মগুলিকে সর্বদা আমাতেই অর্পণ করে তাদের মনের সমস্ত অজ্ঞানতা আমি দীপ্তিমান জ্ঞানবর্তিকা দ্বারা নাশ করি। যারা আমাতেই একাগ্রচিত্ত হয়ে সর্বদা আমাকে পূজা করে, সেই নিত্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি। যারা কাম্য ফলের জন্য অন্য দেবতাদের পূজা করে তাদের সেই পর্যন্তই ফল হয়ে থাকে জানবে। কারণ ফল দেবতার অনুগতই হয়। যারা অন্য দেবতার ভক্ত হয়ে নানা দেবতার পূজা করে আমাকে ভাবনা করে, সেই সমস্ত মানুষও মুক্ত হয়। অতএব নশ্বর অন্য সব দেবতাকে পরিত্যাগ করে প্রভু বলে আমাকে আশ্রয় করে, সেই উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে। পুত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে শোক শূন্য হয়ে আমরণ পরমেশ্বরলিঙ্গকে পূজা করবে। যারা সর্বদা সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে নিত্য লিঙ্গপূজা করে তাদের আমি একজন্মেই পরম পদ প্রদান করি। পরমাত্মার ঐ লিঙ্গ একমাত্র, রজতপ্রভ, জ্ঞানাত্মক, সর্বগত, সর্বদা যোগীদের হৃদয়ে সংস্থিত। তাই অন্য নিয়ত ভক্তগণ বিধান অনুযায়ী চিন্তা করে যে কোন স্থানে সেই শিবলিঙ্গেরই পূজা করে। জলে বা আগুনের মধ্যে অথবা সূর্যে কিংবা অন্য রত্ন প্রভৃতি স্থানে ঈশ্বরকে চিন্তা করে ঐশ্বরলিঙ্গের পূজা করবে। সমস্তই লিঙ্গময় এবং লিঙ্গেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত—তাই যে কোন স্থানে সনাতন লিঙ্গ পূজা করবে। ক্রিয়াবান ব্যক্তিরা জলে বা অগ্নিতে ঐশ্বরলিঙ্গের অর্চনা করে, মনীষীরা আকাশে বা সূর্যে তাঁর পূজা করে, মূর্খেরা কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থে লিঙ্গের অর্চনা করে। কিন্তু যোগীরা হৃদয়েই তাঁর অর্চনা করে থাকেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন না হলেও যদি বৈরাগ্যযুক্ত, আনন্দী আর যোগী হলে ব্রহ্মশরীর ওঙ্কারকে যাবজ্জীবন জপ করা যায়, কিংবা আমরণ একাকী ও জিতচিত্ত হয়ে শতরুদ্রীয় জপ করে, তাহলে সে পরম পদ প্রাপ্ত হবে। হে ব্রাহ্মণগণ, মরণের শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করে, সেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরম পদ লাভ করে। সেই কাশীতে মৃত্যুকালে সমস্ত প্রাণীই পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞান দ্বারাই তার বন্ধন মুক্তি ঘটে। আমাতে সমর্পিত হয়ে সমস্ত বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠান করলে সেই জন্মেই জ্ঞান লাভ করে মানুষ শিবপদ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ, সেই কাশীতে যে নীচ পাপযোনিরা বাস করে তারাও ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংসার থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু যাদের চিত্ত পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, তাদের পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অতএব হে ব্রাহ্মণগণ, মুক্তির জন্য সর্বদা ধর্ম আশ্রয় করবে। বেদের এই গুহ্য উপদেশগুলি যাকে

তাকে দিও না। ধার্মিক আর ভক্ত ব্রহ্মচারীকেই এ কথা বলবে। ব্যাস বললেন, ভগবান, এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মযোগ বর্ণনা করে সেখানে সমাসীন অনাময় নারায়ণকে বললেন, ব্রহ্মবাদীদের হিতের জন্য আমি যে এই জ্ঞান বর্ণনা করলাম, এই মঙ্গলময় জ্ঞান আপনি শান্তচিত্ত শিষ্যদের দান করতে পারেন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, ভগবান অজ ঈশ্বর এই কথা বলে সমস্ত ভক্ত দ্বিজাতিদের হিতের জন্য যোগিবরদের বললেন, তোমরা আমার কথায় আমার দ্বারা কথিত এই জ্ঞান বিধিমতে সমস্ত ভক্ত শিষ্যদের দান করবে। এই যে নারায়ণ আর এই আমি, মহাদেব,—আমরা দুজনে অভিন্ন। এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা এই রকম ভাবে ভেদ দর্শন না করে, তাদেরই এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দান করতে হয়।

এই নারায়ণ নামে আমার যে শ্রেষ্ঠ মূর্তি, এ হল সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ। এটি শান্ত ও অক্ষর রূপে সংস্থিত। জগতে যে সমস্ত ভেদদর্শী লোক আমাকে অন্য রকম দর্শন করে, তারা মুক্তি পায় না, তাদের বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই অব্যক্ত বিষ্ণু ও দেব মহেশ্বর আমাকে যারা অভিন্নরূপে দর্শন করে, তাদের আর জন্ম হয় না। তাই অবিনাশী আত্মস্বরূপ আমাকে এবং অনাদি অনন্ত বিষ্ণুকে দর্শন কর, পূজা কর। যারা আমি ভিন্ন অন্য সব দেবতাকে অন্য ভাবে দর্শন করে, তারা ঘোর নরকে গমন করে এবং আমি তাদের আত্মাতে ব্যবস্থিত থাকি না। আমার শরণাগত ব্যক্তি মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক, নারায়ণকে চিন্তা করলেই তাকে আমি মুক্তি দিয়ে থাকি। তাই আমার ভক্তেরা যদি আমার প্রীতি কামনা করে তাহলে এই মহাযোগী পুরুষোত্তমকে পূজা করবে এবং প্রণাম করবে। এই কথা বলে মহাদেব বাসুদেবকে আলিঙ্গন করে সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ভগবান নারায়ণও তখন পরমশরীর ত্যাগ করে তাপসবেশ গ্রহণ করলেন ও যোগীদের বললেন, সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ পরমেষ্ঠী মহাদেবের অনুগ্রহে আপনারা সংসারনাশক নির্মল জ্ঞান লাভ করেছেন। তাই, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা সকলেই জ্বরমুক্ত হয়ে চলে যান এবং ধার্মিক শিষ্যদের এই পরমেষ্ঠীর বিজ্ঞানে প্রবৃত্ত হবার উপদেশ দিন। ভক্তিমান, শান্ত, ধার্মিক, আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকেই এই ঈশ্বর-বিজ্ঞান সযত্নে দান করতে হয়। বিশ্বাত্মা যোগিযোগজ্ঞ মহাযোগী নারায়ণ এই কথা বলেই অন্তর্হিত হলেন।

সেই সমস্ত ঋষিরাও দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আর প্রাণীদের আদিস্বরূপ নারায়ণকে নমস্কার করে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। মহামুনি ভগবান সনৎকুমার সংবর্তকে এই ঐশ্বরজ্ঞান দান করলেন এবং তিনিও মুক্তি পেয়েছিলেন। যোগিবর সনন্দন মহর্ষি পুলহকে এই জ্ঞান দান করলেন এবং প্রজাপতি পুলহ তা দিলেন গৌতমকে। অঙ্গিরা মুনি বেদবিৎ ভরদ্বাজকে ঐ জ্ঞান দান করলেন এবং কপিল মুনি জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে তা দিলেন। আমার পিতা সর্বতত্ত্বদর্শী পরাশর মুনিও সনকের কাছ থেকে সেই পরম জ্ঞান লাভ করেছেন এবং আমার পিতার কাছ থেকে বাল্মীকি তা পেয়েছেন। সতীদেহখণ্ড থেকে উদ্ভূত শক্তিপীঠের ভৈরব সাক্ষাৎ পিনাকধারী, রুদ্ররূপী মহাযোগী বামদেব পুরাকালে আমাকে সেই জ্ঞানের কথা বলেছেন। ভগবান দেবকীনন্দন হরি নারায়ণও অর্জুনকে নিজেই এই উত্তম জ্ঞান দান করেন। যেদিন আমি রুদ্র বামদেবের কাছ থেকে এই অনুত্তম জ্ঞান লাভ করেছি সেদিন থেকেই মহাদেবের উপর আমার বিশেষ ভক্তি জন্মেছে। আমি ত্রাতা, ভূতনাথ গিরিশ, স্থানু, দেবদেব, ত্রিশূলী রুদ্রের বিশেষ ভাবে আশ্রয় নিয়েছি। আপনারাও পত্নী ও পুত্রদের

সঙ্গে গোবৃষবাহন সেই দেব শম্ভু শিবের আশ্রয় গ্রহণ করুন। কর্মযোগ অনুসারে শঙ্কর মহাদেবকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন এবং গোপতি, সর্পভূষণ মহাদেবকেই পূজা করুন।

ব্যাস এই কথা বললে সেই শৌনকপ্রমুখ মুনিরা স্থাণু মহেশ্বরকে ও সত্যবতী-পুত্র ব্যাসকে আবার প্রণাম করলেন। তারা আনন্দিত হয়ে প্রভু সাক্ষাৎ দেব হৃষীকেশ মঙ্গলময় লোকমহেশ্বর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে বললেন, আপনার প্রসাদে ত্রাতা মহাদেবের প্রতি আমাদের দেবদুর্লভ ভক্তি জন্মেছে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, যে কর্মযোগ দ্বারা এই ভগবান মহাদেবকে মুমুক্ষুরা আরাধনা করতে পারেন, এখন সেই অত্যুৎকৃষ্ট কর্মযোগ বর্ণনা করুন। আপনার কাছে এই সূতও সেই ভগবদ্‌বাক্য শুনবেন। অমৃত মন্থনের সময়ে মুনিগণ আর ইন্দ্রের জিজ্ঞাসায় দেবদেব কূর্মরূপী বিষ্ণু যা বলেছেন, সমস্ত লোকের রক্ষার কারণ ও ধর্মসংগ্রহ-স্বরূপ সেই কর্মযোগের কথা বলুন। সত্যবতী-পুত্র সনাতন ব্যাস তা শুনে সুসমাহিত হয়ে মুনিদের সেই কর্মযোগ বললেন, যারা সর্বদা সেই সনৎকুমার প্রমুখের সঙ্গে শিবের এই সংবাদ পাঠ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের এই মহাদেব-সংবাদ শোনায় কিংবা যে এর অর্থবিচার করে, সে পরমা গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে দৃঢ়ব্রত হয়ে সর্বদা এ কথা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপবর্জিত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে। সেই জন্য মনস্বীদের আর বিশেষত ব্রাহ্মণদের পক্ষে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই শিবসংবাদ সর্বদা পাঠ করা, শ্রবণ করা এবং শিবসংবাদের অর্থজ্ঞান করা কর্তব্য।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে শ্রীমদ্ভাগবদ্‌ঈশ্বরগীতা উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে যোগাদিজ্ঞানযোগ নামে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। এই সঙ্গে ঈশ্বরগীতাও সমাপ্ত হল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, হে ঋষিগণ, ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত ফলপ্রদ সনাতন কর্মযোগের কথা বলছি শোন। ব্রহ্মার দ্বারা প্রদর্শিত বেদবিহিত যে অখিল কর্মযোগ—পূর্বে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু শ্রবণেচ্ছু ঋষিদের কাছে বলেছিলেন আমি ঋষিসঙ্ঘের দ্বারা সেবিত সেই সর্ব-পাপনাশক পবিত্র কর্মযোগ বলছি। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, গর্ভাষ্টম কিংবা অষ্টম বৎসর বয়সে নিজের নিজের গৃহ্যবিহিত বিধান অনুসারে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে দণ্ড, মেখলা, যজ্ঞসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করবে এবং মুনিব্রত ও ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করে, ভিক্ষাচারী হয়ে, স্বকীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমবাসে সুখে অনুভব করে বেদসমূহ অধ্যয়ন করবে। পূর্বকালে দ্বিজগণের যজ্ঞোপবীতের জন্যই ব্রহ্মা কার্পাস তৈরি করেছিলেন। আর কুশময় বা উর্ণানির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণেও তাদের অধিকার আছে। যজ্ঞোপবীত মাত্রেই ত্রিগুণিত সূত্রের দ্বারা প্রস্তুত হবে। ব্রাহ্মণ সর্বদাই উপবীত ধারণ করে থাকবেন এবং শিখাবন্ধন করে রাখবেন। শিখাবন্ধন না করে বা উপবীত ধারণ না করে কর্ম করলে তারা তার ফল পান না। উত্তম ছিদ্রশূন্য শ্বেতবর্ণ কার্পাস বা পট্টবস্ত্র রূপান্তরিত না করে পরিধান করবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্মই ব্রাহ্মণের উত্তম উত্তরীয় বলে অভিহিত হয়েছে। তার অভাবে উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম বা রুরুচর্মও উত্তরীয় হতে পারে।

দক্ষিণ বাহুর নিম্নদেশ দিয়ে বাম বাহুতে সমর্পিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত। কণ্ঠসংলগ্ন যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত। আর বাম বাহুর নিম্নদেশ দিয়ে দক্ষিণ বাহুতে সমর্পিত যজ্ঞসূত্রের নাম প্রাচীনাবীত। পিতৃকর্মে প্রাচীনাবীত ধারণ করতে হয়। অগ্নিগৃহে, গোগণের গোষ্ঠে, হোম ও জপকর্মে, বেদ অধ্যয়নের সময়ে, ভোজনকালে, ব্রাহ্মণের কাছে, গুরু ও সন্ধ্যার উপাসনায় এবং সাধুর কাছে সর্বদা উপবীত ধারণ করতে হয়। এটি ব্রাহ্মণের সনাতন বিধি। মুঞ্জ তৃণনির্মিত, ত্রিগুণ, মসৃণ আর সমান মেখলা করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। মুঞ্জের অভাবে কুশ দ্বারা একগ্রন্থি মেখলা করবে। ব্রাহ্মণের কেশাগ্র পর্যন্ত মাপের সুন্দর ছিদ্রহীন বিল্ব বা পলাশনির্মিত দণ্ড অথবা যে কোন যজ্ঞোপযোগী বৃক্ষ থেকে নির্মিত দণ্ড ধারণ করতে হয়। ব্রাহ্মণ সমাহিত হয়ে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করবেন। কাম, লোভ, ভয় বা মোহের বশবর্তী হয়ে যদি কেউ সন্ধ্যোপাসনা না করেন, তাহলে তিনি পতিত হন। তারপর বিধান মতো সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল—এই দুই সময়েই অগ্নিহোত্র হোম করে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করবেন। তারপর পত্র, পুষ্প আর জল দিয়ে দেবতার পূজো করবেন এবং ধর্মানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভিবাদন করবেন। দ্রব্য প্রভৃতি কামনা না করে কেবল আয়ু ও আরোগ্য কামনা করে সম্যক প্রণতিপূর্বক 'আমি অমুক দেবশর্মা, আমি আপনাকে অভিবাদন করছি' এই রকম অভিবাদন বাক্য ব্রাহ্মণ বলবেন। যাকে অভিবাদন করা হবে, সেই ব্রাহ্মণ অভিবাদক ব্রাহ্মণকেও—'হে অমুক দেবশর্মা, তুমি আয়ুষ্মান হও' এই রকম বাক্য বলে প্রত্যাভিবাদন করবেন এবং অভিবাদকের নামের শেষে যে অকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ থাকবে, তার অভাবে তার অব্যবহিত পূর্বে যে স্বরবর্ণ থাকবে, তাকে প্লুত করে উচ্চারণ করবেন। অভিবাদন করলে যে প্রত্যাভিবাদন করে না, বিদ্বান তাকে কখনই অভিবাদন করবেন না। কারণ সে শূদ্রতুল্য। গুরুর পাদগ্রহণ করতে হলে দুটি হাত পৃথক পৃথক ভাবে রেখে দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ ও বাম হস্তে বাম পদ গ্রহণ করতে হয়। লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক—এই সর্বপ্রকার জ্ঞান যাঁর কাছ থেকে লাভ করা যায়, সর্বাগ্রে তাঁকেই অভিবাদন করবে। দৈব প্রভৃতি কর্মের উপযুক্ত উপকরণ, জল, ভৈক্ষ্যবস্তু, পুষ্প, সমিধ ও এই রকম অন্যান্য সব বস্তু অভিবাদনের সময়ে ধারণ করবে না। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলে ব্রাহ্মণকে 'কুশল' শব্দ উচ্চারণ করে, ক্ষত্রিয়কে 'অনাময়' শব্দ উচ্চারণ করে, বৈশ্যকে 'ক্ষেম' শব্দের দ্বারা ও শূদ্রকে 'আরোগ্য' শব্দের দ্বারা মঙ্গলসমাচার জিজ্ঞাসা করবে। উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য—এঁরা সকলেই গুরু বলে অভিহিত হয়েছেন। মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শাশুড়ী, পিতামহী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী—এঁরা সকলে গুরুজন বলে উল্লিখিত। এই সব গুরুকে গুরুবর্গ বলে। গুরুবর্গ দু'রকম—মাতৃবর্গ আর পিতৃবর্গ। মন, বাক্য, শরীর ও কর্মের দ্বারা এঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন করবে। গুরুদর্শন মাত্রেই অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে। গুরুর সঙ্গে একাসনে বসবে না, কারণ থাকলেও বিবাদ করবে না। জীবনের জন্যও দ্বেষবশত গুরুর সঙ্গে কোন কথা বলবে না। যে ব্যক্তি গুরুদ্বেষী সে অন্যান্য গুণ দ্বারা প্রধান হলেও অধঃপতিত হয়। সর্বপ্রকার গুরুই পূজনীয়। তার মধ্যে পাঁচজন বিশেষ করে পূজনীয়। তারও মধ্যে আবার প্রথম তিনজন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। মাতা সর্বাপেক্ষা পূজনীয়া বলে কথিত। জনক, জননী, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভর্তা—

এই পাঁচজন উক্ত পাঁচ গুরু বলে কথিত হন, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্যন্তিক যত্ন করে বা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েও এই পাঁচ গুরুর পূজা করবে। যত দিন পর্যন্ত পিতা-মাতার বৈরাগ্য না দেখা দেয়, তত দিন পর্যন্ত পুত্র সমস্ত কাজ ত্যাগ করে তাঁদের সেবাশুশ্রূষা করবে। যদি পুত্রের গুণ দ্বারা পিতা-মাতার প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহলে পিতা-মাতার শুশ্রূষারূপ কর্ম দ্বারাই পুত্র সকল প্রকার ধর্ম প্রাপ্ত হন। জগতে মাতার সমান দেবতা নেই, পিতার তুল্য গুরু নেই। কোন কর্ম দ্বারাই এঁদের প্রত্যুপকার করা যায় না। কায়মনোবাক্যে এঁদের প্রিয় কর্ম করবে। তাঁদের আজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কার্যও করবে না। মুক্তিফলজনক ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করেও পিতা-মাতার প্রিয় কর্ম করবে। তাকেই পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ আর ধর্মের সার বলা হয়েছে। গুরুকে সম্যকভাবে আরাধনা করবে। তাঁর আদেশ অনুসারে নিজের গৃহে প্রত্যাগত শিষ্য বিদ্যাফল ভোগ করতে পারে এবং পরলোকে স্বর্গ ভোগ করে। যে মূর্খ পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করে, সে সেই দোষের বশে পরলোকে ঘোরতর নরকে যায়। রমণী সর্বদা পুরুষের অনুগামিনী হবেন। স্বামী সর্বদা তাদের পূজনীয়। মানুষ মাতৃহিতেও রত হবে। তাতেও ইহলোকে গৌরব হয়ে থাকে। ভগবান মনু বলেছেন, যিনি ভর্তৃপিণ্ডের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন, তাঁর অক্ষয়লোকে বাস হয়। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত ও গুরু—এঁরা যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হন, তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে 'আমি অমুক' এই কথা বলবে। যজ্ঞাদি কর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে কনিষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তি সেই সময়ে তাঁর নাম উল্লেখ করে সম্বোধন করবেন না। 'ভো ভবৎ' এই রকম শব্দ উচ্চারণ করে তাঁকে সম্বোধন করবেন। শ্রীলাভেচ্ছু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সর্বদা সাদরে ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, পূজা ও মস্তক দ্বারা বন্দনা করবেন। ক্ষত্রিয়প্রভৃতি তিনটি বর্ণকে ব্রাহ্মণগণ কখনো অভিবাদন করবেন না। তাদের মধ্যে যদি কেউ বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান, শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানকারী এবং গুণবান হয়, তাহলেও তাকে ব্রাহ্মণের অভিবাদন করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব বর্ণকেই ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করতে পারেন। সমান বর্ণের লোককে সমান বর্ণের লোক অভিবাদন করতে পারে। ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু। পতি স্ত্রীলোকের গুরু। কিন্তু অভ্যাগত ব্যক্তি সকলেরই গুরু। বিদ্যা, কর্ম, বয়ঃক্রম, বন্ধু ও ধন—এই পাঁচটি মান্যের স্থান। এদের মধ্যে পরের গুলির চেয়ে আগের গুলিই উৎকৃষ্ট বলে কথিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মধ্যে বিদ্যা, কর্ম, বয়ঃক্রম, বন্ধু আর ধনের একটি যার মধ্যে অধিক বা প্রবল, তিনিই অধিক মান্য। আর নব্বই বছরের বৃদ্ধ শূদ্রও মানের যোগ্য। গমনকালে ব্রাহ্মণ, রাজা, অন্ধ, স্ত্রীলোক, রোগী ভারাবনত, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের আগে যাবার জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিশুদ্ধ হয়ে শিষ্টদের গৃহ থেকে প্রত্যহ ভিক্ষা আহরণ-পূর্বক গুরুর অনুমতি লাভ করে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। যার উপনয়ন হয়েছে এমন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ভবৎ শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করে ভিক্ষা আহরণ করবে। যে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন হয়েছে, সে ভবৎ শব্দ মধ্যে উচ্চারণ করে ভিক্ষা আহরণ করবে। আর যে বৈশ্যের উপনয়ন হয়েছে সে শেষে ভবৎ শব্দ উচ্চারণ করে ভিক্ষা আহরণ করবে। মাতা, ভগিনী কিংবা মাতার সহোদরা ভগিনীর কাছে অথবা যে স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখান দ্বারা অবমাননা করবার সম্ভাবনা নেই, তার কাছে ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা যাচঞা করবে। স্বজাতীয়ের গৃহ

থেকেই ভিক্ষা আহরণ করতে হয়। তার অভাবে অবশ্য সর্ববর্ণের কাছ থেকেই ভিক্ষা করা যায়। কিন্তু পতিত প্রভৃতি ব্যক্তির কাছে কখনই ভিক্ষা করতে নেই। বেদজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠানশীল এবং স্বজাতির বিহিত কর্মকারী ব্যক্তির কাছ থেকে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হয়ে ভিক্ষা আহরণ করবে। গুরুবংশে, নিজের জ্ঞাতিকুলে বা মাতুল প্রভৃতি বন্ধুকুলে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করবে না। কিন্তু যদি ভিক্ষোচিত অন্য গৃহস্থ না থাকে, তাহলে পূর্ব পূর্ব কুল ত্যাগ করে ভিক্ষা করবে। আবার পূর্বোক্ত ভিক্ষাযোগ্য কাউকেই না পাওয়া গেলে শুচি ও সংযতবাক হয়ে ইতস্তত না তাকিয়ে সকল গ্রামেই ভিক্ষা করা যায়। ভিক্ষালব্ধ বস্তু সংগৃহীত হলে সাবধানে পাক করবে। তারপর সংযতবাক ও অনন্যচিত্ত হয়ে তা ভোজন করবে। ব্রহ্মচারী একজনের অন্ন ভোজন করবে না। কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লোকের গৃহ থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবে. কারণ ভিক্ষান্ন দ্বারা নির্বাহিত ব্রহ্মচারীর জীবিকাকে ঋষিরা উপবাসের সমান বলে নির্দেশ করেছেন। প্রতিদিন অত্যন্ত আদরের সঙ্গে অন্ন গ্রহণ করবে। নিন্দা না করে অন্ন ভোজন করতে হয়। অন্ন দেখেই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হবে। পরে সংযতবাক হয়ে ভোজন করবে। অতি-ভোজন রোগের সৃষ্টি করে, আয়ুক্ষয় করে; তা স্বর্গ ও ধর্মের বিরোধী এবং তাতে লোকে নিন্দা করে থাকে। তাই অতিভোজন পরিত্যাগ করবে। পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা সূর্যের দিকে মুখ করে অন্ন ভোজন করবে। উত্তর দিকে মুখ করে কখনই ভোজন করবে না। এই হল সনাতন বিধি। হস্ত-পদ প্রক্ষালন করে বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশনপূর্বক ভোজনের পূর্বে দু'বার আচমন করবে এবং ভোজন সমাপ্ত হলেও দু'বার আচমন করবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপনয়নাদিকর্মযোগ নামে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, ভোজন, পান, নিদ্রা ও স্নানের পর, পথ গমনের পর, লোমহীন ওষ্ঠ স্পর্শ করলে, বস্ত্র পরিধান করলে, রেতঃ, মূত্র বা বিষ্ঠা ত্যাগের পর, অসংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ বা নিষ্ঠীবনের পর, অধ্যয়নের আরম্ভে, কাস ও শ্বাস উদ্গত হলে, উঠানে বা শ্মশানে গমন করলে এবং দুটি সন্ধ্যাকালে পূর্বে একবার আচমন করা হয়ে গেলেও ব্রাহ্মণকে পুনর্বার আচমন করতে হয়। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, স্ত্রীলোক, শূদ্র বা উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করলে, উচ্ছিষ্ট লোক বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্য বস্তু স্পর্শ করলে, রক্তপাত বা অশ্রুপাত হলে, ভোজন কালে, উভয় সন্ধ্যা বন্দনা কালে, স্নান করলে ও মলমূত্র ত্যাগ করলে আচমন করবে। নিদ্রার পরও আচমন করবে। অন্যান্য কারণে একবার আচমন করবে। কিংবা অগ্নি, গো বা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শে, নীলবস্ত্র পরিধান করলে এবং নিজের দেহ থেকে স্খলিত কেশ বা অধোত বস্ত্র স্পর্শ করলে শুদ্ধির জন্য জল, আর্দ্র তৃণ বা পৃথিবী স্পর্শ করবে। পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে উপবেশন করে সর্বদা সংযতবাক হয়ে অনুষ্ণ ও ফেনা প্রভৃতি মুক্ত বিশুদ্ধ জল দ্বারা শুদ্ধির জন্য আচমন করবে। মস্তক বা কণ্ঠ আবৃত করে, মুক্তকচ্ছ হয়ে বা শিখা উন্মুক্ত করে এবং পাদ প্রক্ষালন না করে আচমন করলেও অশুচি থাকে। জ্ঞানবান ব্যক্তি পাদুকা

পরে, জলে স্থিত হয়ে বা উষ্ণীষ ধারণ করে আচমন করবেন না। বর্ষধারা জলদ্বারা, হস্ত উচ্ছিষ্ট থাকলে এক হস্তে অর্পিত জল দ্বারা এবং যজ্ঞসূত্ররহিত, ও পাদুকাসনোপবিষ্ট হয়ে অথবা বহির্জানুকর হয়ে আচমন করা উচিত নয়। গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে, ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে, শয়ন করে বা রাস্তা চলতে চলতে, না দেখে এবং কেশ প্রভৃতি যুক্ত জল দ্বারা আচমন নিষিদ্ধ। শূদ্র বা অশুচি ব্যক্তির প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট এবং অঙ্গুলির অগ্রে স্থিত জল দ্বারা আচমন করবে না। আচমন কালে শব্দ করবে না বা অন্যমনা হবে না। বহিষ্কক্ষ হয়ে এবং দুষ্ট বর্ণ বা রসযুক্ত জল দ্বারা, অল্প বা হস্ত দ্বারা আলোড়িত জল দ্বারা আচমন করবে না। আচমনের জল হৃদয় পর্যন্ত গমন করলে ব্রাহ্মণ এবং কণ্ঠ পর্যন্ত গমন করলে ক্ষত্রিয় শুচি হন। আর মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জলটুকুর দ্বারাই বৈশ্য ও জিহ্বা ও ওষ্ঠের প্রান্ত মাত্র স্পর্শকারী জল দ্বারা আচমন করলে স্ত্রীলোক ও শূদ্র পবিত্র হয়। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্থ রেখাতে ব্রাহ্মতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যস্থলে শ্রেষ্ঠ পিতৃতীর্থ আছে বলা হয়। আর কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্য তীর্থ এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ। এই দৈবতীর্থই আর্যতীর্থ বলে কথিত হয়ে থাকে। অথবা অঙ্গুলিগুলির মূলদেশেই দৈব বা আর্ষতীর্থ এবং তাদের মধ্যভাগের নাম আগ্নেয় তীর্থ সৌমিক তীর্থ বলে কথিত। অতএব এইগুলি জানলে মোহগ্রস্ত হতে হয় না। ব্রাহ্মণ সর্বদা ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করবে অথবা প্রাজাপত্য বা দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করবে। কিন্তু পৈত্র তীর্থ দ্বারা কখনই আচমন করবে না। ব্রাহ্মণ প্রযত্নের সঙ্গে প্রথমে জল দ্বারা তিনবার আচমন করবে, তারপর ওষ্ঠাধর সংবৃত করে জলযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ-মূল দ্বারা মুখ মার্জনা করবে। তার পর অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করবে। তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুটি নাসাপুট স্পর্শ করবে এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুটি কর্ণ স্পর্শ করবে। তারপর সবগুলি অঙ্গুলি দ্বারা বাহুদ্বয়, হস্ততল দ্বারা হৃদয় ও নাভি এবং মস্তক সর্বাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাও নাভি ও মস্তক স্পর্শ করা যায়। আচমনে যে তিনবার জল পান করা যায়, তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা প্রীত হন। এ কথা আমাদের শ্রুতিতে আছে। আচমনের পর অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ মার্জনা করলে গঙ্গা ও যমুনা প্রীত হন। চক্ষু দুটি স্পর্শ দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য প্রীত হন। দুটি নাসাপুট স্পর্শ করলে অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রীত হন। কর্ণদ্বয় স্পর্শ করলে বায়ু ও অগ্নি প্রীত হন। হৃদয় স্পর্শ করলে তার প্রতি সমস্ত দেবতা প্রীত হন। মস্তক স্পর্শ করলে সেই পরম পুরুষ প্রীত হন। আচমন কালে মুখ থেকে যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না, আর দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের মতো পরিগণিত হয়। কিন্তু জিহ্বা স্পর্শ হলে তা অশুচি হয়। অন্য ব্যক্তিকে আচমন করতে জল দেবার সময়ে যদি সেই জলবিন্দু জলদাতার পদে পতিত হয় তবে তাতে তিনি অশুদ্ধ হবেন না। সেই জলবিন্দু বিশুদ্ধ ভূমিগত জলের সমান বলে জানবে। মধুপর্ক ভক্ষণে, সোমরস পানে, তাম্বুল ভক্ষণে এবং ফল, মূল বা ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণে কোন দোষ নেই। মনু এই কথা বলেছেন। প্রচুরান্ন এবং উদক পাত্র হস্তে থাকতে যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহলে সেই সমস্ত দ্রব্য মাটিতে নামিয়ে রেখে নিজে আচমন করে সেই সব দ্রব্যে জল ছিটিয়ে দেবেন। তৈজস বস্তু গ্রহণ করে যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহলে সেই দ্রব্য ভূমিতে নামিয়ে রেখে প্রথমে নিজে আচমন করবেন, তারপর সেই দ্রব্যগুলির উপর জল ছিটিয়ে দেবেন। এ ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করে যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহলে সেই বস্তু ভূমিতে

নিক্ষেপ না করে কেবল আচমন করলেই শুচি হওয়া যায়। বস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কিন্তু বিকল্প বিধি আছে। আর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সংলগ্ন না হলেই পূর্বোক্ত নিয়মে শুদ্ধ হতে পারে। অরণ্যে, জলশূন্য স্থানে, রাত্রিতে এবং চোর বা ব্যাঘ্র প্রভৃতির দ্বারা সমাকীর্ণ পথে দ্রব্য হাতে নিয়েও যদি কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহলে দোষ হয় না, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র দিয়ে দিবাভাগে উত্তর মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করবে। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করে মস্তক আবৃত করে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। ছায়ায়, কূপে, নদীতে, গোষ্ঠে, যজ্ঞস্থানের মধ্যে, পথে ভস্মরাশিতে, অগ্নিতে বা শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করবে না। যে পথে গোগণ বিচরণ করে সেখানে, কর্ষিত ভূমিতে, মহাবৃক্ষের তলে, নূতন তৃণযুক্ত ভূমিতে, দণ্ডায়মান বা বিবস্ত্র অবস্থায়, পর্বত শিখরে, প্রাচীন দেবালয়ে, উইঢিপিতে, প্রাণিযুক্ত গর্তে এবং চলমান অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করবে না। তুষ, অঙ্গার ও কপাল যুক্ত স্থানে, রাজপথে, ক্ষেত্রে, গর্তে, তীর্থে, চতুষ্পথে, নদ-নদীর কাছে, ঊষরভূমিতে এবং অত্যন্ত অশুচি স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করবে না। আর খড়ম বা চর্ম পাদুকা পায়ে দিয়ে, ছত্র মাথায় দিয়ে, উচ্চস্থানে বসে, স্ত্রী, গুরু ও ব্রাহ্মণের দিকে মুখ করে, গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ দেখতে দেখতে বা ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে বায়ুর দিকে মুখ করে এবং অগ্নি বা চন্দ্র সূর্যের দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করবে না। কূল থেকে মৃত্তিকা আহরণ করে, মলমূত্রের স্পর্শ ও গন্ধ দূর হয় এমন ভাবে আলস্য ত্যাগ করে ঐ মৃত্তিকা ও বিশুদ্ধ তোলা জলে শৌচ করবে। ধূলিযুক্ত স্থান থেকে, কর্দম থেকে, রাস্তা থেকে বা ঊষর ভূমি থেকে এবং অন্যের শৌচের ফলে উচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা ব্রাহ্মণ কখনই আহরণ করবেন না। কূপ বা দেবালয় থেকে, গ্রাম থেকে বা জলমধ্য থেকেও শৌচের জন্য মৃত্তিকা আহরণ করতে নেই। শৌচাদির পর পূর্বোক্ত বিধান অনুসারে নিত্য আচমন করবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে আচমনাদি
কর্মযোগ নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, 'পূর্বোক্ত প্রকার দন্ত প্রভৃতিযুক্ত ও শৌচাচার সমন্বিত ব্রহ্মচারীকে যদি গুরু ডাকেন, তাহলে তাঁর গুরুমুখ নিরীক্ষণ করে অধ্যয়ন করা উচিত। সন্ধ্যা ও সদাচারসমন্বিত ব্রহ্মচারী ডান হাত উদ্যত করে গুরু বসতে বললে তাঁর দিকে ফিরে বসবে। শয়ন করে, উপবিষ্ট হয়ে, ভোজন করতে করতে, দূরে দণ্ডায়মান হয়ে বা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ বা সম্ভাষণ করতে নেই। গুরুর কাছে শিষ্যের যে আসন ও শয্যা থাকবে, তা সর্বদা গুরুর চেয়ে নীচু হবে। আর গুরুর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিষ্য যথেচ্ছ ভাবে আসীন হবে না। গুরুর অসাক্ষাতেও কেবল মাত্র গুরুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। গুরুর গমন, বাক্য ও চেষ্টার অনুকরণ করতে নেই। যেখানে গুরুর প্রতিবাদ বা নিন্দা হয়, শিষ্য সেখানে হস্ত প্রভৃতি দ্বারা দুটি কর্ণ আবৃত করবে অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করবে। দূরস্থিত হয়ে অপরের হাত দিয়ে মাল্যচন্দন প্রভৃতি দিয়ে গুরুর অর্চনা করবে না। ক্রুদ্ধ হয়েও গুরুর অর্চনা করতে নেই। গুরু স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থিত থাকলে সে সময়ে তাঁর অর্চনা করবে না। গুরুর

সঙ্গে প্রত্যুত্তর করবে না। গুরু দণ্ডায়মান থাকলে তাঁর কাছে শিষ্য উপবেশন করবে না। সর্বদা গুরুর জন্য জলের কুম্ভ, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করবে এবং গুরুর অঙ্গ-মার্জন ও গন্ধাদিলেপন করে দেবে। গুরুর নির্মাল্য, শয্যা, চর্মপাদুকা, কাষ্ঠপাদুকা, আসন, ছায়া আর চৌকি কখনো লঙ্ঘন করতে নেই। গুরুর দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করে দেবে এবং নিজের সমস্ত কার্য তাঁকে জানাবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা না করে কোন স্থানে যাবে না। সর্বদা গুরুর প্রিয় ও হিতকার্যে রত হবে। গুরুর কাছে পা ছড়িয়ে বসবে না। হাই তোলা, হাসি, উত্তরীয় দ্বারা কণ্ঠ আবৃত করা আর তাল ঠোকা—এই সমস্ত করতে করতে গুরুর সঙ্গে বাক্যালাপ সর্বদা পরিবর্জন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুর মন অন্য দিকে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যয়নের উপযুক্ত সময়ে অধ্যয়ন করবে। গুরুর দ্বারা অনুজ্ঞাত হলে ব্রহ্মচারী সমাহিত হয়ে কাষ্ঠ প্রভৃতির ফলকে উপবেশন করা যায়। কিন্তু আসন, শয্যা বা যানে কখনো উপবেশন করতে নেই। গুরু গমন করলে অনুগমন করতে হয়। যদি গুরু দ্রুতপদে গমন করেন, তাহলে তার পশ্চাতে দ্রুতপদেই গমন করতে হয়। যদিও একাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ, তাহলেও গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ, প্রস্তরনির্মিত উপবেশন স্থান, তৃণনির্মিত বৃহৎ আসন, শিলাতল, কাষ্ঠময় আসন বা নৌকায় গুরুর সঙ্গে একত্র উপবেশন করা যায়। সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, বশীভূত আর ক্রোধশূন্য হবে, শুচি থাকবে, সর্বদা হিতকর মধুর বাক্য প্রয়োগ করবে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যধারণ ও মনোহর মধুর প্রভৃতি রস সেবন করা উচিত নয়। শুক্তদ্রব্য ও প্রাণীহিংসা ত্যাগ করবে। তৈলাদিমর্দন, কজ্জল লেপন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, নিদ্রা, গীতবাদ্যশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, দ্যূতক্রীড়া, লোকের দোষকথন, স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাদের আলিঙ্গন, পরের অনিষ্ট ও পরোক্ষে নিন্দা করা—এই সমস্ত কর্ম সযত্নে পরিহার করবে। জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ—এই সমস্ত বস্তু আচার্যের প্রয়োজন মতো আহরণ করবে এবং প্রত্যহ ভিক্ষাচরণ করবে। কৃত্রিম লবণ ও অন্য দিনে পাক করা দ্রব্য বর্জন করবে এবং নৃত্যদর্শন করবে না। গীত প্রভৃতি বিষয়েও সর্বদা নিস্পৃহ হবে। ব্রহ্মচারী সূর্যদর্শন করবে না ও দন্তমার্জনা করবে না। অশুচি, স্ত্রী, শূদ্র ও চণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গে একান্তে অবস্থান ও বাক্যালাপ করবে না। নিজের ইচ্ছামত কার্য না করে গুরুর প্রিয় কার্যসমূহই করবে। স্নানের সময় শরীরের মল মার্জনা করবে না। মনে মনেও 'গুরুত্যাগ করব' এই রকম চিন্তা করবে না। লোভ বা মোহবশত গুরুত্যাগ করলে পতিত হতে হয়। লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান যার থেকে লাভ হয়, সেই রকম গুরুকে কখনো হিংসা করবে না। গর্বিত, কার্য-অকার্য-বিবেচনাশূন্য ও উন্মার্গগামী গুরুকে ত্যাগ করতে পারা যায়, মনু এ কথা বলেছেন। আচার্যের আচার্য এলে তাঁর প্রতি আচার্যের মতোই ভক্তি করবে, আর গুরুগৃহে বাসের সময়ে গুরু অনুমতি না করলে মাতা, পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি নিজ গুরুজনকে অভিবাদন করবে না। উপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্যাদাতা গুরুকে, রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত পিতৃব্যাদিকে অধর্মানুষ্ঠানের নিষেধকারককে ও হিতোপদেষ্টাকেও এইভাবে সম্মান করবে। শ্রেয়জনে বা শিষ্য ভিন্ন অধিক বয়সের সমানজাতীয় ব্যক্তিতে এবং বয়োবৃদ্ধ গুরুপুত্রে, গুরুস্ত্রীতে ও গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুজনে সর্বদা গুরুর মতো আচরণ করবে। বয়সে কনিষ্ঠই হোন বা সমান বয়স্কই হোন অথবা যজ্ঞবিদ্যা প্রভৃতিতে শিষ্যই হোন, গুরুপুত্র যদি বেদের অধ্যাপক হন, তাহলে তিনি গুরুর মতো মাননীয় হন। কিন্তু গুরুর মতো তাঁর গাত্রে তৈল

প্রভৃতি মাখিয়ে দিতে হয় না বা তাঁকে স্নান করাতে হয় না, অথবা তাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পাদপ্রক্ষালন করতে হয় না। গুরুর সবর্ণা স্ত্রীরা গুরুর মতো পূজনীয়, কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীদের কেবল প্রত্যুত্থান ও পাদগ্রহণশূন্য অভিবাদন দ্বারা সম্মান করতে হয়। গুরুপত্নীর শরীরে তৈল মর্দন করতে নেই, বা তাঁকে স্নান করাতে নেই, তাঁর গাত্রমর্দন এবং কেশ-সংস্কারও করে দিতে নেই। যুবক শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন করবে না। কেবল 'আমি অমুক, আপনাকে অভিবাদন করি' এই কথা বলে ভূমিতেই অভিবাদন করবে। যুবক শিষ্য বিদেশ থেকে সমাগত হয়ে শিষ্ট লোকেদের আচার ব্যবহার স্মরণ করে প্রথম দিন পূর্বোক্ত বিধানে বৃদ্ধা গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ করে বন্দনা করবে। কিন্তু তার পর প্রতিদিন তাঁকে ভূমিতেই অভিবাদন করবে। মাতৃস্বসা, মাতুলানী শ্বশ্রূ আর পিতৃস্বসা—এঁরা মাতা বা গুরুপত্নীর মতো পূজনীয়া। কারণ এঁরা সকলেই মাতা বা গুরুপত্নীর সমান। সবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর প্রত্যহ পাদগ্রহণ করে অভি-বাদন করবে। আর প্রবাস থেকে সমাগত হয়ে পিতৃব্যপত্নী, শ্বশুরপত্নী প্রভৃতি জ্ঞাতি সম্বন্ধীয় স্ত্রীলোকদের পাদগ্রহণ করে অভিবাদন করবে। পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী ও নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—এঁদের প্রতি মাতার মতো আচরণ করবে। কিন্তু মাতা এঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পূর্বোক্ত প্রকার আচার-সম্পন্ন আত্মবান ও অদাম্ভিক শিষ্যকে গুরু বেদ, ধর্ম-শাস্ত্র, পুরাণ ও বেদাঙ্গশাস্ত্র প্রতিদিন অধ্যয়ন করাবেন। শিষ্য সংবৎসর কাল বাস করলেও যদি গুরু জ্ঞান দান না করেন, তাহলে তিনি সেই গুরুকুলবাসী শিষ্যের পাপের ভাগী হন। আচার্যের পুত্র, সেবাশুশ্রূষাদি পরিচর্যাকারী, জ্ঞানান্তরদাতা, ধার্মিক, পবিত্র, অধ্যয়নের গ্রহণ ও ধারণে সমর্থ, ধনদাতা, পুত্র প্রভৃতি, সাধু ও আত্মীয়—এই দশজনকে ধর্মানুসারে অধ্যয়ন করাতে হয়। কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, উপকারক, বিশ্বস্ত ও প্রিয়—দ্বিজাতির মধ্যে এই ছ'জন অধ্যাপনার যোগ্য। পূর্বোক্ত দশ প্রকারের মধ্যে এঁদেরই বেদ অধ্যাপনা করা উচিত ও অন্য ব্যক্তিদের যেমন বিধান আছে সেই রকম শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করানো উচিত। প্রতিদিন সংযত হয়ে আচমনপূর্বক গুরুর পদদ্বয় বন্দনা করে গুরু-মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে উত্তর দিকে মুখ করে অধ্যয়ন করবে। গুরু 'অধ্যয়ন কর' বললে অধ্যয়ন করবে, আর 'এই পর্যন্তই থাক' এই কথা বললে অধ্যয়ন থেকে বিরত হবে। অনুকূলভাবে উপবেশনপূর্বক হস্তদ্বয়ে পবিত্র কুশ ধারণে পবিত্র হয়ে তিনটি প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হলে তবে ওঙ্কার উচ্চারণের যোগ্য হওয়া যায়। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও পরি-সমাপ্তিকালে দ্বিজাতিরা যথাবিধি ওংকার উচ্চারণ করবেন। প্রতিদিন ব্রহ্মাঞ্জলি হস্তে অবস্থানপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করবে। বেদ সমস্ত প্রাণীরই সনাতন চক্ষুস্বরূপ, তাই নিত্য বেদ অধ্যয়ন করবে। বেদাধ্যয়ন না করলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিত্য বেদ অধ্যয়ন করে, ক্ষীরাহুতির দ্বারা দেবগণের যে রকম প্রীতি হয়, তিনি তার দ্বারা দেবতা-দের সেই রকম প্রীতি উৎপাদন করে থাকেন। দেবতারা তৃপ্ত হয়ে সর্বকামনা সিদ্ধির দ্বারা সর্বদা তাকে তৃপ্ত করেন। যিনি নিত্য যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি দধি দ্বারা দেবতাদের প্রীত করে থাকেন। যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঘৃতাহুতি দ্বারা দেবতাদের যে রকম প্রীতি হয়, তিনি তার দ্বারা দেবতাদের সেই রকম প্রীতি উৎপাদন করে থাকেন। আর যিনি নিত্য অথর্ববেদ অধ্যয়ন করে থাকেন, তিনি মধুর দ্বারা দেবতাদের প্রীতি সাধন করে থাকেন। বেদাঙ্গ বা পুরাণ অধ্যয়ন করলে মাংস দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করা হয়। বহু বেদ পাঠে অসমর্থ হলে গ্রামের বহির্ভাগে নির্জন

স্থানে গমন করে সেখানে নদী নির্ঝর প্রভৃতির জলের কাছে সযত্নে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধির নিত্যত্বে আস্থাবান হয়ে অনন্যমনে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী পাঠ করবে। গায়ত্রীর সহস্রবার জপই শ্রেষ্ঠ জপ, শতবার জপ মধ্যম জপ, তাতে সমর্থ না হলে দশবার জপ করবে। এইভাবে কোন এক প্রকারে প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করবে। এই গায়ত্রী জপকেই বলে ব্রহ্মযজ্ঞ। জগদীশ্বর তারতম্য দেখবার উদ্দেশ্যে তুলাদণ্ডে গায়ত্রী আর চারটি বেদের পরিমাণ করেছিলেন। তাতে একদিকে চারটি বেদ ও অন্যদিকে গায়ত্রী স্থাপিত হলে উভয়ের পরিমাণ সমান হয়েছিল। একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক ওঙ্কার ও তারপর ব্যাহৃতি উচ্চারণ করে গায়ত্রী পাঠ করবে। পূর্বকল্পে সমস্ত অশুভের নাশক 'ভূর্ভুবঃ স্বর' এই তিনটি সনাতন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হয়েছিল। এই তিনটি ব্যাহৃতি যথাক্রমে প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল; বিষ্ণু, ব্রহ্মা আর মহেশ্বর; সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ বলে স্মৃত হয়ে থাকে। ওঙ্কার সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মস্বরূপ এবং সাবিত্রীও সেই অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ। এই মন্ত্র সারাৎসার মহাযোগ বলে কথিত আছে। যে ব্রহ্মচারী অর্থজ্ঞানপূর্বক প্রত্যহ বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। বেদের জননী গায়ত্রী সমস্ত লোককে পবিত্র করেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সেই গায়ত্রীর উদ্ধার বলছি, শোন। দক্ষিণাগ্র পাঁচটি রেখা ও তার উপর পশ্চিমাগ্র নয়টি রেখা অঙ্কিত করলে বত্রিশটি কোষ্ঠ হবে। সেই বত্রিশটি কোষ্ঠে বত্রিশ অক্ষররূপিণী গায়ত্রী লিখবে। লেখবার সময়ে প্রতিলোমক্রমে লিখবে এবং উচ্চারণ করার সময়ে বামাবর্তে উচ্চারণ করবে। গায়ত্রীর উদ্ধার এইভাবে করতে হয়—

৫ বর্	১৩ স্য	২১ প্র	২৯ সে	২৮ জ	২০ নঃ	১২ ব	৪ তু
৬ রে	১৪ ধী	২২ চো	৩০ সা	২৭ র	১৯ যো	১১ দে	৩ বি
৭ ণি	১৫ ম	২৩ দ	৩১ ব	২৬ রো	১৮ য়ো	১০ র্গো	২ ৎস
৮ য়ং	১৬ হি	২৪ য়াৎ	৩২ দোম্	২৫ প	১৭ ধি	৯ ভ	১ ত

বামাবর্তে পাঠ করলে চতুষ্পদা গায়ত্রী হবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মণ্যপদরূপিণী পাপ-মোচনী গায়ত্রীকে এইভাবে উদ্ধার করে জপ করবে। গায়ত্রীর পর আর কিছু জপনীয় নেই। এ কথা জেনে যিনি জপ করেন, তিনি মুক্ত হন। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে প্রথমে স্ব স্ব গৃহ্য অনুসারে বেদের উপাকর্ম করবে। পরে গ্রাম এবং নগর পরিত্যাগ করে সাড়ে চার মাস কাল ব্রহ্মচারী সমাহিত হয়ে শুদ্ধদেশে বেদ অধ্যয়ন করবে। হে দ্বিজগণ,

তারপর বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগেই বেদের উৎসর্গক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জন হোমাদি করবে অথবা মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের প্রথম দিন পূর্বাহ্নে ঐ উৎসর্গ কর্ম করবে। হে দ্বিজগণ, তার পর থেকে প্রতি শুক্লপক্ষে বেদ পাঠ করতে হয়। মানব বেদাঙ্গ এবং পুরাণশাস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে পাঠ করবে। যে অনধ্যায়গুলির কথা বলা হবে, সেগুলি বেদপাঠকারী শিষ্য সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে এবং সেই অনধ্যায় দিনগুলিতে অধ্যাপকগণও অধ্যাপনা কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবেন। বর্ষাকালে রাত্রিতে বায়ুর প্রবল প্রবহন শব্দ কর্ণে শুনতে পাওয়া গেলে এবং দিবাভাগে বায়ু দ্বারা ধূলিসমূহ উৎসারিত হতে থাকলে তাৎকালিক অনধ্যায় হয়। বিদ্যুৎ ও গর্জন সমেত বর্ষা হলে বা ইতস্তত উল্কাপাত হলে আকালিক অর্থাৎ যে সময় থেকে তা আরম্ভ হয়, সেই সময় থেকে পরের দিনের সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায় জানবে। এ কথা প্রজাপতি মনু বলেছেন। যথা ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকাশ থেকে অস্বাভাবিক ধ্বনি হয়ে ভূমিকম্প হলে ও চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপসর্গ হলে আকালিক অনধ্যায় জানবে। হোমের জন্য অগ্নি জ্বালা হলে বর্ষা ভিন্ন কেবল বিদ্যুৎ ও গর্জন ধ্বনি হলে এবং বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে মেঘদর্শন হলে সজ্যোতিঃ অনধ্যায় হবে। যারা ধর্মের আতিশয্য চান, বহুজন সমাকীর্ণ গ্রাম ও নগরে অথবা দুর্গন্ধময় স্থানে তাদের পক্ষে নিত্য অনধ্যায় হবে। গ্রামের মধ্যে যদি মৃতদেহ থাকে তাহলে, অধার্মিক জন নিকটে থাকলে, রোদন ধ্বনি কর্ণগোচর হলে ও অনেক লোকের সমাগম হলে সেখানে অনধ্যায় জানবে। জল-মধ্যে, মধ্যরাত্রে, বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগের সময়ে, উচ্ছিষ্ট মুখে অথবা শ্রাদ্ধভোজনের দিবা-রাত্রে মনে মনেও বেদের চিন্তা করবে না। বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রেতশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই দিন থেকে তিন দিন পর্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করবেন না। রাজার অশৌচ জন্মালে এবং চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হলেও তিন রাত্রি অনধ্যায় হয়। অথবা একোদ্দিষ্টভোজী বিদ্বান ব্রাহ্মণের বিপুল দেহে যে সময় পর্যন্ত শ্রাদ্ধের স্নেহপদার্থ ও কুঙ্কুম চন্দন প্রভৃতির গন্ধ বর্তমান থাকে, ততদিন তিনি বেদাধ্যয়ন করবেন না। শয্যায় সম্পূর্ণ শরীর রেখে উবু হয়ে, দুটি জানুতে বস্ত্র প্রভৃতি বেঁধে মাংস ভোজন বা জন্ম-মরণাশৌচের অন্ন খেয়ে বেদাধ্যয়ন করবে না। কুজ্ঝটিকা হলে, বাণপাত হলে, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার সময়ে এবং অমাবস্যা, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী, অষ্টমী—এই সব তিথিতে অনধ্যায় জানবে। উপাকর্ম আর উৎসর্গ কর্মের পর তিন রাত্রি অনধ্যায় জানবে। অগ্রহায়ণ মাসের, পৌষ মাসের ও মাঘ মাসের তিনটি কৃষ্ণাষ্টমীকে পণ্ডিতেরা অষ্টকা বলেছেন। চালতা গাছ, শিমুল গাছ, মউল গাছ, রক্তকাঞ্চন গাছ ও কয়েৎবেল গাছের ছায়ায় কখনো অধ্যয়ন করবে না। সমানবিদ্য ব্যক্তির মৃত্যু হলে, সতীর্থের মৃত্যু হলে এবং আচার্যের মৃত্যু হলে তিন রাত্রি অনধ্যায় হবে। যে সমস্ত অনধ্যায়ের কথা বলা হল, সেইগুলি ব্রাহ্মণদের পক্ষে ছিদ্রস্বরূপ। রাক্ষসেরা সেই অনধ্যায় দিনে অধ্যয়নরূপ ছিদ্র পেলে হিংসা করে, তাই এই সমস্ত অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন বর্জন করবে। নিত্যকর্মে, সন্ধ্যোপাসনায়, উপাকর্মে, আরব্ধ কর্মের পরিসমাপ্তিতে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় দোষ হয় না। প্রবল বায়ু আরম্ভ হলে বা অষ্টকা প্রভৃতিতেও ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ অথবা সাম-বেদের একটিমাত্র মন্ত্র অধ্যয়ন করা যায়। বেদাঙ্গ, মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র পাঠে অনধ্যায় দোষ হয় না। এইগুলির ক্ষেত্রে কেবল পর্বদিনে অনধ্যায় জানবে। ব্রহ্মচারীদের এই ধর্ম আমি সংক্ষেপে বললাম। পুণ্যাত্মা ঋষিদের

কাছে ব্রহ্মা এই কথা পূর্বে বলেছেন। হে দ্বিজগণ, যে দ্বিজাতি বেদ অধ্যয়ন না করে অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন করে, সে অতিশয় মূঢ় ও বেদবহিষ্কৃত। দ্বিজাতিরা তার সঙ্গে আলাপ করবে না। দ্বিজ কেবল বেদপাঠ করেই সন্তুষ্ট হবেন না। কারণ বেদাধ্যায়ী দ্বিজ পূর্বোক্ত আচার না মানলে কর্দমপতিত গোরুর মতো অবসন্ন হয়। যে বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন করেও বেদার্থ বিচার করে না, সে সবংশে শূদ্রতুল্য হয় ও দান প্রভৃতির পাত্ররূপে পরিগণিত হয় না। কেউ যদি গুরুগৃহে আজীবন বাস করতে ইচ্ছা করে, তবে সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শরীরনাশ পর্যন্ত একাগ্রচিত্ত হয়ে গুরুর পরিচর্যা করবে। অথবা বনে গমন করে বিধিপূর্বক অগ্নিতে হোম করবে এবং সেই সময়ে ও প্রত্যহ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সমাহিত হয়ে বেদাভ্যাস করবে। ভস্মস্নানপরায়ণ হয়ে সর্বদা একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী শতরুদ্রীয় আর বেদাঙ্গসমূহ বিশেষভাবে অভ্যাস করবে। বেদবেদাঙ্গসম্মত এই উৎকৃষ্ট পুরাণবিধি তোমাদের কাছে বললাম। পূর্বকালে দেব স্বায়ম্ভুব মনু শ্রেষ্ঠ ঋষিদের জিজ্ঞাসায় তাদের এ কথা বলেছিলেন। যে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্বক এই বিধি পালন করেন, তিনি সংসারের মায়াজাল পরিত্যাগ করে অনাময় পরম মঙ্গলকর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে
বেদাধ্যয়নাদিক্রমনিয়ম নামে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ, দ্বিজাতিরা নিজ শাখা অধ্যয়নের পর একবেদ, দুইবেদ, তিনবেদ বা চারবেদই অধ্যয়ন করবেন। অধ্যয়ন করে বেদার্থ সম্যকরূপে অবগত হয়ে পরে সমাবর্তন স্নান করবেন। গুরুকে ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করে তাঁর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক সমাবর্তন স্নান করতে হয়। যিনি ব্রত আচরণ করেছেন, যিনি বিশুদ্ধচিত্ত, শক্তিমান তিনিই সমাবর্তন স্নানের অধিকারী। স্নাতক বংশযষ্টি, অন্তর্বাস, উত্তরীয় বস্ত্র, দুটি যজ্ঞোপবীত ও জলসহিত কমণ্ডলু—এই সব ধারণ করবেন। নখ কেশ কর্তন করে শুচি হয়ে ছত্র, নির্মল উষ্ণীষ, চর্মপাদুকা, কাষ্ঠপাদুকা ও স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করতে হয়। প্রত্যহ বেদ অধ্যয়নে রত হতে হয়। বহির্মাল্য ধারণ করতে নেই। কাঞ্চনমালা ছাড়া অন্য রক্তমাল্য ধারণ করতে নেই। শুক্লবস্ত্র পরিধান ও শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করতে হয়। সর্বদা প্রিয়দর্শন হতে হয়। যদি ঐশ্বর্য থাকে, তাহলে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিধান করতে নেই। রক্তবস্ত্র, উৎকট বস্ত্র বা অন্যে পরিধান করেছে এমন বস্ত্র পরিধান করতে নেই। অন্যে যে কমণ্ডলু ধারণ করেছে, তাও ধারণ করবে না। অন্যের ব্যবহৃত চর্মপাদুকা বা কাষ্ঠপাদুকা, মালা, উপবীত, অলংকার, কুশ, ও কৃষ্ণাজিনও ধারণ করবে না। প্রতিকূল হয়ে থাকবে না বিকৃত বস্ত্র পরিধান করবে না। রূপলক্ষণসম্পন্না, যোনিদোষ-বিবর্জিতা, মঙ্গলময়ী ও নিজের সবর্ণা স্ত্রীকে যথাবিধি বিবাহ করবে। সমান গোত্রের, একই বংশের বা মাতামহ গোত্রের কন্যাকে বিবাহ করবে না। শীলযুক্তা ও শৌচাচারসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করবে। যত দিন পর্যন্ত পুত্রের জন্ম হতে পারে তত দিন পর্যন্ত ঋতু নিষিদ্ধ দিন ছাড়া ঋতুকালে যত্ন সহকারে ভার্যার সঙ্গে মিলিত হবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে ভার্যার সঙ্গে মিলিত হবে না। এই

সমস্ত তিথিতে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সর্বদা ব্রহ্মচর্যাবলম্বন করবে। স্নাতক নিত্যই আবসথ্যাগ্নি গ্রহণ করবে ও অগ্নিতে হোম করবে এবং পবিত্রকারক ব্রতসমূহ পালন করবে। প্রত্যহ অনলস হয়ে বেদোক্ত স্বকীয় কার্য করবে, তা না করলে শীঘ্রই পতিত হতে হয় ও দেহাবসানে ভীষণ নরকে বাস করতে হয়। প্রযত্নের সঙ্গে বেদ পাঠ করবে, মহাযজ্ঞগুলি অনুষ্ঠান করবে এবং গৃহ্যোক্ত কর্মসমূহ ও সন্ধ্যোপাসনা করবে। নিজের সমান বা অধিক গুণাদিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা করবে। সর্বদা ঈশ্বর আরাধনায় রত থাকবে, সর্বদা দেবপরায়ণ হবে এবং ভার্যাকে ভূষিত করবে। সর্বদা লোকের কাছে 'আমি এই ধর্মীয় কার্য করেছি' এ রকম প্রচার করবে না এবং নিজের পাপ গোপন করবে না। যাতে সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পা থাকে, এ রকম নিজের হিতজনক কার্য করবে। নিজের যেমন বয়স, যেমন কর্ম, যে পরিমাণ ধন, যে রকম বেদাধ্যয়ন, যে রকম বংশমর্যাদা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বদা বেশভূষা, বেদ, বাক্য ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে সুখে কালযাপন করতে হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত এবং সাধুজন কর্তৃক সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত আচারেরই অনুষ্ঠান করবে। অন্য কোন আচারে মন দেবে না। পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় ধর্মেই সন্দেহ উপস্থিত হলে এই রকম মীমাংসা করবে যে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যে সৎপথ অবলম্বন করে গিয়েছেন, সাধুদের অবলম্বিত সেই পথেই গমন করতে হবে। তাতেই সেই পাপ থেকে উত্তীর্ণ হবে। এই ভাবে প্রত্যহ বেদাধ্যয়নকারী, যজ্ঞোপবীতযুক্ত, সত্যবাদী ও জিতক্রোধ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সন্ধ্যাস্নান ও ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, পর গুণে দোষারোপবিহীন, মৃদু ও ইন্দ্রিয়দমনশীল গৃহস্থ পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকে বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ পরিত্যাগ করে বিধানানুসারে সাবিত্রী জপ ও শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সংসার থেকে মুক্ত হন। যিনি সর্বদা মাতা, পিতা, গো ও ব্রাহ্মণের হিতসাধনে রত, দেবভক্ত এবং দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন। গৃহী সর্বদা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সাধন করবেন, প্রত্যহ শুদ্ধান্তঃকরণে দেবতাদের প্রণাম ও তাঁদের পূজা করবেন। গৃহস্থিত, বিভাগশীল, সর্বদা ক্ষমাযুক্ত ও দয়ালু ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলে। কেবল গৃহে বাস করলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, শম ও অধ্যাত্মনিরত জ্ঞান—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত গুণগুলি বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করবেন। কখনই এইগুলি বর্জন করবেন না। আর গর্হিত কর্ম পরিত্যাগ করে যথাশক্তি সৎকর্মানুষ্ঠান করবেন। মোহজাল ছেদন পূর্বক শ্রেষ্ঠ যোগ লাভ করলে যে গৃহস্থ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তাতে সন্দেহ নেই।

অন্যে ক্রোধপূর্বক নিন্দা, অনাদর, তিরস্কার, হিংসা, বন্ধন ও বধোদ্যোগরূপ দোষ করলে তা সহ্য করার নাম ক্ষমা। নিজের দুঃখের মতো পরের দুঃখে সুহৃদ ভাবে করুণা করার নাম দয়া। মুনিরা এই দয়াকে সাক্ষাৎ ধর্মের কারণ বলেছেন। চতুর্দশ বিদ্যার অর্থ জ্ঞানপূর্বক ধারণের নাম বিজ্ঞান জানবে। সেই বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম বৃদ্ধি হয়। যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন-পূর্বক তার অর্থ সম্যক ভাবে অবগত হয়েও যদি কেউ ধর্মকার্য না করে, তাহলে তার সে জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না। যে রকম ঘটেছে, সেই রকম বলার নাম সত্য। এ কথা মনীষীরা বলেছেন। সেই সত্য দ্বারা পরকালে লোকসমূহ জয় করা যায়। সত্যই সেই পরম পদ। তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা শরীর ক্ষয়ের নাম দম। বুদ্ধি ও প্রসন্নতায় যার জন্ম সেই হল শম। যেখানে গিয়ে আর শোক করতে হয় না, সেই অক্ষর পরব্রহ্মের

নাম অধ্যাত্ম। যে বিদ্যা দ্বারা দেবাদিদেব ভগবান মহাদেবকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা যায় তাকে জ্ঞান বলে। মহাদেবে যার মতি, যিনি মহাদেবের অর্চনায় তৎপর আর নিত্য অক্রোধী ও শুচি, তিনিই বিদ্বান। মহাযজ্ঞপরায়ণ সেই বিদ্বানই উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ধর্মের গৃহস্বরূপ শরীরকে যত্নপূর্বক পালন করবে। দেহ ছাড়া সেই পরমপুরুষ মহাদেবকে লাভ করা যায় না। গৃহী সর্বদা সংযত হয়ে ধর্ম, অর্থ ও কামে নিরত থাকবে, কিন্তু ধর্মবর্জিত অর্থ বা কামের কথা মনেও আনবে না। ধর্মকার্য দ্বারা অবসন্ন হলেও কদাচ অধর্ম আচরণ করবে না। দেবরূপী ভগবান ধর্মই সকল প্রাণীর গতি। সকল প্রাণীর প্রিয়কর্ম করবে, পরদ্রোহে কদাচ বুদ্ধি করবে না, বেদ বা দেবতার নিন্দা করবে না। এমন কি, যে দেবতার নিন্দা করে, তার সঙ্গে আলাপ করবে না, যে ব্রাহ্মণ শুচি হয়ে সর্বদা এই ধর্মাধ্যায় পাঠ করেন বা পাঠ করান অথবা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করে সেখানে সম্মানিত হয়ে থাকেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে ধর্মাধ্যায়
নামে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। অহিতকর বা অপ্রিয় কথা বলবে না। কোন রকম চুরি করবে না। অন্যের তৃণ, শাক, মৃত্তিকা বা জল চুরি করলেও মানুষ নরকে যায়। রাজা, শূদ্র এবং পতিত ব্যক্তির কাছে দান গ্রহণ করবে না। যদি কেউ অশক্ত হয় তাহলে অবশ্য সকলের কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু পতিতের কাছে কখনই প্রতিগ্রহ করতে নেই। সর্বদা যাচঞা করবে না এবং বার বার একজনের কাছে যাচঞা করবে না। প্রত্যহ একজনের কাছে যে যাচঞা করে সেই দুর্মতি যাচক দাতার প্রাণ হরণ করে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, আপৎকালেও দেবদ্রব্য ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করবে না। মুনিরা সর্পাদির মুখনিঃসৃত বিষকে বিষ বলেন নি, কিন্তু ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বকেই বিষ বলেছেন। তাই সর্বদা তা পরিত্যাগ করবে। শাক, জল, ফল, মূল ও তৃণ—এই সমস্ত দ্রব্য দ্রব্যস্বামী দান না করলেও যদি গ্রহণ করা হয়, তবু তা চুরি বলে গণ্য হয় না, প্রজাপতি মনু এই কথা বলেছেন, তার মধ্যে বিশেষ এই যে দেবপূজার জন্য দ্বিজগণ না বলে পুষ্প গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাও অধিকারীর অনুমতি ছাড়া প্রত্যহ এক স্থান থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্প—এই সমস্ত অদত্ত বস্তু কেবল ধর্মের নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু উপভোগাদির জন্য গ্রহণ করলে পতিত হতে হয়। ক্ষুধায় পীড়িত পথিক তিল, মুগ, যব প্রভৃতি মুষ্টি পরিমাণে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত না হলে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত নয়, ধর্মবেত্তারা এই রকম নিয়ম নির্দেশ করেছেন। পাপ করে বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রত করার সময়ে পাপ গোপন করে 'আমি পুণ্যের জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান করছি, প্রায়শ্চিত্তের জন্য নয়', এই রকম কথায় স্ত্রী ও শূদ্রাদি ব্যক্তিকে ভুলিয়ে কোন অনুষ্ঠান করতে নেই। ছল করে যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয় তা রাক্ষসদের ভোগ্য হয়। তাছাড়া এ রকম ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পরলোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হন। যার যা

বর্ণাশ্রমবিহিত চিহ্ন নয়, সে যদি সেই সব চিহ্ন প্রভৃতি ধারণ করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে সে তার দ্বারা বর্ণাশ্রমীদের পাপ গ্রহণ করে এবং সেই পাপে জন্মান্তরে তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে। ধর্মবিনাশক, বিড়ালব্রতধারী সেই পাপীরা পাপের ফলে সদ্যই পতিত হয়। তার সেই কর্মের এই ফল। বেদবিরুদ্ধ-মার্গাবলম্বী, অন্য বর্ণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, পঞ্চরাত্র মতাবলম্বী, পাশুপত ধর্মাবলম্বীদের বাক্য দ্বারাও অর্চনা করবে না। বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত, এবং ব্রাহ্মণ নিন্দারত ব্যক্তিদের মনে মনেও চিন্তা করবে না। এই সমস্ত পাপীরা পতিত। এদের সঙ্গে যাজন, বিবাহাদি সম্বন্ধ, একাসনে বাস ও সম্ভাষণ করলেও পতিত হতে হয়। এই জন্য সযত্নে তাদের সঙ্গে এই সব কার্য পরিত্যাগ করবে। দেবদ্রোহের চেয়ে গুরুদ্রোহ কোটিগুণ বেশী দোষজনক। আবার নাস্তিক্য গুরুদ্রোহের চেয়েও কোটিগুণ বেশী দোষজনক। গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, কৃষ্যাদি বা রাজসেবা প্রভৃতি কাজের অপকর্ষ ঘটলে কিংবা কুল ক্রমাগত সদাচার নষ্ট হলে প্রশংসিত কুলেরও অপকর্ষ ঘটে থাকে। কুবিবাহ, সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করা, বেদপাঠ না করা ও ব্রাহ্মণের অবমাননা করা—এই সব কারণেও কুল দূষিত হয়। মিথ্যাকথন, পরদারগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ আর শ্রুতিবিরুদ্ধ ধর্মাচরণ হেতু কুল শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। অশ্রোত্রিয় আর বিহিতাচারশূন্য দ্বিজদের এবং শূদ্রদের দান করলেও কুল নীচু হয়। যে গ্রামে বহু অধার্মিক আর পাষণ্ডী বাস করে, সেখানে, অত্যন্ত রোগবহুল গ্রামে এবং শূদ্রের রাজ্যে বাস করবে না। দ্বিজ হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করবে, আর পূর্ব বা পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব বা পশ্চিম ভাগেও শুভ দেশে বাস করতে পারে, কিন্তু অন্য দেশে বাস করবে না। যে দেশে প্রত্যহ কৃষ্ণসারমৃগ স্বভাবত বিচরণ করে ও শাস্ত্রোক্ত পবিত্র নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, দ্বিজ সেই স্থানে বাস করবে। এ ছাড়া অন্য স্থানে বাস করতে পারবে না। চণ্ডাল প্রভৃতির নিকটবর্তী গ্রামেও বাস করবে না। পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্বিত, রজক প্রভৃতি নীচজাতি আর অন্ত্যাবসায়ীদের সঙ্গে বাস করবে না। এই সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পঙ্ক্তিতে ভোজন, ভাণ্ডমিশ্রণ ও পক্কান্নের মিশ্রণ, এদের পৌরোহিত্য, এদের অধ্যাপনা, এদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ, অন্য কালে বা এক কালে এক পাত্রে এক-সঙ্গে ভোজন, একত্রে অধ্যয়ন ও একত্রে যাজন—এই এগারোটি সংকর নামক দোষ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সব কার্য করলে এদের পাপে পাপী হতে হয় আর এই সমস্ত ব্যক্তির নিকটে বাস করলেও পাপ হয়। তাই সযত্নে সংকর-পাপজনক কর্ম পরিহার করে চলতে হয়। কিন্তু এক পঙ্ক্তিতে উপবেশন করেও যদি ভস্ম দ্বারা সীমা নির্দেশ করা যায় আর পরস্পরকে স্পর্শ না করে, তাহলে সংকর দোষ হয় না। অগ্নি, জল, ভস্ম, দ্বার, স্তম্ভ এবং রাস্তা—এই ছয় দ্রব্য দ্বারা এক পঙ্ক্তি পৃথক হয়ে যায়। প্রয়োজন না থাকলে শত্রুতা ও বিবাদ এবং খলতা করবে না আর পরের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে গমন করে গাভী, শস্য প্রভৃতি ভক্ষণ করলে তা কাউকে বলবে না। বিদ্বান ব্যক্তি অশৌচী ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করবে না। কাউকে মর্মবেদনা দেবে না। সূর্যমণ্ডলের পরিবেশ, চন্দ্রের পরিবেশ, ইন্দ্রধনু এবং শবাগ্নি অন্যকে বলে দেখাবে না। বহু লোকের সঙ্গে এবং বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ করবে না। পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের প্রতিকূল কর্ম করবে না। নিজের জন্ম সম্বন্ধে অমুক পক্ষের অমুক তিথিতে বা অমুক নক্ষত্রে

জন্ম হয়েছে, এ রকম কথা কাউকে বলবে না। ব্রাহ্মণ, রজস্বলা বা অশুচি ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবে না। দেবতা, গুরু বা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দান থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবে না। নিজের প্রশংসা ও অন্যের নিন্দা করবে না, দেবতা নিন্দা ও বেদনিন্দা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করবে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, হে দ্বিজ দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং বেদনিন্দা করে এমন ব্যক্তির নিষ্কৃতির উপায় কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা, দেবনিন্দা বা সোপবৃংহণ বেদের নিন্দা করে, সে ব্যক্তি শতকোটি কল্পেরও অধিক কাল নরকে বাস করে। বেদ, গুরু বা দেবতা প্রভৃতির নিন্দা শুনলে মৌনাবলম্বন করবে, কোন উত্তর দেবে না। ঐ নিন্দাকারী ব্যক্তিদের দেখবে না এবং কর্ণ আবৃত করে সে স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাবে। জ্ঞানবান ব্যক্তি পরের গুপ্ত কথা আলোচনা করবে না, বরং গোপন করে রাখবে। আত্মীয়-জনের সঙ্গে কখনই বিবাদ করবে না। ব্রাহ্মণ পাপীই হোক বা নিষ্পাপই হোক, তাকে পাপী বলবে না। কারণ প্রকৃত পাপীকেও পাপী বললে তার তুল্য পাপ হয় এবং যে পাপী নয় তাকে পাপী বললে মিথ্যা বলার জন্য অধিক পাপী হতে হয়। কেউ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হয়ে রোদন করলে তার সে অশ্রুবিন্দু ঐ অপবাদকারীর পুত্র ও পশুদের বিনষ্ট করে থাকে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুরুপত্নীগমন বা বিমাতৃ-গমন—এই সমস্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগ। এ নির্দেশ সাধুদের। কিন্তু মিথ্যা-বাক্যকথনে পাপীর শুদ্ধি দেখা যায় না।

উদীয়মান বা অস্তগামী চন্দ্র বা সূর্যকে বিনা কারণে দর্শন করবে না। আকাশ-মধ্যস্থ, জলবিম্বে প্রতিগত বা রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্যকেও অকারণে দর্শন করবে না। বস্ত্রাচ্ছাদিত ও আয়নার মধ্যগত চন্দ্র-সূর্যকেও দর্শন করবে না। বিবস্ত্রা স্ত্রী এবং বিবস্ত্র পুরুষকেও দর্শন করবে না। মূত্র, মল বা সংস্পৃষ্ট-মৈথুন ব্যক্তিকে দর্শন করতে নেই। অশুচি হয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি দর্শন করবে না। পণ্ডিত, বিকলাঙ্গ ও চণ্ডাল এবং উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিদের দর্শন করবে না। উচ্ছিষ্ট বা অবগুণ্ঠিত হয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করবে না। প্রেত সংস্পর্শকারীকে স্পর্শ করবে না। রাগান্বিত গুরুর মুখ দর্শন করবে না। তৈল ও জলে ছায়া দর্শন করবে না। পত্নী আহার করতে বসলে তাকে দর্শন করবে না। যে গোরুকে বন্ধন করা হয় নি তাকে এবং মত্ত ও উন্মত্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না। ভার্যার সঙ্গে একত্রে আহার করবে না। ভার্যা যখন প্রস্রাব করছে, হাঁচছে বা হাই তুলছে বা নিজের ইচ্ছামতো বসে আছে, তখন তাকে দর্শন করবে না। ভালোই হোক বা মন্দই হোক, নিজের প্রতিবিম্ব জলে দর্শন করবে না। কখনো মূত্র লঙ্ঘন করবে না বা মূত্রের উপর দাঁড়াবে না। শূদ্রকে জ্ঞানোপদেশ করবে না। তিলমিশ্রিত অন্ন, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু দেবে না। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম ও হোমের দ্রব্য দেবে না এবং দাস ভিন্ন অন্ন শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দেবে না। শূদ্রকে ব্রতোপদেশ বা ধর্মোপদেশও করবে না। ক্রোধের বশ হবে না এবং অনুরাগ ও দ্বেষ দুই-ই পরিহার করবে। লোভ, অহংকার, অসূয়া, জ্ঞানীর নিন্দা, মান, মোহ, ক্রোধ ও দ্বেষ—এ সব যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করবে। কাউকে পীড়ন করবে না, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যকে তাড়না করবে। হীন ব্যক্তিদের বা অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তিদের আশ্রয় কখনো নেবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের প্রতি অবজ্ঞা করবেন না, সযত্নে দীনতা বর্জন করবেন। সম্মানী ব্যক্তির অসম্মান করতে নেই এবং নিজে নিজে শপথ করতে নেই। নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটবে না, গোরুকে শুইয়ে

দেবে না। বহু নদীকে একটি নদী বলে এবং বহু পর্বতকে একটি পর্বত বলে নির্দেশ করবে না। সঙ্গীকে ভোজনকালে বা বিশ্রামকালে পরিত্যাগ করবে না। বিবস্ত্র হয়ে অবগাহন করবে না। অগ্নিতে পাদক্ষেপ করবে না। প্রথমে মস্তকে তৈল দিয়ে অবশিষ্ট তৈল শরীরে মর্দন করবে না। সর্প আর অস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না ও বিনা প্রয়োজনে নিজের ইন্দ্রিয়গুলি স্পর্শ করবে না। গুপ্তস্থানের রোমগুলি স্পর্শ করবে না। অশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গমন করবে না। হস্ত পদ, বাক্য আর চক্ষুর চপলতা ত্যাগ করবে। লিঙ্গ, উদর আর কর্ণের চপলতা পরিহার করবে। শরীর ও নখে শব্দ করবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করবে না। হস্ত বা পদ দ্বারা জল তাড়না করবে না। ইট ও ফল দ্বারা ফল ভাঙবে না। ম্লেচ্ছ ভাষা শিখবে না। পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করবে না। নখ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা নখবাদ্য করবে না। নখ দ্বারা তৃণ প্রভৃতি ছেদন বা ভূমি খনন প্রভৃতি করবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অকারণ বা নিষ্ফল যুদ্ধ করবেন না। ভক্ষ্য বস্তু কোলে নিয়ে ভক্ষণ করবে না এবং যাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল নেই এমন কাজ করবে না। বিনা প্রয়োজনে নৃত্য করবে না, গান করবে না ও বাদ্য বাজাবে না। একই সঙ্গে দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চুলকাবে না। ঔষধ বা লৌকিক স্তব দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে না। অক্ষক্রীড়া করবে না, দৌড়বে না এবং জলে মলমূত্র ত্যাগ করবে না। উচ্ছিষ্ট হয়ে নিদ্রা যাবে না. বিবস্ত্র হয়ে স্নান করবে না এবং উচ্ছিষ্ট বা বিবস্ত্র হয়ে গমন, পাঠ ও মস্তক স্পর্শ করবে না। দন্ত দ্বারা নখ বা লোম ছিঁড়বে না, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাবে না। প্রাতঃকালীন রৌদ্র আর চিতাধূম শরীরে লাগাবে না। একা শূন্য গৃহে শয়ন করবে না। নিজে চর্মপাদুকা বহন করবে না। অকারণে থুথু ফেলবে না এবং বাহু দ্বারা নদী পার হবে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি পদ দ্বারা পদপ্রক্ষালন করবেন না, অগ্নিতে পদদ্বয় তপ্ত করবেন না এবং দেবতা, গুরু, বিপ্র, গো, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য—এদের বিষয়ে প্রবঞ্চনা করবেন না। অশুচি হয়ে শয়ন, যানারোহন, বেদাধ্যায়ন, স্নান, ভোজন ও বাইরে বেরোনো —এই সব কাজ কখনো করবে না। শয়ন, অধ্যয়ন, যানে আরোহণ, মলমূত্র ত্যাগ, ভোজন ও গমন—এই সমস্ত কর্ম দুটি সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্ন সময়ে সযত্নে পরিহার করে চলবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় হাত দিয়ে গোরু, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, অন্ন ও দেবতার প্রতিমূর্তি স্পর্শ করবে না আর পা দিয়ে তো এই সব কখনই স্পর্শ করবে না। অশুচি ব্যক্তি অগ্নির পরিচর্যা করবে না এবং দেবতা ও ঋষিদের নামকীর্তন করবে না। অগাধ জলে অবগাহন করবে না এবং এক হাতে অগ্নি ধারণ করবে না। বাম হাতে জল তুলে পান করবে না এবং উপুড় হয়ে পশুদের মতো মুখ দিয়ে জল পান করবে না, উচ্ছিষ্ট মুখে উত্তর দেবে না। জলে রেতঃ ত্যাগ করবে না। মলমূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তুতে স্পৃষ্ট বস্ত্র প্রভৃতি ধৌত করার জন্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করবে না। বেগবতী নদী পার হবে না এবং জলে মৈথুন আচরণ করবে না। চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করবে না। জলে থুথু ফেলবে না। অস্থি, ভস্ম, কপাল, কেশ, কণ্টক, তুষ, অঙ্গার আর শুষ্ক গোময়ের উপর কখনই উঠবে না। বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি লঙ্ঘন করবে না। শয্যার নীচে অগ্নি রাখবে না। পায়ের কাছে কখনই অগ্নি রাখবে না। মুখের সাহায্যে অগ্নি জ্বালাবে না। অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করবে না। জল দিয়ে অগ্নি

নির্বাপিত করবে না। কূপে নেমে স্নান করবে না ও অশুচি অবস্থায় কখনো কিছু বলবে না। সুহৃদের মৃত্যু বা পীড়ার সংবাদ অন্য ব্যক্তিকে নিজে শোনাবে না। বাণিজ্য করতে গিয়ে বিক্রয়ের অযোগ্য বস্তু বা মিথ্যা কথার দ্বারা বঞ্চনা করে কোন বস্তু বিক্রয় করবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি মুখে ফুঁ দিয়ে অগ্নি জ্বালাবে না। অশুচি হয়ে পুণ্যস্থানের জলাশয়ে স্নান করবে না। সীমান্ত ভূমিতে চাষ করবে না। পূর্বে সত্য প্রতিজ্ঞা করে কখনই তা ভঙ্গ করবে না। সর্প, পশু, পক্ষী,—এদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে না। জল, বায়ু বা রৌদ্রের দ্বারা অন্যের পীড়া উৎপাদন করবে না। শিল্পীর কাছ থেকে কোন ভালো জিনিস তৈরি করিয়ে নিয়ে তার মজুরি না দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেবে না। ভিক্ষার জন্য সন্ধ্যায় বা প্রাতে গৃহদ্বারে আঘাত করবে না। অন্যের ভোগের পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত গন্ধদ্রব্য আর মালা ধারণ করবে না। ভার্যার সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করবে না। পথ ছেড়ে কুপথে যাবে না। ব্রাহ্মণ খেতে খেতে দাঁড়াবে না এবং হাসতে হাসতে কথা বলবে না। নিজের অগ্নি হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না। জলে বেশীক্ষণ থাকবে না। পাখা, কুলো বা হাত দিয়ে নিজের অগ্নি জ্বালাবে না। মুখের দ্বারাই অগ্নি জ্বালাবে, কারণ মুখ থেকেই অগ্নির জন্ম। পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাষণ করবে না। অযাজ্য ব্যক্তির পৌরোহিত্য করবে না। ব্রাহ্মণ একাকী সভায় যাবে না এবং বহু লোক একত্র হয়ে দল বেঁধেও যাবে না। প্রদক্ষিণ না করে দেবগৃহে প্রবেশ করবে না। বস্ত্র দ্বারা বায়ুসেবন করবে না, দেবগৃহে নিদ্রা যাবে না। একা বা অধার্মিক লোকের সঙ্গে পথ চলবে না। পণ্ডিত, শূদ্র ও অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে এবং পাদুকাবর্জিত বা জলরহিত হয়ে পথ চলবে না। শত্রুর সঙ্গে এবং কমণ্ডলু না নিয়ে পথ চলবে না। অগ্নি, গো এবং ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়ে কখনো গমন করবে না। হে ব্রাহ্মণগণ, আশ্রিত ও আশ্রয়গ্রহণেচ্ছু স্ত্রীকে উপেক্ষা করবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দেবগৃহে বা দেবতাসান্নিধানে কিংবা যতি, ব্রতী, যোগী ও সিদ্ধপুরুষদের নিন্দা করবে না। ইচ্ছা করে গো ও ব্রাহ্মণের ছায়া লঙ্ঘন করবে না। রোগী ও পতিত প্রভৃতি ব্যক্তিকে নিজের ছায়া লঙ্ঘন করতে দেবে না। অঙ্গার, কেশ ও ভস্ম প্রভৃতির উপর দাঁড়াবে না। সম্মার্জনীর ধুলো গায়ে লাগতে দেবে না এবং স্নান করবার সময়ে ও কলসে জল ভরবার সময়ে সেই জলের ছিটা গায়ে লাগতে দেবে না। অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করবে না ও অপেয় বস্তু পান করবে না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে আশ্রমাচারনিয়মধর্মনামে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করবে না। আপৎকাল ছাড়া জানতই হোক বা অজ্ঞানবশেই হোক, যদি কেউ শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহলে সে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ ছ'মাস অতিনিন্দিত শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে জীবিত অবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের অন্ন উদরে থাকতে থাকতে মৃত্যু হয়, মৃত ব্যক্তি সেই জাতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। রাজার অন্ন, নর্তকের অন্ন, সূত্রধরের অন্ন, চর্মকারের অন্ন, মিলিত জনসমূহের অন্ন আর

বেশ্যার অন্ন—এই ছয় প্রকার অন্ন সর্বদা পরিত্যাগ করবে। কল্মু, ধোপা, মদ্যব্যবসায়ী গায়ক, কামার, অশৌচী আর চোরের অন্ন সর্বদা পরিত্যাগ করবে। কুম্ভকার, চিত্রকর, কুসীদজীবী, পতিত, পৌনর্ভব, নাপিত আর অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করবে না। স্বর্ণকার, নট, ব্যাধ, বন্ধ, আতুর, চিকিৎসক, অসতী স্ত্রী ও দাম্ভিক—এই সব ব্যক্তির অন্ন ভোজন করবে না। চোর, নাস্তিক, দেবতানিন্দুক, সোমবিক্রয়কারী আর শ্বপাক—এই সব ব্যক্তির অন্ন ভোজন করবে না। যে স্ত্রৈণ আর যার গৃহে স্ত্রীর উপপতি বাস করে, তাদের অন্ন এবং উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃপণের অন্ন ভোজন করবে না। পঙ্‌ক্তি ভোজনের যোগ্য হলেও পঙ্‌ক্তির বাইরে প্রদত্ত অন্ন, বহু লোক একত্রিত হয়ে যে অন্ন দান করে সেই অন্ন, শস্ত্রজীবীর অন্ন, ক্লীব ও সন্ন্যাসীর অন্ন, মত্ত ও উন্মত্ত ব্যক্তির অন্ন, ভীত ও রুদিত ব্যক্তির অন্ন, ভর্ৎসনাপূর্বক দত্ত অন্ন, যে অন্নের উপর হাঁচি হয়েছে সেই অন্ন, ব্রাহ্মণদ্বেষী, পাপমতি আর প্রেতশ্রাদ্ধকারীর অন্ন এবং অশৌচান্ন ভোজন করবে না। বৃথাপক্ক অন্ন, শঠ ও চতুরের অন্ন এবং যার সন্তান হয় নি এমন স্ত্রী ও ঠিকা মজুরের অন্ন ভোজন করবে না। শিল্পী, শস্ত্রবিক্রয়কারী, শৌণ্ডিক ও চিকিৎসকের অন্ন এবং ঘণ্টা বাজিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের অথবা ঘাটিদারের অন্ন ভক্ষণ করবে না। বিন্ধলিঙ্গীর, যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বেই বিবাহ করে তার, পরপূর্বার ও পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্মত নিযুক্ত ভ্রাতৃপত্নীতে যে ব্যক্তি নিয়োগধর্ম অতিক্রম করে কামবশত আসক্ত হয় তার অন্ন ভক্ষণ করবে না। অবজ্ঞাত বা পাদাদি দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ও বিস্ময়জনক অন্ন ভোজন করবে না। এমন কি গুরুর অন্নও সংস্কারবর্জিত হলে ভোজন করা উচিত নয়। মানুষের সমস্ত পাপ অন্নে অবস্থান করে বলে যে যার অন্ন ভোজন করে, সেই অন্নভোক্তাকে অন্নদাতার পাপ ভোগ করতে হয়। যে যার কৃষিকর্ম করে; যে পুরুষানুক্রমে নিজের বংশের মিত্র, যে যার গো পালন করে, যে যার দাস্যকর্ম করে এবং যে যার ক্ষৌরকর্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাদের সিদ্ধ অন্ন ভোজন করতে পারা যায়। আর যে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করেছে, তার অন্নও ভোজন করা যায়। নট, কুম্ভকার ও কৃষক—এদের অল্প মূল্য দিয়ে এদের অন্ন ভোজন করা যায়। পায়স, জলোপসেক ছাড়া স্নেহপক্ক বস্তু, ছাতু, তিলের খৈল ও তৈল—এই সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। বৃন্তাকফল, নালিতা শাক, কুসুম শাক, পাথরকুচি, পেঁয়াজ, রসুন, শুক্ত আর নির্যাস—এই সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করবে না। ব্যাঙের ছাতা, গ্রাম্য শূকর, চালিদা; যে নবপ্রসূতা গাভীর প্রসবের পর দশ দিন অতীত হয় নি তার দুধ, বিলয় ও সুমুখ শাক এবং বাঁশের কোড়া—এই সব বস্তু পরিত্যাগ করবে। গাজর, কিংশুক, কুক্কুট, যজ্ঞডুমুর, নিম্নকন্ধ লাউ—এই সব বস্তু ভক্ষণ করলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। তিল ও তণ্ডুলপক্ক বস্তু, ক্ষীরগুড়সংযুক্ত গোধূমচূর্ণ, পায়স ও পিঠে—এই সব বস্তু দেবতার উদ্দেশে ছাড়া কেবল নিজের জন্য প্রস্তুত হলে ভক্ষণ করবে না। আর যে মাংস বা মৎস্যের মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করা হয় নি তা, নিবেদনের আগে নৈবেদ্য প্রভৃতি দেবান্ন, কিংবা হোমের আগে ঘৃত প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য এবং যবাগু, তিতাব্জ ক্ষুদ্র বাতাবিলেবু, কদম্ব, কয়েৎবেল, প্লক্ষ আর বকুল—এই সব বস্তুও সযত্নে পরিত্যাগ করবে। দিনের বেলা খোল প্রভৃতি যে সব বস্তু থেকে স্নেহ উদ্ধৃত হয়েছে তা, তিলের খৈল, ধানা এবং রাত্রিতে তিলসংযুক্ত দ্রব্য ও দধি ভক্ষণ করবে না। দুধের সঙ্গে তক্র পান করবে না,

বীজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে না, রন্ধনকালে অপবিত্র অথবা যা দেখতে অপবিত্র বস্তুর মতো সেই দ্রব্য এবং অসৎসঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করবে। কেশযুক্ত বা কীটযুক্ত, কিংবা মৃত্তিকালিপ্ত অন্ন, গোরু বা কুকুর যে অন্ন ঘ্রাণ করেছে, সিদ্ধ করে নামানোর পর পুনর্বার সিদ্ধ করা অন্ন এবং চণ্ডাল, রজস্বলা ও পতিত ব্যক্তির দৃষ্ট অন্ন ভোজন করবে না। অবজ্ঞার সঙ্গে প্রদত্ত অন্ন, বাসি অন্ন, এক পঙ্‌ক্তিস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা না করে ভোজন শেষ করে আচমন করার পর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের পাতে যে অন্ন থাকে সেই অন্ন, কাক বা কুক্কুট দ্বারা সংস্পৃষ্ট অন্ন, কৃমিসংযুক্ত অন্ন, মনুষ্য যে অন্নের ঘ্রাণ নিয়েছে সেই অন্ন এবং কুষ্ঠরোগীর দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করবে না। রজস্বলা বা অসতী নারী প্রদত্ত অন্ন অথবা ক্রোধপূর্বক প্রদত্ত অন্ন এবং মলিন বস্ত্র পরিহিতা বা নিঃসম্পর্কীয়া রমণী প্রদত্ত অন্ন ভোজন করবে না। বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ ও উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করবে না। প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত না হলে সেই গাভীর দুগ্ধ পান করবে না। মেষের দুগ্ধ ও বৃষাক্রান্ত রজস্বলা গাভীর দুগ্ধ পান করবে না। মনু এই কথা বলেছেন। বলাক, হাঁস, ডাহুক, চড়াই, টিয়া, কুরর—যে সব পাখির পা জোড়া সেগুলি, কোকিল, শুষ্ক মাংস, নীলকণ্ঠ পাখি, খঞ্জন পাখি, শ্যেন, শকুন, পেঁচা, চখাচখী, ভাস, পায়রা, ঘুঘু, টিট্টিভ এবং গ্রাম্যকুক্কুট ভোজন করবে না। সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুর, শূকর, মর্কট আর গর্দভ—এই সব পশু ভক্ষণ করবে না। সাধারণ নিয়ম এই যে নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি ছাড়া অন্য সব গ্রাম্য বা বন্য পশু ও পক্ষী এবং জলচর ও স্থলচর প্রাণী কিছুই ভক্ষণ করবে না। হে সত্তমগণ, গোসাপ, কচ্ছপ, খরগোশ, খড়্গী, শজারু—পঞ্চনখের মধ্যে এই পাঁচটি ভক্ষণীয়—এ কথা প্রজাপতি মনু বলেছেন। আঁশযুক্ত মাছ এবং রুরু হরিণের মাংস ব্রাহ্মণদের নিবেদন করে ভক্ষণ করবে, না হলে নয়। ময়ূর, তিতির পাখি, চাতক পাখি, নাদা, বুড়ো, খুব কান লম্বা খাসী আর বর্তক—এরা ভক্ষণযোগ্য মনু এ কথা বলেছেন। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, মাছের মধ্যে রাজীব, শকুলমাছ, পাঠীন ও রুই মাছ খাওয়া যায়। যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে এই সব প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা যায়। বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই সব মাংস ভক্ষণ করা যায়। এই সব মাংস শাস্ত্র অনুসারে শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে নিযুক্ত হলেও ভক্ষণ করা যায় এবং ব্যাধি হলে বা আহারাভাবে প্রাণ সংশয় হলেও এই সব মাংস ভক্ষণ করবে। মাংস ভক্ষণ না করাই উচিত, কিন্তু যজ্ঞের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করলে এবং ঔষধরূপে, আপৎকালে ও যজ্ঞে নিযুক্ত হয়ে ভক্ষণ করলে কোন দোষ হয় না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বা দৈবকার্যে নিযুক্ত হয়ে মাংস ভক্ষণ করে না; সেই ব্যক্তি পশুর যতগুলি লোম আছে, তত বছর নরক ভোগ করে থাকে। দ্বিজগণ কখনো মদ্য দান, পান, স্পর্শ বা দর্শন কিছুই করবে না—এ কথা শাস্ত্রসিদ্ধ। তাই দ্বিজগণ যত্নপূর্বক সর্বদা মদ্য পরিত্যাগ করবে। মদ্যপান করলে পতিত হতে হয় এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণের কাছে সম্ভাষণেরও অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কেউ অভক্ষ্য ভক্ষণ করলে বা অপেয় পান করলে প্রায়শ্চিত্ত করে সে যত দিন না পাপমুক্ত হয়, ততদিন তার কর্মে অধিকার থাকবে না। হে বিপ্রগণ, তাই নিত্যই সযত্নে অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান পরিহার করবে। এর অন্যথা করলে নরকগামী হবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণয় নামে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, হে মহামুনি, যার দ্বারা এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারা যায়, ব্রাহ্মণদের প্রতি দিন কর্তব্য সেই কর্মগুলির বিবরণ দিন। ব্যাস বললেন, ব্রাহ্মণদের প্রতি দিন কর্তব্য কর্মগুলি আমি ক্রমে ক্রমে বলছি। তোমরা সমাহিত চিত্তে আমার কাছ থেকে তা শোন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে নিদ্রা থেকে উঠে মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করবে। ধর্ম এবং অর্থের কথা এবং তা কি রকম কায়ক্লেশে লাভ করা যায়, তাও চিন্তা করবে। পরে সূর্যোদয়ের সময় হলে পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে অবশ্য কর্তব্য শৌচ প্রভৃতি ক্রিয়া সমাপন করে পবিত্র নদীতে স্নান করবেন। যারা পাপী তারাও প্রাতঃস্নান করলে পবিত্র হয়। তাই সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে প্রাতঃস্নান করবে। প্রাতঃস্নানের দ্বারা দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল হয়ে থাকে। তাই মুনিরা প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করেন। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেই ঋষিদের ঋষিত্ব প্রাপ্তি হয় তাতে সন্দেহ নেই। নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ থেকে সর্বদা লালা প্রভৃতি নির্গত হয়ে থাকে, তাই প্রথমে স্নান না করে কোন বৈধ কর্মাচরণ করবে না। অলক্ষ্মী, কালকর্ণিকা, দুঃস্বপ্ন, দুষ্টচিন্তা—সমস্ত পাপই প্রাতঃস্নান দ্বারা নষ্ট হয়, তাতে সন্দেহ নেই। অস্নাত ব্যক্তির কোন কর্মেই পবিত্রতা জন্মায় না, তাই জপ, হোম প্রভৃতি কর্মের পূর্বে অবশ্যই স্নান করবে। পীড়া প্রভৃতির জন্য অসমর্থ ব্যক্তি মস্তকে জল না দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ প্রক্ষালন করবে। তা না পারলে ভিজে কাপড় দিয়ে শরীর পরিষ্কার করবে। এতেই সে পবিত্র হবে। যদি কেউ তাও করতে না পারে তাহলে সে নিম্নোক্ত যে কোন প্রকারে স্নান করবে। অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে মহর্ষিদের মতে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্ম প্রভৃতি স্নান করা উচিত। ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক—এই ছয় রকম স্নানের কথা ঋষিরা বলেছেন। জলবিন্দুসহ কুশ দ্বারা মন্ত্র পাঠ করে যে মার্জন করা হয় তার নাম ব্রাহ্মস্নান। আপাদমস্তকভস্ম লেপনের নাম আগ্নেয়স্নান। গোরুর পা থেকে উত্থিত ধূলির দ্বারা আপাদমস্তক ভূষিত করার নাম বায়ব্যস্নান। রৌদ্র লাগানো ও বৃষ্টির জল লাগানোর নাম দিব্যস্নান। মনে মনে আত্মচিন্তা করে অবগাহন স্নানের নাম বারুণস্নান এবং যোগস্থ হয়ে বিশ্ব প্রভৃতি চিন্তার নাম যৌগিকস্নান। ব্রহ্মবাদীরা এই যৌগিকস্নান করে থাকেন, একে আত্মতীর্থ বলে। স্নান পুরুষদের অন্তঃশুদ্ধিকর। তাই প্রত্যেক দিন স্নান করবে। বিদ্বান ব্যক্তি শক্তি অনুসারে বারুণ বা প্রাজাপত্য স্নান করবেন। প্রথমে দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন করে বিধান অনুসারে তার দ্বারা দন্ত মার্জনা করবে। তার পর আচমন করে পবিত্র হয়ে প্রতি দিন প্রাতঃকালে স্নান করবে। দন্তকাষ্ঠ হবে মধ্যমা অঙ্গুলির মতো স্থূল, দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ আর ত্বকযুক্ত। তার অগ্রভাগ দ্বারা দন্ত মার্জনা করবে। ক্ষীরী বৃক্ষ বা মালতী বৃক্ষ এবং আপাং, বিল্ব বা করবী বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জনা বিশেষ শুভ। বিধানজ্ঞ ব্যক্তি নিন্দিত দন্তকাষ্ঠ-সমূহ পরিত্যাগ করে শাস্ত্রোক্ত একটি দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করে অনিষিদ্ধ দিনে তার দ্বারা দন্ত মার্জনা করবে। দন্তকাষ্ঠ উৎপাটন করবে না এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ধারণ করবে না। দন্ত মার্জনার পর দন্তকাষ্ঠটি প্রক্ষালন করে ভগ্ন করবে এবং সাবধানে পবিত্র স্থানে তা পরিত্যাগ করবে। তার পরে মন্ত্রবিদ ব্যক্তি স্নান করে আচমনের পর প্রতি দিন দেবতা, ঋষি আর পিতৃগণের তর্পণ করবে। পরে আবার আচমন করে সংযতবাক হয়ে 'আপোহিষ্ঠা' প্রভৃতি তিনটি মন্ত্র পাঠ করে, ব্যাহৃতি পাঠপূর্বক সাবিত্রী বা শুভ বারুণ মন্ত্র পাঠ করবে,

তারপর কুশোদকবিন্দু দিয়ে দেহের মার্জনা করবে। তারপর ওঙ্কার ও মহাব্যাহৃতি সহ বেদমাতা গায়ত্রী জপ করে তদ্গত চিত্তে সূর্যের প্রতি জল অঞ্জলি দেবে। শুদ্ধ অন্তঃকরণে পূর্বমুখে কুশাসনে উপবেশন করে প্রথমে তিনটি প্রাণায়াম করে পরে সন্ধ্যাধান করবে। এ হল শাস্ত্রের বিধান। যিনি সন্ধ্যা, তিনিই জগৎপ্রসূতি, মায়াতীতা, নিষ্কলা, ত্রিতত্ত্ব থেকে সমুৎপন্না, কেবলা ঐশ্বরী শক্তি; বিদ্বান ব্রাহ্মণ সূর্যমণ্ডলগতা সাবিত্রীকে ধ্যান করে জপ করবেন এবং সর্বদা পূর্বাভিমুখ হয়ে সন্ধ্যোপাসনা করবেন। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সর্বদাই অশুচি। তার কোন কর্মেই অধিকার থাকে না। তাই সে যে কার্যই করে তার ফল প্রাপ্ত হয় না। অনন্যচেতা, শান্ত, বেদপারঙ্গম, পূর্বকালীন ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র অনুসারে সন্ধ্যোপাসনা করে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়েছেন। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপ্রণাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মকার্যে যত্নবান হয়, সে অযুত নরকে বাস করে। তাই অতি যত্নের সঙ্গে সন্ধ্যোপাসনা করবে। সেই সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা যোগাত্মা পরম দেবের উপাসনা করা হয়। বিদ্বান ব্যক্তি শুদ্ধ হয়ে পূর্বমুখে উপবেশন করে প্রতি দিন শ্রেষ্ঠ জপ সহস্রবার বা মধ্যম জপ শতবার অথবা নিকৃষ্ট জপ দশবার গায়ত্রী জপ করবেন। তারপর সমাহিত চিত্তে ঋক্, যজুঃ আর সামবেদ থেকে উৎপন্ন বিবিধ সূর্য মন্ত্র দ্বারা উদয়কালীন সূর্যের উপাসনা করবে। এই ভাবে মহাযোগী দেবাদিদেব দিবাকরের উপাসনা করে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহের দ্বারা অবনত মস্তকে ভূমিতে প্রণাম করবে—

ওঁ খখোল্কায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে বিশ্বরূপিণে ॥ ইত্যাদি।

তুমি তিনটি কারণেরও হেতুস্বরূপ, তুমি শান্ত, তুমি খখোল্ক নামে প্রসিদ্ধ। তোমার কাছে আমি নিজেকে নিবেদন করলাম। তুমি বিশ্বরূপী। তোমাকে নমস্কার। তুমি দয়ালু, তুমিই সূর্য, তুমিই ব্রহ্মরূপী। তোমাকে নমস্কার। তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই অপ্, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃত, তুমিই ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই সনাতন পুরুষ রুদ্র মহাদেব, তুমিই জীবদেহের অন্তরস্থিত পরমজ্যোতিঃ, পরমাত্মা, জটাধারী, তোমাকে প্রণাম করি। এই যে বিশ্ব নানা প্রকারে সৎ আর অসৎ বস্তুসমূহ প্রসব করছে, এও তুমিই। তুমিই রুদ্র এবং তুমিই সূর্য। তোমাকে প্রণাম করি। আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি মীঢ়ুষ্টম, তুমি বরুণ, তুমি রুদ্র; আমি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ও তোমার শরণাপন্ন হই। তুমিই হিরণ্যবাহু, তুমি হিরণ্যপতি, তুমিই অম্বিকাপতি, তুমিই উমাপতি, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি নীলগ্রীব, তুমিই পিনাকী, তুমিই বিলোহিত, তুমি ভর্গ এবং তুমিই সহস্রাক্ষ। তোমাকে প্রণাম। তুমি তমোনাশী আদিত্য, তোমাকে নিত্য প্রণাম করি। তুমি বজ্রহস্ত, তুমিই ত্র্যম্বক, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি মহৎ, তুমি পরমেশ্বর, তুমি সর্বদেহীর হিরণ্ময় গৃহের গুপ্তাত্মা। তাই তোমার শরণাপন্ন হই। তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শ্রেষ্ঠ অমৃত, তুমিই বিশ্ব, তুমিই পশুপতি, তুমিই ভীম এবং তুমিই অর্ধনারীশ্বর রূপে বিরাজমান। তোমাকে প্রণাম। তুমিই সূর্য, ভাস্বান, পরমেষ্ঠী, উগ্র ও সর্বভুক নামে প্রসিদ্ধ। আমি সর্বদা তোমার শরণাপন্ন হই।

প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সূর্যহৃদয়স্তব পাঠ করে সূর্যকে প্রণাম করবে। ব্রহ্মার দ্বারা প্রদর্শিত এই সূর্যহৃদয়স্তব পুত্র, শিষ্য ও ধার্মিক দ্বিজাতিদের উপদেশ করবে। এই পবিত্র সূর্যহৃদয়স্তোত্র সর্বপাপনাশক, বেদসার থেকে সমুদ্ভূত, ব্রাহ্মণের হিতজনক এবং ঋষিদের দ্বারা নিষেবিত। তারপর গৃহে আগমন করে বিধান

অনুসারে অগ্নি প্রজ্বালন করে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করবে। অথবা অনুমতি পেলে পুত্র, শিষ্য, পত্নী, সহোদর বা পুরোহিতও বিধান অনুসারে হোম করতে পারেন। প্রত্যহ ইন্দ্রিয় সংযম করে শুদ্ধান্তঃকরণ ও শুচি হয়ে শুক্লবস্ত্র পরিধান করে, পবিত্র হস্তে অনন্য মনে হোম করতে হয়। যজ্ঞোপবীত বা দর্ভ না নিয়ে কর্ম করলে সেই কৃতকর্মের ফল রাক্ষসেরা পায়। তাই ইহলোকে বা পরলোকে তার দ্বারা কোন উপকারই হয় না। তারপর দেবতাদের প্রণাম করতে হয়, তাঁদের পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপহার নিবেদন করে বয়স্ক ব্যক্তিদের অভিবাদন করবে এবং গুরুর উপাসনা ও হিতকার্যে রত থাকতে হবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ সযত্নে নিজ শক্তি অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করবে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ জপ করবে, শিষ্যদের বৈদিক নিগমগুলি ও বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করাবে, নিজে অর্থ বুঝবে এবং বেদ প্রভৃতির বিচার করবে। শাস্ত্র দ্বারা ধর্মাধর্ম নিরূপণ করবে। আর যোগক্ষেমের জন্য রাজার কাছে গমন করবে। কুটুম্ব প্রভৃতির জন্য বিবিধ অর্থ সংগ্রহ করবে। তারপর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানের জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করবে। আর পুষ্প, আতপ চাল, কুশ, তিল আর শুদ্ধ গোময় আহরণ করবে। নদী, দেবখাত, পুষ্করিণী, সরোবর, গর্ত ও প্রস্রবণে প্রতিদিন স্নান করবে। অন্যের কূপের নিকটবর্তী চৌবাচ্চায় স্নান করবে না। নদী, দেবখাত প্রভৃতি বা নিজস্ব কূপ, নিজস্ব চৌবাচ্চার অভাব হলে জলের ভিতর থেকে পাঁচ পিণ্ড মৃত্তিকা তুলে নিয়ে স্নান করবে। একটি কাঁচা আমলকি ফলের সমপরিমাণ মৃত্তিকা নিয়ে তার একটির দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন করবে। নাভির উপরিভাগ দুটি মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করবে, নাভির অধোভাগ তিনটি মৃত্তিকা দ্বারা ও পাদদেশ ছয়টি মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করবে। যে অঙ্গ যে পরিমাণ মৃত্তিকার দ্বারা প্রক্ষালন করার কথা বলা হয়েছে, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণ গোময় দ্বারাও ততবার লেপন করতে হয়। তীরে অবস্থিত হয়ে অঙ্গে মৃত্তিকা আর গোময় সেই বিষয়ের মন্ত্র দ্বারা লেপন করতে হয়। তারপর প্রক্ষালন করে, বিধান অনুসারে আচমনপূর্বক সমাহিত চিত্তে স্নান করবে। অভিমন্ত্রণপ্রকাশক শুভ বারুণ মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করে ভাবশুদ্ধ হয়ে অব্যক্ত অব্যয় বিষ্ণুকে ধ্যান করবে। জল নারায়ণ থেকে সমুদ্ভূত এবং জল নারায়ণের আশ্রয়। তাই বিদ্বান ব্যক্তি স্নানের সময়ে নারায়ণ দেবকে স্মরণ করবেন। ওঙ্কার উচ্চারণ করে সূর্য দর্শন করে জলাশয়ে তিনবার ডুব দেবে। পূর্বে আচমন করা হয়ে গেলেও মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি 'অন্তশ্চরসি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করবে। যেমন—হে দেব, তুমিই ভূতসমূহের অন্তরে বিচরণ কর, তুমিই বিশ্বতোমুখ, তুমিই যজ্ঞ, বষট্‌কার, তুমিই জল, তুমিই জ্যোতি, তুমিই রস এবং তুমিই অমৃত। পরে দ্রুপদী মন্ত্র তিনবার পাঠ করবে। বিদ্বান ব্যক্তি প্রণব ও মহাব্যাহৃতিযুক্তা সাবিত্রী তিনবার জপ করবেন এবং অঘমর্ষণ সূক্ত তিনবার পাঠ করবেন। তারপর 'আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 'ইদমাপঃ প্রবহত' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ও ব্যাহৃতি দ্বারা মার্জন করবে। 'আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ' ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা সেই জল অভিমন্ত্রিত করে জলমধ্যস্থিত হয়ে গলদেশ পর্যন্ত নিমজ্জিত করে অঘমর্ষণ সূক্ত তিনবার পাঠ করবে। 'দ্রুপদী' মন্ত্র, সাবিত্রী ও 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এই মন্ত্র আবৃত্তি করবে এবং প্রণব উচ্চারণ করবে অথবা হরি স্মরণ করবে। জলমধ্যস্থিত হয়ে যজুর্বেদোক্ত 'দ্রুপদাদিব' মন্ত্র তিনবার পাঠ করলে সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়। মার্জন হয়ে গেলে হাতে জল নিয়ে মন্ত্র জপপূর্বক সেই

জল মস্তকে প্রক্ষেপ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি ঘটে। আর যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সমস্ত পাপ নাশ করেন, সেই রকম অঘমর্ষণ সূক্তও সমস্ত পাপ নাশ করে থাকেন। তারপর সূর্যোপস্থাপন করবে। ঊর্ধ্বে পুষ্প ও আতপ চাল যুক্ত জল প্রক্ষেপ করে তমঃপারে স্থিত সূর্যকে ঊর্ধ্বে অবলোকন করবে। 'উদুত্যং', 'চিত্রম্' ও 'তচ্চক্ষুঃ' এই মন্ত্রগুলির দ্বারা 'হংসঃ শুচিষৎ' মন্ত্র দ্বারা, সাবিত্রী দ্বারা এবং সূর্যবিষয়ক পাপনাশক অন্যান্য বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সূর্যোপস্থান করতে হয়। তারপর চতুষ্পাদযুক্তা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মসদৃশী উৎকৃষ্টা সাবিত্রী জপ করবে। এই সাবিত্রী জপকেই জপযজ্ঞ বলে। তারপর বিবিধ পবিত্র মন্ত্রসমূহ, গুহ্যবিদ্যা, শতরুদ্রিয় মন্ত্র, আথর্বশিরো মন্ত্র এবং সৌর মন্ত্র শক্তি অনুসারে পাঠ করবে। পূর্বাগ্রে কুশের উপর পূর্বমুখে শুচি ও সমাধিস্থ হয়ে উপবেশন করে অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় সূর্য দর্শন করতে করতে জপ করবে। স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ বা পুত্রজীব—এই সব বস্তুর দ্বারা জপমালা তৈরি করতে হয়। এই মালাগুলি একটির চেয়ে আরেকটি বেশী প্রশস্ত। পণ্ডিত ব্যক্তি জপের সময় কথা বলবেন না, অন্য কিছু দর্শন করবেন না, মস্তক বা গ্রীবা কম্পিত করবেন না এবং দন্ত প্রকাশ করবেন না। জপের সময়ে এই সব নিষিদ্ধ কর্ম করলে রাক্ষস আর সিদ্ধেরা সবলে জপ হরণ করে, সেই জন্য শুদ্ধ ও নির্জন স্থানে অবস্থান করে জপ করবে। জপের সময়ে চণ্ডাল, পতিত এবং অশৌচী ব্যক্তিকে দেখলে আচমন করে আবার জপ করবে। আর ঐ সব ব্যক্তির সঙ্গে সম্ভাষণ করলে স্নান করে আবার জপ করবে। অশুচি ব্যক্তিকে দর্শন করলে নিত্য পবিত্র ব্যক্তি শক্তি অনুসারে সৌর মন্ত্র বা পাবমানী মন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে জপ করবে। যদি জপকর্তা আর্দ্র বস্ত্র পরে থাকে, তাহলে জলের মধ্যে স্থিত হয়ে জপ করবে। আর যদি শুষ্ক বস্ত্র পরে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ স্থানে কুশের উপর সমাহিতভাবে উপবেশন করে জপ করবে। তারপর সূর্যকে প্রদক্ষিণ ও ভূমিতে নমস্কার করে আচমনপূর্বক শক্তি অনুসারে শাস্ত্রমতে বেদাধ্যয়ন করবে। তারপর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করবে। প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ করে পরে নামের শেষে 'তর্পয়ামি বঃ' এই রকম বলবে। নিজ নিজ গৃহ্য অনুসারে দেবতা ও ঋষিদের যথাক্রমে যব আর আতপ চালযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করবে এবং পিতৃগণকে ভক্তিসহকারে তিলযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করবে। দেবতর্পণের সময়ে উপবীত ধারণ করবে, সনকাদি ঋষির তর্পণের সময়ে নিবীত ধারণ করবে আর পিতৃতর্পণের সময়ে প্রাচীনাবীত ধারণ করবে। নিজ নিজ তীর্থ দ্বারা ভক্তিভাবে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করবে। তারপর বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দান করে আচমনপূর্বক সংযতবাক হয়ে পুষ্প, পত্র আর জল দ্বারা নিম্নলিখিত দেবতাদের তাঁদের নিজ নিজ মন্ত্রে পুজা করবে। —ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য, বিষ্ণু আর অভীষ্ট অন্যান্য দেবতাদের ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিসহকারে পুজা করবে। পুরুষ সূক্তের দ্বারা দেবতাদের পুষ্প ও জল দান করবে। তাহলে সমস্ত দেবতাকেই সম্যক ভাবে অর্চনা করা হয়। সমাহিত চিত্তে দেবতাদের ধ্যান করে প্রণব উচ্চারণপূর্বক নমস্কারযুক্ত মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে পুষ্প প্রভৃতি দান করবে। বিষ্ণু আরাধনার চেয়ে পুণ্যজনক অন্য কোন বৈদিক কর্মই নেই। তাই প্রতিদিন সেই আদি-মধ্য-অন্তহীন হরিকে অর্চনা করবে। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এই মন্ত্রের সমান এবং পুরুষ সূক্তের সমান মন্ত্র চতুর্বেদের মধ্যে নেই। তারপর শান্তিপরায়ণ তদ্গত চিত্ত ও তন্ময় হয়ে 'তদ্বিষ্ণোঃ' মন্ত্র দ্বারা অমলতেজা বিষ্ণুর কাছে নিজ আত্মাকে সমর্পণ করবে। অথবা পবিত্র ভাবে সেই সনাতন দেবাদিদেব মহাদেব

ভগবান মহেশ্বর ঈশানকে আরাধনা করবে। সমাহিত চিত্তে রুদ্রগায়ত্রী, প্রণব, ঈশান মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্রসমূহ বা ত্র্যম্বক মন্ত্র পাঠ করে পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অথবা কেবল জল দ্বারাও মহেশ্বরের পুজা করবে। অথবা 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র পাঠ করে পুজা এবং জপ করবে। দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়কে নমস্কার করবে এবং 'যো ব্রাহ্মণম্' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাঁকে আত্মসমর্পণ করবে। ব্রাহ্মণ পঞ্চব্রহ্ম জপ করতে করতে প্রদক্ষিণ করে আকাশ মধ্যগত দেবাদিদেব মহাদেব ঈশানকে ধ্যান করবে। 'হংসঃ শুচিষৎ' এই ঋক্ মন্ত্র দ্বারা সূর্য দর্শন করবে। তারপর বিশুদ্ধান্তঃকরণে গৃহে গমন করে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মানুষযজ্ঞ আর ব্রহ্মযজ্ঞ—এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম পঞ্চযজ্ঞ। যদি তর্পণের পূর্বে ব্রহ্মযজ্ঞ করা না হয়ে থাকে, তাহলে অতিথি সেবারূপ মনুষ্যযজ্ঞ সমাপন করে বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ করবে। বিশুদ্ধান্তঃকরণে পবিত্রহস্ত হয়ে দর্ভসমূহের উপর উপবেশন করে অগ্নির পশ্চিম দিকে পশুপক্ষী প্রভৃতিকে অন্নাদি দানরূপ ভূতযজ্ঞ সমাধা করবে। শালাগ্নিতে বা লৌকিকাগ্নিতে অথবা জলে বা ভূমিতে বৈশ্বদেব হোম করবে। একেই বলে দেবযজ্ঞ। যদি লৌকিক অগ্নিতে অন্ন পাক করা হয়ে থাকে, তাহলে লৌকিক অগ্নিতেই হোম করবে। আর যদি শালাগ্নিতে অন্ন পাক করা হয়ে থাকে, তাহলে শালাগ্নিতেই হোম করবে। এ সনাতন বিধি। বৈশ্বদেব হোমের অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূতবলি কর্ম করবে। এটি সকল প্রাণীর ঐশ্বর্যপ্রদ ভূতযজ্ঞ বলে জানবে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পতিত, চণ্ডাল, কুক্কুর আর পক্ষীদের বাইরে ভূমিতে অন্ন দেবে আর সন্ধ্যার সময়ে পত্নী সিদ্ধ অন্ন দ্বারা মন্ত্রহীন বলি প্রদান করবে। প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিধান অনুসারে এই ভূতযজ্ঞ করবে। প্রতিদিন পিতৃলোককে উদ্দেশ্য করে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে অথবা ঐ অন্ন কিছুটা নিয়ে সমাহিত চিত্তে বেদার্থবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করবে। এরই নাম নিত্যশ্রাদ্ধ, আর এই হল গতিপ্রদ পিতৃযজ্ঞ। তারপর গৃহে সমাগত শান্ত অতিথিকে প্রতিদিন কায়মনোবাক্যে পুজা ও প্রণাম করবে। বাম হস্তকে অন্বারব্ধ করে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অতিথিদের প্রত্যহ শক্তি অনুসারে হন্তকার, অগ্র বা ভিক্ষা দান করবে এবং অতিথিকে পরমেশ্বর বলেই জানবে। গ্রাসপরিমিত অন্নের নাম ভিক্ষা, তার চতুর্গুণ পরিমিত অন্নের নাম অগ্র আর তারও চতুর্গুণ পরিমিত পুষ্কল অন্নের নাম হন্তকার। গো দোহনের উপযুক্ত সময়ে অতিথির জন্য অপেক্ষা করে তবে নিজে ভোজন করবে। অভ্যাগত অতিথিদের সর্বদা শক্তি অনুসারে পুজা করবে। ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে বিধান অনুসারে ভিক্ষা দান করবে এবং লোভশূন্য হয়ে সামর্থ্য অনুসারে যাচকদের অন্ন দান করবে। এই সব করতে না পারলে কেবল গোরুদের অন্ন দান করবে। তাতেই সমস্ত সিদ্ধি হবে। পরে অন্নের নিন্দা না করে মৌনভাবে বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন করবে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করে অন্ন ভোজন করে সেই দুর্মতির তির্যক যোনিতে জন্ম হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে না পারলে প্রতিদিন শক্তি অনুসারে বেদাভ্যাস এবং দেবতাপুজামাত্র করবে। তাতেই সমস্ত পাপ নষ্ট হবে। যে ব্যক্তি মোহ বা অজ্ঞানবশত দেবতাপুজা না করে ভোজন করে, সে দেহাবসানে নরক ভোগ করে এবং তারপর শূকর যোনিতে জন্ম লাভ করে। অতএব যে ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে সযত্নে কর্মসমূহ সম্পন্ন করে আত্মীয়দের সঙ্গে ভোজন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়াবিধি নামে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, ভূমিতে পদ সংলগ্ন করে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক পূর্বমুখে বা সূর্যাভিমুখ হয়ে অন্ন ভোজন করতে হয়। যে ব্যক্তি আয়ুষ্কামনা করে সে পূর্বদিকে মুখ করে ভোজন করবে, যে সম্পদ বৃদ্ধি কামনা করে সে পশ্চিম দিকে মুখ করে ভোজন করবে এবং যে ব্যক্তি সত্যফল কামনা করে সে উত্তর মুখ হয়ে ভোজন করবে। পাঁচটি অঙ্গ প্রক্ষালন করে অন্নপাত্র ভূমিতে রেখে ভোজন করবে। মনুপ্রজাপতি বলেছেন এই রকম ভোজন উপবাসের সমান। গোময় প্রভৃতি দ্বারা বিলেপিত পবিত্র স্থানে পদদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মুখ—এই পাঁচটি স্থান প্রক্ষালনপূর্বক পঞ্চার্দ্র হয়ে আচমন করে ক্রোধ পরিত্যাগ করে ভোজন করবে। মহাব্যাহৃতি পাঠ করে জল দ্বারা অন্ন পরিবেষ্টন করে 'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্র পাঠ করে জল পান করবে। তারপর 'প্রাণায় স্বাহা' বলে প্রথমে প্রাণাহুতি প্রদান করবে। তার পরে 'অপানায় স্বাহা' বলে অপানাহুতি, 'ব্যানায় স্বাহা' বলে ব্যানাহুতি, 'উদানায় স্বাহা' বলে উদানাহুতি এবং সব শেষে 'সমানায় স্বাহা' বলে পঞ্চম আহুতি দান করবে। এদের যথার্থ স্বরূপ চিন্তা করে আত্মাতে এই পাঁচটি প্রাণাহুতি প্রদান করবে। দেবগণ, প্রজাপতি এবং আত্মাকে মনে মনে চিন্তা করে অবশিষ্ট অন্ন ইচ্ছানুসারে ব্যঞ্জন মিশ্রিত করে মনোযোগ সহকারে ভোজন করবে। ভোজনের পর 'অমৃতাপিধানমসি' এই মন্ত্র পাঠ করে জল পান করবে। তারপর আচমন করে 'অয়ং গৌঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে পুনরায় আচমন করবে। তারপরে সর্বপাপনাশক 'দ্রুপদী' মন্ত্র তিনবার পাঠ করে 'প্রাণানাং গ্রন্থিরসি' এই মন্ত্র বলে উদর স্পর্শ করবে। সমাহিত চিত্তে আচমন করে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রথমে বামপাদাঙ্গুষ্ঠে, তারপর দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে জল প্রদান করবে। তারপর হস্ত উত্তোলন করে হস্তস্থিত জল অপসারণ করবে। পরে 'সন্ধ্যায়াম্' মন্ত্র দ্বারা কৃতানুমন্ত্রণ করবে। তারপর 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আত্মযোগ করবে। সমস্ত প্রকার যোগের মধ্যে আত্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে আত্মযোগ করে থাকেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। গন্ধমাল্যে অলঙ্কৃত, শুচি ও উপবীতধারী হয়ে ভোজন করতে হয়। সন্ধ্যা বা প্রাতঃকালের মধ্যে বিশেষত পূর্ণ সন্ধ্যাকালে ভোজন করবে না। সূর্যগ্রহণের পূর্বেও ভোজন করবে না। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সায়ংকাল থেকে আর ভোজন করবে না এবং চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ লাগলেও আর ভোজন করবে না। গ্রহণ ছেড়ে গেলে স্নান করে তবে ভোজন করবে। কিন্তু মহানিশার সময়ে যদি চন্দ্রগ্রহণ ছাড়ে তাহলে ভোজন করবে না এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রস্তাস্ত হলেও ভোজন করবে না, পরদিন মুক্তি দর্শন করে তবে ভোজন করবে। দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি আর ভোজন দেখছে এমন ক্ষুধার্ত মানুষকে না দিয়ে ভোজন করবে না। যজ্ঞাবশেষ ভোজন করবে। কিন্তু ক্রুদ্ধ বা অন্যমনা হয়ে ভোজন করবে না। যে ব্যক্তি নিজের জন্য রন্ধন করে নিজেই ভোজন করে, যে ব্যক্তি কামোপভোগের জন্য মৈথুন করে এবং যে ব্যক্তি অর্থোপার্জনের জন্য অধ্যয়ন করে তাদের জীবন নিষ্ফল বলে জেনো। বেষ্টিতশিরা হয়ে, অগ্নি প্রভৃতি কোণে মুখ করে কিংবা চর্মপাদুকা পরিধান করে আহার করলে সেই আহার অসুরের তৃপ্তিকর হয় জানবে। সম্পূর্ণ অর্ধরাত্রে বা সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজন করবে না। অজীর্ণ হলে ভোজন করবে না, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করে, ভগ্ন আসনে উপবেশন করে এবং যানে আরোহণ করে ভোজন করবে না। ভগ্ন পাত্রে বা কোন প্রাণীর উপর রেখে ও মৃত্তিকার উপর রেখে ভোজন করবে না। আহারে প্রবৃত্ত হয়ে ঘৃতগ্রহণ বা মস্তক-

স্পর্শ করবে না। ভোজন করতে করতে বেদ পাঠ করবে না। নিঃশেষ করে ভোজন করবে না। ভার্যার সঙ্গে ভোজন করবে না। অন্ধকারে, উভয় সন্ধ্যাকালে এবং দেবালয়ে ভোজন করবে না। একবস্ত্রে ভোজন করবে না। যানস্থিত হয়ে বা শয়ন করে ভোজন করবে না। কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করে, হাসতে হাসতে বা বিলাপ করতে করতে ভোজন করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হয় ততক্ষণ সুখে উপবেশন করবে এবং ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি রূপ বেদার্থ ব্যাখ্যা করবে। তারপর শুচি হয়ে উপবেশন করে পূর্বোক্ত বিধান অনুসারে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করবে। পশ্চিম দিকে মুখ করে গায়ত্রী জপ করবে। যে ব্রাহ্মণ বিধান অনুসারে প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যা না করে ভোজন প্রভৃতি করে, সে সর্বকর্মবর্জিত হয়ে শূদ্রতুল্য হয়। সায়ংকালেও বিধিপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে। তারপর যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করবে। পরে পা মুছে শুষ্ক পদে ভৃত্য ও বান্ধববর্গের সঙ্গে শয়ন করবে। উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মাথা করে শয়ন করা উচিত নয়। অনাবৃত স্থানে বা বিবস্ত্র ও অশুচি হয়েও শয়ন করা উচিত নয়। বসবার আসনে শয়ন করবে না। ভাঙা খাটে বা জনশূন্য গৃহে বা বাঁশযুক্ত খাটে বা পলাশ-নির্মিত খাটে কখনই শয়ন করবে না। ব্রাহ্মণদের প্রতিদিন কর্তব্য মোক্ষফল-দায়ক কর্মগুলির কথা বললাম। নাস্তিক্য বা আলস্যের কারণে যে ব্রাহ্মণ এই সব বিধি পালন করে না সে দেহাবসানে ঘোরতর নরকে যায় ও তারপর তার কাকযোনিতে জন্ম হয়। নিজ আশ্রমবিধি ছাড়া অন্য কোন মুক্তির উপায় নেই। তাই পরমেষ্ঠীর সন্তোষের জন্য যে সব কর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলি সযত্নে সম্পাদন করবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে ভোজনাদিনিয়মবিধি
নামে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, ব্রাহ্মণগণ অমাবস্যা তিথিতে ভক্তি সহকারে ভোগ মোক্ষ প্রদায়ক পিণ্ডান্বাহার্যক নামে শ্রাদ্ধ করবে। অমাবস্যা তিথিতে অপরাহ্ণ কালে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা পিণ্ডান্বাহার্যক শ্রাদ্ধক্রিয়াকে অতীব প্রশংসা করা হয়। প্রতিপদ প্রভৃতি কৃষ্ণপক্ষের সমস্ত তিথিতেই শ্রাদ্ধ করা যায়, কেবল চতুর্দশী ছাড়া। কিন্তু এর মধ্যে একটির চেয়ে পরেরটিতে শ্রাদ্ধ করলে অধিকতর প্রশস্ত ফল হয়। সমস্ত অমাবস্যা, গৌণ পৌষীয়, গৌণ মাঘীয় ও গৌণ ফাল্গুনীয় তিনটি কৃষ্ণাষ্টমী, মাঘ মাসীয় পঞ্চদশী, বর্ষাকালের মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী ও যে সময়ে শস্য পরিপক্ব হয়—এই সমস্ত কালে বিহিত শ্রাদ্ধ ও প্রতিদিনের বিহিত শ্রাদ্ধ নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগহণ এবং আত্মীয়দের মৃত্যুর জন্য যে শ্রাদ্ধ হয় তা নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। এই নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ অবশ্যই করতে হয়। না হলে নরক প্রাপ্তি ঘটে। চন্দ্র সূর্য গ্রহণের সময়ে ও নিম্নলিখিত অন্য কালগুলিতে কাম্য শ্রাদ্ধসমূহ প্রশস্ত ফলদায়ক হয়। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুব এবং ব্যতীপাত যোগে শ্রাদ্ধ করলে অনন্ত ফল হয়। সংক্রান্তি ও জন্মদিনে কৃত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল দান করে। আর সমস্ত নক্ষত্রে এই সমস্ত বিশেষ ফলের জন্য শ্রাদ্ধ করবে। ব্রাহ্মণ কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করলে স্বর্গ লাভ করেন। রোহিণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে পুত্র লাভ হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তি হয়। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে উগ্রকর্মের সিদ্ধি ও শৌর্য প্রাপ্তি ঘটে।

পুনর্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে ভূমি ও পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে লক্ষ্মী প্রাপ্তি হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে ব্রাহ্মণ সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হন, মঘা নক্ষত্রে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপ নাশ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে ধন প্রাপ্তি হয়। হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বহু পুত্রবান হওয়া যায়। স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বাণিজ্যে সিদ্ধি ও বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সুবর্ণ লাভ হয়। অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বহু মিত্র লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে কৃষিকার্যে লাভ ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত কার্যে সিদ্ধি হয়। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত অভিলাষিত দ্রব্য লাভ হয়। শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠ বল প্রাপ্তি হয়। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সুবর্ণ রজত ভিন্ন ধাতুদ্রব্য লাভ হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে উত্তম গৃহ প্রাপ্তি হয়। রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বহু গো লাভ হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে লাভ হয় বহু অশ্ব, আর ভরণী নক্ষত্রে যদি শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। রবিবারে শ্রাদ্ধ করলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়, সোমবারে শ্রাদ্ধ করলে সৌভাগ্য হয়, মঙ্গলবারে হয় সর্বত্র বিজয়। বুধবারে শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত অভীষ্ট দ্রব্য লাভ হয়। বৃহস্পতিবারে শ্রাদ্ধ করলে বিদ্যা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শুক্রবারে শ্রাদ্ধ করলে ধনলাভ হয়। এবং শনিবারে শ্রাদ্ধ করলে হয় দীর্ঘ পরমায়ু। প্রতিপদ তিথিতে শ্রাদ্ধ করলে উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রাদ্ধ করলে কন্যা লাভ হয়। তৃতীয়া তিথিতে শ্রাদ্ধ করলে বহুজ্ঞ হওয়া যায়। চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করলে ক্ষুদ্র পশু লাভ হয়। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করলে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করলে ঘৃতপ্রাপ্তি ও কৃষিকার্যে লাভ হয়। সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করলে মানুষ ধনবান হয়। অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করলে বাণিজ্যে সর্বদা লাভ হয়। নবমীতে শ্রাদ্ধ করলে এক খুরে পশু লাভ হয়। দশমীতে শ্রাদ্ধ করলে দুই খুরযুক্ত বহু পশু লাভ হয়। একাদশীতে শ্রাদ্ধ করলে রৌপ্য লাভ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বহু পুত্র লাভ হয়। দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করলে সুবর্ণ, রজত ও অন্য ধাতু লাভ হয়। ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করলে জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করলে কুসন্তান হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধকর্তা সর্বদা সমস্ত অভীষ্ট লাভ করতে পারেন। চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করবে না। কেবল শস্ত্রাহত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধ চতুর্দশীতেই করতে হয়। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বা উৎকৃষ্ট বস্তুর লাভ হলেই শ্রাদ্ধ করবে। তাতে কোন কালনিয়ম নেই। তাই ভোগ বা মুক্তিলাভের জন্য দ্বিজাতিগণ তখন শ্রাদ্ধ করবেন। পুত্র-জন্ম প্রভৃতি সমস্ত কর্মের আরম্ভ এবং অভ্যুদয়কার্যের জন্য শ্রাদ্ধ করবে। পর্বদিনে পার্বণশ্রাদ্ধ করবে। প্রতিদিন কর্তব্য ও নিত্যশ্রাদ্ধ, কাম্যশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও পার্বণশ্রাদ্ধ—এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের কথা মনু বলেছেন। তীর্থযাত্রার জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয় সেটিকে ষষ্ঠ শ্রাদ্ধ বলা হয়। এই শ্রাদ্ধ সযত্নে অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তকালে কর্তব্য শ্রাদ্ধ হল সপ্তম শ্রাদ্ধ। এর কথা ব্রহ্মা বলেছেন। যে শ্রাদ্ধ করলে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারা যায়, সেই দৈবিক শ্রাদ্ধই অষ্টম শ্রাদ্ধ বলে জানবে। সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করবে না। কিন্তু সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে গ্রহণ লাগলে শ্রাদ্ধ করা যেতে পারে। স্থানবিশেষে শ্রাদ্ধসমূহ অত্যন্ত পুণ্যজনক হয়ে থাকে। যেমন গঙ্গা, অমরকণ্টক পর্বত আর প্রয়াগতীর্থে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্তফলপ্রদ হয়।

পিতৃগণ এই গাথা গান করে থাকেন এবং বিদ্বানগণ এ কথা কীর্তন করে থাকেন যে শীলবান ও গুণান্বিত বহু পুত্রই কামনা করা উচিত, কারণ এই সব বহু পুত্রের মধ্যে যদি কেউ পিণ্ডদান করতে গয়ায় যায়, যদি অন্য কোন কাজেও গয়ায় গিয়ে শ্রাদ্ধ করে, তাহলে সেই শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণ নরক থেকে উত্তীর্ণ হন এবং সেই শ্রাদ্ধকর্তাও শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন। বরাহপর্বত, গয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান বারাণসী, গঙ্গাদ্বার, প্রভাসক্ষেত্র, বিল্বকতীর্থ, নীলপর্বত, কুরুক্ষেত্র, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, মহালয়, কেদারতীর্থ, ফল্গুতীর্থ, নৈমিষারণ্য, সরস্বতীতীর, পুষ্করক্ষেত্র, নর্মদাতীর, কুশাবর্ত, শ্রীশৈল, ভদ্রকর্ণক, বেত্রবতী, বিপাশা ও গোদাবরী নদীর তীর—এই সব স্থান ও এই রকম অন্যান্য তীর্থ এবং পুলিন ও নদীতীরে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, জল, মূল, ফল, শ্যামাধান, উত্তম শাগ, নীবার প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল ও মুগ—এই সব বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। আম্র, পাণিরত, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, দাড়িম, বিদারী ও ভরুণ্ডী শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদান করবে। মধু সংযুক্ত খই, শর্করামিশ্রিত শক্তু, পানিফল, কেশুর—এই সমস্ত বস্তু অতি যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে দান করবে। মৎস্য মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ দু'মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। হরিণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে তিনমাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। মেষমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে চারমাস এবং পক্ষিমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পাঁচমাস পরিতৃপ্ত থাকেন, ছাগমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে ছয়মাস, পৃষতমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে সাতমাস, এণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে আটমাস, রুরুমৃগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে নয়মাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। বরাহ বা মহিষ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে দশমাস এবং শশ বা কূর্ম মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে এগারোমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। গব্যদুগ্ধ বা তার পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ সংবৎসরকাল তৃপ্ত থাকেন। আর বাধ্রীণস মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে বারো বছর পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। কালশাক, বড় বড় আঁশযুক্ত মাছ, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং মুনিজনের ভক্ষণীয় নীবার প্রভৃতি অন্ন শ্রাদ্ধে প্রদান করলে পিতৃলোকের অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি সাধিত হয়। ক্রয়লব্ধ মাংস, প্রতিগ্রহলব্ধ মাংস অথবা স্বয়ংমৃত পশুর মাংস—যেমনই হোক না কেন, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করলে অক্ষয় ফল হয়। পিপুল, সুপারি, মসুর, কুমড়া, লাউ, বেগুন, ভূস্তৃণ, স্বরস, কুসুম্ভ, পিণ্ডমূল, নটেশাক, বরবটী এবং মহিষ বা ছাগলের দুধ—এ সবই শ্রাদ্ধে বর্জন করবে। কেদোধানের চাল, কোবিদার, পালংশাক ও মরিচ—এ সব দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করবে না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, অমাবস্যা তিথিতে স্নান করে যথোক্ত বিধান অনুসারে পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করে ও শুচি হয়ে, ব্রাহ্মণ শুদ্ধান্তঃকরণে পিণ্ডান্বাহার্যক শ্রাদ্ধ করবে। দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে আগে বেদপারগ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করবে। কারণ বেদজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই হব্য-কব্য দান ও অন্যদানের উপযুক্ত পাত্র। সোমপায়ী, রজোগুণহীন, ধর্মজ্ঞ, শান্তচিত্ত, ব্রতী, নিয়মস্থ ও ঋতুকালাভিগামী ব্যক্তিরা পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন। পঞ্চাগ্নি-হোমকর্তা, অধ্যয়নকারী, যজুর্বেদবিদ্, বহ্বৃচ, ত্রিসৌপর্ণ, ত্রিমধু, ত্রিণাচিকেত,

সামবেদাধ্যায়ী, জ্যেষ্ঠসামগ, অথর্বশিরোধ্যায়ী, রুদ্রাধ্যায়ী, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, বিদ্বান, ন্যায়বেত্তা, শিক্ষাকল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গবেত্তা, মন্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রের ব্রাহ্মণভাগবেত্তা, ধর্মশাস্ত্রপাঠক, ঋষিচান্দ্রায়ণব্রতানুষ্ঠায়ী, ঋষিব্রতানুষ্ঠায়ী, দ্বাদশবার্ষিকব্রতকারী, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা বিশুদ্ধ এবং বহুদাতা—এই সমস্ত ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিপাবন। চান্দ্রায়ণব্রতকারী, সত্যবাদী, পুরাণবেত্তা, গুরুদেবতাপূজা-পরায়ণ, অগ্নিহোত্রী, জ্ঞানরত, সর্বপ্রকারে বিমুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, মহাদেবপূজাপরায়ণ ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণেরাও পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন। অহিংসারত, নিত্য অপ্রতিগ্রহকারী, যাজ্ঞিক ও দাননিরত ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন। পিতার হিতকর্মে রত, প্রাতঃস্নানকারী, অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ, মুনিব্রতাবলম্বী ও ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন। জ্ঞানী, মহাযোগী, বেদার্থচিন্তাকারী, শ্রদ্ধালু ও শ্রাদ্ধনিরত ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন। যিনি সমাবর্তন স্নান করেছেন, যিনি সর্বদা ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, অথর্ববেদাধ্যায়ী, মুমুক্ষু, অসমানপ্রবর, অসমানগোত্র ও সম্বন্ধহীন ব্রাহ্মণদেরও পঙ্‌ক্তিপাবন বলে জানবে।

যোগী, শান্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী যতিকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে। না পেলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাবে। এদের অভাবে মুমুক্ষু ও বিষয়া-সক্তিবর্জিত গৃহস্থকে ভোজন করাবে। এদের কাউকেই না পেলে সাধক গৃহস্থকে ভোজন করাবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য প্রভৃতি ভোজন করলে যে ফল হয়, প্রকৃতির গুণতত্ত্বজ্ঞ যতি হব্য প্রভৃতি ভোজন করলে তার সহস্রগুণ বেশী ফল হয়। তাই দৈব ও পৈত্র্য কার্যে সযত্নে ঈশ্বরজ্ঞানপরায়ণ শ্রেষ্ঠ যোগীদের ভোজন করাবে। তাদের না পেলে অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। হব্য কব্য প্রদানে এই হল প্রধান কল্প। এদের না পেলে সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অনুকল্প বলে জানবে। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য—এই দশজনকে ভোজন করানো যেতে পারে।

শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাবে না। ধন দ্বারা মিত্রের সঙ্গে মিত্রতা সম্পাদন করবে। যে সব ব্যক্তি পিশাচের মতো আচার-অনুষ্ঠান করে ও যারা দক্ষিণালোভী তাদের ভোজন করাবে না। কারণ এই সব লোককে ভোজন করালে পরলোকে কোনই ফল হয় না। অথবা পূর্ব পূর্ব ভোজনযোগ্য ব্যক্তির অভাবে মিত্রকেও ভোজন করানো যায়। কিন্তু শূদ্র পণ্ডিত হলেও তাকে ভোজন করাবে না। কারণ শূদ্র যে হবি ভোজন করে সে হবি পরলোকে ফল দান করে না। মূর্খ ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির মতো নিজেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অতএব তাকে হব্যাদি দান করবে না। কারণ কেউই ভস্মে ঘি ঢালে না। যেমন অনুর্বর ভূমিতে বীজ বপন করলে বপনকর্তা ফল পায় না, সেই রকম বেদে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করলে হব্যাদিদাতা ফল পায় না। যে ব্যক্তি মন্ত্র জানে না, সে হব্য কব্যের যতগুলি পিণ্ড ভোজন করে থাকে, পরলোকে ততগুলি অগ্নিময় লৌহগোলক ভক্ষণ করে থাকে। বিদ্যাসম্পন্ন ও সৎকুলোৎপন্ন হয়েও যে নরাধম ব্রাহ্মণ হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করালে সেই হব্য কব্য অসুরেরই তৃপ্তি সাধন করে। যাদের তিনপুরুষ পর্যন্ত বেদ ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হয়েছে, তারা কুৎসিত ব্রাহ্মণ এবং তারা শ্রাদ্ধাদি ভোজনের অযোগ্য। শূদ্রের দাস, রাজার বেতন-গ্রাহী, শূদ্রযাজক, গ্রামযাজক এবং বধ ও বন্ধন দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী—এই ছ'জন অধম ব্রাহ্মণ। যারা প্রশ্নের উত্তর করে জীবিকানির্বাহ করে, তাদের এবং পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণদের

পতিত বলা হয়েছে। এদের এবং বেদবিক্রয়ীদের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করবে না। কন্যা-পুত্র-বিক্রয়ী, পরপূর্বা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ও নীচ বর্ণের যাজনকর্তা—এরা সকলেই পতিত। এ কথা মুনিরা বলেছেন। সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা যে অধ্যাপনা করে ও যারা বেতনগ্রহণ করে বেদপাঠ ও বেদের অধ্যাপনা করে, তারা সকলেই পতিত। এ কথা মুনিরা বলেছেন। অধ্যয়ন না করে যারা কেবল বৃদ্ধদের কাছে শাস্ত্র শ্রবণমাত্র করে এ রকম ব্যক্তি, নিগ্রন্থ, পঞ্চরাত্রগ্রন্থাধ্যায়ী, কাপালিক ও পাশুপতশাস্ত্রাধ্যায়ী, পাষণ্ড এবং পাষণ্ডতুল্য—এই সব নিন্দিত দুরাত্মারা যার শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করে, তার কৃত শ্রাদ্ধ ইহলোকে বা পরলোকে কোনই ফল দান করে না। যে অনাশ্রমী আর যে আশ্রমে থেকেও আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করে না, যে মিথ্যাশ্রমী—তারা সকলেই পঙ্‌ক্তি অপবিত্র করে। দুষ্টচর্মযুক্ত, কুনখী, কুষ্ঠ বা শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, শ্যাবদন্তক, বিদ্ধলিঙ্গ, চোর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, শূদ্রাগামী, বীরঘাতী, দিধিষূপতি, গৃহদাহী, জারজান্নভোজী ও সোমবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণগণ এবং পরিবেত্তা, হিংস্রক, পরিবিত্তি, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত, পুনর্ভূ স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান, টাকার সুদগ্রহণকারী এবং মূর্খ গণক—এরা সকলেই পঙ্‌ক্তিদূষক বলে জানবে। গীতবাদ্যে অনুরক্ত, পাপরোগী, একচক্ষুহীন, অঙ্গহীন বা অধিক অঙ্গবিশিষ্ট, ব্রহ্মচর্যাবস্থায় স্ত্রীলোকগামী, কুমারীগামী, পতি থাকা সত্ত্বেও জারজ-পুত্র, বিধবা গর্ভজাত পুত্র, অপবাদগ্রস্ত, পূজারী ব্রাহ্মণ, ক্রোধবশত মিত্রের অপকারী, ক্রূর, সর্বদা ভার্যার আজ্ঞাকারী, খল, মাতা পিতা বা গুরুত্যাগকারী, ভার্যাত্যাগকারী, সগোত্রাগামী, ভ্রষ্টাচারী, অস্ত্রব্যবহারজীবী, পুত্রহীন, কূটসাক্ষী, পাচক, রঙ্গ দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, সমুদ্রযাত্রাকারী, অকৃতজ্ঞ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী—এই সব ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি-দূষক। বেদনিন্দা ও দেবনিন্দাকারী এবং ব্রাহ্মণদের নিন্দায় রত ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে পরিত্যাগ করবে। কৃতঘ্ন, খল, ক্রূর, নাস্তিক, বেদনিন্দুক, মিত্রবঞ্চক ও ঐন্দ্রজালিক—এই সব ব্রাহ্মণদের বিশেষ ভাবে পঙ্‌ক্তিদূষক বলে জানবে। পূর্বোক্ত নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের অযোগ্য ও নিজ কর্মে দানের অযোগ্য। আর ব্রহ্মহত্যাকারী বা পরিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে সযত্নে শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করবে। শূদ্রের অন্ন জল প্রভৃতি দ্বারা শরীরপোষণকারী, সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগকারী এবং মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণেরা পঙ্‌ক্তিদূষক বলে জেনো। বেদ পড়ে যে ব্রাহ্মণ বেদ ভুলে গেছে এবং যে স্নান, দান পরিত্যাগ করেছে, যে তমোগুণাবলম্বী বা রজোগুণাবলম্বী সেই সব ব্রাহ্মণকে পঙ্‌ক্তিদূষক বলে জানবে।

বেশী আর কী বলব, যে সব ব্যক্তি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান করে তারা সকলেই শ্রাদ্ধভোজনের অযোগ্য বলে জানবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলে চললেন, গোময় ও জল দ্বারা সমাহিত চিত্তে ভূমি শোধন করে শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন 'আগামী কাল আমি শ্রাদ্ধ করব' এই বলে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নিমন্ত্রণযোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে সাধুলোকের দ্বারা নিমন্ত্রণ করবে। পূর্ব দিনে অসম্ভব হলে পরের দিনেও

অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিনেও নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে। এইভাবে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হলে সেই শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির পিতৃগণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়েছে মনে মনে এই রকম চিন্তা করে মনের মতো বেগে শীঘ্র শ্রাদ্ধকালে এসে উপস্থিত হন। অন্তরীক্ষচারী পিতৃগণ সেই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজন করে থাকেন। তাঁরা বায়ুস্বরূপ হয়ে অবস্থান করেন এবং শ্রাদ্ধ-ভোজন করে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হলে যে সব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হবেন, তারা সকলেই নিয়ম মেনে ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে অবস্থান করবেন। যিনি শ্রাদ্ধ করবেন, তিনি ক্রোধ, ব্যস্ততা ও মত্তুতা পরিত্যাগ করবেন, সত্যবাদী ও মনোযোগী হবেন। কোন ভারবহন কর্ম, মৈথুন ও অধ্বগমন পরিত্যাগ করবেন। একজনের কাছে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যে ব্রাহ্মণ তার গৃহে ভোজন না করে অন্যের কাছে গিয়ে ভোজন করে সে ঘোরতর নরকে বাস করে ও পরে শূকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে তাকে উপেক্ষা দেখিয়ে অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাকে তার থেকেও বেশী পাপী বলে জানবে। সে মৃত্যুর পর বিষ্ঠার কীট হয়। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যে ব্যক্তি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মহত্যাকারীর পাপ তাকে স্পর্শ করে এবং তির্যক যোনিতে তার জন্ম হয়। নিমন্ত্রিত হয়ে যে ব্রাহ্মণ পথগমন করে, তার পিতৃগণ সেই মাসে ধূলি ভোজন করে থাকেন। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে কলহ করে, তার পিতৃগণ সেই মাসে মল ভোজন করেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে সংযতাত্মা, অক্রোধী ও শৌচপরায়ণ হবেন। শ্রাদ্ধকর্তাও জিতেন্দ্রিয় হয়ে এই সব আচরণ করবে এবং শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন সমাহিত চিত্তে দক্ষিণ দিকে গিয়ে পরিষ্কার মূলসমেত দক্ষিণাগ্র কুশ ও জল আহরণ করবে। দক্ষিণ দিকে ঢালু, স্নিগ্ধ, অন্য সম্বন্ধ রহিত, আলোকময়, সুলক্ষণযুক্ত শুচি স্থানকে গোময় প্রভৃতি দ্বারা লেপন করবে। নদীতীর, তীর্থ, স্বকীয় ভূমি, পর্বতের উপরিস্থিত সমতল স্থান ও জনহীন স্থানে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। অন্যের ভূমিতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কখনই করবে না। মোহবশত অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করলে ভূস্বামী শ্রাদ্ধের অন্ন প্রভৃতি দূষিত করে থাকেন। বন, পর্বত, পুণ্য স্থান ও তীর্থগুলি এবং দেবালয়—এই সব স্থানের কোন স্বামী নেই বলে মুনিদের দ্বারা উক্ত হয়। এতে পরিগ্রহ হয় না। শ্রাদ্ধের ভূমির সব দিকে তিল ছড়িয়ে ছাগ বেঁধে রাখবে। কারণ অসুরকৃত সমস্ত দোষই তিল বিক্ষেপণ আর ছাগবন্ধনের দ্বারা নষ্ট হয়। তারপর বহু প্রকারে পরিশুদ্ধ, চোষ্য-পেয়যুক্ত, অনেক ব্যঞ্জনের মধ্যস্থিত অন্ন সামর্থ অনুসারে সাজিয়ে দেবে। মধ্যাহ্ন শেষ হলে যে সব ব্রাহ্মণ ক্ষৌর প্রভৃতি ক্রিয়া সমাপন করেছেন,তাঁদের নিয়ম মতো দন্তকাষ্ঠ দেবে। মাখবার উপযোগী তেল, স্নানের উপযোগী বস্ত্র ও স্নানের জল বিশ্বদেব বিষয়ক মন্ত্র উচ্চারণ করে ঔড়ুম্বর পাত্রে প্রদান করবে। তারপর স্নানক্রিয়া সমাপ্ত হলে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রত্যুত্থান করে যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য আর আচমনীয় দেবে। বিশ্বদেব পক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে পূর্বে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের আসন তিনটি দর্ভে উপহৃত ও পূর্বমুখী করে প্রদান করবে। দক্ষিণাগ্র কুশের উপর দক্ষিণ মুখে তিলোদক ছিটিয়ে পিতৃব্রাহ্মণের আসন দেবে। 'উপবেশন করুন' এই কথা ব্রাহ্মণদের বলে পূর্বোক্ত পৃথক পৃথক আসনে আসন স্পর্শ করে উপবেশন করাবে। দেবপক্ষে দুজন ব্রাহ্মণকে পূর্ব দিকে মুখ করে বসাবে। পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তর দিকে মুখ করে বসাবে। ঐ দুজন ব্রাহ্মণ পিতৃপক্ষে আর মাতামহপক্ষে এক একজন দেবতাস্বরূপ। এতে অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করবে না। কারণ ব্রাহ্মণাধিক্য হলে দেশ, কাল, সংস্কার, শৌচ ও

ব্রাহ্মণসম্পদ—এই পাঁচটিই নষ্ট হয়। অথবা দুর্লক্ষণবর্জিত বিদ্যা ও শীলসমন্বিত, বেদ-পারঙ্গম একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাবে। সমস্ত প্রস্তুত বস্তু থেকে অন্ন তুলে তুলে দেবপক্ষের অন্নোৎসর্গ শেষ হলে অন্যের উদ্দেশে অন্ন প্রভৃতি দান করবে। শ্রাদ্ধের অন্ন ব্রহ্মচারীকে দান করলে 'অগ্নৌকরণ' হয়। তাই শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণ একজনকেও ভোজন করাবে। ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজনের জন্য উপস্থিত হয়ে উপবিষ্ট হলে তাদের শ্রাদ্ধ কালে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করাবে। যে শ্রাদ্ধে অতিথি ভোজন হয় না, সেই শ্রাদ্ধ করলে প্রশস্ত ফল পাওয়া যায় না। তাই শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হলে অত্যন্ত যত্ন করে অতিথি ভোজন করাবে। অতিথি ভোজনরহিত শ্রাদ্ধে যে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করে তারা এবং শ্রাদ্ধকর্তা কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাতে সন্দেহ নেই। অঙ্গহীন, পতিত, কুষ্ঠরোগী, ক্ষতাশৌচবিশিষ্ট, পুক্কশ, নাস্তিক, কুক্কুট, শূকর ও কুকুর—এদের দূর থেকে পরিত্যাগ করবে। ঘৃণিত, অশুচি, নগ্ন, মত্ত, ধূর্ত, রজস্বলা, নীল বা কাষায় বস্ত্র পরিহিত এবং পাষণ্ড ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধকালে পরিহার করে চলবে। শ্রাদ্ধে পৈতৃক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম করতে হবে, সে সবই বৈশ্বদেব বিধান অনুসারে করবে। আসনে স্বস্তির সঙ্গে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণদের অলংকার দ্বারা ভূষিত করবে। মালা, সূত্র, গন্ধদ্রব্য, শিরো-বেষ্টন, বস্ত্র এবং অনুলেপন দ্বারাও তাদের সজ্জিত করবে। তারপর উত্তর দিকে মুখ করে ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে শাস্ত্র অনুসারে 'বিশ্বে দেবাসঃ' এই ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করবে। তারপর অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করে দুটি পবিত্র গ্রহণ করে 'শন্নো দেবী' এই মন্ত্র পাঠ করে জল নিক্ষেপ করবে। পরে 'যবোঽসি' এই মন্ত্র পাঠ করে যব নিক্ষেপ করবে। তারপর 'যো দিব্যা' এই মন্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য প্রদান করবে। অনন্তর সামর্থ্যমতো গন্ধদ্রব্য, মালা, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দান করবে।

এরপর বিদ্বান শ্রাদ্ধকর্তা দক্ষিণামুখ ও অপসব্য হয়ে 'উশন্তস্ত্বা' এই ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করবে। তারপর পিতৃব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করে শাস্ত্র অনুসারে, 'আযান্তু নঃ' এই মন্ত্র পাঠ করবে। তারপর 'শন্নো দেবী' এই মন্ত্র দ্বারা জল এবং 'তিলোঽসি' এই মন্ত্র পাঠ করে অর্ঘ্য পাত্রে তিল দেবে। যথাপূর্ব ব্রাহ্মণের হাতে অর্ঘ্য দান করবে। তারপর সমাহিত হয়ে পিতামহ পাত্র ও প্রপিতামহ পাত্রের অবশিষ্ট জল পিতৃপাত্রে রাখবে। 'পিতৃভ্যঃ স্থানয়সি' এই মন্ত্র পাঠ করে অর্ঘ্যপাত্র উপুড় করবে। তারপর ঘৃতমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করে 'অগ্নৌ করিষ্যে' এই কথা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করবে। ব্রাহ্মণরা 'কুরুষ্ব' বললে উপবীত ধারণ করে হোম করবে। কুশ হাতে নিয়ে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ঐ হোম করতে হয়। আর পৈত্র হোম ও বৈশ্বদেব হোম প্রাচীনাবীত ধারণ করে করতে হয়। দক্ষিণ জানু মাটিতে রেখে দেবকার্য আর বাম জানু মাটিতে রেখে পিতৃকার্য করবে। 'সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করে এবং 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা' এই মন্ত্র পাঠ করে হোম করবে। অগ্নির অভাব হলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম অর্থাৎ দান করবে। কিংবা সমাহিত চিত্তে মহাদেবের কাছে কিংবা গোষ্ঠে হোম করবে। তারপর পিতৃব্রাহ্মণ অনুজ্ঞা দিলে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সিকতাময় ভূমি গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করবে, পরে সেই স্থানে শুভ দক্ষিণাপ্রবণ বৃত্ত বা চতুষ্কোণ তৈরি করবে। তার মধ্যদেশে কুশ দ্বারা তিন স্থানে তিনবার উল্লিখন করবে। ঐ স্থানে দক্ষিণাগ্র কুশ-গুচ্ছ বিছিয়ে হবির অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তিনটি পিণ্ড দান করবে। পিণ্ড দান করে সেই হস্ত লেপভোজী পিতৃগণের উদ্দেশে ঐ কুশমূলে মুছে নেবে। তারপর তিনবার

আচমন করে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ ও মন্ত্র পাঠ করে ছয় ঋতু এবং পিতৃগণকে নমস্কার করবে। সমাহিত হয়ে ক্রম প্রদত্ত পিণ্ডের কাছে ধীরে ধীরে জল দান করবে এবং যথাক্রমে আঘ্রাণ করবে। তারপর পিণ্ডের অবশিষ্ট অন্ন বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে এবং মাংস, নানা প্রকার পিঠা, তিলের মিষ্টান্ন, পায়স, ডাল, শাক, ইক্ষু, ফল, দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, দাতার অভীপ্সিত বহুবিধ ভোজ্য-পেয় প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণের ইচ্ছামতো নানা প্রকার অন্ন, পানীয় প্রভৃতি এবং তিল ও শর্করা ব্রাহ্মণদের প্রদান করবে। মঙ্গলকামী ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের উষ্ণ অন্ন ভোজন করাবেন, কিন্তু ফল, মূল, জল—এই সব বস্তু উষ্ণ দিতে নেই। সেই সময়ে ভূমিতে জানু পেতে বসবে না, ক্রুদ্ধ হবে না, মিথ্যা বাক্য বলবে না, পদ দ্বারা অন্ন স্পর্শ করবে না এবং পদদ্বয় কম্পিত করবে না। ক্রোধযুক্ত হয়ে বা অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে যে সব বস্তু দান করা যায়, তা রাক্ষসেরা হরণ করে থাকে। ব্রাহ্মণের কাছে আর্দ্র শরীরে থাকবে না। শ্রাদ্ধকালে শ্যেন, কাক প্রভৃতি পক্ষীকে তাড়িয়ে দেবে না। কারণ ক্ষুধার্ত পিতৃগণই ঐ সব রূপ ধরে আসেন। হাত দিয়ে লবণ দেবে না, লৌহপাত্র দ্বারা পরিবেশন করবে না এবং অশ্রদ্ধা করে কোন বস্তু দান করবে না। স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র বা উড়ুম্বর নির্মিত পাত্রে যা পরিবেশন করা যায়, তা অক্ষয় ফল দান করে থাকে। গণ্ডারচর্মনির্মিত পাত্র দ্বারা প্রদত্ত বস্তু বিশেষ ফল উৎপাদন করে থাকে। শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকানির্মিত পাত্রে ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে দাতা, পুরোহিত ও ভোজনকারী—এই তিনজনের ঘোর নরকপ্রাপ্তি হয়। একই পঙ্‌ক্তিতে অসমান ভাবে পরিবেশন করবে না, যাচঞা করবে না, কাউকে অধিক বা অল্প দেওয়াবে না। যারা এই রকম যাচঞা করে, এই রকম দান করে বা দান করায়, তারা সকলেই ভীষণ নরকগামী হয়। শিষ্টেরা সংযতবাক হয়ে ভোজন করবেন এবং পক্ক বস্তুর উৎকৃষ্ট বা অপকর্ষ বিষয়ে কোন মন্তব্য করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত হবির কোন গুণাগুণ বলা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্তই পিতৃগণ ভোজন করে থাকেন। আগেই আসনে বসে যে ব্রাহ্মণ আগেই আহার করতে শুরু করে, সেই পঙ্‌ক্তিতে আসীন দর্শনকারী বহু ব্রাহ্মণের পাপ তাকে স্পর্শ করে। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ কিছুই পরিত্যাগ করবে না। মাংস ভোজনে কোন কারণে নিষেধ থাকলেও শ্রাদ্ধনিযুক্ত ব্রাহ্মণকে তা ভোজন করতে হয় এবং তার পক্ষে অন্যের অন্নের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হয়ে যে ব্রাহ্মণ মাংস ভোজন করে না সে একুশবার পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও অতি সুন্দর শ্রাদ্ধকল্প ব্রাহ্মণদের শ্রবণ করাতে হয়। তারপর অন্ন উৎসর্গ করে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসাপূর্বক ভুক্ত ব্রাহ্মণদের সম্মুখের ভূমিতে সেই অন্ন ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর তৃপ্ত ব্রাহ্মণদের আচমন করাতে হয়।

'অভিরম্যতাম্' এই কথা বলে ভুক্ত ব্রাহ্মণদের অনুজ্ঞা গ্রহণ করবে। তার পর ব্রাহ্মণগণ তাকে 'স্বধাস্তু' এই কথা বলবেন। ভুক্ত ব্রাহ্মণেরা ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা যা করতে বলবেন, তাই করবে। পিতৃকর্মে 'স্বদিতম্' গোষ্ঠশ্রাদ্ধে 'সুশ্রিতম্', আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে 'সম্পন্নম্' আর দেবশ্রাদ্ধে 'রুচিতম্' এই কথা বলবে। তারপর সংযতবাক হয়ে পিতৃপূর্বক ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে দক্ষিণ দিকে পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করে এই বর যাচঞা করবে—আমাদের দাতারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন, বেদ ও সন্ততিসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, আমাদের শরীর থেকে যেন শ্রদ্ধা অপগত না হয়, আমরা যেন বহু বস্তু দান করতে পারি, বহু অন্ন হোক, প্রত্যহ যেন অতিথি লাভ করতে পারি, অনেকেই যেন আমাদের

কাছে যাচঞা করে, কিন্তু আমাদের যেন কারো কাছে যাচঞা করতে না হয়। শ্রাদ্ধের পিণ্ডসমূহ গো, ব্রাহ্মণ বা অজদের দেবে, কিংবা জলে নিক্ষেপ করবে। পত্নী পুত্রাকাঙ্ক্ষা করলে মধ্যম পিণ্ড ভোজন করবেন। তারপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে আচমন করে অবশিষ্ট বস্তু দ্বারা প্রথমে নিজের আত্মীয়দের ও পরে ভৃত্যবর্গকে পরিতুষ্ট করে ভোজন করাবে। এদের ভোজন শেষ হলে অবশিষ্ট অন্ন নিজে পত্নীর সঙ্গে ভোজন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্ত না যান, ততক্ষণ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট স্থান উপলেপন করবে না। শ্রাদ্ধদিনের রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রী ব্রহ্মচর্য পালন করবে। শ্রাদ্ধ করে বা শ্রাদ্ধে ভোজন করে যে ব্যক্তি মৈথুন করে, সে মহারৌরব নরক ভোগের পর কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শান্ত, সত্যবাদী, শুচি, অক্রোধী ও সমাহিত হয়ে শ্রাদ্ধকর্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা বেদাধ্যয়ন ও পথগমন পরিত্যাগ করবে। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ করে, অন্যের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ মহাপাতকীর তুল্য হয় ও বহুতর নরকে গমন করে।

আমি সংক্ষেপে তোমাদের কাছে এই শ্রাদ্ধকল্প বললাম। কি উদাসীন, কি তত্ত্বজ্ঞ সকলেই এই নিয়মের অনুগামী হবেন। বিপৎপাত হলে বা অগ্নি প্রভৃতি না পেলে ব্রাহ্মণ আমান্ন দিয়েও শ্রাদ্ধ করবেন। শূদ্র সর্বদাই আমান্ন দিয়েই শ্রাদ্ধ করবে। শ্রদ্ধালু বিধিবেত্তা যে অন্নে আম শ্রাদ্ধ করবেন, সেই প্রকার আমান্ন দিয়েই 'অগ্নৌকরণ' এবং পিণ্ডদান করবেন। শান্তচিত্ত হয়ে যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধ করে, সে নিষ্পাপ হয়ে যতিদের লভ্য নিত্য পদ প্রাপ্ত হয়। তাই ব্রাহ্মণেরা সযত্নে শ্রাদ্ধ করবেন। তাহলেই সনাতন মহাদেবও সম্যকরূপে আরাধিত হবেন। ধনহীন ব্রাহ্মণ স্নান করে তিলোদক দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করে সমাহিত চিত্তে ফল বা মূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করতে পারেন। যে ব্যক্তির পিতা জীবিত, তিনি শ্রাদ্ধ করবেন না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে পিতা যাদের শ্রাদ্ধ করবেন, তিনিও তাদের শ্রাদ্ধ করতে পারেন। পিতা, পিতামহ আর প্রপিতামহ —এঁদের মধ্যে যাঁর মৃত্যু হবে তাঁকেই শ্রাদ্ধ দেবে, অন্যকে নয়। এঁরা জীবিত থাকলে এই সব ব্যক্তিকেই ভোজন করাবে। জীবিত ব্যক্তিকে না দিয়ে কোন কাজ করবে না। যদি জারজ পুত্র নিয়োগবশত উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেই পুত্র বীজী আর ক্ষেত্রীকে সমান দান করার অধিকারী হবে। যে পুত্র নিয়োগবশত উৎপন্ন নয়, সে কেবল জন্মদাতাকেই পিণ্ডদান করবে। আর যদি নিয়োগবশত উৎপন্ন হয়, তাহলে ক্ষেত্রীকেও পিণ্ডদান করবে। কিন্তু সে শ্রাদ্ধে আগে বীজীর, তারপর ক্ষেত্রীর নাম উল্লেখ করে দুটি পিণ্ড দান করবে। মৃতাতিথিতে বিধান অনুসারে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করবে। নিজ অশৌচ অপগত হয়ে গেলে ইচ্ছা হলে কামশ্রাদ্ধ করতে পারবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্বাহ্ণে করতে হয়। এতে দেবশ্রাদ্ধের মতো সমস্ত কার্য করবে এবং তিলের কার্য সমস্তই যব দ্বারা সম্পন্ন করবে। এতে পিতৃপক্ষে ঋজু কুশ দেবে এবং দুজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই রকম পাঠ করবে। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতৃগণের, তারপর পিতৃগণের এবং তারপর মাতামহদের—এই তিন রকম শ্রাদ্ধ হবে। এই তিন শ্রাদ্ধের আগে দেবশ্রাদ্ধ করবে এবং প্রদক্ষিণ না করে শ্রাদ্ধ করবে না। সমাহিত চিত্তে উপবীত ধারণ করে পূর্বমুখে পিণ্ডদান করবে। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, প্রতিমায় বা ব্রাহ্মণে ভক্তিসহকারে প্রথমে গণেশ আর ষোড়শমাতৃকার পূজা করবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি এবং বহু প্রকার অলংকার দ্বারা মাতৃগণের

পুজা করে তিনটি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে। মাতৃযাগ না করে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার ক্ষতি করবেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে শ্রাদ্ধকল্পে নামে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ, সপিণ্ড জননে বা সপিণ্ড মরণে ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ। এ কথা মুনিরা বলেছেন। এই অশৌচ অবস্থায় নিত্য, কাম্য বা অন্য কোন বিহিত কর্মই করবে না এবং মনে মনেও বেদের আলোচনা করবে না। শুচি, অক্রোধী, শান্ত ব্রাহ্মণদের শালাগ্নিতে হোম করার জন্য নিযুক্ত করবে। কিন্তু নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ শুষ্ক অন্ন বা ফল দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম করবে। অন্য ব্যক্তিরা অশৌচী ব্যক্তিদের স্পর্শ এবং অশৌচীদের কাছ থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করবে না। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে এদের স্পর্শ করা যায়। জাতাশৌচে সপিণ্ড প্রভৃতির স্পর্শে দোষ নেই, কিন্তু কেবল শিশু ও প্রসূতিকে স্পর্শ করতে পারবে না। বেদাধ্যায়ী, যাগকর্তা ও বেদজ্ঞ পিতা এবং অন্যান্য সকলকেই স্নান করার পর স্পর্শ করা যায়। আর দশ দিন কেটে গেলে মাতাকেও স্পর্শ করা যায়। এই দশ দিনের অশৌচ নির্গুণ বা অতিনির্গুণের পক্ষে জানবে। একটি গুণ, দুটি গুণ বা তিনটি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের যথাক্রমে তিন দিন, চার দিন ও একদিন গেলেই শুদ্ধি। দশ দিন অতীত হলে অধ্যয়ন ও হোম প্রভৃতি যথাযথ ভাবে করবে এবং চতুর্থ দিন অতীত হলে সংস্পর্শ-দোষও থাকবে না। এ কথা মনু প্রজাপতি বলেছেন। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগগ্রস্ত ও যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের সারা জীবনই অশৌচ। ব্রাহ্মণদের তিন রাত্রি বা দশ রাত্রি অশৌচ। উপনয়ন সংস্কারের পূর্বে মৃত্যু হলে তিন রাত্রি আর সংস্কারের পরে মৃত্যু হলে দশ রাত্রি অশৌচ হবে। দু বছরের কম বয়সের শিশুর মৃত্যু হলে মাতা-পিতার তিন রাত্রি অশৌচ এবং অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের তিন রাত্রি অশৌচ। যে বালকের দাঁত ওঠে নি তার মৃত্যু হলে মাতা-পিতার একদিন অশৌচ ও যে বালকের দাঁত উঠেছে তার মৃত্যুতে অত্যন্ত নির্গুণ মাতা-পিতার তিন রাত্রি অশৌচ। দাঁত ওঠবার আগে বালকের মৃত্যুতে সদ্য শৌচ, চূড়ার পূর্ব পর্যন্ত বালকের মৃত্যুতে একদিন অশৌচ আর উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুতে তিন রাত্রি অশৌচ, এ সবই সপিণ্ডের পক্ষে। বালকের জন্মের পর যদি অশৌচের মধ্যেই মৃত্যু হয়, তাহলে পিতা-মাতার অঙ্গ স্পর্শ করা যাবে না এ রকম সম্পূর্ণাশৌচ হবে, সপিণ্ড আর সহোদরের সদ্য শৌচ হবে। কিন্তু সহোদর নির্গুণ হলে দশ দিনের পরেও আবার একদিন অশৌচ হবে। দাঁত ওঠার পর বালকের মৃত্যু হলে নির্গুণ সপিণ্ডদের একদিন অশৌচ হবে এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হলে তিন রাত্রি অশৌচ হবে। যে বালকের দাঁত ওঠে নি তার মৃত্যু হলে অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের একরাত্রি অশৌচ হবে। উপনয়নের পূর্বে মৃত্যু হলে সগুণ সপিণ্ডের সম্বন্ধে স্নান বিহিত হয়েছে এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হলেও স্নান বিধান আছে। ছ'মাসের মধ্যে স্ত্রীদের গর্ভস্রাব হলে, যত মাসের গর্ভ তত দিনের অশৌচ হবে। ছ'মাসের পর গর্ভস্রাব হলে স্ত্রীর দশ রাত্রি অশৌচ হবে আর সপিণ্ডদের সদ্য শৌচ হবে। কিন্তু যদি সপ্তম বা অষ্টম মাসে বালক জন্মেই সেই

দিন মারা যায়, তাহলে গর্ভস্রাবাশৌচের মতোই অশৌচ হবে। গর্ভস্রাবে অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের একরাত্রি অশৌচ হবে। যথেচ্ছাচারী জাতির তিন রাত্রি অশৌচ হবে। যদি জননাশৌচের মধ্যেই মরণাশৌচ হয় এবং মরণাশৌচের মধ্যে আবার মরণাশৌচ হয়, তাহলে পূর্বের অশৌচের যে ক'দিন বাকি আছে, তাতেই দুই অশৌচ যাবে। কিন্তু যদি পূর্বের অশৌচের শেষ দিনে অশৌচ হয়, তাহলে অশৌচ দু' দিন বৃদ্ধি পাবে। যদি মরণাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হয় এবং জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হয়, তাহলে মরণাশৌচ দ্বারাই জননাশৌচ নির্বাহ হবে। যদি কোন অশৌচের অর্ধেক দিন কেটে গেলে অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচ হয়, তাহলে অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচের দ্বারাই পূর্ব অশৌচ যাবে। যদি কোন অশৌচের পাঁচদিন গত না হলে অঘবৃদ্ধমৎ অশৌচ হয়, তাহলে পূর্ব অশৌচের দ্বারাই অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচ নির্বাহ হবে। অন্য স্থানে থেকে জননাশৌচ বা মরণাশৌচের কথা শুনলে অশৌচের যে কদিন অবশিষ্ট আছে, সেই কদিন অশৌচ হবে। সংবৎসরের মধ্যে অতীত মরণাশৌচের কথা শুনলে সপিণ্ডদের তিন রাত্রি অশৌচ হবে। সংবৎসরের পর শুনলে স্নানের দ্বারাই শুদ্ধি হয়। বেদার্থবিদ, অধ্যয়নকর্তা ও অগ্নিহোত্রী—এই সব ব্যক্তির সর্বপ্রকার অশৌচ সব সময়ে তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অবস্থাবিশেষে সকলেরই তৎক্ষণাৎ অশৌচ নাশ হয়। বাগ্‌দানের পর বিবাহ-সংস্কারের পূর্বে স্ত্রীদের মৃত্যু হলে সপিণ্ডদের তিনরাত্রি অশৌচ হবে। বিবাহ-সংস্কার হয়ে যাবার পর মৃত্যু হলে কেবল ভর্তার অশৌচ হবে। বাগ্‌দানের পূর্বে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলে একদিন অশৌচ হয়। দু' বছর বয়সের আগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলে সদ্যশৌচ হয়। দাঁত ওঠার আগে ভগিনীর মৃত্যু হলে ভ্রাতার সদ্যশৌচ হবে। দু' বছরের আগে মৃত্যু হলে ভ্রাতার একদিন অশৌচ হবে। বিবাহের আগে অবধি তিনরাত্রি অশৌচ ও বিবাহের পর ঐ নারীর মৃত্যু হলে ভর্তৃসপিণ্ডদের দশরাত্রি অশৌচ হবে।

মাতামহের মৃত্যু হলে দৌহিত্রের তিন রাত্রি অশৌচ হয়। সমানোদকের মৃত্যুতে বা জন্মে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। যাদের সঙ্গে যোনি-সম্বন্ধ আছে তাদের এবং পিতৃবন্ধুর মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয় অর্থাৎ একরাত্রি ও তার আগের এবং পরের সকাল অথবা দুই রাত্রি ও তাদের মধ্যবর্তী সকাল অশৌচ হয়। গুরুর মৃত্যু হলে একদিন ও সব্রহ্মচারীর মৃত্যু হলে একদিন অশৌচ। যার অধিকারে বাস করা যায়, সেই ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হলে সজ্যোতি অশৌচ হয়। দত্তা কন্যার পিতৃগৃহে মৃত্যু হলে পিতার তিন রাত্রি অশৌচ হবে। যে নারী পূর্বে অন্য পুরুষের ভার্যা ছিল, তার মৃত্যুতে ও তার গর্ভজাত পুত্রের মৃত্যুতে এবং কৃত্তক পুত্রের মৃত্যুতে তিন রাত্রি অশৌচ হবে। আচার্যের মৃত্যু হলে তিন রাত্রি অশৌচ হবে। অন্য পুরুষগতা ভার্যার মৃত্যু হলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ হবে। আচার্যের পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু হলে অহোরাত্র অশৌচ হবে এবং উপাধ্যায় ও স্বগ্রামস্থ শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হলে এক রাত্রি অশৌচ হবে। পিতৃস্বসার পুত্র ও মাতৃস্বসার পুত্র বা অন্য কোন একাহ অথবা পক্ষিণী অশৌচ সম্বন্ধযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বগৃহে মৃত্যু হলে তিন রাত্রি অশৌচ। অন্য গ্রামে স্থিত শ্রোত্রিয় প্রভৃতির স্বগৃহে মৃত্যু হলে একদিন অশৌচ ও শিষ্যের মৃত্যু হলে গুরুর একদিন অশৌচ হবে। শাশুড়ী ও শ্বশুর মারা গেলে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। সগোত্রের মৃত্যু হলে সদ্য শৌচ হয়। ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বারো দিনে, বৈশ্য পনেরো দিনে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রার গর্ভজাত বান্ধবের জন্মে বা মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ দশ দিনেই শুদ্ধ হন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষেও

এই রকম হীনবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের জন্ম বা মৃত্যুতে স্বজাতির পক্ষে বিহিত অশৌচ গ্রহণ করতে হয়। তাতেই তাদের শুদ্ধি হবে। সমস্ত বর্ণই নিজ নিজ বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণের সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে সেই সেই বর্ণের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে সাবধানে অশৌচ গ্রহণ করবে। আর স্বজাতীয় সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে স্ববর্ণবিহিত অশৌচ গ্রহণ করবে। কিন্তু শূদ্র সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে বৈশ্যের ছয় রাত্রি, ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি ও ব্রাহ্মণের এক রাত্রি অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, বৈশ্য সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে শূদ্রের পনেরো দিন, ক্ষত্রিয়ের ছয় রাত্রি ও ব্রাহ্মণের তিন রাত্রি অশৌচ। ক্ষত্রিয় সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের ছয় দিন আর বৈশ্য-শূদ্রের দশ বা বারো দিন অশৌচ। ব্রাহ্মণ সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শুদ্ধি দশ দিনে হবে। এ কথা বলেছেন কমলাপতি বিষ্ণু। অসপিণ্ড মৃত ব্রাহ্মণকে বন্ধুর মতো বহন ও দাহ করে ব্রাহ্মণ যদি তার সপিণ্ডের অন্ন গ্রহণ করে তার গৃহে বাস করে, তাহলে দশ রাত্রের পর শুদ্ধ হবে। আর যদি কেবল তাদের অন্ন ভোজন করে, তাহলে তিন-রাত্রি গত হলেই শুদ্ধ হয়। যদি অন্ন ভোজন ও তার গৃহে বাস না করে, তাহলে সেইদিনই শুদ্ধ হয়। সমানোদক ও মাতৃবন্ধুকে বহন ও দাহ করলে তিন রাত্রি অতীত হলে শুদ্ধি হয়। দহন-বহনকারী সপিণ্ড দশ দিনে শুদ্ধ হন। লোভবশত শবদাহ করলে ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বারো দিনে, বৈশ্য পনেরো দিনে ও শূদ্র ত্রিশ দিনে শুদ্ধ হয়। অথবা সকলেই ছয় রাত্রে শুদ্ধ হয়। কিংবা তিন রাত্রি কেটে গেলে শুদ্ধ হয়। অনাথ ধনহীন ব্রাহ্মণকে দহন-বহন করলে স্নানের পর ঘৃত ভক্ষণ করে সকলেই শুদ্ধ হয়। উৎকৃষ্ট বর্ণ যদি অপকৃষ্ট বর্ণের দহন-বহন প্রভৃতি কার্য করে, তাহলে সেই অপকৃষ্ট বর্ণের যে অশৌচ বিহিত আছে তা প্রতিপালন করতে হবে এবং অপকৃষ্ট ব্যক্তি যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের দহন বহন করে তাহলে সেই উৎকৃষ্ট বর্ণের যে অশৌচ বিহিত আছে তা পালন করতে হবে। অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে স্নানের পর শুদ্ধ হবে। স্বেচ্ছায় যে ব্রাহ্মণ মৃত ব্রাহ্মণের অনুগমন করে, সে স্নান করে অগ্নি স্পর্শপূর্বক ঘৃতপান করলে শুদ্ধ হবে। শবানুগমন করে ক্ষত্রিয় একদিনের পর শুদ্ধ হয়, বৈশ্য দু' দিনের পর ও শূদ্র তিন দিনের পর শুদ্ধ হয়। কিন্তু সকলকেই একশবার প্রাণায়াম করতে হবে। যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রের অস্থিসঞ্চয়নের আগে বিলাপ করে, তাহলে তিন রাত্রি অশৌচ হবে। অন্যত্র রোদন করলে এক রাত্রি কাটলে শুদ্ধ হবে। অস্থিসঞ্চয়নের আগে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি শূদ্রগৃহে গিয়ে বিলাপ করে, তাহলে এক দিন অশৌচ হবে, অন্যত্র রোদন করলে সজ্যোতি অশৌচ হবে। ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয়নের আগে বৈশ্য বা শূদ্র যদি ঐ রকম রোদন করে, তাহলে কেবল স্নান করলেই চলবে। ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয়নের আগে ব্রাহ্মণ তার গৃহে গমন করে রোদন করলে সবস্ত্র স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে। অশৌচী ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তি উপবেশন, শয়ন বা ভোজন প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ভাবে করবে, সে বান্ধবই হোক বা পরই হোক, তাকে দশ দিন অশৌচ পালন করে শুদ্ধ হতো হবে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে একবারও অশৌচীর অন্ন ভোজন করে, অশৌচ নিবৃত্ত হলে সে স্নান করে শুদ্ধ হবে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি যত দিন অশুচির অন্ন ভক্ষণ করবে, তার তত দিন অশৌচ হবে। অশৌচ অপগত হলে প্রায়শ্চিত্ত করবে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের দাহ পর্যন্ত অশৌচ পালন করবে। সপিণ্ডের জন্মে ও সপিণ্ডের মৃত্যুতে অশৌচ পালন করবে। সপ্তম পুরুষ অতীত হলে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হবে। কোন পুরুষের সন্তান তা না

জানলে ও নাম না জানলে সমানোদকতা নিবৃত্ত হয়। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি লেপভোজী তিনজন এবং নিজে এই রকম সাতটি পুরুষে সপিণ্ডতা হয়। অদত্তা কন্যার সাত পুরুষে সপিণ্ডতা ও দত্তা কন্যার ভর্তৃকুলে সপিণ্ডতা —এ কথা দেব পিতামহ বলেছেন। এক পুরুষের ঔরসে অন্য বর্ণের স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদের তিন পুরুষের সপিণ্ডতা হয়। কারুকর্মকারী, শিল্পকর্মকারী, বৈদ্য, দাসী, দাস, দাতা, ব্রতানুরক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, যজ্ঞকারী আর ব্রতী—এদের সদ্য শৌচ হয়। রাজা, অভিষিক্ত ব্যক্তি ও অন্নদাতা—এদেরও সদ্য শৌচ। আরব্ধ যজ্ঞে, আরব্ধ বিবাহে ও আরব্ধ দেবপূজায় তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। দুর্ভিক্ষ, নগর-গ্রাম দাহ প্রভৃতি বিপর্যয়েও সদ্য শৌচ হয়। যুদ্ধে মৃত বা বিদ্যুৎ, রাজা, পক্ষী ও সর্প প্রভৃতির দ্বারা হত হলে সদ্য শৌচ হবে। অগ্নি বা বায়ুতে মৃত্যু হলে, দুর্গম পথগমনের সময়ে মৃত্যু হলে, অনশনব্রত করে মৃত্যু হলে, গো বা ব্রাহ্মণের হেতু মৃত্যু হলে অথবা সন্ন্যাসী হয়ে মৃত্যু হলে সদ্য শৌচ হবে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী, যতি আর উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুতে এবং পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধুরা অশৌচের কথা বলেন নি। পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে দাহ, অস্থিসঞ্চয় বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুই নেই এবং অশ্রুপাত, পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কিছুই করতে নেই। যে ব্যক্তি নিজে ইচ্ছা করে অগ্নি বা বিষ প্রভৃতি দ্বারা নিজের আত্মাকে নষ্ট করে, তার অশৌচ অথবা অগ্নিসংস্কার কিংবা জল পিণ্ড প্রভৃতি দান কিছুই বিহিত হয় নি। যদি অনবধানতা বশত অগ্নি বা বিষ প্রভৃতিতে মৃত্যু হয়, তাহলে তার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করবে এবং তার অশৌচ প্রতিপালন করবে। পুত্রের জন্ম হলে সেই দিনে সুবর্ণ, বস্ত্র, গোরু, ধান্য, তিল, অন্ন, গুড় ও ঘৃত—এই সব বস্তু ইচ্ছা অনুসারে প্রতিগ্রহ করবে। অশৌচী ব্যক্তির কাছ থেকে ফল, পুষ্প, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, জল, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, ক্ষীর ও শুষ্ক অন্ন—এ সব প্রতিদিন গ্রহণ করা যায়। আহিতাগ্নিকে তিন প্রকার অগ্নি দ্বারা শাস্ত্র অনুসারে দাহ করতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অগ্ন্যাধান করে নি তাকে গৃহ্যোক্ত বিহিত অগ্নি দ্বারা দাহ করতে হয়। অন্য ব্যক্তিদের লৌকিক অগ্নিতে দাহ করবে। মৃতদেহ না পেলে পলাশপাতা দিয়ে মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে সপিণ্ডগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ন্যায় মতে তা দাহ করবেন। দশ দিন পর্যন্ত বান্ধবেরা সিক্ত বস্ত্রে সংযতবাক হয়ে নাম গোত্র উচ্চারণ করে একবার তর্পণ করবেন। প্রতিদিন গৃহের বহির্ভাগে সায়ং ও প্রাতঃকালে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে হবে। চতুর্থ দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। দ্বিতীয় দিনে বান্ধবের সঙ্গে ক্ষৌরকার্য করবে এবং চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয়ন করবে। শুচি, পূর্বমুখ যুগ্ম ব্রাহ্মণদের অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোজন করাবে এবং মৃত্যুর পঞ্চম দিনে, নবম দিনে, একাদশ দিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে। এরই নাম শ্রাদ্ধ। একাদশ বা দ্বাদশ দিনে অথবা নবম দিনে প্রেতকে উদ্দেশ করে শ্রাদ্ধ করবে। এই শ্রাদ্ধে একটি পবিত্র, একটি অর্ঘ্য এবং একটি পিণ্ড দেবে। এই রকম প্রতি মাসের ও প্রতি বৎসরের মৃত্যু দিনে শ্রাদ্ধ করবে। সংবৎসর পূর্ণ হলে সপিণ্ডীকরণ করবে। প্রেত, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের উদ্দেশে এক একটি করে চারটি অর্ঘ্য পাত্র করবে। 'যে সমানাঃ' এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ পাত্রে প্রেতার্ঘ্য মিশ্রিত করবে এবং প্রেতপিণ্ডও ঐ রকম পিতামহ প্রভৃতি তিনটি পিণ্ডে মিশ্রিত করবে। দেব শ্রাদ্ধ করে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করবে। তারপর পিতামহ

প্রভৃতির আবাহন করবে এবং তারপর প্রেতের আবাহন করবে। যে সব প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করা হয়েছে, তাদের প্রেতপদ উল্লেখ করে কার্য করবে না। যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতের প্রেতপদ উল্লেখ করে কার্য করে সে পিতৃহত্যার পাপভাগী হয়। পিতার মৃত্যু হলে এক বৎসর কাল পিণ্ড দান করবে এবং প্রত্যহ প্রেত ধর্মানুসারে এক বৎসর অন্বষ্টশ্রাদ্ধ করবে। প্রতি সংবৎসর পার্বণ বিধানে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করবে। এ হল সনাতন বিধি। মাতাপিতার পিণ্ডদান প্রভৃতি যা কিছু কার্য তা পুত্র করবেন। পুত্রের অভাবে কন্যা, কন্যার অভাবে পত্নী, পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা করবেন। মনুষ্যগণ সমাহিত চিত্তে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দান প্রভৃতি করে এই বিধানমতে শ্রাদ্ধ করবেন।

গৃহস্থের এই ক্রিয়াবিধি সম্যকভাবে আপনাদের কাছে বললাম। কিন্তু স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীর শুশ্রূষা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নেই। স্বধর্মপরায়ণ ও সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিতচিত্ত ব্যক্তিরাই বেদবাদীদের দ্বারা প্রোক্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে শৌচবিধি নামে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিধান অনুসারে অগ্নিহোত্র হোম করবে। অমাবস্যায় দর্শ নামে যাগ ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যাগ করবে। নূতন শস্য পেলে ব্রাহ্মণরা তার দ্বারা যজ্ঞ করবে। ঋতুর অন্তে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করবে। অয়নের শেষে করবে পশুযজ্ঞ এবং বৎসরের অন্ত হলে সোমরসের দ্বারা নিষ্পাদ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করবে। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে অভিলাষী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নবশস্যেষ্টি এবং পশুযাগ না করে অন্ন বা মাংস ভক্ষণ করবে না। যারা নবান্ন দ্বারা যাগ না করে বা পশুহব্য দ্বারা যাগ না করে নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করে, তারা স্বীয় প্রাণকেই ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করে। প্রতি পর্বে সাবিত্রী হোম ও শান্তি হোম করবে। আর অষ্টকা অন্বষ্টকায় সকলেই পিতৃগণের নিত্য শ্রাদ্ধ করবে। গৃহস্থাশ্রমী ত্রৈবর্ণিকদের এইগুলি নিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্যগুলি অধর্ম বলে কথিত আছে। নাস্তিক্য বা আলস্যবশত যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান না করে বা যজ্ঞ না করে, সে বহুতর নরক ভোগ করে এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, বৈতরণী, অসিপত্রবন এবং অন্যান্য ঘোরতর বহু নরক ভোগ করে সেই দুর্মতি বিপ্র অন্ত্যজকুলে বা শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ অতি যত্নসহকারে অগ্ন্যাধান করে বিশুদ্ধাত্মা হয়ে পরমেশ্বরকে পূজা করবে। ব্রাহ্মণদের অগ্নিহোত্রের চেয়ে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নেই। তাই তাঁরা নিরন্তর অগ্নিহোত্র দ্বারাই ঈশ্বর আরাধনা করবেন। যে ব্যক্তি সাগ্নিক হয়ে পরে আলস্যবশত অগ্নিহোত্র করে না, সেই মূর্খের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। নাস্তিকের কথা আর কী বলব? যার পোষ্যবর্গের জীবিকার জন্য তিন বৎসরের আহার্য সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে অথবা যার তার চেয়েও বেশী আছে, সেই ব্যক্তিই সোমযাগ করতে পারে, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সোমযাগকেই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সোমলোকস্থিত মহেশ্বরকে সোমযাগ দ্বারা আরাধনা করবে। মহাদেবের আরাধনা করতে গেলে সোমযাগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যাগ আর নেই। কিংবা তার সমান কোন যাগও নেই। তাই

সোমযাগ দ্বারাই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করবে। ব্রাহ্মণদের মুক্তির জন্য পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমত যে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলেছেন, তা শ্রৌত ও স্মার্ত। এই দু'প্রকার,— অগ্নিত্রয়ের সম্বন্ধ থেকে শ্রৌত ধর্ম উৎপন্ন হয়। আর স্মার্ত ধর্মের কথা আগেই বলেছি। শ্রৌত্র ধর্মেই অধিক শ্রেয় নিহিত। তাই শ্রৌত ধর্মই আচরণ করবে। দু'প্রকার ধর্মই বেদ থেকে নিঃসৃত। তাই দু'প্রকার ধর্মই শ্রেয়ের কারণ, শ্রুতি বা স্মৃতি না পেলে সাধুজনের আচরিত ধর্মকেই তৃতীয় প্রকার ধর্ম বলে জানবে। যাঁরা অঙ্গ এবং উপাঙ্গ-সহ বেদ ধর্মত অধ্যয়ন করেছেন, সর্বদা আত্মগুণান্বিত সেই ব্রাহ্মণদের শিষ্ট বলে জানবে। নিরন্তর বিচার দ্বারা যা তাঁদের অভিমত, সাধুরা তাকেই ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু অন্য প্রকার লোকের আচরিত কর্মকে ধর্ম বলে নির্দেশ করেন নি, এটা নিশ্চিত। বেদ বিস্তৃত হয়েছে পুরাণ আর ধর্মশাস্ত্রে। তার মধ্যে একটি থেকে হয় ব্রহ্মবিজ্ঞান, অন্যটি থেকে ধর্মজ্ঞান। যারা ধর্ম জানতে ইচ্ছা করেন, তাদের পক্ষে ধর্মশাস্ত্র উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং হে ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ দ্বিজগণ, তোমাদের পক্ষে পুরাণই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ ছাড়া অন্য কিছু থেকেই ধর্ম এবং বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। তাই ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণকে শ্রদ্ধা করা পণ্ডিতদের কর্তব্য।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি
নিয়ম নামে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলে চললেন, আশ্রমবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের এই যাবতীয় পরম ধর্মের কথা তোমাদের বললাম। এখন তোমাদের কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তা বলব, শোন। গৃহী দু'প্রকার—সাধক ও অসাধক। এদের মধ্যে সাধক-গৃহী বৃত্তি হিসাবে অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ আর যাজন করবেন। কুসীদ, কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যও করতে পারেন। তবে নিজে নয়, অন্যকে দিয়ে করাবেন। কৃষিকর্ম করতে না পারলে বাণিজ্য করাবেন এবং বাণিজ্যের অভাব ঘটলে কুসীদ করবেন। বিপদের সময়েই কৃষি, বাণিজ্য বা কুসীদ করবেন; কিন্তু প্রধান কল্প হিসাবে অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ আর যাজনকেই গ্রহণ করবেন। অথবা নিজেও বাণিজ্য, কৃষি বা কুসীদকর্ম করতে পারেন। কিন্তু কুসীদ অতি পাপজনক জীবিকা, তা পরিত্যাগ করাই ভালো। ঋষিরা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলেছেন, কিন্তু নিজে কর্ষণ করাকে ভালো বলেন নি। তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি নিলেও বিপদে পড়েন না। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষাত্র ধর্মের দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করতে না পারেন, তাহলেই বৈশ্যের ধর্ম গ্রহণ করবেন। তবুও ব্রাহ্মণ নিজে কখনই কৃষিকর্ম করবেন না। লাভ হলে, পিতা দেবতা ব্রাহ্মণদের পূজা করবেন। এঁরা তৃপ্ত হয়ে তার কৃষিকর্মজনিত দোষসমূহ নষ্ট করেন। দেবতা ও পিতৃগণকে উপার্জিত বস্তুর কুড়ি ভাগের এক ভাগ দেবে এবং ত্রিশ ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণদের দেবেন। তাহলে কৃষিকর্মে দোষ হয় না। বাণিজ্য কর্মে কৃষির চেয়ে দ্বিগুণ দেবেন ও কুসীদ কর্মে তিন গুণ দেবেন এই রকম দান করলে এই সব কর্মে দোষ হবে না, এ বিষয়ে সংশয় নেই। অথবা সাধক গৃহস্থ শিলোঞ্ছবৃত্তিও অবলম্বন করতে পারেন। তার বিদ্যা শিল্প প্রভৃতি অন্য

রকম আরো বহুতর জীবিকার উপায় আছে।

অসাধক গৃহস্থের পক্ষেও শিল ও উঞ্ছ নামে পূর্বোক্ত দুটি বৃত্তির কথা ঋষিরা বলেছেন। অথবা তারা 'অমৃত' দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। আর বিপদের সময়ে 'মৃত' দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করা যায়। অযাচিত বস্তুকে বলে 'অমৃত' আর ভিক্ষালব্ধ বস্তুর নাম 'মৃত'। তিন বছর বা তার বেশী কিংবা এক বছর বা তার বেশী যাতে চলে এ রকম ধান্য সঞ্চয় করবে অথবা সপরিবারে তিন দিন যাতে চলে এ রকম সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে আগামীকাল খাবার মতো কিছুই সঞ্চয় নেই। এই রকম চার প্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে পূর্বের চেয়ে উত্তর প্রকার শ্রেষ্ঠ। কারণ বৃত্তিসংকোচরূপ সংযমধর্ম অনুসারে তারা পরকালে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করে থাকেন। তার মধ্যে যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে বহু আত্মীয় পোষণ করতে হয়, তিনি ঋত, অযাচিত, ভৈক্ষ্য, কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ—এই ছয় প্রকার কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তার চেয়ে যার পরিবার অল্প, তিনি যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তার চেয়েও অল্প পোষ্য থাকলে অধ্যাপনা ও যাজন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত। আর যার পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্র, তিনি কেবল অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণের ধনসাধ্য পুণ্য কার্য করবে, সামর্থ্য না থাকলে তিনি কেবল অগ্নিহোত্রপরায়ণ হবেন এবং পর্ব ও অয়নের শেষে যে সমস্ত যজ্ঞ করতে হয় সেগুলি করবেন। অল্পসত্ত্ব সাধারণ মানুষ জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, নিজের গুণ বর্ণনা, প্রভুর মতো বেশ প্রভৃতি ধারণ—এই রকম নানা অবৈধ কাজ করে। কিন্তু জীবিকার জন্য সেই লোকবৃত্তির অনুকরণ করা উচিত নয়। দম্ভ, ছল প্রভৃতি যাতে নেই, যাতে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করতে হয় না, যা অতি বিশুদ্ধ—এই রকম ব্রাহ্মণ-জীবিকা দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করবেন। সাধুদের কাছ থেকে অন্ন যাচঞা করে দেবতা ও পিতৃগণের তুষ্টি বিধান করবেন অথবা পবিত্র সন্ন্যাসীদের দান করবেন, কিন্তু স্বয়ং তার দ্বারা তৃপ্ত হবেন না। যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জন করে গৃহস্থ, দেবতা ও পিতৃলোককে বিধিমতে তুষ্ট না করে সে কুকুরজন্ম লাভ করে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটিই শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মের অবিরোধী কাজই অবলম্বনীয়। ধর্মবিরুদ্ধ কাজ কখনই অবলম্বন করা উচিত নয়। যে অর্থ ধর্মের জন্য সঞ্চিত, নিজের জন্য নয়, সেই অর্থই অর্থ। যে অর্থ নিজের জন্য সঞ্চিত, ধর্মের জন্য নয়, তাকে অর্থই বলা যায় না। তাই ব্রাহ্মণ অর্থ সঞ্চয় করে সৎপাত্রে দান করবেন ও যজ্ঞ করবেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে দ্বিবিধ গৃহবৃত্তিকথন নামে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, পূর্বে ব্রহ্মা নিজে ব্রহ্মবাদী ঋষিদের যে শ্রেষ্ঠ দানধর্মের কথা বলেছিলেন, এখন আমি তা বর্ণনা করব। শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎপাত্রে অর্থ প্রদানই ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ দান বলে কথিত। শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বিশিষ্ট শিষ্টজনকে যা দান করা যায়, তাকেই বলি বিত্ত। না হলে দান না করে যা রাখা হয়, তা অন্যের ধন, যে রাখে তার নয়, সে রক্ষক

মাত্র। দান প্রথমত তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। আর চতুর্থ দানের নাম বিমল। এই দান সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উপকারীকে নয়, সাধারণ ব্রাহ্মণকে, ফল কামনা না করে, প্রতিদিন যে দান করা হয় তাকে বলে নিত্য দান। পাপনাশের জন্য পণ্ডিতদের হাতে সাধুরা যা তুলে দেন, তাই নৈমিত্তিক দান। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য, স্বর্গ প্রভৃতি কামনা করে যে দান করা হয়, ধর্মচিন্তক ঋষিরা তাকেই কাম্য দান বলেছেন। ধর্মযুক্ত চিত্তে বেদবিদ ব্রাহ্মণদের ঈশ্বর-প্রীতির জন্য যে দান করা যায়, তাকে মঙ্গলজনক বিমল নামে দান বলে। সৎপাত্র প্রাপ্ত হলেই সামর্থ্য অনুসারে দানধর্ম পালন করবে। কারণ এই রকম সদা-দানশীল ব্যক্তির কাছে কখনো এ রকম দানপাত্রও উপস্থিত হন যিনি দান গ্রহণ করে দাতাকে সমস্ত প্রকার পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণ-পোষণ করে যা অতিরিক্ত থাকবে তাই দান করবে। কুটুম্ব ভরণ-পোষণ না করে দান করলে সে দান ফলপ্রদ হয় না। শ্রোত্রিয়, কুলীন, বিনীত, তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও দরিদ্র—এদের ভক্তিপূর্বক দান করবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে সে সেই পরমস্থান প্রাপ্ত হয়, যে স্থানে গেলে আর কোন শোক থাকে না। যে ব্যক্তি ইক্ষু, যব ও গোধূমযুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি গোচর্ম পরিমিত ভূমি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ভূদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অন্নদান ভূমিদানের তুল্য, কিন্তু বিদ্যাদানের ফল তার চেয়েও বেশী। যে ব্যক্তি শান্ত, শুদ্ধাচারী ধার্মিক ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্বক বিদ্যাদান করে সে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিদিন ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করে। গৃহস্থকে অন্নদান করলে মানুষের ফল হয় না। গৃহস্থকে দান করতে হলে আমান্ন দান করা উচিত। তা করলে দাতা অতি শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় উপবাসপূর্বক বিশুদ্ধ চিত্তে শান্ত ও শুদ্ধাচারী সাতটি বা পাঁচটি ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণতিল ও মধু দ্বারা বিধি অনুসারে পূজা করে বিশেষভাবে গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করবে, তারপর 'হে ধর্মরাজ, তোমার প্রীতি হোক', এই কথা সেই ব্রাহ্মণদের দিয়ে বলাবে ও নিজে বলবে। অথবা মনে অন্য কোন কামনা থাকলে তাও বলাবে ও নিজে বলবে। এই রকম করলে সারাজীবনের পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসারের চর্মে হিরণ্য, তিল, মধু ও ঘৃত—এই সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় পক্কান্ন ও জলপূর্ণ কুম্ভ ধর্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদের দান করলে ভয় থেকে মুক্তি হয়। আর সাতটি বা পাঁচটি সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ তিল ও জল দান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। মাঘমাসের কৃষ্ণাদ্বাদশীতে উপবাস করে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হয়ে অগ্নিতে কৃষ্ণতিল দ্বারা হোম করে সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণদের তিল দান করলে জন্ম থেকে কৃত সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অমাবস্যা তিথিতে 'উমার সঙ্গে ঈশ্বর সনাতন মহাদেব প্রীত হোন', এই কথা বলে দেবদেবেশ মহাদেবের উদ্দেশে তপস্বী ব্রাহ্মণকে যা কিছু দান করা যায়, তার দ্বারা সাত জন্ম কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি স্নান করে কৃষ্ণচতুর্দশীতে মহাদেবের আরাধনাপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তার পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নান করে ধার্মিক ব্রাহ্মণদের যথাবিধি পদপ্রক্ষালন প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে পূজা করে 'মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হোন' এই বলে

স্বকীয় দ্রব্য দান করবে। তাহলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণাচতুর্দশী, কৃষ্ণাষ্টমী ও অমাবস্যায় ভক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশেষভাবে মহাদেবকে পূজা করবে। একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পূজাপূর্বক বিষ্ণুপ্রীতি কামনায় ব্রাহ্মণভোজন করালে পরম গতি লাভ হয়। শুক্লপক্ষীয় এই দ্বাদশী তিথির সঙ্গে বিষ্ণুর সম্বন্ধ রয়েছে। তাই এই দ্বাদশীতে দেব জনার্দনকে অতি যত্ন-পূর্বক পূজা করবে। এই তিথিতে দেবাদিদেব মহাদেবকে উদ্দেশ করে বা বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে যা কিছু দেওয়া যায়, তাতে অনন্ত ফল হয়ে থাকে। এ কথা ঋষিরা বলেছেন। যে মানুষ যে দেবতাকে আরাধনা করতে ইচ্ছা করবে সেই বিদ্বান, সেই দেবতার সন্তোষের জন্য ব্রাহ্মণদের পূজা করবেন। কারণ ব্রাহ্মণদের শরীরে সর্বদা দেবগণ বাস করেন। ব্রাহ্মণ না পেলে কখনো কখনো প্রতিমা প্রভৃতিতেও দেবতারা পূজিত হয়ে থাকেন। তাই দেবতাবিশেষের কাছে ফলবিশেষের কামনা করে প্রযত্নের সঙ্গে বিশেষ করে ব্রাহ্মণের মধ্যেই দেবতাপূজা করবে। ঐশ্বর্যকামী সর্বদা ইন্দ্রকে পূজা করবেন, ব্রহ্মতেজকামী ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ব্রহ্মাকে পূজা করবেন। আরোগ্যকামী সূর্যপূজা করবেন। ধনকামী অগ্নিপূজা করবেন। যিনি সর্বকর্মে সিদ্ধি চান তিনি গণেশকে পূজা করবেন। ভোগকামী চন্দ্রকে পূজা করবেন। বলকামী বায়ুকে পূজা করবেন। সর্বসংসার থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অতি যত্নের সঙ্গে হরিকে পূজা করবেন। যিনি যোগ, মোক্ষ বা ঈশ্বর জ্ঞান ইচ্ছা করবেন, তিনি অতি যত্নপূর্বক বিরূপাক্ষ মহাদেবকে পূজা করবেন। যিনি মহাভোগসমূহ বা জ্ঞান ইচ্ছা করেন, তিনি ভূতেশ মহাদেব বা অনন্তরূপী কেশবকে পূজা করবেন। জলদান করলে তৃপ্তিলাভ হয়। অন্নদান করলে অক্ষয় ধনলাভ হয়। ভূমিদান করলে তৃপ্তি, অক্ষয়ধন, অভিলষিত সন্তান, উত্তম চক্ষু ও আধিপত্য—এই সবই লাভ হয়। সুবর্ণ দান করলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়। গৃহ দান করলে উত্তম অট্টালিকা লাভ হয়। রৌপ্য দান করলে উত্তম রূপ লাভ হয়। বস্ত্র দান করলে চন্দ্রলোকে বাস হয়। ঘোটক দান করলে উত্তম যান লাভ হয়। বলীবর্দ দান করলে অতুল সম্পত্তি হয় ও গাভী দান করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যানদান বা শয্যাদান করলে মনোমত স্ত্রী লাভ হয়। ভীতকে অভয় দান করলে অতুল ঐশ্বর্য হয়। ধান্যদান করলে চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়। বেদপ্রদান করলে অবিনশ্বর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে বেদবিদ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ধান্য প্রদান করে সে পরলোকে স্বর্গ ভোগ করে। গোরুকে ঘাস প্রদান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়। ইন্ধন প্রদান করলে মানুষের পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফল, মূল, শাক ও বিবিধপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য যে ব্রাহ্মণদের দান করে, তার সর্বদা হর্ষ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি রোগীর আরোগ্যের জন্য ঔষধ, স্নেহদ্রব্য ও আহার্য সামগ্রী দান করে, সে রোগরহিত হয়ে সুখ ও দীর্ঘজীবন লাভ করে। যে ব্যক্তি ছত্র ও চর্মপাদুকা দান করে সে ক্ষুরধার সমন্বিত অসিপত্রবন নামে নরক এবং তার তীব্র পাপ থেকে রক্ষা পায়। ইহসংসারে যা যা ইষ্টতম এবং নিজগৃহে যা অতি মনোরম, অক্ষয় পুণ্যকামী ব্যক্তি সেই সব বস্তু গুণবান ব্রাহ্মণকে দান করবেন। অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণে এবং সংক্রান্তি প্রভৃতি কালে প্রদত্ত বস্তু অক্ষয় ফল দান করে। প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে, দেবালয়ে ও নদ-নদীতে সৎপাত্রে দান করলে তা অক্ষয় ফল দান করে। দানধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবের আর নেই। সেই

হেতু দ্বিজাতিরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের দান করবেন। স্বর্গ, আয়ু ও ঐশ্বর্যকামী বা মুমুক্ষু ব্যক্তির অথবা পাপীর পাপক্ষয়ের জন্য প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের দান করতে হয়। গোরু, ব্রাহ্মণ, অগ্নি বা অন্য দেবতাদের দান করার সময়ে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত তা নিবারণ করে, সেই পাপাত্মা জন্মান্তরে তির্যকযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জন করে তার দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চনা না করে, রাজা তার সর্বস্ব অপহরণ করে তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে যে ব্যক্তি অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ বিপ্রদের অন্নাদি দান না করে, সেই ব্যক্তি নিন্দিত ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। এই রকম ব্যক্তির কাছে প্রতিগ্রহ করবে না এবং এদের দানও করবে না। রাজা এই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মসাধন নিজস্ব দ্রব্য অসাধু ব্যক্তিকে দান করে, সেই ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির চেয়েও অধিক পাপী এবং সে পরলোকে নরকে যায়। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, যে সব ব্রাহ্মণ বেদাধ্যায়ী, বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও সংযমপরায়ণ, তাদেরই দান করতে হয়। বিদ্বান, ধার্মিক, ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে ভোজন করলেও তাকেই ভোজন করাবে। অধার্মিক মূর্খ দশরাত্রি উপবাসী থাকলেও কখনই তাকে ভোজন করাবে না। যে ব্যক্তি সন্নিহিত শ্রোত্রিয়কে অতিক্রম করে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই পাপী সেই পাপে বংশের সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত দগ্ধ করে। দূরে স্থিত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যা, শীল প্রভৃতির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে সন্নিহিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করেও তাকেই যত্নপূর্বক দান করবে। যে অর্চিত বস্তু দান করে বা যে অর্চিত বস্তু গ্রহণ করে তারা উভয়েই স্বর্গে যায়। এর বিপরীত আচরণ করলে উভয়েই নরকে যায়। স্বর্ণ, পিঠা, গোরু, অশ্ব, ভূমি ও তিল—এই সব বস্তু অবিদ্বান ব্যক্তি গ্রহণ করলে সে কাঠের মতো ভস্মীভূত হয়। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছ থেকেই গ্রহণের ইচ্ছা করবেন। তার অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ করা চলে। কিন্তু শূদ্রের কাছ থেকে কোন ভাবেই গ্রহণ করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ বৃত্তিসংকোচ চাইতে পারেন, কিন্তু সম্পদের আধিক্য চাইবেন না। কারণ ধনলোভী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য থাকে না। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে ও সমস্ত যজ্ঞ করেও তিনি ধনসংকোচকারীর মতো গতি পেতে পারেন না। প্রতিগ্রহে অতিশয় আসক্ত হবে না। কেবল জীবিকানির্বাহের উপযোগী ধন আহরণ করবে। জীবন যাত্রা নির্বাহের উপযোগী ধনের চেয়ে বেশী গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। যে সর্বদা যাচঞা করে সে স্বর্গের উপযুক্ত পাত্র তো নয়ই, উপরন্তু সে গৃহস্থদের নিত্য উদ্বেগ সৃষ্টিকারী চোরের তুল্য। গুরু ও ভৃত্য প্রভৃতির ভরণ পোষণ এবং দেবতা ও অতিথির অর্চনার জন্য সব বর্ণের কাছ থেকেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই গৃহীত বস্তুর দ্বারা নিজের তৃপ্তি সাধন করা উচিত নয়। দেবতা ও অতিথির পূজাকারী, সংযতাত্মা গৃহস্থ এই ভাবে চললে পরম পদ প্রাপ্ত হন। অথবা পুত্রকে সমস্ত বিত্ত সমর্পণ করে তত্ত্ববিদ ব্যক্তি অরণ্যে গিয়ে উদাসীন ও সমাহিত ভাবে একাকী বিচরণ করবেন।

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের এই সব গৃহস্থধর্ম বললাম। এই সব জেনে এই মতো চলবেন। আর ব্রাহ্মণদের দিয়ে এই রকম অনুষ্ঠান করাবেন। যে ব্যক্তি অনাদি দেব অদ্বিতীয় মহেশ্বরকে গৃহধর্মানুসারে নিরন্তর অর্চনা করে, যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতযোনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে দানধর্মাদিকথন নামে ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করে অগ্নি ও ভার্যাকে সঙ্গে নিয়ে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে। অথবা শরীর জরাগ্রস্ত হলে পুত্রের কাছে ভার্যাকে রেখে বনে গমন করবে। উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষীয় প্রশস্ত দিনের পূর্বাহ্নে বনে গমন করে নিয়মবান ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে তপস্যা করবে। প্রতিদিন আহারের জন্য পবিত্র ফল-মূল আহরণ করবে এবং সংযতাহারী হবে ও ফল-মূল দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চনা করবে। স্নান করে প্রত্যহ দেবতাদের পূজা করবে ও অতিথিদের পূজা করবে। তারপর গৃহে গমন করে সমাহিত চিত্তে আটটি মাত্র গ্রাস ভক্ষণ করবে। সর্বদা জটা ধারণ করবে, নখ ও রোম ছেদন করবে না। সর্বদা বেদ অধ্যয়ন করবে এবং অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। মুনিদের ভক্ষণযোগ্য নানা প্রকার বন্য বস্তু, শাক, মূল বা ফল দ্বারা অগ্নিহোত্র ও পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করবে। সর্বদা বল্কল পরিধান করবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করবে, সর্বপ্রাণীতে দয়াবান হবে। কারো কাছে প্রতিগ্রহ করবে না। নিয়মিত দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করবে। নক্ষত্র যাগ, নবশস্যেষ্টি ও চাতুর্মাস্য যাগও করবে, বসন্ত ও শরৎকালে উৎপন্ন নীবার প্রভৃতি নিজে আহরণ করে বিধান অনুসারে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যাগ সম্পাদন করবে। এই সব নীবার প্রভৃতির দ্বারা পুরোগশ চরু পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্তুত করবে এবং তা পিতৃগণ ও দেবতাদের নিবেদন করে নিজে ভোজন করবে, কারণ ঐটিই পবিত্র বন্য হবি। নিজে লবণ প্রস্তুত করে ভোজন করবে। মধু, মাংস, ভূমিতে জাত ছত্রাক, ভূস্তৃণ ও চালতা ফল খাবে না। ফালের দ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করা হয়েছে, তাতে জাত শস্য প্রভৃতি এবং কারো উৎসৃষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করবে না। ক্ষুধায় কাতর হলেও গ্রামজাত পুষ্প বা ফল ভক্ষণ করবে না এবং শ্রাবণ বিধি অনুসারে সর্বদা অগ্নির পরিচর্যা করবে। প্রাণীহিংসা করবে না, কখনো কলহ করবে না এবং ভয়শূন্য হয়ে থাকবে। রাত্রে কিছুই ভোজন করবে না, রাত্রে কেবল ধ্যানে রত হয়ে থাকবে। সর্বদা জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হবে। তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ব্রহ্মচারীর ধর্ম পালন করবে এবং পত্নীর সঙ্গে সহবাস করবে না। যে ব্যক্তি বনে গমন করে কামাতুর হয়ে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়, তার সেই ব্রত নষ্ট হয় ও সেই ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বানপ্রস্থাশ্রমে উৎপাদিত সন্তানের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। সেই সন্তানের ও তার বংশের কারোরই বেদপাঠে অধিকার থাকবে না। সর্বদা ভূমিতে শয়ন করবে, সাবিত্রী জপ করবে, সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে ও সর্বদা সংবিভাগরত হবে। পরিবাদ, মিথ্যাকথন, নিদ্রা ও আলস্য পরিহার করবে। একাগ্নি ও গৃহশূন্য হয়ে থাকবে। ভূমিতে জল ছিটিয়ে তাতে আশ্রয় নেবে। মৃগের সঙ্গে বিচরণ করবে, মৃগের সঙ্গে নিদ্রা যাবে, শিলা বা কাঁকরে সমাহিত চিত্তে শয়ন করবে। একদিন মাত্র নির্বাহের উপযোগী ফল প্রভৃতি বা এক মাসের ব্যয়ের উপযুক্ত ফল প্রভৃতি কিংবা ছয় মাস বা এক বছরের উপযুক্ত নীবারাদি অন্ন সঞ্চয় করবে। পূর্বে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত নীবার প্রভৃতি অন্ন, জীর্ণ বস্ত্র ও শাক, ফল, মূল প্রভৃতি সবই আশ্বিন মাসে ফেলে দেবে। দন্তকেই উদূখল-মুষল রূপে ব্যবহার করে আহার করবে, কপোতবৃত্তি অবলম্বন করবে কিংবা পাষাণ দ্বারা চূর্ণ করে ভক্ষণ করবে। যথা সময়ে পরিপক্ক বস্তু ভক্ষণ করবে। শক্তি অনুসারে দিনের বেলা অন্ন আহরণ করে সায়াহ্নে ভক্ষণ করবে। অথবা একদিন উপবাস করে দ্বিতীয় দিন রাত্রে

ভোজন করবে। অথবা তিন দিন উপবাস করে চতুর্থ দিন রাত্রে ভোজন করবে। শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে অথবা পূর্ণিমা-আমাবস্যা দিন সিদ্ধ -যবাগু আহার করবে। অথবা নিজে থেকে পতিত স্বাভাবিক ফল, মূল পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে। বানপ্রস্থে এই ভাবেই থাকতে হয়। কেবল ভূমিতে শয়ন করে থাকবে, অথবা পাদাগ্রে দণ্ডায়মান হয়ে দিনযাপন করবে, কিছুক্ষণ উত্থিত হয়ে ও কিছুক্ষণ উপবিষ্ট হয়ে থাকবে এবং কোন সময়েই ধৈর্য ত্যাগ করবে না। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হবে, বর্ষাকালে বৃষ্টিধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, হেমন্তকালে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তপস্যা বাড়িয়ে চলবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করবে, পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করবে, একপদে দণ্ডায়মান থাকবে এবং সর্বদা কিরণমাত্র ভক্ষণ করবে। অথবা পঞ্চাগ্নি হয়ে উষ্ণ ধূম পান করবে, উষ্ণ পানীয় গ্রহণ করবে, সোমপান করবে, শুক্ল পক্ষে দুগ্ধ পান করবে ও কৃষ্ণপক্ষে গোময় ভক্ষণ করবে। গলিত পত্রসমূহ ভোজন করবে অথবা সর্বদা প্রাজাপত্য প্রভৃতি ব্রত করবে, যোগাভ্যাস করবে, রুদ্রাধ্যায় পাঠ করবে, অথর্ববেদের শিরোভাগ অধ্যয়ন করবে এবং বেদান্ত অভ্যাস করবে। সর্বদা সংযমী হবে, অতন্দ্র হয়ে নিয়মসমূহ পালন করবে। উত্তরীয়, কৃষ্ণমৃগচর্ম ও শুক্ল-যজ্ঞোপবীত ধারণ করবে। আত্মাতে অগ্নি আরোপ করে ধ্যান তৎপর হবে ও মৌনব্রত অবলম্বন করে অগ্নিশূন্য ও অনিশ্চিত গৃহ হয়ে মোক্ষের জন্য যত্নপর হবে। ফল-মূলের অভাবে তপস্বী-ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা আহরণ করবে। যদি সেখানে ঐ রকম ব্রাহ্মণ না থাকেন, তাহলে অন্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতির কাছ থেকেও ভিক্ষা গ্রহণ করা যায়। এই রকম ভিক্ষা না পাওয়া গেলে গ্রাম থেকে পাতার ঠোঙায়, মাটির মালসায় বা হাতে করেই ভিক্ষা আহরণ করবে এবং বনে বাস করে আটটি মাত্র গ্রাস ভোজন করবে। আত্ম সংশোধনের জন্য নানা উপনিষদ পাঠ করবে এবং বিশেষ বিদ্যা, সাবিত্রী ও রুদ্রাধ্যায় পাঠ করবে। তারপর ব্রহ্মময় হয়ে অনশনব্রত কিংবা অগ্নিপ্রবেশ রূপ মৃত্যুর উপায় অবলম্বন করবে।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে বাণপ্রস্থাশ্রমধর্ম নামে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, এইভাবে বাণপ্রস্থাশ্রমে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করে আয়ুর চতুর্থভাগে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করবে। শান্ত, যোগাভ্যাসরত, ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ আত্মাতে অগ্নি সংস্থাপন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। যখন সমস্ত বস্তুতেই বিতৃষ্ণা জন্মাবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করবে। এর বিপরীত আচরণ করলে পতিত হতে হয়। ইন্দ্রিয়দমনশীল ও পরিপক্ব হয়ে প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যাগ করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবেন। সন্ন্যাসী তিন প্রকার—জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী ও কর্মসন্ন্যাসী। যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত, ভয়বর্জিত, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব থেকে বিনির্মুক্ত এবং আত্মচিন্তাপরায়ণ, তিনি জ্ঞানসন্ন্যাসী বলে কথিত হন। যিনি শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব থেকে মুক্ত ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে নিত্য বেদাভ্যাস করেন, বিজিতেন্দ্রিয় সেই মুক্তিকামীকেই বেদসন্ন্যাসী বলা হয়। যে

ব্রাহ্মণ অগ্নিসমূহ আত্মসাৎ করে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং সমস্তই পরব্রহ্মে সমর্পণ করেন, তিনি কর্মসন্ন্যাসী বলে কথিত। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি যোগী তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী যোগীর কোন কার্য বা কোন চিহ্ন প্রভৃতি কিছুই নেই। তিনি জীর্ণ বস্ত্র বা জীর্ণ কৌপীনধারী হয়ে, কিংবা উলঙ্গ অবস্থায় মমতাশূন্য, নির্ভয়, শান্ত, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত ও পরিগ্রহ বিবর্জিত হয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। সন্ন্যাসী পরিমিত গ্রাস ভোজন করবেন ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গ্রাম থেকে অন্ন আহরণ করবেন, সর্বদা ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হয়ে উপবিষ্ট থাকবেন, কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করবেন না, সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হবেন। এবং আত্মাকে সহায় করে মোক্ষার্থী হয়ে ইহলোকে বিচরণ করবেন। মৃত্যু হোক বা পরমায়ু বৃদ্ধি হোক—এই ধরনের কামনা তিনি করবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশেরই অপেক্ষা করে, সেই রকম ভাবে কর্মাধীন জীবনকাল বা মরণকালের প্রতীক্ষা করবেন। কখনো বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করবেন না, বেদ প্রভৃতি শ্রবণ করবেন না ও বেদ প্রভৃতির উপদেশ দেবেন না। এই রকম জ্ঞানতৎপর যোগীই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। বিদ্বান সন্ন্যাসী একবস্ত্র পরিধান করবেন অথবা কৌপীন ধারণ করবেন, মস্তক মুণ্ডন করবেন অথবা কেবলমাত্র শিখা ধারণ করবেন। পরিগ্রহ শূন্য হয়ে কায়মনোবাক্যে সংযমী হবেন। কাষায় বস্ত্র পরিধান করে গ্রামের প্রান্তভাগে বৃক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে ধ্যান বা যোগ তৎপর হয়ে বাস করবেন। শত্রু, মিত্র, মান, অপমান সমস্ত বিষয়েই সমান জ্ঞান করবেন। প্রত্যহ ভৈক্ষ্য বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু প্রতিদিন একই ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা-গ্রহণ করতে নেই। যে যতি মোহবশত বা অন্য কারণে প্রতিদিন একজনের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করে ভোজন করে, কোন ধর্মশাস্ত্রে তার পাপমুক্তির উপায় বলা হয় নি। যতিকে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি পাষাণ, লোষ্ট্র, কাঞ্চন সবই সমান দেখবেন এবং প্রাণীহিংসা থেকে নিবৃত্ত হবেন, সর্ব বস্তুতে স্পৃহা ত্যাগ করবেন ও মৌন অবলম্বন করবেন, পথ দেখে দেখে পা ফেলবেন এবং কাপড় দিয়ে ছেঁকে জল পান করবেন। তিনি যদি কথা কন, তাহলে সত্য কথা কইবেন এবং মনকে পবিত্র রাখবেন। বর্ষা ছাড়া অন্য কালে ভিক্ষুক এক জায়গায় বাস করবেন না, কমণ্ডলু মাত্র ধারণ করে ও শুচি হয়ে সর্বদা স্নান ও শৌচক্রিয়ায় রত হবেন। আর সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন ও বনবাস করবেন। মোক্ষশাস্ত্রে নিরত, ব্রহ্মচর্যাবলম্বী, জিতেন্দ্রিয়, দম্ভ-অহঙ্কার-নিন্দা ও নিষ্ঠুরতা-রহিত এবং আত্মজ্ঞান রূপ গুণযুক্ত যতির মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। স্নান করে বিধান অনুসারে আচমনপূর্বক শুচি হয়ে তিনি দেবালয় প্রভৃতিতে সর্বদা দেবরূপী সনাতন প্রণব জপ করবেন। তিনি ধৌত কাষায় বস্ত্র পরিধান ও ভস্ম দ্বারা লোম আবৃত করে যজ্ঞোপবীতধারী এবং কুশপাণি ও শান্তাত্মা হয়ে থাকবেন এবং যজ্ঞবিষয়ক যে সমস্ত বেদমন্ত্র আছে, দেবতাবিষয়ক যে সমস্ত বেদমন্ত্র আছে, পরমাত্মবিষয়ক যে সমস্ত বেদ আছে এবং উপনিষদ প্রভৃতিতে যে শ্রুতি ধৃত রয়েছে, সেই সবই একাগ্রচিত্তে সর্বদা পাঠ করবেন। ব্রহ্মচারী ও মৌন ব্রতাবলম্বী যে যতি পর্ণকুটিরে বাস করে প্রতিদিন বেদমন্ত্র জপ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, ক্ষমা, দয়া ও সন্তোষ—এই সমস্ত ব্রত বিশেষভাবে পালন করা যতির কর্তব্য। যতি বেদান্ত জ্ঞান-নিষ্ঠ হবেন অথবা প্রতিদিন স্নান করে সমাহিত চিত্তে ভিক্ষান্ন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন, হোমের সময়ে সমাহিত চিত্তে হোমমন্ত্র পাঠ করবেন। প্রতিদিন বেদমন্ত্র জপরূপ

বেদাধ্যয়ন করতে হয়। উভয় সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করতে হয়। সর্বদা নির্জনে পরমেশ্বরকে ধ্যান করতে হয়, সর্বতোভাবে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতে হয়। একবস্ত্র পরিধান অথবা দুই বস্ত্র পরিধান, কমণ্ডলু ধারণ এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করতে হয়। এই সব করলেই বিদ্বান যতি সেই পরমব্রহ্ম লাভ করতে পারেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে যতিধর্মনামে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, এইভাবে নিজ আশ্রমধর্মে চিত্ত অর্পণ করে সংযতাত্মা যতিরা ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা অথবা ফল-মূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। এক সময়েই ভিক্ষা করবে। অধিক ভিক্ষা করবে না। কারণ ভিক্ষাতে অত্যন্ত আসক্ত হলে বিষয়াসক্তি জন্মায়, সাতটি বাড়ি থেকে ভিক্ষা আহরণ করবে, সাতটি বাড়ি থেকে যদি ভিক্ষার বস্তু পাওয়া না যায়, তাহলে আবার ভিক্ষা আহরণ করবে। পাত্র ধুয়ে নিয়ে সেই পাত্রে ভোজন করবে এবং ভোজনের পর আবার তা ধুয়ে নেবে। অথবা প্রতিদিন নূতন পাত্র সংগ্রহ করে তাতে ভোজন করবে। কিন্তু পাত্র ধুয়ে নিতে হলে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য লোভ না করে একটি মাত্র পাত্রই পরিষ্কার করে নেবে। গৃহস্থের গৃহে পাক করার ধূম অপগত হলে, উদূখল মুষলের কাজ শেষ হয়ে গেলে, রন্ধনের অগ্নি নির্বাপিত হলে, গৃহস্থ পর্যন্ত সমস্ত লোকের আহার শেষ হলে এবং আহারের উচ্ছিষ্ট পাত্র প্রভৃতি ফেলা হয়ে গেলে যতি ভিক্ষাচরণ করবে। 'ভিক্ষা দিন' এই কথা বলে ভিক্ষুক গো-দোহন করতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ অধোমুখে মৌন অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি শুচি ও সংযত-বাক হয়ে একবার ভোজন করবেন। হস্তপদ প্রক্ষালন করে বিধিমত আচমন করে সূর্যকে অন্নপ্রদর্শন পূর্বক পূর্বমুখ হয়ে ধীরে ধীরে ভোজন করতে হয়। প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে, পাঁচটি প্রাণাহুতি দিয়ে সমাহিত হয়ে আটটি গ্রাস ভোজন করবে। তারপর আচমন করে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের চিন্তা করতে হয়। যতিদের পাত্র রূপে চার রকম পাত্র প্রজাপতি মনু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেগুলি হল লাউয়ের পাত্র, কাঠের পাত্র, মাটির পাত্র ও বাঁশের পাত্র। রাত্রির প্রথমে, মধ্যরাত্রে, রাত্রির শেষভাগে এবং বিশেষ করে সন্ধ্যার সময়ে ঈশ্বরকে অগ্নিবিশেষে চিন্তা করবে। প্রথমে হৃৎপদ্ম-নিলয়ে বিশ্বরূপ অথচ বিশ্বের কারণ, সর্বভূতের আত্মা, তমোগুণাবস্থিত অথচ তমোতীত, সকলের আধারস্বরূপ, অব্যক্ত আনন্দময়, অবিনাশী, প্রকৃতিপুরুষের অতীত, আকাশ-স্বরূপ, মঙ্গলময় জ্যোতির ধ্যান করবে। তারপর তার মধ্যে সর্বলোকেশ্বর, ব্রহ্মরূপী, আদি-মধ্য-অন্তহীন, সত্ত্ব-গুণাবস্থিত, অবিনাশী, সত্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী, পরব্রহ্ম, মহাপুরুষ, বিশ্বরূপী, নীললোহিত পরমেশ্বরের ধ্যান করবে। ওঙ্কার দ্বারা আকাশ রূপ পরমাত্মাতে আত্মাকে সংস্থাপন করে, আকাশ মধ্যস্থিত দেব ঈশানকে ধ্যান করবে। সর্ব ভাবের কারণ, আনন্দাশ্রয় শুদ্ধ সেই পুরাণপুরুষকে ধ্যান করলে সংসার বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি হয়। অথবা জগৎ সম্মোহনের আলয় যে মূল প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিরূপ গুহার মধ্যে সর্বভূতের একমাত্র কারণ, সর্বভূতের জীবন, সর্বভূতের লয়স্থান, ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ এবং মুমুক্ষুদের দ্বারা সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট পরম ব্যোমাকারের চিন্তা করে তার মধ্যে নিহিত,

কেবল জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, পরমার্থ, সত্য এবং সর্বেশ্বর যে পরব্রহ্ম তাঁকে চিন্তা করে সংযত হয়ে উপবিষ্ট থাকবে। আমি যতিদের অতি গুহ্যতম জ্ঞানের বিষয়ে বললাম। যে ব্যক্তি সর্বদা এর অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঐশ্বর যোগ প্রাপ্ত হন। তাই ধ্যানমগ্ন ও সর্বদা আত্মবিদ্যাপরায়ণ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করবে। সেই ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত পদার্থ থেকে নিজ আত্মাকে পৃথক বিবেচনা করে অদ্বিতীয়, অজর, আনন্দস্বরূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ধ্যান করবে। যাঁর থেকে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাঁকে পেলে জীব আর এই সংসারে ফিরে আসে না, সকলকে পেরিয়ে যাঁর অবস্থিতি তিনিই সেই দেব ঈশ্বর। মঙ্গলময়, অব্যয়, শাশ্বত, গগন যাঁর অংশ, এবং তাঁর পরস্থিত যিনি, তিনিই মহেশ্বর।

এখন ভিক্ষুদের যতগুলি ব্রত আছে বা যতগুলি উপব্রত আছে, তার মধ্যে কোনটি না করলে তার কী প্রায়শ্চিত্ত সে কথা বলি। কামবশত স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হলে সমাহিত চিত্তে শুচি হয়ে প্রাণায়াম সমাযুক্ত সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তারপর নিয়মমত সংযতমনে কৃচ্ছ্রব্রত করতে হয়। পরে সেই সন্ন্যাসী আবার আশ্রমে প্রবেশ করে সাবধানে বিচরণ করবেন। মনীষীরা সব পরিহাসযুক্ত মিথ্যাকথনকে যদিও দোষ বলেন নি, তবু ভিক্ষুর তা করা উচিত নয়। কারণ এই মিথ্যা কথা বলা অতি ভয়ানক পাপ। ধর্মলিপ্সু যতি মিথ্যা কথা বললে একরাত্রি উপবাস ও একশত প্রাণায়াম করবেন, অত্যন্ত বিপদে পড়লেও ভিক্ষু অন্যের বস্তু অপহরণ করবেন না। চুরির চেয়ে বড় অধর্ম আর শাস্ত্রে কিছু নেই। এই চৌর্যকেই উৎকট হিংসা বলে, কারণ যাকে ধন বলা হয়, তাই মানুষের বহিশ্চর প্রাণের তুল্য। যে ব্যক্তি যার ধন অপহরণ করে, সে তার প্রাণই অপহরণ করে। এই চৌর্যরূপ হিংসা যে কেবল ধনীরই প্রাণ নাশ করে তা নয়, তার দ্বারা চোরের নিজ জ্ঞানেরও বিনাশ হয়ে থাকে। এই ভাবে যে দুরাচার কারো ধন অপহরণ করে, সে বিহিত আচার ও ব্রত থেকে ভ্রষ্ট হবে। কিন্তু সেই কার্যের ফলে যদি নির্বেদ উপস্থিত হয়, তাহলে ভিক্ষু শাস্ত্রবিহিত বিধান অনুসারে সংবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করবেন। ভিক্ষু যদি না জেনে বা দৈববশে হিংসা করেন তাহলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ণ করবেন। যদি যতির ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যের ফলে স্ত্রীলোক দেখে রেতঃস্খলন হয়, তাহলে ষোলটি প্রাণায়াম করবেন। দিনের বেলা রেতঃস্খলন হলে তিন রাত্রি উপবাস ও শত প্রাণায়াম করতে হবে। প্রতিদিন একজনের কাছে ভিক্ষা করে ভোজন করলে বা মধু, মাংস ভক্ষণ করলে কিংবা নবশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করলে, অথবা প্রত্যক্ষত লবণ ভক্ষণ করলে শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত করবেন। সর্বদা ধ্যানে নিষ্ঠা যতিদের সমস্ত পাপ নষ্ট করে। তাই মহেশ্বরকে জেনে তাঁর ধ্যানে রত থাকবে। জ্যোতির্ময়, অক্ষর, অব্যয় পরমব্রহ্মে যিনি অবস্থিত তাঁকেই মহেশ্বর বলে জানবে। এই যে দেব মহাদেব—ইনি কেবল, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণপ্রদ, জ্যোতির্ময়, অক্ষর, দ্বিতীয় রহিত পরমব্রহ্ম। ফলত সেই মহেশ্বর ও পরমব্রহ্ম অভিন্ন। মহাদেব শব্দের যোগার্থও এই যে জ্ঞান সংস্থিত নিজ ধামে আত্মযোগ নামক তত্ত্বে পূজিত হন বলে তাঁর নাম হয়েছে মহাদেব। যিনি অন্য দেবতাকে মহাদেব থেকে পৃথকভাবে দেখেন না এবং সেই মহাদেবকেই যিনি আত্মা বলে বিবেচনা করেন, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর থেকে নিজ আত্মাকে পৃথক বলে বিবেচনা করে, যে ব্যক্তি সেই পরম দেবকে দেখতে না পায়, সেই রকম লোকের পরিশ্রম সবই বৃথা। সেই অব্যয় তত্ত্বস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, আর সেই ব্রহ্মই মহাদেব,

এই রকম জানতে পারলে ভবসংসারে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তাই যতি সর্বদা সংযত চিত্তে জ্ঞান যোগরত, শান্ত ও মহাদেবপরায়ণ হয়ে সাধন করবেন।

হে ব্রাহ্মণগণ, যতিদের এই শুভ আশ্রম ধর্মের কথা তোমাদের কাছে বললাম। পূর্বকালে ভগবান পিতামহ পরমেশ্বর ব্রহ্মা মুনিদের কাছে এ কথা বলেছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা কথিত যতিধর্মের আশ্রয়রূপ এই শুভ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুত্র, শিষ্য আর যোগী ছাড়া আর কাউকে উপদেশ দেবে না। যতিদের এই নিয়মবিধানের কথা বলা হল। এই সব নিয়মের অনুষ্ঠান করলে তার প্রতি পশুপতি মহাদেব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হন। যে সব যতি নিবিষ্ট মনে প্রতিদিন এই নিয়মের অনুষ্ঠান করেন, তাদের আর জন্ম বা বিনাশ হয় না।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে যতিধর্ম নামে
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, ব্রাহ্মণদের হিতের জন্য পাপ নাশের উপযোগী শুভজনক প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলছি। শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করা ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম করা—এই দুই কারণে মানুষ পাপগ্রস্ত হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলে ঐ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত না করে ক্ষণকালও থাকবে না। শান্ত ও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ যা বলবেন, তাই করা উচিত। শ্রেষ্ঠ বেদার্থবিদ, শান্ত, ধর্মকর্মানুরক্ত সাগ্নিক এক ব্রাহ্মণও যে কর্ম করার ব্যবস্থা দেন, সেই কর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অগ্নিহীন অথচ বেদপারঙ্গম হলে তিনজন ব্রাহ্মণ ধর্মার্থী হয়ে, যে কর্মকে ধর্ম কর্ম বলে নির্দেশ করবেন, সেই কর্মই ধর্মের সাধন বলে জানবে। অনেক ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, তর্কসিদ্ধান্তপারংগম, বেদাধ্যয়নশীল, সাতজন ব্রাহ্মণের বাক্য ধর্মকার্যে গ্রাহ্য করে থাকে। মীমাংসান্যায়তত্ত্বজ্ঞ ও বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ একুশজন ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশ করবেন। ব্রহ্মহত্যাকারী, নিষিদ্ধ মদ্যপানকারী, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরণকারী ও গুরুপত্নীগামী—এরা সকলেই মহাপাতকী। এদের সঙ্গে যারা একবছর পর্যন্ত সংসর্গ করে তারাও মহাপাতকী। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে টানা একবছর সময় পতিতের সঙ্গে এক যানে আরোহণ, এক শয্যায় শয়ন আর এক আসনে উপবেশন করে, সেও পতিত হয়। জ্ঞানপূর্বক পতিতকন্যাকে বিবাহ বা পতিত ব্যক্তির যাজনকর্ম করলে অথবা পতিত ব্যক্তিকে অধ্যাপনা করলে, কিংবা পতিত ব্যক্তির সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করলে দ্বিজগণ সর্বদাই পতিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পতিত ব্যক্তির সঙ্গে একত্র অধ্যয়ন করে, সে সংবৎসরে পতিত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী আত্মশুদ্ধির জন্য কুটির নির্মাণ করে বারো বছর বনে বাস করবে এবং নিহত ব্রাহ্মণের মস্তক বা অন্য মৃত ব্যক্তির কপাল চিহ্নস্বরূপ হাতে নিয়ে ভিক্ষা করবে। কিন্তু দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণগৃহ পরিত্যাগ করবে। সেই হত ব্রাহ্মণকে স্মরণ করতে করতে ও নিজে আত্মগ্লানি করতে করতে পূর্বে সংকল্পিত নয় এ রকম সাতটি গৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে। গৃহস্থের গৃহে রন্ধনের ধূম অপগত হলে, পাকের অগ্নি নির্বাপিত হলে, ভুক্তোচ্ছিষ্ট প্রভৃতি পরিত্যক্ত হলে লোকের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে এক সময়ে ভিক্ষা আহরণ করবে। অথবা ধৈর্য অবলম্বন করে বনজাত ফল-মূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

করবে। নিহত ব্রাহ্মণের কপাল হাতে নিয়ে খট্বাঙ্গ ধারণ করে ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এই ভাবে বারো বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হবে। অজ্ঞানতাবশত ব্রহ্মহত্যা করে থাকলে এই প্রায়শ্চিত্ত শুভজনক জানবে। কিন্তু জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যাকারী নিজে অনশন ব্রত করবে অথবা পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থান থেকে পতিত হবে, কিংবা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে বা জলের মধ্যে প্রবেশ করবে। ব্রহ্মহত্যাকারী যদি ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য ব্রাহ্মণ বা গোরুর কারণে প্রাণত্যাগ করে, অথবা যদি অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে রোগ থেকে মুক্ত করে, এবং এই সব কিছুর সঙ্গে যদি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করে, তাহলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হয়। ব্রহ্মঘাতক ত্রিরাত্রি উপবাস করে যদি অরুণা ও সরস্বতী নদীর লোকবিশ্রুত সঙ্গমস্থলে ত্রৈকালিক স্নান করে, তাহলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হয়। ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি যুক্ত হয়ে পবিত্র রামেশ্বর তীর্থে গমন করে মহাসমুদ্রে স্নান করে মহেশ্বরকে দর্শন করলেও শুদ্ধ হওয়া যায়। ব্রহ্মহত্যাকারী মানুষ দেবাদিদেব মহাদেবের কপালমোচন তীর্থে গমন করে স্নানপূর্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চনা করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে স্থানে অপরিমিত প্রভাবশালী দেবাদিদেব ভৈরব কর্তৃক পূর্বে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কপাল স্থাপিত হয়েছে, সেই স্থানে স্নানপূর্বক ভৈরবরূপী মহাদেবকে পূজা করে পিতৃলোকের তর্পণ করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত
কথনবিষয়ে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, পূর্বকালে অমিতপ্রভাবশালী দেব শঙ্কর কি কারণে ব্রহ্মার দেহজ কপাল পৃথিবীতে সংস্থাপন করেছিলেন? ব্যাস বললেন, হে ঋষিগণ, আপনারা সেই পাপবিনাশিনী পুণ্যকথা ও দেবাদিদেব মহামতি মহাদেবের মাহাত্ম্যের কথা শুনুন। পূর্বে মহর্ষিরা সুমেরু শৃঙ্গের উপর লোকাদিদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে 'অব্যয় তত্ত্ব কি' এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা মহাদেবের মায়ায় মোহিত হয়ে পরম ভাব না জেনে ঋষিদের কাছে নিজের আত্মাকেই সেই অব্যয় তত্ত্ব বলে এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন—'আমিই বিধাতা, আমিই জগৎকারণ, আমি স্বয়ম্ভূ, অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আমার আদি নেই। আমিই পরব্রহ্ম, আমাকে অর্চনা করলেই মানুষ সংসার থেকে মুক্তি পায়। আমি সমস্ত দেবতাদের প্রবর্তক ও নিবর্তক। এ সংসারে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।' ব্রহ্মা এই রকম মনে করলে নারায়ণের অংশ থেকে জাত যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে হাস্য করে বললেন, 'ব্রহ্মণ, এখন তোমার এই রকম বলবার কারণ কী? তোমাকে অজ্ঞান ব্যাধিতে ধরেছে। এ সব কথা বলা তোমার মোটেই উচিত হয় নি। আমি যজ্ঞ, আমি সর্বলোকের বিধাতা, আমি প্রভু নারায়ণ। আমাকে ছাড়া এই জগৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। আমিই পরম জ্যোতি, শ্রেষ্ঠ গতি। আমার আদেশেই তুমি এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করেছ।' ব্রহ্মা আর বিষ্ণু মোহবশত পরস্পরকে পরাজিত করবার জন্য এই রকম বলতে থাকলে তাঁদের কাছে চার বেদ এসে উপস্থিত হলেন। দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা ও যজ্ঞাত্মা

বিষ্ণুকে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পরমেষ্ঠী মহেশ্বরের যথাযথ তত্ত্ব বলতে শুরু করলেন। ঋগ্বেদ বললেন, প্রাণীরা যাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং যাঁর থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, মুনিগণ যাঁকে সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলে থাকেন, তিনিই দেবাদিদেব মহাদেব। যজুর্বেদ বললেন, যিনি সমস্ত যজ্ঞ ও যোগ দ্বারা সমর্চিত, যে দেবকে মুনিরা ঈশ্বর বলে থাকেন, সেই দেবই মহেশ্বর। সামবেদ বললেন, যিনি বিশ্বের গতির কারণ, যোগীরা আকাশমধ্যস্থ যে মঙ্গলময় তত্ত্বকে সর্বদা চিন্তা করে থাকেন, তিনিই মহাদেব। অথর্ববেদ বললেন, যে রুদ্ররূপী পরমপুরুষ মহেশকে যতিগণ যত্নপূর্বক দর্শন করে থাকেন, তিনিই ভগবান মহাদেব। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা চতুর্বেদের এই শুভজনক বাক্য শুনে মোহের বশে হাসতে হাসতে বললেন, ভূতপ্রেতপরিবৃত হয়ে পত্নীর সঙ্গে যে শিব ক্রীড়া করে থাকে, সে কি করে সর্বসঙ্গবর্জিত আর পরমব্রহ্ম পদবাচ্য হতে পারে? ব্রহ্মা এই কথা বললে প্রণবাত্মা সনাতন ভগবান স্বভাবত অমূর্ত হলেও সেই সময়ে মূর্তিমান হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, ভগবান রুদ্র নিজ আত্মা ছাড়া অন্য কোন পত্নীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন না। ইনিই মহেশ্বর। এই সেই ভগবান স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন মহেশ্বর। অনাদি শিবাদেবী এঁর আত্মানন্দরূপা বলে কথিত। কিন্তু ইনি বহিরাগতা শক্তি নন। প্রণব এই কথা বললেও কিন্তু ঈশ্বরেরই মায়ায় মোহিত থাকায় ব্রহ্মা আর যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর অজ্ঞান নাশ হল না। এই অবসরে বিশ্বস্রষ্টা বিরিঞ্চি এক অদ্ভুত দিব্য মহা-জ্যোতি দর্শন করলেন। ঐ মহাজ্যোতি দ্বারা সমগ্র আকাশ পূর্ণ হয়ে গেল। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তারপর তার মধ্যে আর একটি দিব্যজ্যোতি প্রাদুর্ভূত হল। এই জ্যোতি তেজোময় চক্রের মতো। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই রকম দেখলেন। সেই অনিন্দিত ভয়ানক তেজোমণ্ডল দেখে ব্রহ্মার ঊর্ধ্বদিকের পঞ্চম মস্তক অতি কোপে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই সেই তেজোমণ্ডল ত্রিশূলধারী, পিঙ্গলবর্ণ, নাগরূপ যজ্ঞোপবীতধারী নীললোহিত মহাপুরুষে পরিণত হল। তখন ভগবান ব্রহ্মা সেই নীল-লোহিত শঙ্করকে বললেন, হে মহেশ্বর, আমি ভগবান। আমি জানি যে আমার ললাট থেকে তুমি পূর্বে এই শঙ্কররূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছ। তাই তুমি আমার শরণ নাও। মহেশ্বর পদ্মসম্ভবের এই সদম্ভ কথা শুনে লোকদাহক কালভৈরবকে প্রেরণ করলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকটি ছেদন করলেন। দেবদেব শম্ভু তাঁর মস্তক ছেদন করলে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বকর্তা মহেশ যোগবলে তাঁকে জীবিত করে দিলেন। ভুজঙ্গরাজ যাঁর বলয়, অর্ধচন্দ্র যাঁর শিরোভূষণ, যিনি কোটি সূর্যসদৃশ, যিনি জটাসমূহে সুশোভিত, ব্যাঘ্রচর্ম যাঁর বস্ত্র, যিনি দিব্য অক্ষমালা-যুক্ত ও ভস্ম যাঁর ভূষণ—এই রকম ত্রিলোচন ত্রিশূলপাণি, কণ্ঠে দর্শনীয় মহাযোগী মহাদেব মহেশ্বরকে দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা জীবিত হলে মণ্ডলমধ্যস্থ ও মহাদেবীর সঙ্গে সমাবিষ্ট দেখেছিলেন। যোগনিষ্ঠ যোগীরা যাঁকে হৃদিমধ্যে ঈশ্বররূপে দর্শন করে থাকেন, সেই অদ্বিতীয় আদিপুরুষ ব্রহ্মরূপী মহাদেবকে তিনি দর্শন করতে লাগলেন। আকাশ-সংজ্ঞিতা সেই শ্রেষ্ঠা দেবী যাঁর শক্তি, অনন্তৈশ্বর্য যোগাত্মা সেই মহেশকে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন। যাঁকে একবার মাত্র প্রণাম করলে মোহ উৎপাদক সমস্ত জগদ্‌বীজ বিনষ্ট হয়, সেই রুদ্রকে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন। আচারনিষ্ঠ না হয়েও কেবলমাত্র তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হলেই যাঁকে দর্শন করা যায়, সেই লোকাত্মা লোকনায়ক মহাদেবকে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সর্বদা যাঁর লিঙ্গ অর্চনা

করে থাকেন, সেই শিব দৃষ্ট হতে লাগলেন। ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন সেই শংকরকে, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত জগতের জননী প্রকৃতি কখনই বিদায় নেন না, যিনি বিজ্ঞানতনু ঈশ্বর। যাঁর মণ্ডলের মধ্যে এই বিদ্যাসহিত ভগবান হিরণ্যগর্ভ পুত্র রুদ্র অবস্থান করছেন, সেই পরমেশ্বরকে দেখা যেতে লাগল। যাঁর দুটি পাদপদ্মে পুষ্প, পত্র বা জল দান করলে মানুষ সংসার থেকে উদ্ধার পায়, সেই রুদ্রকে দেখা যেতে লাগল। সনাতন কাল তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁরই নিয়োগে সকলের উপর প্রভুত্ব করে থাকেন। সুতরাং তিনি কালের ও কাল। সেই প্রকার শংকর দৃষ্ট হতে লাগলেন। সমগ্র লোকের জীবন এবং স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের ভূষণ চন্দ্র যাঁর আভরণ, সেই মহাদেবকে উমার সঙ্গে দেখা যেতে লাগল। দেবীর সঙ্গে যাঁর যোগ স্বাভাবিক পরম মুক্তি বলে সর্বদা কীর্তিত হয়ে থাকে, সেই মহাদেব দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হতে লাগলেন। বিয়োগাভিমুখ যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগীরা নিরন্তর যাঁকে যোগরূপে ধ্যান করে থাকেন, দেবীর সঙ্গে সেই যোগপুরুষকে দেখা যেতে লাগল। মহাদেবীর সঙ্গে বরাসনে উপবিষ্ট সনাতন মহাদেবকে দর্শন করে ব্রহ্মার পরমা স্মৃতি জাগরিত হল। ভগবান ব্রহ্মা মহেশ্বর সম্বন্ধে পরমা স্মৃতি লাভ করে উমার সঙ্গে অর্ধেন্দুভূষণ মহাদেবকে এই ভাবে স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন—মহাদেবকে নমস্কার, মহাদেবীকে নমস্কার। শান্তমূর্তি শিব ও শিবাকে সতত নমস্কার করি। তুমিই ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিদ্যা, তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি মহেশ, তোমাকে নমস্কার। তুমি মূল প্রকৃতি, তোমাকেও নমস্কার। তুমি বিজ্ঞানতনু, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্বিষয় জ্ঞানস্বরূপা, তোমাকেও বার বার নমস্কার করি। তুমি কালেরও সংহারকর্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশ্বরী, তোমাকেও নমস্কার। রুদ্রকে বার বার নমস্কার। রুদ্রাণীকেও বার বার নমস্কার। তুমি কালস্বরূপ, তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি মায়াস্বরূপা, তোমাকেও বার বার নমস্কার। তুমি সমস্ত কার্যের নিয়োগকর্তা, তোমাকে বার বার নমস্কার আর তুমি ক্ষোভিকা, তোমাকেও বার বার নমস্কার। সুতরাং নারায়ণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। প্রকৃতি রূপিণী তোমাকেও নমস্কার করি। তুমিই যোগীদের গুরু, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগদাত্রী, তোমাকেও নমস্কার। তুমি সংসারনাশক আর তুমি জগতের উৎপাদিকা, তোমাদের নমস্কার। তুমি নিত্যানন্দবিগ্রহ, তুমি প্রভু, তোমাকে নমস্কার। তুমি আনন্দমূর্তি-রূপিণী, তোমাকেও নমস্কার। তুমি কার্যবিহীন আর তুমি বিশ্বপ্রকৃতি, তোমাদের নমস্কার করি। তুমি ওঙ্কারমূর্তি পরমেশ্বরী আর তুমি ওঙ্কারের মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বর। তুমি আকাশ শক্তি এবং তুমি আকাশে সংস্থিত। তোমাদের নমস্কার।

এই ভাবে উমার সঙ্গে শঙ্করের স্তব আটটি শ্লোকের সাহায্যে প্রণত হয়ে শতরুদ্রিয় গান করতে করতে ব্রহ্মা ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। তারপর প্রণতজনের পীড়া-নাশক মহাদেব ব্রহ্মাকে দুহাতে তুলে ধরে বললেন, এখন তোমার প্রতি আমি প্রীত হয়েছি। অতঃপর মহাদেব ব্রহ্মাকে পরমযোগ ও অতুল মহৎ ঐশ্বর্য দান করে সম্মুখে অবস্থিত নীললোহিত মহেশ্বর রুদ্রকে বললেন, জগতের প্রথম স্থিত ও পূজনীয় এই ব্রহ্মাকে তুমি নিজে রক্ষা করবে। ইনি গুণের দ্বারা জ্যেষ্ঠ, ইনি তোমার পিতা। হে নিষ্পাপ, এই আদিপুরুষকে বধ করা তোমার উচিত নয়। ইনি যোগৈশ্বর্যের মাহাত্ম্যে আমারই শরণ নিয়েছেন। হে অনঘ, এই দেখ এই যজ্ঞও যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমান। এই সগর্ব যজ্ঞকেও তোমার শাসন করা উচিত। এখন বিরিঞ্চির এই ছিন্ন মস্তক

ধারণ কর। ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য তুমি পৃথিবীতে ব্রত প্রদর্শন করে সর্বদা ভিক্ষা কর এবং তার দ্বারা দেব ও ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কর। ভগবান মহেশ্বর এই কথা বলে সেই পরম পদ স্বাভাবিক দিব্যস্থানে ফিরে গেলেন। তারপর কপর্দী ভগবান নীললোহিত কালভৈরবকে ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম মুখটি দিয়ে দিলেন। 'লোকহিতকর এই ব্রত ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য অনুষ্ঠান কর এবং এই কপাল হাতে নিয়ে ভিক্ষা আহরণ কর—' কালভৈরবকে এই আদেশ দিয়ে দংষ্ট্রাকরালবদনা অগ্নিশিখার মালায় ভূষিতা ব্রহ্মহত্যা নাম্নী কন্যাকে এই বলে প্রেরণ করলেন, হে ভীষণে, এই কালভৈরবের দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন কর। যত দিন লাগবে, তত দিন পর্যন্ত তুমি ত্রিশূলী কালভৈরবের অনুগমন কর। ব্রহ্মহত্যাকে এই রকম আদেশ দিয়ে লোকমহেশ্বর কালভৈরবকে বললেন, আমার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ভিক্ষার্থীরূপে সমগ্র জগৎ ভ্রমণ কর। যখন তুমি অনাময় নারায়ণকে দেখতে পাবে, তখন তিনি পাপশোধনের স্পষ্ট উপায় বলে দেবেন।

দেবদেব কপর্দীর কথা শুনে বিশ্বাত্মা ভগবান কালভৈরব কপাল হাতে নিয়ে বিকৃত বেশে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেছিলেন। বিকৃত হলেও ঐ বেশ নিজের তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান, অতি সুন্দর, ত্রিনয়নবিশিষ্ট, সুশ্রী ও পবিত্র। কোটি সূর্যের মতো অতি গর্বিত প্রমথদের দ্বারা সমাবৃত হয়ে কালাগ্নিনয়ন মহাদেব সেই সময়ে শোভা পেতে লাগলেন। পরমেষ্ঠীর অমৃতস্বরূপ সেই দিব্য আনন্দ পান করে লীলাবিলাসবহুল ঈশ্বর লোকের সমীপে উপস্থিত হতে লাগলেন। সেই সময়ে রমণীগণ সেই কালবদন কালভৈরব শঙ্করকে রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। তারা প্রভুর সামনে নানা প্রকার গান ও নৃত্য করতে লাগল এবং ভগবানের সস্মিত মুখ দেখে ভ্রূভঙ্গী করতে লাগল। শূলধারী মহাদেব দেব দানব প্রভৃতির দেশগুলিতে যাওয়ার পর যেখানে পুরুষোত্তম রয়েছেন, সেই বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। লোকহিতকর শঙ্কর বিষ্ণুর দিব্যভবনে উপস্থিত হয়ে শ্রেষ্ঠ ভূতগণের সঙ্গেই তাতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। বিষ্ণুর অংশ থেকে সমুদ্ভূত শঙ্খচক্রগদাহস্ত, পীতবসনধারী, বিষ্বক্‌সেন নামে বিখ্যাত মহাভুজ মহাবলশালী দ্বারপাল পরমেশ্বরের দিব্য পরমভাব না জেনে ত্রিশূলপাণি মহাদেবকে তাতে প্রবেশ করতে বারণ করেছিলেন। তারপর কালবেগ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর শঙ্করেরা কালভৈরবের আদেশে সেই বিষ্ণুসম্ভব দ্বারপালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। দ্বারপাল বিষ্বক্‌সেন কালবেগ নামে গণকে জয় করে ক্রোধ সংরক্ত নেত্রে রুদ্রের দিকে দৌড়ে গিয়ে রুদ্রকে সুদর্শন ছুড়ে মারলেন। তারপর ত্রিপুরারি ত্রিশূলী শত্রুজয়ী দেব মহাদেব সেই বিষ্বক্‌সেনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে চেয়ে দেখলেন। সেই সময়ে প্রলয়াগ্নির মতো তেজস্বী ভূতনাথ শূল দ্বারা বক্ষ বিদারণ করে বিষ্বক্‌সেনকে ভূতলশায়ী করলেন। বিষ্বক্‌সেন শূল দ্বারা অত্যন্ত আহত হয়ে নিজের পরম বল পরিত্যাগ করে ব্যাধিহত ব্যক্তির মতো মৃত্যুকে দর্শন করে জীবন ত্যাগ করলেন। মহাদেব বিষ্ণুপুরুষকে এই ভাবে বধ করে তাঁর দেহ গ্রহণ করে প্রমথশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে বিষ্ণুর অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ করলেন। ভগবান হরি জগৎকারণ ঈশ্বরকে দেখে কপালের শিরা ভেদ করে রক্তধারা বার করে দিলেন এবং বললেন, হে অমিতদ্যুতি ভগবান, আমার এই ভিক্ষা নাও। হে ত্রিপুরারি, তোমাকে অন্য ভিক্ষা দেওয়া যায় না। তারপর দিব্য সহস্র বছরের মধ্যেও পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কপাল সম্পূর্ণ হল না এবং সেই রক্তধারাও সমানে প্রবাহিত হয়ে যেতে লাগল। তারপর প্রভু

নারায়ণ হরি বহু সম্মানের সঙ্গে কালরুদ্রকে নানাভাবে স্তব করে বললেন, আপনি কেন ব্রহ্মার এই কপাল ধারণ করেছেন? তা শুনে দেবদেব মহেশ্বর সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। হৃষীকেশ ভগবান অচ্যুত তখন ব্রহ্মহত্যাকে ডেকে প্রার্থনা করলেন, তুমি ত্রিশূলীকে ছেড়ে চলে যাও। ব্রহ্মহত্যা কিন্তু মুরারির এই কথা শুনেও ত্রিশূলীর কাছ থেকে গেল না। তখন সর্ববিদ কিছুক্ষণ ধ্যান করে জগদ্‌যোনি শঙ্করকে বললেন, হে ভগবান, যে স্থানে মহেশ্বর সমগ্র জগতের দোষসমূহ অতি সত্বর নাশ করেন, সেই অতি পবিত্র দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন কর। তারপর চারদিকে মহাযোগী প্রমথেরা সংস্তব করতে থাকলে মহাযোগী মহাদেব বিষ্বক্‌সেনের দেহ হাতে ধারণ করে নৃত্য করতে করতে লোকসমূহের হিতকামনায় লীলাচ্ছলে সমস্ত গোপনীয় তীর্থ ও দেবালয়ে গমন করেছিলেন। নারায়ণ হরি নৃত্য দর্শন করবার জন্য পরম রূপ ধারণপূর্বক মহাদেবের অনুগমন করেছিলেন। বৃষভবাহন অনন্ত যোগাত্মা মহাদেবও গোবিন্দকে দেখতে দেখতে ঈষৎ হাসতে হাসতে বারবার নৃত্য করেছিলেন। তার পর নারায়ণ আর অনুচরদের সঙ্গে ধর্মবাহন রুদ্র বারাণসী নামে বিখ্যাত মহাদেবপুরীতে উপস্থিত হলেন।

কপর্দী বিশ্বেশ্বর বারাণসীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মহত্যা হাহা শব্দে আর্তনাদ করে ক্লিষ্ট হয়ে পাতালে প্রবেশ করল। মহাদেব পরম স্থানে প্রবেশ করে ব্রহ্মার কপাল গণসমূহের সামনে স্থাপন করলেন, দয়ানিধি মহাদেব কপাল স্থাপন করে বিষ্ণুকে বিষ্বক্‌সেনের দেহটি দান করলেন ও বললেন, এ বেঁচে উঠুক। যে ব্যক্তি আমার উত্তম কপালী রূপ সব সময়ে স্মরণ করবে তার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত পাপ অতি শীঘ্র নাশ পাবে। মানুষ এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে এসে স্নান করে পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে অনিত্য বলে জেনে এই তীর্থে বাস করবে, দেহাবসানে আমি তাকে পরম জ্ঞান ও পরমপদ প্রদান করব—ভগবান মহাদেব এই কথা বলে জনার্দনকে আলিঙ্গন করে ক্ষণকালের মধ্যেই প্রমথদের সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান কৃষ্ণও ত্রিশূলীর কাছ থেকে বিষ্বক্‌সেনকে লাভ করে পরম শরীর ধারণপূর্বক অতি শীঘ্র নিজের স্থানে ফিরে গেলেন। মহাদেবের অতিপ্রিয়, শুভজনক ও মহাপাতকনাশী কপালমোচন তীর্থের কথা আপনাদের বললাম।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কাছে এই অধ্যায় পাঠ করে সে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে কপালমোচনমাহাত্ম্য নামে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বললেন, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ অগ্নিবর্ণের তপ্ত সুরা নিজে পান করবে। সেই অগ্নিবর্ণের সুরার দ্বারা শরীর দগ্ধ হলে সে পাপ থেকে মুক্ত হবে। অথবা গোমূত্র বা গোময় রস, বা গব্য দুগ্ধ বা ঘৃত অথবা জল অগ্নিবর্ণ করে পান করবে। তার দ্বারা শরীর দগ্ধ হলেই সেই পাপ থেকে মুক্ত হবে। অথবা পাপক্ষয়ের জন্য জলার্দ্র বস্ত্র পরিধান করে শুচি ও বিষ্ণু ধ্যানপরায়ণ হয়ে ব্রহ্মহত্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করবে। সুবর্ণস্তেয়কারী বিপ্র রাজার কাছে গিয়ে বলবে, মহারাজ, আমি সুবর্ণ অপহরণ করেছি। আমাকে শাস্তি দিন। রাজা মুষল হাতে নিয়ে তার দ্বারা নিজে তাকে একবার আঘাত করবেন। মৃত্যু হলে সুবর্ণ

চোর পাপ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যা দ্বারাও পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন। লকুচ বা খাঁদির কাষ্ঠের মুষল বা তীক্ষ্ণাগ্র শক্তি বা লৌহদণ্ড কাঁধে নিয়ে মুক্তকেশে দ্রুত গতিতে রাজার কাছে গিয়ে নিজের সেই পাপ স্বীকার করে বলবে, এই কাজ আমি করেছি। এর দ্বারা আমাকে শাসন করুন। রাজার শাসনে বা রাজার ক্ষমায় সুবর্ণ অপহারক পাপ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু রাজা যদি তাকে শাসন না করেন, তাহলে রাজা নিজেই সেই পাপে লিপ্ত হবেন। ব্রাহ্মণ যদি তপস্যার দ্বারা সুবর্ণ অপহরণের পাপ থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে তিনি চীর পরিধান করে অরণ্যে ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবেন, কিংবা অশ্বমেধের অবভৃথে স্নান করবেন অথবা নিজের শরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ ব্রাহ্মণদের দান করবেন। অথবা সুবর্ণ অপহরণকারী ব্রাহ্মণ সেই পাপক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হয়ে এক বছর ব্রত অনুষ্ঠান করবেন। কামাতুর হয়ে যদি কেউ গুরুপত্নী গমন করে, তাহলে সে লৌহের স্ত্রীমূর্তি নির্মাণ করে তা উত্তপ্ত করে আলিঙ্গন করবে। অথবা নিজেই নিজের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন করে হাতে নিয়ে যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ বক্রগতি পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে গমন করবে। অথবা গুরুর কার্যের জন্য হত হলে শুদ্ধ হবে কিংবা ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে অথবা কণ্টকময় বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করে এক বছর নিয়ত নীচে শয়ন করবে। তাহলে গুরুর অল্পগত পাপ থেকে মুক্ত হবে। অথবা বল্কল পরিধান করে সমাহিত হয়ে এক বছর প্রাজাপত্য ব্রত করলে বা অশ্বমেধের অবভৃথে স্নান করলে মুক্ত হওয়া যায়। গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি তিন বছর সর্বদা ব্রতী ও ব্রহ্মচারী হবে এবং তিন দিন উপবাস করে চতুর্থ দিনের রাত্রিতে ভোজন করবে। তিন দিন অন্তর কেবল জল পান করবে এবং নীচে শয়ন করবে। লুটিয়ে লুটিয়ে বিচরণ করবে বা কিছুক্ষণ বসে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হবে। অথবা চারটি বা পাঁচটি চান্দ্রায়ণ করলেও মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পতিতের সংসর্গ করে তার কি করে মুক্তি হয় বলছি। যে ব্যক্তি যে রকম পতিতের সঙ্গ করবে তার পাপও সেই রকম হবে। সেই পাপ নাশের জন্য সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। এক বছর সংসর্গ করলে তাকে নিরলস হয়ে সংবৎসর কাল তপ্তকৃচ্ছ্র করতে হবে। দু'মাস সংসর্গ করলে দু'মাস তপ্তকৃচ্ছ্র করবে। এই সব ব্রত করলে মহাপাতকীর পাপ নাশ হবে। অথবা পৃথিবী স্থিত পুণ্যতীর্থে পর্যটন করলেও পাপক্ষয় হবে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুনারীগমন আর এই ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে সজ্ঞানে সংসর্গ করলে ব্রাহ্মণ অনশন করবে। অথবা সমাহিত চিত্তে সমস্ত পুণ্যতীর্থ পর্যটন করবে অথবা মহাদেবকে ধ্যান করে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। মহাপাতকীর পক্ষে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা এ ছাড়া আর অন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেন নি। তাই মহাপাতকী পুণ্যতীর্থে পর্যটন অথবা নিজ দেহকে দগ্ধ করবে। নিজের কন্যা, ভগিনী বা পুত্রবধূর সঙ্গে জ্ঞানত যৌনাচারে লিপ্ত হলে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। এই হল শাস্ত্রের বিধান। মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা, মাতুলানী বা ভাগিনেয়ীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করবে। অথবা সেই পাপের শান্তির জন্য জগদ্‌যোনি অনাদি অনন্ত হরিকে ধ্যান করে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে যৌনাচার করলে সেই পাপ শান্তির জন্য সমাহিত হয়ে চারটি বা পাঁচটি চান্দ্রায়ণ করবে। পিতৃষ্বসার বা মাতৃষ্বসার বা মাতুলের কন্যার সঙ্গে সঙ্গম করলে চান্দ্রায়ণ করবে। সখার পত্নী বা শ্যালিকাতে উপগত হলে অহোরাত্র উপবাস করে তপ্তকৃচ্ছ্র করবে। ঋতুমতীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করলে তিন রাত্রি উপবাস করে শুদ্ধ হবে। চাণ্ডালীতে উপগত হলে

তিনটি তপ্তকৃচ্ছ্র করবে অথবা সান্তপন ব্রত করবে। এ ছাড়া মুক্তির উপায় নেই। মাতার গোত্রের নারীতে বা সমানপ্রবরা নারীতে উপগত হলে বিশুদ্ধ চিত্তে চান্দ্রায়ণ করলে বিশুদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ যদি অন্য ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সঙ্গম করেন, তাহলে এক বছর কৃচ্ছ্র এবং অবিবাহিতা বা অরজস্বলা কন্যায় উপগত হলে চান্দ্রায়ণ করতে হবে। মনুষ্যেতর প্রাণীতে, ঋতুমতীতে, যোনিভিন্ন স্থানে আর জলে রেতঃপাত করলে সান্তপন ব্রত করবে। অসতী-স্ত্রী-গমন করলে তিন রাত্রি উপবাস করে শুদ্ধ হবে। গোরুর সঙ্গে সঙ্গম করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। ছাগী বা মেষীর সঙ্গে যৌনাচার করলে প্রাজাপত্য করবে। পতিতা স্ত্রীতে উপগত হলে তিনটি প্রাজাপত্য করবে। পুক্কশীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। নটী, শৈলূষী, রজকী, বংশজীবিনী আর চর্মোপ-জীবিনী রমণীর সঙ্গে সঙ্গম করলে চান্দ্রায়ণ করবে। ব্রহ্মচারী যদি কামমোহিত হয়ে স্ত্রী-গমন করে তাহলে গর্দভচর্ম পরিধান করে সাতটি গৃহে ভিক্ষা করবে এবং নিজের পাপ স্বীকার করে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করবে। এই রকম ব্রত এক বছর করলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হবে। অথবা যতি ছ' মাস ব্রাহ্মণের অনুমতিতে থেকে ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। তাহলে রেতঃসেকারী ব্রহ্মচারীর পাপ থেকে মুক্তি ঘটবে। রেতঃস্খলন হলে ভৈক্ষচর্যা ও অগ্নি-পূজন সাত রাত্রি করবে না ও প্রায়শ্চিত্ত করবে। ওঙ্কার উচ্চারণ করে মহাব্যাহৃতি দ্বারা সংবৎসর কাল হোম করবে, শুচি হয়ে রাত্রিতে ভৈক্ষ্যবস্তু আহার করবে। নদীতীরে বা তীর্থে ক্রোধবর্জিত হয়ে সাবিত্রী জপ করবে। তাহলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হবে। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় বধ করে, তাহলে ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। কিন্তু যদি না জেনে বধ করে তাহলে ছ' মাস ধরে পঞ্চাশটি গোরু দান করবে। অথবা বনে বাস করে ধ্যানযুক্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে সংবৎসর কাল প্রাজাপত্য, সান্তপন অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করবে। সজ্ঞানে বৈশ্য হত্যা করলে তিন বছর ধরে হাজারটি গোরু দান করবে অথবা ব্রহ্মহত্যা ব্রতের সিকিভাগ প্রায়শ্চিত্ত করবে। অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। সজ্ঞানে শূদ্র হত্যা করলে সংবৎসর কাল ব্রত করবে অথবা সেই পাপক্ষয়ের জন্য পাঁচশো বা আড়াইশো গোরু দান করবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকে হত্যা করলে যথাক্রমে আট বছর, ছয় বছর ও তিন বছর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। ব্রাহ্মণী-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ আট বছর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। ক্ষত্রিয় কন্যাকে বধ করলে ব্রাহ্মণ ছয় বৎসর ব্রত করবে। বৈশ্য রমণী হত্যাকারী ব্রাহ্মণ তিন বছর ব্রত করবে। ব্রাহ্মণ শূদ্র হত্যা করলে এক বছর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। বেশ্যা হত্যাকারী দ্বিজাতি ব্রাহ্মণকে কিছু দান করলে শুদ্ধ হবে। অন্ত্যজ রমণী হত্যা করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে অথবা পরাক ব্রত করলে শুদ্ধ হবে। এ কথা ভগবান মনু বলেছেন। ভেক, নকুল, কাক, গ্রাম্য শূকর, মূষিক ও কুকুর হত্যা করলে মহাব্রতের ষোল ভাগের এক ভাগ প্রায়শ্চিত্ত জানবে। অথবা কুকুর হত্যাকারী নিরলস হয়ে তিন রাত্রি পয়ঃ পান করবে। বিড়াল বা নকুল বধ করলে এক যোজন পথ হাঁটতে হবে। অশ্ব বধ করলে ব্রাহ্মণ বারো রাত্রি ব্রত করবে। সর্প হত্যা করলে একজন ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণলোহময় প্রতিমা দান করবে। নপুংসককে বধ করলে আঠারো হাজার তোলা খড় দান করবে। অথবা ব্রাহ্মণকে এক মাষা সীসা দান করবে। বরাহ হত্যা করলে ঘৃত কুম্ভ এবং তিতির পাখি হত্যা করলে বত্রিশ সের তিল দান করবে। শুকপাখি বধ করলে দুই বছর বয়স্ক গোরু দান করবে। ক্রৌঞ্চ বধ করলে তিন বছর বয়স্ক গোরু দান করবে। হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন ও ভাসপাখি বধ করলে ব্রাহ্মণকে একটি গোরু দান করবে। আর

মাংসভোজী ব্যাঘ্র প্রভৃতি বধ করলে পয়স্বিনী ধেনু দান করবে। হরিণ প্রভৃতি পশু বধ করলে ক্ষুদ্র স্ত্রী বৎস দান করবে। উষ্ট্র বধ করলে একরতি সোনা দান করবে। অস্থি-যুক্ত প্রাণী বধ করলে ব্রাহ্মণকে যা হোক কিছু দান করবে। অস্থিহীন প্রাণী বধ করলে প্রাণায়াম দ্বারাই শুদ্ধ হওয়া যায়। ফলবান বৃক্ষ ছেদন করলে একশত ঋক্ জপ করবে। গুল্ম, বল্লী, লতা ছেদন করলে এবং ফলে-ফুলে ভরা বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি ছেদন করলে ঘৃত ভক্ষণই প্রায়শ্চিত্ত। হস্তী বধ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করবে। অজ্ঞানতাপূর্বক গোহত্যা করলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করবে। কিন্তু সজ্ঞানে গোহত্যা করলে সে পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

শ্রীকূর্মপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে প্রায়শ্চিত্তনিয়মবিষয়ে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলতে লাগলেন, পুরুষহরণ, স্ত্রীহরণ বা গৃহ হরণ করলে এবং বাপী ও কূপের জল হরণ করলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হবে। অল্প মূল্যের দ্রব্য অন্য গৃহ থেকে চুরি করলে ঐ সব দ্রব্য তার অধিকারীকে ফিরিয়ে দিয়ে সান্তপন ব্রত করবে। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্বক স্বজাতীয় গৃহ থেকে ধান্য ও ভাত প্রভৃতি ধন চুরি করলে এক বছর প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হয়। ভক্ষ্য দ্রব্য, ভোজ্য দ্রব্য, যান, শয্যা, আসন, ফুল, মূল ও ফল অপহরণ করলে পঞ্চগব্যপানের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম আর মাংস অপহরণ করলে তিন রাত্রি উপবাস করতে হবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও পাষাণ—এগুলির মধ্যে কোন একটি হরণ করলে বারো দিন তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করবে। কার্পাস বস্ত্র, পট্ট বস্ত্র, ঊর্ণা নির্মিত কম্বল প্রভৃতি, দুই খুরযুক্ত পশু, পক্ষী, চন্দন প্রভৃতি গন্ধৌষধি—এই সব বস্তুর অপহরণ করলে তিন দিন দুগ্ধ পান করবে। নরমাংস ভক্ষণ করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। কাক, কুকুর, হস্তী, গ্রাম্য শূকর, গ্রাম্য কুক্কুট—এই সব ভক্ষণ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র করে শুদ্ধ হবে। যে সব পশুপক্ষী কাঁচা মাংস খায়, তাদের ভক্ষণ করলে, ষাঁড়, শৃগাল ও বানর—এই সব জন্তুর মাংস বা মল-মূত্র ভক্ষণ করলেও তপ্তকৃচ্ছ্র করবে এবং বারো দিন উপবাস করে কুষ্মাণ্ড মন্ত্র পাঠ করে ঘৃতাহুতি দান করবে। বেজী, পেঁচা ও বিড়াল ভক্ষণ করলে সান্তপন ব্রত করবে। শ্বাপদ, উট বা গাধা ভক্ষণ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করবে ও পূর্ব বিধান মতো সংস্কার করবে। বক, বলাকা, হংস, কারণ্ডব ও চখাচখির মাংস ভক্ষণ করলে বারো দিন উপবাস করবে। পেঁচা ও শরারি পাখির মাংস ভক্ষণ করলেও বারো দিন উপবাস করবে। শিশুমার, নীলকণ্ঠ পাখি ও মৎস্যের মাংস ভক্ষণ করলে যখন ইচ্ছা তখন আহার করবে না এবং পূর্বোক্ত ব্রত করবে। কোকিল, মৎস্যভোজী, ব্যাঙ ও সাপ ভক্ষণ করলে একমাত্র গোমূত্রের সঙ্গে সিদ্ধ যবান্ন আহার করলে শুদ্ধ হবে। জলচর পাখি জলজ পাখি, যে সব পাখি ঠোঁট দিয়ে ঠোকরায় সেই সব পাখি, যারা খাবার সময়ে ছড়িয়ে খায় সেই সব পাখি, যাদের পা রক্তবর্ণ সেই সব পাখি ভক্ষণ করলে এক সপ্তাহ গোমূত্রের সঙ্গে সিদ্ধ যবান্ন আহার করবে। কুকুর মাংস, শুষ্ক মাংস ও নিজের উদরপূর্তির জন্য আহৃত মাংস ভোজন করলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য একমাত্র গোমূত্রের সঙ্গে পক্ব যবান্ন

আহার করবে। বার্তাক, মূলক, শজিনা, কুটক ও চটক—এই সব ভক্ষণ করে প্রাজাপত্য করবে। শাঁখ ও কুমীর ভক্ষণ করলে প্রাজাপত্য করবে। পেঁয়াজ বা রসুন ভক্ষণ করলে চান্দ্রায়ণ করবে। নালিকা শাক ও তণ্ডুলীয় শাক ভক্ষণ করলে প্রাজাপত্য করবে। অম্লকুচুই ও হরিতাল ভক্ষণ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হবে। কুসুম্ভ ভক্ষণ করলে প্রাজাপত্য করবে। লাউ ও পলাশ ভক্ষণ করলে প্রাজাপত্য করবে। যজ্ঞডুমুর ভক্ষণ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র করে শুদ্ধ হবে। দেবতাদের নিবেদন না করে বা রোগ প্রভৃতি ছাড়া তিল ও তণ্ডুল সিদ্ধ অন্ন, ঘৃত, ক্ষীর, গুড় আর আটার মিশ্রণে প্রস্তুত বস্তু, পায়স, পিঠা—এই সব বস্তু এবং এই রকম অন্য বস্তু ভক্ষণ করলে তিন রাত্রি উপবাস করলে শুদ্ধ হবে। অপেয় দুগ্ধ পান করে সমাহিত ভাবে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গোমূত্রে সিদ্ধ যবান্ন ভোজন করলে একমাসে শুদ্ধ হওয়া যায়। প্রসবের পর দশ দিন অতীত হয় নি এমন প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ, বা এ রকম মহিষী বা অজার দুগ্ধ বা বৃষসঙ্গতা গাভীর দুগ্ধ কিংবা বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ পান করলে শুদ্ধির জন্য এক মাস গোমূত্রে সিদ্ধ যবান্ন আহার করবে। আর এই সব দুগ্ধ এই রকম দোষযুক্ত না হলেও যদি বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহলে তা পান করে সাত রাত্রি গোমূত্রে সিদ্ধ যবান্ন আহার করবে। নব শ্রাদ্ধে বা জননাশৌচী বা মরণাশৌচীর অন্ন ভোজন করলে ব্রাহ্মণ সমাহিত হয়ে চান্দ্রায়ণ করবে। যিনি প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করেন, কিন্তু অন্নের অগ্রভাগ দান করেন না, তাঁর অন্ন ভোজন করলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হবে। অভোজ্য জাতিদের পক্কান্ন আর অন্ত্যাবসায়ীদের পক্কান্ন ভোজন করলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করে শুদ্ধ হবে। ব্রাহ্মণ যদি চণ্ডালের অন্ন ভোজন করে, তাহলে বিধিমতে চান্দ্রায়ণ করবে। জেনেশুনে ভোজন করে থাকলে সারা বৎসর প্রাজাপত্য করবে ও তার পুনঃসংস্কার করতে হবে। সুরা ছাড়া অন্য মদ্য পান করলে চান্দ্রায়ন ব্রত করবে। অভোজ্য অন্ন ভক্ষণ করলে প্রাজাপত্য করবে। বিষ্ঠা, মূত্র ও বীর্য ভক্ষণ করলেও প্রাজাপত্য করবে। যে পাপের সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি, তাতে সব ক্ষেত্রেই যথানিয়মে একদিন উপবাস করবে। গ্রাম্য শূকর, গাধা, উট, শৃগাল, বানর বা কাক—এই সব প্রাণীর মূত্র বা বিষ্ঠা ভক্ষণ করলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করবে। ব্রাহ্মণ যদি মানুষের বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরাসংস্পৃষ্ট বস্তু না জেনে ভক্ষণ করে তাহলে তার পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করতে হয়। যে পশুরা কাঁচা মাংস খায় তাদের, অথবা পক্ষীর বিষ্ঠা মূত্র না জেনে ভক্ষণ করলে ব্রাহ্মণ মহাসান্তপন ব্রত করবে। ভাসপাখি, ব্যাঙ, কুরর পাখি ও বিষ্কির ভক্ষণ করলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ব্রত করে শুদ্ধ হবে। ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনে অতিকৃচ্ছ্র এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে চান্দ্রায়ণ—এই হল ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে বিধান। সুরাপাত্রে জল পান করলেও চান্দ্রায়ণ করবে। উচ্ছিষ্ট জল পান করলে ব্রাহ্মণ তিন রাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হবে। গোরুর পীতাবশিষ্ট জল পান করলে গোমূত্রে সিদ্ধ যবান্ন ভক্ষণ করবে। মূত্র বা বিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা দূষিত জল পান করলে বিশুদ্ধির জন্য সান্তপন ব্রত করবে। চণ্ডালের কূপে বা ভাণ্ডে সজ্ঞানে জল পান করলে ব্রাহ্মণ পাপক্ষয়ের জন্য সান্তপন ব্রতে প্রায়শ্চিত্ত করবে। চণ্ডাল সংস্পৃষ্ট জল পান করলে ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য পান করে তিন রাত্রি উপবাস করবে। মহাপাতকীর সংস্পর্শে থাকতে থাকতে যদি সজ্ঞানে কেউ স্নান ভোজন করে, তাহলে সেই মূঢ়াত্মা তপ্তকৃচ্ছ্র করবে। মহাপাতকী, চণ্ডাল বা ঋতুমতী স্পর্শ করে যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতাবশত ভোজন করে

তাহলে তিন রাত্রি উপবাস করে শুদ্ধ হবে। স্নানার্হ ব্যক্তি যদি স্নান না করে অজ্ঞানত ভোজন করে, তাহলে অহোরাত্র উপবাস করে শুদ্ধ হবে। আর জেনে-শুনে ভোজন করলে প্রাজাপত্য ব্রতে শুদ্ধ হবে। এ কথা বলেছেন ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু। বাসি খাবার খেলে বা গোরু প্রভৃতির দ্বারা দূষিত বস্তু ভোজন করলে উপবাস করবে অথবা কৃচ্ছ্রের সিকিভাগ প্রায়শ্চিত্ত করবে। সংবৎসর না জেনে অভক্ষ্য ভক্ষণ করলে বারবার প্রাজাপত্য করবে এবং সজ্ঞানে করে থাকলে আরও বেশি প্রায়শ্চিত্ত করবে। ব্রাত্যদের যাজনকর্ম করলে বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি করলে অথবা অভিচার কর্ম করলে কিংবা অহীন নামক যাগ করলে তিনটি প্রাজাপত্য করে শুদ্ধ হবে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির শাপে নিহত ব্যক্তির দাহাদি কর্ম করলে গোমূত্র যাবক আহার করে প্রাজাপত্য ব্রত করলেই শুদ্ধ হবে। তেল মেখে কিংবা বমি করে যদি কেউ মলমূত্র ত্যাগ বা ক্ষৌর প্রভৃতি কর্ম কিংবা মৈথুন করে, তাহলে অহোরাত্র উপবাস করলেই সে শুদ্ধ হবে। ব্রাহ্মণ প্রমাদবশত এক দিন মাত্র বিবাহাগ্নি পরিহার করলে তিন রাত্রি উপবাস করলে শুদ্ধ হবে। তিন দিন পরিহার করলে ছ'দিন উপবাসে শুদ্ধ হবে। আর দশ বারো দিন পরিহার করলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হবে। পতিত ব্যক্তির কাছে কোন দ্রব্য গ্রহণ করলে তা পরিত্যাগ করে বিধিমতো প্রাজাপত্য ব্রত করে শুদ্ধ হওয়া যায়। ভগবান মনু এ কথা বলছেন। প্রায়োপবেশন ব্রত থেকে ভ্রষ্ট ও প্রব্রজ্যাচ্যুত ব্যক্তি তিনটি প্রাজাপত্য ও তিনটি চান্দ্রায়ণ করবে। তারপর আবার জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ হবে এবং ধর্মদর্শী হয়ে সম্যকরূপে সেই ব্রত আচরণ করবে। ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা উপাসনা না করলে সেই দিন ভোজন না করে সংযতমনা হয়ে জপ করবে। যদি সায়ংসন্ধ্যা না করে, তাহলে সেই রাত্রিতে ভোজন না করে জপ করবে। সমিধ আধান না করলে বিশুদ্ধির জন্য স্নান করে শুচি হয়ে সমাহিত চিত্তে এক হাজার আট গায়ত্রী জপ করবে। গৃহস্থ যদি অনবধানবশত সন্ধ্যা না করে, তাহলে স্নানের পর উপবাস করে সন্ধ্যা উপাসনা করবে। আর বিশেষ রকম শ্রম হওয়াতে যদি সন্ধ্যা করতে না পারে, তাহলে উপবাস মাত্র করে শুদ্ধ হবে। যদি বেদবিহিত নিত্য কর্ম-সমূহ ও ব্রত লোপ করেন, তাহলে স্নাতক ব্রাহ্মণ একদিন উপবাস করবে। অগ্নি-পরিত্যাগকারী ব্রাহ্মণ এক বছর প্রাজাপত্য করবে। ব্রাত্য দ্বিজ চান্দ্রায়ণ এবং গোরু দান করলে শুদ্ধ হবে। ব্রাহ্মণ নাস্তিকতা করলে প্রাজাপত্য করবেন। আর দেবদ্রোহ বা গুরুদ্রোহ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করবে। সংহিতা জপপরায়ণ হয়ে দু'দিন উপবাস-পূর্বক তৃতীয় দিন রাত্রে ভোজন ও প্রতি দিন 'দেবকৃতস্যেনস' ইত্যাদি শাকল মন্ত্রের দ্বারা শাকল হোম করবে। এক মাস এই রকম ব্রতাচরণ অযাজ্য যাজনের প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ যদি নীল বা রক্তবস্ত্র পরিধান করে, তাহলে অহোরাত্র উপবাস করে স্নানের পর পঞ্চগব্য পান করলে শুদ্ধ হবে। সজ্ঞানে উষ্ট্রযান বা গর্দভযানে আরোহণ করলে কিংবা বিবস্ত্র হয়ে জলে অবগাহন করলে ত্রিরাত্র উপবাসে বিশুদ্ধ হবে। চণ্ডালদের কাছে বেদ বা ধর্ম কিংবা পুরাণ প্রভৃতি বললে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হবে, এ ছাড়া অন্য নিষ্কৃতি নেই। যদি ব্রাহ্মণ উদ্বন্ধন প্রভৃতির দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তাহলে চান্দ্রায়ণ অথবা প্রাজাপত্য ব্রত করলে শুদ্ধ হবে। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি আচমনের পূর্বে প্রমাদ-বশত চণ্ডাল প্রভৃতিকে স্পর্শ করে, তাহলে স্নান করে এক হাজার আটবার গায়ত্রী জপ করবে। ব্রহ্মচারী এ রকম করলে সমাহিত হয়ে একশোবার 'দ্রুপদা' মন্ত্র জপ

করবে এবং তিন রাত্রি উপবাস করে পঞ্চগব্য পান করলে শুদ্ধ হবে। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করে চণ্ডাল প্রভৃতিকে স্পর্শ করলে বিশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত করতে হবে। চণ্ডাল, অশৌচী, মৃতদেহ বা রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে। এ বিধান পিতামহ ব্রহ্মার। চণ্ডাল, অশৌচী বা শবস্পর্শকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ স্পর্শ করে, তাহলে সে স্নান করে আচমনপূর্বক সমাহিত চিত্তে জপ করবে। চণ্ডাল প্রভৃতির দ্বারা স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে যে স্পর্শ করেছে, তাকে সজ্ঞানে স্পর্শ করলে বিশুদ্ধির জন্য স্নান করে আচমন করবে। এ কথা পিতামহ প্রজাপতি বলেছেন। ভোজন করতে করতে যদি ব্রাহ্মণের মল নিঃসরণ হয় তাহলে শৌচ করে স্নান করবে এবং উপবাস করে ঘৃতাহুতি দান করবে। চণ্ডালের মৃতদেহ স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ব্রত করে শুদ্ধ হবে। তৈলাক্ত অবস্থায় স্পর্শ না করে কেবলমাত্র দেখলে অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ সুরা স্পর্শ করলে তিনটি প্রাণায়াম করে শুচি হবে। পেঁয়াজ ও রসুন স্পর্শ করলে ঘৃত প্রাশন করলে শুচি হওয়া যায়। কুকুর কামড়ালে ব্রাহ্মণ তিন দিন সন্ধ্যাবেলা পয়ঃ পান করবে। অথবা কুকুরদষ্ট ব্রাহ্মণ স্নান করে গায়ত্রী জপ করবে। নীরোগ ব্রাহ্মণ ধন থাকতেও যদি পঞ্চযজ্ঞ না করে ভোজন করে, তাহলে তিন দিন উপবাস করে শুদ্ধ হবে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি পর্বতিথিতে অগ্নিহোত্র না করে, তাহলে অর্ধ প্রাজাপত্য করে শুদ্ধ হবে। যে সব ব্যক্তি ঋতুকালে ভার্যাতে উপগত না হয়, তারাও অর্ধ প্রাজাপত্য ব্রত করে শুদ্ধ হবে। বিনা রোগে যদি মল-মূত্র ত্যাগ করবার পর জলশৌচ না করে বা জলের মধ্যে অঙ্গ নিমজ্জিত করে শৌচ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি সেই বস্ত্র পরে স্নান করে গো স্পর্শ করলে শুদ্ধ হয়। সজ্ঞানে ঐ রকম করলে ব্রাহ্মণ সূর্যোদয় থেকে জলমধ্যে স্থিত হয়ে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করবে এবং ব্রতী হয়ে তিন দিন উপবাস করবে। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিপূর্বক মৃত শূদ্রের অনুগমন করে, তাহলে নদীতীরে গিয়ে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করবে। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের কাছে অবধিসংযুক্ত শপথ করে, তাহলে যাবকান্ন ভোজন দ্বারা চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। এক পঙ্‌ক্তির মধ্যে কাউকে বেশী কাউকে কম পরিবেশন করলে প্রাজাপত্য করতে হয়। চণ্ডাল প্রভৃতির ছায়া স্পর্শ করলে স্নান করে ঘৃত ভক্ষণ করতে হয়। ম্লেচ্ছের অন্ন দর্শনে অশুচি হলে সূর্য দর্শন করবে। মানুষের অস্থি স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হবে। মিথ্যা অধ্যয়ন করলে এক বৎসর ভিক্ষা করতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করে পাঁচ বছর ব্রত করলে শুদ্ধ হবে। ব্রাহ্মণকে ধমক দিলে ও গুরুতর ব্যক্তিকে তুই-তোকারি করলে স্নান করে যখন বলা হয়েছে তখন থেকে দিনশেষ পর্যন্ত ভোজন করবে না এবং যাঁকে ঐ রকম বলা হয়েছিল তাঁর পা ধরে প্রসন্ন করবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারাও তাড়ন করলে বা তাঁর গলায় কাপড় দিলে বা বাক্ কলহে পরাজিত করলে প্রণাম করে তাঁকে প্রসন্ন করবে। ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য দণ্ড উত্তোলন করলে প্রাজাপত্য ব্রত করবে। ব্রাহ্মণের রক্তপাত করলে প্রাজাপত্য ও অতিকৃচ্ছ্র করবে। গুরুর আক্রোশজনক কর্ম করলে বা তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বললে ঐ পাপের বিশুদ্ধির জন্য এক দিন উপবাস করবে। দেবতা ও ঋষিদের দিকে মুখ করে থুথু ফেললে বা তাঁদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করলে অগ্নি দ্বারা জিহ্বা পুড়িয়ে ফেলবে ও ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ দান করবে। দেবোদ্যানে যে ব্রাহ্মণ মূত্র বা বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সে সেই পাপক্ষয়ের জন্য শিশ্ন ছেদন করে চান্দ্রায়ণ ব্রত করলে শুদ্ধ হয়। অজ্ঞানতাপূর্বক যে ব্রাহ্মণ দেব-

গৃহে মূত্র ত্যাগ করে, সে শিশ্ন ছেদন করে চান্দ্রায়ণ করলে শুদ্ধ হয়। দেবতা বা ঋষি বা দেবতুল্য ব্যক্তিদের নিন্দা করলে ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে প্রাজাপত্য ব্রত করলে শুদ্ধ হবেন। দেব প্রভৃতির নিন্দাকারী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করলে স্নান করে দেবতার অর্চনা করবে, তাকে দর্শন করলে সূর্য দর্শন করবে এবং তাকে স্মরণ করলে বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করবে। কিন্তু সর্বভূতাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে সজ্ঞানে নিন্দা করলে শতবর্ষেও তার মুক্তি হয় না। সেই পাপ থেকে মুক্তির জন্য তাঁর শরণাগত হয়ে প্রথমে চান্দ্রায়ণ, তার পর প্রাজাপত্য ও তার পরে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করবে। বিধান অনুসারে সর্বস্ব দানে পাতকীর বিশুদ্ধি হয় ও বিধান অনুসারে প্রাজাপত্য বা অতিকৃচ্ছ্র কিংবা চান্দ্রায়ণেও পাপীর বিশুদ্ধি হয়। পুণ্যক্ষেত্র গমনেও সর্বপাপ বিনাশ হয় আর দেবতা-পূজাতেও মানুষের সর্বপ্রকার পাপ নাশ হয়। অমাবস্যা তিথিতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করে মহাদেবকে পূজা করে, সে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে বা কৃষ্ণাচতুর্দশীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে মহাদেবী দুর্গার পূজা করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ত্রয়োদশীর রাত্রির প্রথম প্রহরে উপহার সহ ত্রিলোচনকে পূজা করলেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করে সমাহিত চিত্তে সর্বপাপক্ষয়ের জন্য যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল ও সর্বপাপক্ষয়—এই সাতজনের উদ্দেশে তিলযুক্ত উদকাঞ্জলি দান করবে। স্নান করে পূর্বাহ্ণে এই রকম উদকাঞ্জলি দান করতে হয়, তাতে সমস্ত পাপ থেকেই মুক্তি হয়। সমস্ত ব্রতেই শান্ত ও সংযতমনা হয়ে ব্রহ্মচর্য, ব্রাহ্মণপূজা, উপবাস ও অধঃশয়ন করবে। অমাবস্যা তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মার উদ্দেশে তিনটি ব্রাহ্মণের সম্যকরূপে পূজা করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে উপবাস করে যে ব্যক্তি সপ্তমীতে সমাহিত চিত্তে সূর্যপূজা করে, সে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। শনিবারে ভরণীনক্ষত্র ও চতুর্থী তিথি হলে সেই দিনে যে ব্যক্তি যমের পূজা করে, সে সাত-জন্মের সঞ্চিত পাপ থেকে মুক্তি পায়। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতে ভগবান জনার্দনের পূজা করে, সে মহাপাপ থেকে মুক্ত হয়। গ্রহণ প্রভৃতি কালে জপ, তীর্থসেবা, তপস্যা এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা—এই সব কর্ম করলে মহাপাপ পর্যন্ত নাশ হয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপে পাপী হয়েও পুণ্যতীর্থে নিয়ম অবলম্বন করে প্রাণত্যাগ করে, সে সর্বপাতক থেকে মুক্তি পায়। স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন বা মহাপাতকী হলেও সহমৃতা রমণী সেই স্বামীকে উদ্ধার করে। স্ত্রীলোকেরা যে পাপই করুক না কেন, সহগমনই তাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে কথিত আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীর সেবায় রতা পতিব্রতা রমণীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। পতিব্রতা ও ধর্মাচরণরতা কামিনীরা যে মঙ্গল লাভ করে এ বিষয়ে সংশয় নেই। ঐ প্রকার স্ত্রীলোককে ইহলোকে কোন সময়েই কেউ পরাভূত করতে পারে না। এই দেখ না, ত্রিলোক-বিখ্যাতা সুভগা রামপত্নী সীতা কেবল সতীত্বধর্মের বলেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করেছিলেন। এক সময়ে রাক্ষসেশ্বর রাবণ কালপ্রেরিত হয়ে বিশালনয়না রামপত্নী সীতাকে কামনা করেছিল, রাক্ষসেশ্বর রাবণ মায়া তাপস বেশ ধারণ করে বিজন বনে বিচরণকারিণী সুন্দরী সীতাকে হরণ করতে চাইল। সেই শুচিস্মিতা সীতা রাবণের মনোভাব বুঝতে পেরে নিজের স্বামী দাশরথি রামকে স্মরণপূর্বক প্রিয়মুখে আবসথ্যাগ্নির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রামজায়া সীতা

কৃতাঞ্জলি হয়ে নিজ পতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ-জ্ঞানে মহাযোগস্বরূপ ও সর্বলোকের দাহকারী অগ্নিকে এই ভাবে আরাধনা করতে লাগলেন—

যিনি মহাযোগস্বরূপ, যিনি অনির্বচনীয় তত্ত্ব, যিনি সর্বপ্রাণীর দাহক, সর্বভূতের ঈশ্বর ও সর্বভূতের সংহারকর্তা, সেই পরমবহ্নিকে নমস্কার করি। যিনি সাক্ষী, সর্বতোমুখ, প্রদীপ্তবপু এবং সর্বভূতের হৃদিস্থিত আত্মা, সেই পাবকদেবকে নমস্কার করি। যিনি ব্রাহ্মণদের হিতকারী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, যোগী, মৃগচর্মাম্বর, সর্বভূতের ঈশ্বর পরমপদস্বরূপ, সেই বহ্নির শরণাপন্ন হই। জগন্মূর্তি, সর্বতেজের উৎপত্তি স্থান, মহাযোগেশ্বর, আদিত্য, সর্বতেজের প্রভব প্রজাপতিস্বরূপ সেই বহ্নির শরণাপন্ন হই। যিনি মহাগ্রাস, ত্রিশূলধারী, সর্বযোগীশ্বর, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সেই কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ বহ্নির শরণাপন্ন হই। হে বহ্নি, তুমি বিরূপাক্ষ, মহাব্যাহৃতিস্বরূপ, হিরন্ময়গৃহে অব্যক্ত রূপে স্থিত, মহান এবং অমিততেজা, তোমার শরণাপন্ন হই। যিনি সর্বপ্রাণীর মধ্যে অবস্থিত, সেই বৈশ্বানরের শরণাপন্ন হই। যিনি হব্যকব্য-বাহক ও ঈশ্বর, সেই বহ্নি-দেবের শরণ নিই। যিনি জগৎপ্রসূতি সবিতার আকাশমণ্ডলস্থ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, বরেণ্য, মঙ্গলময় পরমতত্ত্ব, সেই বহ্নির শরণাপন্ন হই। হে হব্যবাহন, আমাকে রক্ষা কর। এই ভাবে অষ্টশ্লোকাত্মক মন্ত্র বহ্নিদেবতার উদ্দেশে জপ করে রামপত্নী যশস্বিনী সীতা উন্মীলিত নয়নে মনে মনে রামকে ধ্যান করতে লাগলেন। তখন ভগবান হব্যবাহন মহেশ্বর যেন তেজ দ্বারা দহন করবার জন্যই অত্যন্ত দীপ্ত হয়ে আবসথ্য অগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন। তিনি রাবণ বধের ইচ্ছায় মায়াময়ী সীতার সৃষ্টি করে রামপ্রিয়া সীতাকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মায়াময়ী সীতাকে নিয়ে সাগরপারে লংকায় চলে গেল।

তারপর রাম ও লক্ষ্মণ রাবণবধ করে সীতাকে গ্রহণের ব্যাপারে শংকাকুলিত হলেন। সেই মায়াময়ী সীতা সকলের বিশ্বাসের জন্য আবার অগ্নিতে প্রবেশ করলেন এবং অগ্নিও সেই সীতাকে দগ্ধ করলেন। উগ্ররশ্মি ভগবান অগ্নি মায়াময়ী সীতাকে দগ্ধ করে রামকে প্রকৃত সীতা দেখালেন। তাই অগ্নি দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয় হলেন। তখন ক্ষীণ-কটি জনকাত্মজা সীতা দু'হাতে স্বামীর দুটি চরণ গ্রহণ করে রামের উদ্দেশে ভূমিতে প্রণাম করলেন। এই রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে রাম আনন্দিত চিত্তে মস্তক দ্বারা নমস্কার করে বহ্নিকে সন্তুষ্ট করলেন। তারপর অগ্নিকে বললেন—ভগবন, আপনি তো এখুনি এঁকে দগ্ধ করলেন। তাহলে আবার সৃষ্ট হয়ে কি করে ইনি আমার কাছে এলেন? সর্বলোকের দাহকারী হব্যবাহন অগ্নিদেব সমস্ত লোকের সামনেই দাশরথি রামকে পূর্বের বৃত্তান্ত যথাযথ বলতে লাগলেন, মিথিলেশ্বর জনক হরপ্রিয়া পার্বতীর তপস্যা করে দেবীর প্রিয়া এই সীতাকে লাভ করেছিলেন। স্বামীর সেবাপরায়ণা, পতিব্রতা, সুশীলা এই সীতাকে রাবণ কামনা করেছে দেখে এঁকে আমি ভবানীর পাশে রেখেছিলাম। রাবণ যে সীতাকে হরণ করেছিল, সেই সীতা ভস্মীভূত। রাবণবধের জন্যই আমি সেই মায়া সীতার সৃষ্টি করেছিলাম। যার জন্য আপনি রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দেখলেন, সেই মায়াময়ী সীতাকে আমি ধ্বংস করে ফেলেছি। এখন লোকের বিনাশকারী রাবণও নিহত। তাই আমি বলছি, এই পাপশূন্যা জানকীকে গ্রহণ করুন এবং নিজেকে অবিনশ্বর কারণরূপ দেবনারায়ণ বলে চিন্তা করুন। বিশ্বতেজা বিশ্বতোমুখ ভগবান অগ্নি এই কথা বলে রামচন্দ্র ও জীবকুলের

দ্বারা সম্মানিত হয়ে অন্তর্হিত হলেন।

পতিব্রতা স্ত্রীদের এই মাহাত্ম্যের কথা বললাম। মুনিরা বলেছেন যে এই হল স্ত্রীলোকদের সর্বপাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত। নানা প্রকার পাপযুক্ত মানুষও যদি সুসংযত হয়ে পুণ্যতীর্থে নিজের দেহ পরিত্যাগ করে, তাহলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। পৃথিবীতে স্থিত পুণ্যতীর্থগুলিতে স্নান করলে সঞ্চিত পাতক থেকে মানুষ মুক্ত হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর মতানুযায়ী এই সব ধর্ম তোমাদের কাছে বললাম, মহেশ্বরের আরাধনার জন্য নিত্যজ্ঞানযোগও বর্ণনা করেছি। যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মহাদেবকে দেখতে পান, অন্য ব্যক্তি শত কল্পেও তাঁকে দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানরূপ পরমধর্ম স্থাপনা করে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক ইহজগতে কেউ নেই। সেই লোকই পরম যোগী। যে এই রকম ধর্ম স্থাপনে সমর্থ হলেও মোহবশত তা করে না, সে মুনি বা যোগযুক্ত হলেও ভগবানের অতিপ্রিয় হতে পারে না। তাই সর্বদা এই জ্ঞান বিতরণ করবে। বিশেষ করে ধর্মযুক্ত শান্ত ও শ্রদ্ধান্বিত ব্রাহ্মণদেরই এ জ্ঞান দান করতে হয়। যে ব্যক্তি এই ব্যাস-ঋষি সংবাদ প্রতিদিন পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধ বা দৈবকার্যে অথবা ব্রাহ্মণের কাছে পবিত্র চিত্তে প্রতি দিন এটি পাঠ করতে হয়। আর ব্রাহ্মণদের প্রতি দিন এটি শ্রবণ করা উচিত। যে মুক্তাত্মা ব্যক্তি এর অর্থ বিচার করে প্রতি দিন শুচি ব্রাহ্মণদের শোনায়, সে দোষের আবরণ পরিত্যাগ করে মহেশ্বরের কাছে গমন করে।

সত্যবতীর পুত্র ভগবান ব্যাস এই রকম বাক্যে মুনিদের ও সূতকে সমাশ্বাস দিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গে প্রায়শ্চিত্তবিবেক নামে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই সঙ্গে ব্যাসগীতাও সমাপ্ত হল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, রোমহর্ষণ, জগতে যে সব মহাতীর্থ ও বিখ্যাত তীর্থ আছে, এখন সেগুলির কথা আমাদের কাছে বল। রোমহর্ষণ বললেন, ব্রহ্মা প্রমুখ মুনিরা পুরাণে যে বিবিধ তীর্থের কথা বলেছেন, সেগুলির কথা আমি বলছি, শুনুন। হে মহর্ষিরা, যে স্থানে স্নান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধ ও দান প্রভৃতির একটি মাত্র করলেও সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র হয়, সেই পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ তীর্থের নাম প্রয়াগ। এটি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ক্ষেত্র। এর মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের আগে বলেছি। কুরুক্ষেত্র নামে আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তাকে দেবগণও বন্দনা করেন। সেই তীর্থে ঋষিদের আশ্রম আছে ও সেই তীর্থ সমস্ত পাপ নাশ করে। দম্ভ আর পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে, বিশুদ্ধাত্মা হয়ে ঐ তীর্থে স্নানের পর যা কিছু দান করা যায়, তা দাতার দুই কুলই পবিত্র করে। গয়া অতি গুহ্য তীর্থ ও পিতৃলোকের কাছে অতি দুর্লভও বটে। সেখানে পিণ্ডদান করলে মানুষের আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি একবারও গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে, তার পিতৃগণ তার দ্বারা উদ্ধার পেয়ে পরমাগতি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মা রুদ্র সর্বলোক-

হিতের জন্য গয়াতীর্থে শিলার উপর তাঁর পদ ন্যস্ত করেছেন। ঐ স্থানে পিণ্ডদান প্রভৃতি দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করতে হয়। গয়াতীর্থে যেতে সমর্থ হলেও যে ব্যক্তি সেখানে যায় না, সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে পিতৃগণ দুঃখ করে থাকেন। তার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়। গয়া সম্বন্ধে পিতৃগণ যে গাথাগুলি গান করেন, মহর্ষিরা এইভাবে তা বলে থাকেন : বংশের যে কেউ গয়ায় যাবে, সে-ই আমাদের উদ্ধার করবে। আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি যদি পাপী ও স্বধর্মবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও গয়ায় যায়, তবু সে আমাদের উদ্ধার করবে। সুশীল ও সদ্গুণযুক্ত বহু পুত্র কামনা করা উচিত। কারণ তাদের মধ্যে কেউ না কেউ গয়ায় যেতে পারে। তাই সমস্ত বর্ণের মানুষ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে গয়ায় গিয়ে একাগ্রচিত্তে বিধান অনুসারে পিণ্ডদান করবে। যে সব মানুষ গয়ায় পিণ্ডদান করে, তারাই ধন্য। তারা পিতৃকুল ও মাতামহকুল—এই দুই কুলেরই সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করে নিজে পরমস্থান প্রাপ্ত হয়। প্রভাস নামে বিখ্যাত আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে।-তাকে সিদ্ধদের আবাস ভূমি বলা হয়। সেখানে ভগবান মহাদেব বাস করেন। ঐ তীর্থে স্নানের পর ব্রাহ্মণ পূজা করলে মানুষ উত্তম অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেবতারা যাঁকে নমস্কার করে থাকেন, সেই ত্র্যম্বক তীর্থে রুদ্রের পূজা করলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় ও সেখানে সুপর্ণাক্ষ নামে মহাদেবকে অর্চনা করলে ও ব্রাহ্মণদের পূজা করলে নিশ্চয় গণাধিপতির পদ লাভ হয়। পরমেষ্ঠী মহাদেবের সোমেশ্বর নামে যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তা সমস্ত ব্যাধি নাশ করে। সেই পবিত্র তীর্থ রুদ্রলোকে বাসরূপ মুক্তি দান করে। বিজয় নামে সুন্দর তীর্থটি সমস্ত তীর্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থে মহাদেবের বিজয় নামে বিখ্যাত একটি লিঙ্গ আছে। এই স্থানে ছ'মাস সংযতাহারী, সমাহিতচিত্ত ও ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করলে ব্রাহ্মণেরা পরম পদ প্রাপ্ত হন। পূর্বদেশে মহাদেবের একাম্র নামে আরেকটি সুন্দর শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। সেই তীর্থে গমন করলে গণপতি হওয়া যায়। এই স্থানে শিবভক্তের উদ্দেশে অল্প পরিমাণেও ভূমি দান করলে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি সার্বভৌম রাজা হয় ও মুক্তিকামী মুক্তি পায়। মহানদীর অতি পবিত্র জল সমস্ত পাপ নাশ করে। গ্রহণের সময়ে ঐ জল স্পর্শ করলে মানুষ সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ, ত্রিভুবন-বিখ্যাত বিরজা নামে আরেকটি নদী আছে। মানুষ তাতে স্নান করলে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ভগবান নারায়ণের পুরুষোত্তম নামে আর একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে পরমপুরুষ শ্রীমৎ নারায়ণদেব বিরাজ করছেন। ঐ স্থানে স্নান করে পরমপুরুষ বিষ্ণুর পূজা করলে ও তার পর ব্রাহ্মণদের পূজা করলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। তীর্থের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ ও সর্বপাপহর গোকর্ণ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। তা পরমেষ্ঠী শম্ভুর বাসভূমি। মহাদেবের অত্যুত্তম লিঙ্গ গোকর্ণেশ্বরকে দর্শন করলে মানুষ বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ও ভগবান মহাদেবের প্রিয় হয়। উত্তর গোকর্ণেও শূলধারী মহাদেবের লিঙ্গ আছে। সেখানে মহাদেবের পূজা করলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। উত্তর গোকর্ণে দেবদেব মহাদেব স্থাণু নামে বিখ্যাত। তাঁকে দর্শন করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। মহাত্মা বিষ্ণুর কুব্জাশ্রম নামে আর একটি অতি পবিত্র স্থান আছে। এই স্থানে মহাপুরুষ বিষ্ণুকে পূজা করলে দেহাবসানে মানুষ বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। এখানেই ত্রিপুরারি রুদ্র দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দেবনারায়ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

এই ক্ষেত্রকে ঋষিরা সেবা করেন। চারদিকে এর পরিমাণ এক যোজন। এটি বিষ্ণুর অতি পবিত্র আলয়। এখানে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বিরাজ করেন। অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর কোকামুখ নামে আর একটি তীর্থ আছে। সেখানে গেলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুর তুল্য রূপ প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর আনন্দবর্ধনকারী আর একটি মহাতীর্থের নাম শালগ্রাম। মানুষ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করলে হৃষীকেশের দর্শন পায়। অতি পবিত্রকারী অশ্বতীর্থে সিদ্ধেরা বাস করেন। সেখানে ভগবান নারায়ণ হয়গ্রীব রূপে সর্বদা অবস্থিত। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এক ত্রিভুবন-বিখ্যাত তীর্থ আছে, তার নাম পুষ্কর। এটি সমস্ত পাপ নাশ করে। সেখানে দেহ রাখলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনে মনেও পুষ্কর তীর্থকে স্মরণ করেন, তিনি সমস্ত পাতক থেকে মুক্তি পান। দেহান্তে তিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন। সেই পুষ্কর ক্ষেত্রে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ আর রাক্ষসেরা সকলেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, মানুষ সেখানে স্নান করলে শুদ্ধ হয় ও পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে পূজা করলে ব্রহ্মার দর্শন পায়। সেখানে অনিন্দিত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হলে মানুষ সমস্ত ঈপ্সিত ফল পায় ও পরলোকে ইন্দ্রত্ব লাভ করে। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা যার সেবা করেন, সেই রকম একটি তীর্থের নাম হল সপ্তগোদাবর। সেখানে মহাদেবকে পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেখানে মঙ্কণক মুনি পরমেশ্বর রুদ্রের শরণাগত ও পঞ্চাক্ষরপরায়ণ হয়ে মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। সেই মুনি 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতে করতে তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। তারপর মঙ্কণক মুনির তপঃসিদ্ধি হল এবং তিনি ভগবান রুদ্রকে সমাগত জেনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। ভগবান রুদ্র মুনির এই নৃত্য দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ রকম ভাবে নাচছ কেন? মঙ্কণক মুনি মহাদেবকে দেখেও বারবার নৃত্য করতে লাগলেন। ভগবান মহেশ্বর তখন মুনিকে গর্বিত দেখে তার গর্ব খর্ব করার জন্য নিজের শরীর বিদীর্ণ করে তাকে ভস্মের রাশি দেখালেন এবং বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার শরীর থেকে উত্থিত এই ভস্মরাশি দেখ। এই হল তপস্যার মাহাত্ম্য। তোমার মতো তপস্বী ঢের আছে। কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি যে গর্বিত হয়ে নাচতে শুরু করেছ, এ তপস্বীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত। দেখ, তোমার চেয়ে তপস্যায় আমি অনেক শ্রেষ্ঠ। বিশ্বদর্শী জগৎসংহারক রুদ্র মুনিকে এই কথা বলে পরম ভাব অবলম্বন করলেন। তখন তাঁর হাজারটি মাথা, হাজারটি চোখ আর হাজারটি পা হল এবং করালদংষ্ট্রা প্রকাশ করে ও ভীষণ দীপ্ত রূপ ধারণ করে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন। তখন মঙ্কণক ঋষি সেই মহাদেবের পাশে আয়তনয়না মনোহর বিলাসযুক্তা, অযুত সূর্যের মতো দীপ্তিময়ী প্রসন্নমুখী রমণীয়া এক দেবীকে দেখলেন। ঐ অমিতদ্যুতিশালিনী দেবী ঈষৎ হাসি নিয়ে বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এই রকম ব্যাপার দেখে জিতেন্দ্রিয় মঙ্কণক মুনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রুদ্রাধ্যায় জপ করে মাথা নত করে ভগবান রুদ্রকে প্রণাম করলেন। ভগবান মহেশ্বর তখন মুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেই ভীষণ রূপ ত্যাগ করে পূর্বের রূপে ফিরে গেলেন আর দেবীও অদৃশ্য হলেন। প্রণত ভক্ত মঙ্কণক মুনিকে আলিঙ্গন করে দেবদেব মহাদেব বললেন, বৎস, ভয় নেই। তোমায় কী দেব, বল। তখন মঙ্কণক মুনি হৃষ্ট হয়ে ত্রিপুরারি মহাদেবকে নতমস্তকে প্রণাম করে একটি কথা জানতে চেয়ে বললেন, হে মহাদেব,

আপনাকে নমস্কার করি। আপনার এই যে বিশ্বতোমুখ অতি ভয়ানক রূপ, এটি আসলে কী? আর যিনি আপনার পাশে বিরাজ করছিলেন, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তিনিই বা কে? এ সব কথা আমি জানতে চাই। মঙ্কণক মুনির কথা শুনে ত্রিপুরদাহক মহেশ্বর নিজের ও দেবীর বৃত্তান্ত এই ভাবে বর্ণনা করলেন।—আমি সহস্রচক্ষু, সমস্ত প্রাণীর আত্মা আর সর্বতোমুখ। আমি সমস্ত সংসারবন্ধন দাহ করি। আমি কালস্বরূপ আর কালহর মহাদেব হর। চেতনাত্মক বিশ্বকে আমিই প্রেরণ করে থাকি। তাই আমিই সেই অন্তর্যামী পুরুষ আর পুরুষোত্তমও আমিই। ত্রিগুণময়ী মূল প্রকৃতি পুরুষোত্তমেরই পরমা মায়া। মুনিরা সেই মায়াশক্তিকেই জগতের উৎপত্তিকারণরূপা সনাতনী বলে থাকেন। সেই পরম অব্যক্ত বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ নিজের মায়া দ্বারা সমস্ত জগৎকে মোহিত করে রাখেন। এ হল শ্রুতির কথা। ঐ নারায়ণস্বরূপে আমি এই সমগ্র জগৎকে এই ভাবে সর্বদা নিজ নিজ কার্যে স্থাপন করে থাকি আর পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে থাকি। সর্বব্যাপী, নিত্য, নির্মল, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ঐ অনাদি নারায়ণ নিজের শক্তিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত হয়ে নিজের মূর্তি প্রকৃতি থেকে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। মায়ার সঙ্গে মিলিত বিশ্বরূপ ভগবান নারায়ণদেবকেই সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বলা হয়। পরমেষ্ঠীর সৃষ্টিকারী স্বভাবের কথা তোমার কাছে সম্যকভাবে বললাম। অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপী আমিই ভগবান অনাদি কালরূপ ও জগতের ধ্বংসকারী। আমি যখন পরম ভাব আশ্রয় করি, তখন মনীষীরা আমাকেই রুদ্র বলে থাকেন। বৎস, যে দেবীকে আমার পাশে দেখেছিলে, তিনি আমারই শক্তি, তাঁর নাম বিদ্যা। তাই তুমি নিজে আমার বিদ্যাদেহ দেখেছ। এই হল সমস্ত তত্ত্বের স্বরূপ। আমিই প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর, আমিই স্থিতির কর্তা বিষ্ণু, সৃষ্টির কর্তা ব্রহ্মা আর সর্বভূতের লয়কারী ভগবান রুদ্র। এ কথা শ্রুতিতে আছে। উৎপত্তি বিনাশ রহিত—এই তিন তত্ত্বই পরব্রহ্মে ব্যবস্থিত। তাই এই তিন পদার্থই ব্রহ্মাত্মক, অব্যক্ত ও অক্ষর। শ্রুতিতে এ রকম বলা হয়ে থাকে। আত্মানন্দময়, তত্ত্বস্বরূপ, চিন্মাত্র, পরমপদ আকাশের মতো সর্বব্যাপী ও অংশশূন্য যে ব্রহ্ম, তা ছাড়া জগতে অন্য পদার্থ আর কিছুই নেই। এ কথা জেনে তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন করে আমার পূজা ও বন্দনা কর। তাহলেই ঈশ্বরকে ঐরূপে দেখতে পাবে। এই সব কথা বলে ভগবান মহাদেব অন্তর্ধান করলেন। তারপর মঙ্কণক মুনি সেই সপ্তগোদাবর তীর্থেই ভক্তি সহকারে রুদ্রের আরাধনা করেছিলেন, ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা সেবিত পবিত্র ও অতুলনীয় এই সপ্তগোদাবর তীর্থ সেবা করলে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সমস্ত পাতক থেকে মুক্ত হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যানপ্রসঙ্গে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, পরমেষ্ঠী রুদ্রের ত্রিভুবনবিখ্যাত, পবিত্র ও অতি বিস্তৃত অন্য একটি তীর্থ আছে। তার নাম রুদ্রকোটি। পূর্বে পুণ্যতম কালে জিতেন্দ্রিয় কোটি ব্রহ্মর্ষি দেবদর্শনের জন্য সেই স্থানে গিয়েছিলেন। ভক্তিমান ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে 'পিনাকপাণি গিরিশকে আমি আগে দেখব, আমি আগে দেখব' এই রকম ভাবে প্রবল কলহ দেখা দিল।

তখন যোগীদের গুরু মহাদেব রুদ্র ব্রহ্মর্ষিদের ভক্তি দেখে কোটি রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই কারণে ঐ তীর্থের নাম রুদ্রকোটি। ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই গিরিগুহাশায়ী মহাদেব পার্বতীপতিকে দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। 'উৎপত্তিবিনাশরহিত ঈশ্বর মহাদেবকে আমিই আগে দেখেছি' এই কথা ভেবে প্রত্যেক ব্রহ্মর্ষিই ভক্তিতে রুদ্রকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। তারপর তারা আকাশে এক নির্মল ও অতি বিপুল জ্যোতি দেখেছিলেন আর সেই জ্যোতিতেই তারা সকলে পরমপদে বিলীন হয়েছিলেন। অতি পবিত্র ঐ মঙ্গলময় তীর্থে ভগবান রুদ্র অধিবাস করেছেন। তাই সেখানে রুদ্রদেবের দর্শন ও অর্চনা করলে রুদ্রের কাছেই বাস করা হয়। মধুবন নামে আর একটি শুভতীর্থ আছে। সেখানে গিয়ে নিয়ম পালন করলে ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ হয়। পদ্মনগরী নামে আর একটি পুণ্যতম ক্ষেত্র আছে। সেখানে গিয়ে পিতৃলোকের পূজা করলে নিজের বংশের শতপুরুষকে উদ্ধার করা যায়। জগতের মধ্যে কালঞ্জর নামে একটি মহাতীর্থ আছে, সেখানে সংহারকর্তা ভক্তপ্রিয় ভগবান মহেশ্বর রুদ্র কালকে বিনষ্ট করেছিলেন। পূর্বকালে শিবভক্ত শ্বেত নামে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ঐ স্থানে বিধিমত শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শিবাভিলাষী হয়ে শিবকে নমস্কার করে শিবের পূজা করেছিলেন। আর ভক্তিযোগ সহকারে শিবে চিত্ত অর্পণ করে সর্বদা রুদ্রমন্ত্র জপ করেছিলেন। তারপর যেখানে রাজর্ষি শ্বেত ছিলেন, সেখানে প্রদীপ্তশরীর কাল ভীষণ শূল হাতে নিয়ে তাঁকে নিজ পুরে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলেন। সর্বভূতের লয়কারী, ভয়ানক, ঘোররূপধারী, প্রচণ্ডতেজা কালকে শূল হাতে আসতে দেখে রাজর্ষি শ্বেত ভীত হলেন। তখন তিনি দুহাতে অত্যুত্তম শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে নতমস্তকে শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। রাজা জপ আর বারবার শিবকে নমস্কার করতে থাকলে কৃতান্ত তার সামনে এসে উপহাস করে 'চলে এসো, চলে এসো' এই কথা বলতে লাগলেন। রুদ্রভক্ত রাজা ভীত হয়ে কৃতান্তকে বললেন, 'একমাত্র মহাদেবের পূজায় রত ব্যক্তিদের ছেড়ে অন্য লোককে বিনাশ কোরো না।' রাজা ভয়াকুল চিত্তে এই কথা বললে ভগবান কৃতান্ত উত্তর দিলেন, 'শিবের অর্চনায় রত লোকই হোক বা আর কেউই হোক, আমার বশীভূত হয় না এমন লোক কে আছে?' সর্বলোকের লয়কারী কাল এই কথা বলে রাজাকে পাশ দিয়ে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু তখনও রাজা শতরুদ্রিয় জপ করে যেতেই লাগলেন। তারপর রাজর্ষি শ্বেত দেখলেন ভূতেশ্বর মহাদেবের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মালায় সজ্জিত, অনাদি, বিপুল তেজোরাশি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। রাজা ঐ তেজের মধ্যে দেবীর সঙ্গে বর্তমান সুবর্ণবর্ণ, চন্দ্রকলায় শোভিত এক তেজোময় পুরুষকে দেখতে পেলেন। তা দেখে তিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন ও বুঝতে পারলেন, আমাদের নাথ আসছেন। তারপর মহাদেবীর সঙ্গে মহেশ্বর রুদ্রকে অল্প দূরে আসতে দেখে এবং রাজর্ষিকে সকলের ঈশ্বর মহাদেবের শরণাগত জেনেও কাল নিঃশঙ্ক চিত্তে তাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পুরাণপুরুষ, ভূতাধিপতি, ভগবান, উগ্রকর্মা দেব রুদ্র তা দেখে কালকে বললেন, 'এ আমার ভক্ত, আমাকে আকুল হয়ে ডাকছে। একে আমার কাছে দিয়ে দাও।' বৃষভবাহন মহাদেবের এই কথা শুনেও কিন্তু কাল নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে সেই শিবভক্তকে পাশ দিয়ে বেঁধে ফেললেন এবং ক্রুদ্ধ ভাবে রুদ্রের দিকে ধাবিত হলেন। কালকে আসতে দেখে বিশ্বমায়ার বিধানজ্ঞ মহাদেব পার্বতীর দিকে কটাক্ষপাত করে অবজ্ঞার সঙ্গে বাঁ পা দিয়ে কালকে আঘাত করলেন। মহেশ্বরের পদাঘাতে অতি ভীষণ

কালের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হল। তখন দেবতাধিপতি মহেশ্বর উমার সঙ্গে বিরাজ করতে লাগলেন। আর সেই রাজর্ষি শ্বেত দেব ঈশ্বর হরকে দেখে সত্ত্বগুণাশ্রয় সেই অব্যয়-পুরুষকে হৃষ্ট মনে নমস্কার করতে লাগলেন ও বললেন, জগতের কারণ ভবকে নমস্কার। বিশ্বমঙ্গলবিধাতা হরকে নমস্কার। ধীমান শিবকে নমস্কার। মোক্ষদায়ী মহাদেবকে নমস্কার। তুমি মহাঐশ্বর্যশালী। তোমাকে বারবার নমস্কার। তোমার রূপের বিভাগ নেই। তুমি মানুষের অধিপতি। তোমাকে নমস্কার। হে গণেশ্বর, তুমি শরণাগতের দুঃখ নাশ কর। তোমাকে নমস্কার। তুমি অনাদি, নিত্য, অভ্যুদয়সম্পন্ন ও বরাহ-শৃঙ্গধারী। তোমাকে নমস্কার। তুমি বৃষকেতন, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুণ্ডমালায় সজ্জিত, তোমাকে নমস্কার। তুমি নটরাজ, তুমি নৃত্যকালে বিচিত্র প্রকার বাহু সঞ্চালন কর। তুমি হর, তোমাকে নমস্কার। তারপর প্রণামপরায়ণ রাজাকে মহাদেব অনুগ্রহ করে নিজের অক্ষয় গণপতি পদ আর শিবের তুল্য রূপ দান করলেন। অনন্তর উমা, পারিষদগণ আর রাজর্ষি শ্বেতকে সঙ্গে নিয়ে, মহর্ষি আর সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত হয়ে মহেশ্বর হর মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে মহেশ কালকে হত্যা করায় লোকনাথ পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রের কাছে গিয়ে বর চাইলেন, কাল বেঁচে উঠুক। ব্রহ্মা বললেন, হে ঈশান, হে বৃষধ্বজ, কালের কোনই দোষ নেই। কারণ আপনিই কালকে ঐ কাজে নিযুক্ত করেছেন। দেবদেব ব্রহ্মার কথা শুনে সেই দেব দেবেশ্বর বিশ্বাত্মা মহেশ্বর বললেন, 'তাই হোক' আর কালও বেঁচে উঠলেন। শোনা যায় এই ভাবেই এই পরমতীর্থের নাম হয়েছিল কালঞ্জর। সেখানে গিয়ে মহাদেবের অর্চনা করলে গণপতির পদ লাভ করা যায়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যান প্রসঙ্গে কালবধবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, দেবদেব মহাদেবের অতি গোপনীয় ও মহৎ আর একটি উৎকৃষ্ট স্থান আছে তার নাম মহালয়। মহালয় তীর্থে দেবাদিদেব ত্রিপুরারি রুদ্র নাস্তিকদের নিদর্শন রূপে শিলাতলে পদন্যাস করেছিলেন। সেই স্থানে ভস্মলিপ্তদেহে শান্ত পাশুপতেরা বেদাধ্যয়নতৎপর হয়ে মহাদেবকে উপাসনা করে থাকেন। সেখানে স্নান করে ভক্তি-সহকারে রুদ্রপদ দর্শন ও অবনতমস্তকে মহাদেবকে নমস্কার করলে রুদ্রের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। দেবদেব মহাত্মা শম্ভুর কেদার নামে আর একটি বিখ্যাত ক্ষেত্র আছে। সেটি সিদ্ধদের অতি পবিত্র বাসস্থান। সেখানে স্নান করে বৃষবাহন মহাদেবকে পূজা করলে এবং অতি পবিত্র জল পান করলে গণপতির পদ লাভ করা যায়। কেদার তীর্থে শ্রাদ্ধ ও দান প্রভৃতি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সংযতাত্মা যোগী ও দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠেরা যার সেবা করেন, সেই প্লক্ষাবতরণ তীর্থে শ্রীনিবাস বিষ্ণুর পূজা করলে বিষ্ণুলোকে সুখে বাস করা যায়। মগধারণ্য নামে আর একটি তীর্থ আছে যার ফল স্বর্গলোক প্রাপ্তি। সেখানে গমন করলে ব্রাহ্মণ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। মহাপাতকের নাশক কনখল নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে। সেখানেই দেবাদিদেব রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেছিলেন। ঐ তীর্থে শুচি ও শ্রদ্ধালু হয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করলে মানুষ সমস্ত

পাপ থেকে মুক্ত হয় ও ব্রহ্মলোকে বাস করে। নারায়ণের অতিপ্রিয় মহাতীর্থ নামে এক পবিত্র তীর্থ আছে ঐ স্থানে হৃষীকেশের অর্চনা করলে শ্বেতদ্বীপে বাস করা যায়। তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতি পবিত্র আর একটি তীর্থের নাম শ্রীপর্বত। এই স্থানে প্রাণত্যাগ করলে মানুষ মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় হয়। এই স্থানে দেবীর সঙ্গে মহেশ্বর রুদ্র সন্নিহিত আছেন। এখানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সর্বপাপনাশিনী অতি পবিত্র গোদাবরী নামে নদীতে স্নান করে বিধান অনুসারে দেবতা ও পিতৃলোকের তর্পণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সহস্র গোদানের ফল লাভ করা যায়। পূতসলিলা ও অতিবিপুলা এক পবিত্র নদী আছে, তার নাম কাবেরী। তাতে স্নান করে তর্পণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে তিন রাত্রি উপবাস বা এক রাত্রি উপবাস করে ব্রাহ্মণদের তীর্থসেবা করতে বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তির বাক্য ও মন শুদ্ধ, হস্ত ও পদ সংযত, যে ব্যক্তি লোভ-শূন্য ও জিতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তিই সমস্ত তীর্থের ফল পায়। ত্রিজগতে বিখ্যাত এক মহাতীর্থ আছে। তার নাম স্বামিতীর্থ, দেবতাদের দ্বারা বন্দিত স্কন্দ সর্বদা সেই স্থানের নিকটে থাকেন, সেখানে কুমার ধারায় স্নান করে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করলে এবং ষড়াননদেব স্কন্দকে পূজা করলে মৃত্যুর পর কার্তিকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা যায়। তাম্রপর্ণী নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত এক নদী আছে। সেই নদীতে স্নান করে ভক্তিসহকারে বিধানমতে পিতৃলোকের তর্পণ করলে পাপকারী ব্যক্তি পিতৃগণকে উদ্ধার করতে পারে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চন্দ্রতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে কাবেরীর উদ্ভব হয়েছে। এই স্থানে যে বস্তু দান করা যায়, তা অক্ষয় ফল দেয় এবং মৃত ব্যক্তিদের তাতে সদ্গতি হয়। হে দ্বিজগণ, যে সব ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিন্ধ্যপাদে দেবাদিদেব সদাশিবকে দর্শন করেন, তাদের আর যমের মুখ দেখতে হয় না। দেবিকা নদীতে সিদ্ধদের দ্বারা সেবিত বৃষ নামে একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে স্নান করে তর্পণ করলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি তো হয়ই, তার উপর যোগসিদ্ধিও লাভ হয়। সর্বপাপনাশন দশাশ্বমেধিক নামে একটি তীর্থ আছে। এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ল্যভ করে। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিশোভিত পুণ্ডরীক নামে একটি তীর্থ আছে। সমাহিত হয়ে ঐ তীর্থে গেলে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এই তীর্থে ব্রহ্মার পূজা করলে ব্রহ্মলোকে সম্মানের সঙ্গে বাস করা যায়। সরস্বতী নদী যেখানে অন্তর্হিত হয়েছে, সেই স্থান, রমণীয় প্লক্ষ প্রস্রবণ, ব্যাসতীর্থ, পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক এবং যমুনার উৎপত্তিস্থান—এই সব তীর্থ সমস্ত পাপ বিনাশ করে। পিতৃগণের দুহিতা দেবীরূপা গন্ধকালী নামে বিখ্যাতা একটি নদী আছে। ঐ নদীতে স্নান করলে স্বর্গ লাভ হয় এবং ঐ নদীতে প্রাণ ত্যাগ করলে জন্মান্তরে জাতিস্মর হওয়া যায়। সিদ্ধ আর চারণদের দ্বারা সেবিত কুবেরতুঙ্গ নামে পাপনাশক আর একটি তীর্থ আছে। এই তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করলে কুবেরের অনুচর হওয়া যায়। উমাতুঙ্গ তীর্থে রুদ্রবল্লভা উমাদেবী সর্বদা বিরাজ করেন। ঐ স্থানে সেই মহাদেবীকে পূজা করলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ভৃগুতুঙ্গ তীর্থে তপস্যা, শ্রাদ্ধ আর দান করলে পিতৃকুল আর মাতামহকুলের সাতপুরুষ পর্যন্ত পবিত্র হয়। আমরা এই রকমই মনে করি। কাশ্যপের এক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে, তার নাম কালসর্পি। পাপক্ষয়ের জন্য ঐ

তীর্থে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ ও দান করবে। দশার্ণ তীর্থে দান, শ্রাদ্ধ, হোম, তপস্যা আর জপ করলে সর্বদা অক্ষয় অব্যয় ফল হয়। দ্বিজাতিদের দ্বারা সেবিত কুরুজাঙ্গল নামে একটি তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে বিধান অনুসারে দান করলে ব্রহ্মলোকে গমন করে আদর লাভ করে। বৈতরণী মহাতীর্থে, স্বর্ণবেদীতে, ব্রহ্মপৃষ্ঠে, ব্রহ্মার অতি মনোহর সরোবরে, পুণ্যজনক ভরতাশ্রমে, পবিত্র মনোহর গৃধ্রবনে, মহাহ্রদে ও কৌশিকী নদীতে দান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সর্বভূতের হিতের জন্য ধীমান মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে নাস্তিকদের কাছে প্রমাণ দেবার জন্য পা রেখেছিলেন। সাপ যেমন পুরোনো খোলস ছেড়ে ফেলে, সেই রকম ঐ তীর্থে ধর্মপরায়ণ মানুষও অল্প কালেই পাপকে পরিত্যাগ করতে পারে। মুণ্ডপৃষ্ঠের উত্তরে ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা সেবিত ত্রিভুবনখ্যাত কনকনন্দা নামে এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানের নদীতে স্নান করলে অতি মন্দ চরিত্রের ব্রাহ্মণরাও স্বর্গে যেতে পারেন এবং যে কোন সময়ে দান বা শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় ফল হয়। এ কথা মুনিরা বলেছেন। মানুষ ঐ স্থানে স্নান করলে পাপ ধুয়ে ফেলে তিনটি ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে। মানস সরোবরে স্নান করলে সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ স্থানে যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে দৃঢ় ভক্তির সঙ্গে শ্রাদ্ধ করে সে দিব্যভোগ্য বস্তুসমূহ লাভ করে এবং মোক্ষের পথ খুঁজে পায়। আশী হাজার যোজন বিস্তৃত, নানা প্রকার ধাতুতে সজ্জিত, সিদ্ধ ও চারণ সমাকুল, দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত হিমবান পর্বত আছে। ঐ পর্বতে সুষুম্না নামে একটি অতি রমণীয় পুষ্করিণী আছে। ঐ স্থানে গেলে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মহত্যাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন। সেখানে শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় ফল ও দান করলে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ হয় আর পিতৃলোকের উদ্ধার করা যায়। এমন কি ঊর্ধ্বতন দশ ও নিম্নতন দশ পুরুষেরও উদ্ধার সম্ভব হয়। হিমবান পর্বত আর গঙ্গা সব জায়গাতেই পবিত্র। যে সব নদী সমুদ্রে পড়েছে তারা আর সমস্ত সমুদ্র বিশেষ ভাবে পুণ্যজনক। বদরিকাশ্রমে গেলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। সেই স্থানে সনাতন দেব নারায়ণ হরি নর ঋষির সঙ্গে বাস করছেন। অত্যন্ত পবিত্র সেই তীর্থ মহাদেবের প্রিয়। সেখানে দান ও জপ করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়; কেউ সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধ করলে তার সমস্ত পিতৃগণ উদ্ধার পান। অতি পবিত্র দেবদারু বন নামে তীর্থে সিদ্ধ আর গন্ধর্বেরা বাস করেন আর স্বয়ং মহাদেব বিরাজ করেন। সেখানে দান করলে মহাফল লাভ হয়। মহাদেব এই স্থানে বাসকারী সমস্ত মুনিকে মোহিত করেছিলেন, পরে ঐ শ্রেষ্ঠ মুনিরা পুজা করলে ভগবান মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে তোমরা এই রমণীয় শ্রেষ্ঠ আশ্রমে বাস করবে। তাহলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। ইহলোকে ধর্মপরায়ণ যে সব মানুষ এই স্থানে আমার অর্চনা করবে, আমি তাদের অবিনশ্বর গণপতি পদ দান করব। আমি এখানে নারায়ণের সঙ্গে সর্বদা বাস করব। এই স্থানে প্রাণত্যাগ করলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, যে সব ব্যক্তি অন্য দেশে বাস করেও এই তীর্থের স্মরণ করবে, তাদের সমস্ত পাপ আমি নাশ করব। এই স্থানে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম, পিণ্ডদান, ধ্যান, জপ, ব্রত প্রভৃতি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। তাই মহাদেবের দ্বারা সেবিত পবিত্র দেবদারু বনকে যে করে হোক ব্রাহ্মণদের দর্শন করা উচিত। যেখানে ঈশ্বর মহাদেব আর পুরুষোত্তম বিষ্ণু বাস করছেন, সেইখানে গঙ্গা তীর্থ আর দেবালয়গুলি সর্বদাই উপস্থিত।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যানবিষয়ে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিরা বললেন, সূত, ভগবান বৃষকেতন কেন দেবদারু বনে গিয়ে ব্রাহ্মণদের মোহিত করেছিলেন, সে-কথা আমাদের বল। সূত বললেন, যে দেবদারু বনকে দেবতা আর সিদ্ধেরা সেবা করে থাকেন, সেইখানে পূর্বকালে হাজার হাজার মুনি স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে তপস্যা করেছিলেন। ঐ মহর্ষিরা নানা প্রকার কাম্য কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়ে বিবিধ যজ্ঞ আর তপস্যা করতে লাগলেন। তখন কামনাসক্ত-চিত্ত ঐ মুনিদের দোষ দেখিয়ে দেবার জন্য ভগবান মহাদেব দেবদারু বনে এসে উপস্থিত হলেন। মহাদেব মহেশ্বর শঙ্কর বিশ্বগুরু ভগবান বিষ্ণুকে পাশে নিয়ে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের গতিলীলায় অলস বাহু দুটি জানু পর্যন্ত লম্বিত, স্থূল দেহ, চক্ষু দুটি সুন্দর, অঙ্গে সুবর্ণের অলঙ্কার, মুখখানি পূর্ণ চন্দ্রের মতো—শ্রী যেন উপচে পড়ছে। মত্ত হস্তীর মতো তাঁর গমন ভঙ্গী, তিনি দিগম্বর, নানারত্নযুক্ত সুবর্ণ-ময় মালায় সজ্জিত। মহাদেবের মুখে অল্প অল্প হাসি। তাঁকে উনিশ বছর বয়সী একটি কিশোরের মতো দেখাচ্ছিল। এই রকম বেশে ভগবান মহাদেব সেখানে এলেন। যে অনন্ত, অবিনাশী পুরুষ হরি সমস্ত লোকের উৎপত্তির কারণ, সেই বিষ্ণু স্ত্রীবেশ ধারণ করে মহাদেবের অনুগমন করতে লাগলেন। তিনি যে মনোহর স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন তার মুখটি পূর্ণ চন্দ্রের মতো, পয়োধর পীন ও উন্নত, চক্ষু দুটি সুন্দর, হাসিটি পবিত্র। এই মূর্তি লীলাচঞ্চল, শ্যামল আর সুপ্রসন্না। বিষ্ণুর পরণে পীতবসন, গতিভঙ্গীটি রাজহংসের মতো সুন্দর। চলার সময়ে তাঁর নূপুর দুটি ঝঙ্কার তুলছিল।

ভগবান মহেশ্বর নিজের মায়ায় জগৎকে মোহিত করে স্ত্রীবেশধারী হরির সঙ্গে এই ভাবে দেবদারু বনে বিচরণ করতে লাগলেন। বিশ্বেশ্বর পিনাকী মহাদেবকে এই ভাবে বিচরণ করতে দেখে সেখানকার নারীরা মায়ায় মোহিত হয়ে মহাদেবের অনুগমন করতে লাগল। ঐ সব নারীদের পতিব্রতা বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু এখন মহাদেবের ঐ রূপ দেখে তারা কামজর্জর হল এবং তাদের বস্ত্র ও আভরণ খুলে পড়ে যেতে লাগল। এই ভাবে বারাঙ্গনার মতো নির্লজ্জ হয়ে তারা শিবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগল। ঋষিদের তরুণ পুত্রেরা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এখন কামার্ত হয়ে স্ত্রীবেশধারী হৃষীকেশের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। বিলাসিনী নারীরা পত্নীর সঙ্গে মহাদেবকে অতি সুন্দর ও অদ্বিতীয় নায়করূপে দেখে নাচতে গাইতে শুরু করল আর মাঝে মাঝে ইচ্ছার বশে আলিঙ্গনও করতে লাগল। সেই মুনিকুমাররা কাছে এসে আদিদেব স্ত্রীবেশী বিষ্ণুকে দেখে অল্প অল্প হাসতে লাগলেন ও নাচ গান করতে লাগলেন। কেউ বা আবার ভ্রূভঙ্গ করতে লাগলেন। এই ভাবে তারা তাঁর সঙ্গে যেতে লাগলেন। তখন সেই মায়াবী মুরারি বাসুদেব ঐ স্ত্রীসঙ্ঘের ও মুনিকুমারদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের মনে উপভোগ ও প্রবৃত্তির জন্ম দিতে লাগলেন। মায়ামোহিত হওয়ায় তারা ঐ উপভোগ যেন সম্পূর্ণ ভাবেই অনুভব করতে পারল। অনন্ত শক্তিযুক্তা শক্তিপ্রধানা পার্বতীর সঙ্গে অবস্থানের সময়ে মহাদেবের যেমন শোভা হয়, সেই ঋষিপত্নী আর স্ত্রীবেশধারী মাধবের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবগণের প্রভু বিশ্বনাথেরও সেই রকম শোভা হয়েছিল। সেই সময়ে তমোদর্শী মহাদেব নারীগণের প্রকৃতিতে ভর করলেন আর আদিদেব নারায়ণ যুবকদের স্বভাবে ভর করে তাদের চালিত করতে লাগলেন।

রুদ্র নারীদের আর কেশব পুত্রদের মোহিত করছেন দেখে মুনিরা ক্রুদ্ধ হলেন। ঋষিরা হরমায়ায় মোহিত হয়ে দেবদেব কপর্দীকে উদ্দেশ্য করে যারপরনাই নিষ্ঠুর বাক্য বলতে লাগলেন এবং নানা প্রকার অভিশাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু আকাশে সূর্যের দীপ্তি থাকলে যেমন তারাদের প্রভা ফলবতী হয় না, সেই রকম মুনিদের অভিশাপ মহাদেবের কাছে কোনই ফল উৎপাদন করতে পারল না। মায়ামোহিত তপস্বী ব্রাহ্মণেরা শিবকে ভর্ৎসনা করে শিবের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে? ভগবান মহেশ্বর বললেন, সুব্রতগণ, আমি আপনাদের সঙ্গে তপস্যা করার জন্য এই জায়গায় পত্নীর সঙ্গে এসেছি। মহাদেবের এই কথা শুনে ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিরা বললেন, তপস্যা করতে গেলে বস্ত্র পরিধান তবু করতে পারো, কিন্তু ভার্যাকে ত্যাগ করতে হবে। তখন মহাদেব হেসে উঠে পাশে স্থিত জনার্দনের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, আপনারা সকলে নিজের নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যাপারে সর্বদাই ব্যস্ত। তাহলে এ রকম ধর্মজ্ঞ ও শান্তচিত্ত হয়েও কি করে বলছেন যে আমাকে পত্নী ত্যাগ করতে হবে? ঋষিরা বললেন, আমরা শাস্ত্রে তো বলেই দিয়েছি যে ব্যভিচারিণী পত্নীকে স্বামী ত্যাগ করবেন। তোমার এই সৌভাগ্যবতী পত্নীটি ব্যভিচার করছে। তাই তাকে ত্যাগ করবে। মহাদেব বললেন, ব্রাহ্মণ, আমার এই পত্নী কখনো মনে মনেও অন্যকে কামনা করে না। তাই একে আমি কখনই ত্যাগ করব না। ঋষিরা বললেন, রে অধম পুরুষ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ব্যভিচারিণী। তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তাই শীঘ্র এখান থেকে চলে যা। ঋষিদের কথা শুনে মহাদেব বললেন, আমি সত্য কথাই বলেছি। তোমাদের এঁকে ব্যভিচারিণী বলে মনে হয় তো হোক। এই বলে মহাদেব ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর হরির সঙ্গে ভিক্ষার্থী হয়ে পরমেশ্বর মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে গেলেন। দেবদেব ভিক্ষার্থী হয়ে আসছেন দেখে বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী এগিয়ে গিয়ে ভক্তি সহকারে তাঁকে নমস্কার করলেন। তারপর পা ধুইয়ে দিয়ে পরিষ্কার আসনে বসতে দিলেন। ব্রাহ্মণদের দণ্ডাঘাতে তাঁর শরীর ভগ্ন ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দেখে বিষণ্ণ মুখে নানা রকম ঔষধ দিয়ে বেঁধে দিলেন এবং ঘটা করে পত্নীর সঙ্গে উপস্থিত যোগীর পূজা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনার আচার কী? এ সব কথা বলুন। ভগবান বললেন, আমি এক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। ব্রহ্মময় এই যে বিশুদ্ধ মণ্ডল সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছেন, ইনিই আমার দেবতা। আমি সর্বদা নিশ্চল চিত্তে তাঁরই ভাবনা করে থাকি। এই কথা বলে শ্রীসমন্বিত মহাদেব অরুন্ধতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। ঋষিরাও আবার দণ্ড, যষ্টি আর মুষ্টির দ্বারা তাঁকে তাড়না করতে লাগলেন। তারপর শিবকে উলঙ্গ ও বিকৃত-চিত্তযুক্ত হয়ে ভ্রমণ করতে দেখে ঋষিরা বললেন, রে দুর্মতি, তুই এই লিঙ্গ উপড়ে ফেল। মহাযোগী শঙ্কর তাঁদের বললেন, যদি আমার এই লিঙ্গের উপর তোমাদের এতই রাগ, তবে না হয় উপড়েই ফেলছি। এই বলে ভগদেবতার নেত্র অপহরণকারী ভগবান লিঙ্গ উপড়ে ফেললেন। কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যেই তারা আর মহাদেব, কেশব বা লিঙ্গ কাউকেই দেখতে পেলেন না। তখন সমস্ত লোকের ভীতি উৎপাদক নানা উৎপাত উপস্থিত হল। সহস্ররশ্মি সূর্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল, পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল, সমস্ত গ্রহ নিষ্প্রভ হয়ে গেল, মহাসাগর উত্তাল হয়ে উঠল। এমন সময় অত্রি মুনির পত্নী পতিব্রতা অনসূয়া স্বপ্ন দেখলেন। তিনি ভয়ে আকুল হয়ে সেই ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বললেন, আমরা যাঁকে এই

মাত্র দেখেছি, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান মহেশ্বর। নিজের তেজে সমস্ত বনকে উদ্দীপ্ত করে নারায়ণের সঙ্গে তিনি আমাদের গৃহে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন। অনসূয়ার কথা শুনে মহর্ষিরা সকলে ভয় পেলেন এবং মহাযোগী বিশ্বকর্তা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। নানা রকম আশ্চর্য বস্তুতে সজ্জিত, সহস্র প্রভায় উজ্জ্বল, জ্ঞান-ঐশ্বর্য প্রভৃতি যুক্ত রমণীয় আসনে তখন সাবিত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মা উপবিষ্ট ছিলেন। প্রভুকে তখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ নিষ্পাপ যোগীরা আর মূর্তিধারী চার বেদ উপাসনা করছিলেন। ব্রহ্মার মুখ হাস্যময়, ভ্রূ দুটি রমণীয়, চোখ দুটি সুন্দর। তাঁর চারটি মুখ, বাহুগুলি বিশাল। সেই ছন্দোময় স্বয়ম্ভু পরমপুরুষ তখন চারদিক আলো করে বসে ছিলেন। পবিত্র, প্রসন্নবদন দেবশরীর ব্রহ্মাকে দেখে ঋষিরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। চারটি মূর্তিতে বিদ্যমান, দেবদেব, চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে মুনিদের বললেন, হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, তোমরা কেন এসেছ? তখন মুনিরা জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে পরমাত্মা ব্রহ্মাকে বললেন—

এক অতি সুন্দর পুরুষ সর্বাঙ্গসুন্দরী ভার্যাকে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে পবিত্র দেবদারু বনে এসেছিল। সেই ব্যক্তি তার দৈহিক সৌন্দর্যে আমাদের পত্নী আর কন্যাদের মুগ্ধ করেছিল এবং তার ভার্যা আমাদের পুত্রদের নষ্ট করেছিল। তাকে আমরা বহু শাপ দিই। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়। পরে তাকে আমরা প্রচণ্ড ভাবে তাড়না করি ও তার লিঙ্গটি উৎপাটিত করি। লিঙ্গ উৎপাটিত করার পরেই ঐ ভগবান, তার ভার্যা আর ঐ উৎপাটিত লিঙ্গ—সমস্তই অদৃশ্য হয় এবং সমস্ত জীবের ভীতি উৎপাদক ঘোর সমস্ত উৎপাত শুরু হয়। দেব, সেই পুরুষ কে? পুরুষোত্তম, আমরা ভয় পেয়েছি। ব্রহ্মণ, এই জগতে যা কিছু হয়, সবই আপনি জানেন। তাই উপযুক্ত অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা করুন।

মুনিরা তাঁকে এই কথা জানালে বিশ্বাত্মা কমলযোনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি পুটে মহাদেবের ধ্যান করে বলতে লাগলেন, হায় হায়, আজ তোমাদের সর্বনাশ হয়েছে। ধিক তোমাদের ঐ দেবদারু বনকে, ধিক তোমাদের তপস্যাকেও। তোমরা যে এই দারু বনে তপস্যা করছ, সে সবই বিফল। রাশি রাশি পুণ্যফলের দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায়, নিধিসমূহের মধ্যে নিধিস্বরূপ সেই ভগবান মহাদেবকে তোমরা পেয়েও হেলায় হারালে। মোহিত হয়ে তোমরা নিষ্ফল ভাবকে আশ্রয় করেছিলে। যোগী আর যতিরা যে নিধিকে সর্বদা সযত্নে আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, হায়, সেই নিধিকে পেয়েও তোমরা উপেক্ষা করলে। যাঁকে পেয়ে দেবতাদের সমস্ত ঐশ্বর্য অবিনশ্বর হয়েছে, হায় রে, সেই অক্ষয় দেবকে পেয়েও তোমরা বুঝতে পারলে না। যাঁকে সর্বদা অর্চনা করে আমি বিশ্বপতি হয়েছি, সেই পরমনিধি মহাদেবকে পেয়েও তোমরা অবহেলা করলে। তোমরা কী দুর্ভাগা। যিনি প্রসিদ্ধ, অব্যয়, দিব্য ঐশ্বর্যের আধার, সেই নিধিস্বরূপ পরমব্রহ্মকে পেয়েও এ কী করলে। এঁকে দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর বলে জানবে। তাঁর পরমপদ কিছুতেই জানা যায় না। সহস্র যুগের শেষে কি দেবতা, কি ঋষি, কি পিতৃলোক, সমস্ত দেহীরই ধ্বংস হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ দেব অবিনশ্বর। এই ভগবান মহেশ্বর কালস্বরূপ হয়ে সমস্ত প্রজাসঙ্ঘকে ধ্বংস করেন। ইনিই আবার নিজের তেজে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করে থাকেন। ইনি সমস্ত ভুবনের অধিপতি। ইনি চক্রধারী ও বিষ্ণুস্বরূপ। ইনি সত্যযুগে যোগী, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে কাল আর কলিতে ধর্মকেতু। রুদ্রের ত্রিগুণাত্মক তিন মূর্তি—তার দ্বারাই তিনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন। তাঁর এক মূর্তি তমোগুণ প্রধান অগ্নি, দ্বিতীয় মূর্তিটি রজোগুণ প্রধান ব্রহ্মা আর তৃতীয়টি সত্ত্বগুণ প্রধান বিষ্ণু।

এ কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এঁর মঙ্গলময় নিত্য অন্য একটি মূর্তি আছে। তা দিগম্বর ঐ মূর্তিতে পরব্রহ্ম যোগযুক্ত হয়ে নিত্য অবস্থান করেন। তোমরা যাঁকে ঐ দেবের পার্শ্ববর্তিনী ভার্যা বলে নির্দেশ করলে, তিনি সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ দেব। তাঁর থেকেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং তাঁতেই লয় পাবে। তিনি সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন, অথচ তিনিই পরমা গতি। তিনিই সহস্রশীর্ষা, সহস্রচক্ষু আর সহস্রচরণ, পুরুষ, অদ্বিতীয় প্রধান, পরমাত্মা, পুরাণাত্মা ও অক্ষয় হরি। একমূর্তি অনন্তাত্মা নারায়ণকেই বেদে চতুর্বেদ, চতুর্মূর্তি, ত্রিগুণ আর পরমেশ্বর বলে কীর্তন করা হয়েছে। জলময়শরীর প্রভু সেই পরম ব্রহ্মের গর্ভস্বরূপ। মোক্ষকামী ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার মন্ত্র দ্বারা এঁরই স্তব করে থাকেন। ভগবান পুরুষোত্তম কল্পশেষে সমস্ত বিশ্বকে সংহার করার পর যে যোগামৃত আস্বাদন করে অধিষ্ঠান করেন, সেটিই বিষ্ণুর পরমপদ। এঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বৃদ্ধি নেই। ইনি অজ, বিশ্বদর্শী। বেদবিদরা এঁকেই অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি বলে থাকেন। তারপর প্রলয় কাল কেটে গেলে ভগবান জগৎ সৃষ্টি করতে অভিলাষী হয়ে জলে বীজ নিক্ষেপ করেন। জলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ঐ বীজকেই তোমরা এই ব্রহ্মা আর বিশ্ব বলে জানো। আমিই সেই মহাত্মা, বিশ্বতোমুখ, মহাপুরুষ ব্রহ্মা। তাঁর মায়ায় মোহিত বলে সকলের জনক সেই দেবদেব মহাদেব ভূতেশ্বর হরকে তোমরা জানতে পারো না। এই অনাদি ভগবান মহাদেব হরই বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও সংহার করে থাকেন। তাঁর কোন বিকার নেই, তাঁর থেকে কোন পদার্থই ভিন্ন নয়। সেই যোগমায়ারূপ শরীরধারী প্রভুই আমাকে বেদসমূহ দান করেছেন। সেই মায়াবানই মায়ার দ্বারা সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি ও বিকার সাধন করেন। এ কথা জেনে মুক্তির জন্য তোমরা সেই শিবের শরণাপন্ন হও।

ভগবান ব্রহ্মা এই রকম বললে মরীচি প্রমুখ মহর্ষিরা সমাহিত হয়ে সর্বব্যাপী দেব ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সর্বদেবেশ্বর, আমরা কিভাবে আবার সেই মহেশ্বরের দর্শন পাব, সে-কথা বলে দিন। আপনি তো শরণাগতকে পরিত্রাণ করেন। ব্রহ্মা বললেন, তাঁর যে লিঙ্গকে তোমরা ভূমিতে পড়ে যেতে দেখেছিলে, সেই লিঙ্গের মতো দেখতে আর একটি লিঙ্গ নির্মাণ কর, তার পর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সযত্নে নানা প্রকার বৈদিক নিয়মে পূজা কর। তোমরা বন্ধু আর পুত্রদের সঙ্গে মিলে শতরুদ্রিয় পাঠ আর পরম তপস্যা অবলম্বন করে, ঋক, যজুঃ ও সামবেদস্থিত শাঙ্কর মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করে সমাহিত ভাবে পূজা কর এবং সকলেই কৃতাঞ্জলি পুটে ভগবান শূলপাণির শরণাপন্ন হও। তাহলেই অসংস্কৃতাত্ম পুরুষেরা যাঁকে সহজে দেখতে পায় না, সেই দেবাধিপতি মহাদেবকে দেখতে পাবে।

এরপর মহর্ষিরা অমিততেজা বরদাতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে আবার দেবদারু বনে ফিরে গেলেন। পরম পদার্থের বিষয়ে অনভিজ্ঞ মহর্ষিরা বীতরাগ ও মাৎসর্যশূন্য হয়ে নানা প্রকার স্থণ্ডিল, পর্বত গুহা, নির্জন শুভ নদীতীর প্রভৃতি স্থানে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে মহাদেবের আরাধনা করতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেবল শৈবাল-ভোজন করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন, কেউ জলের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। কেউ বা অনাবৃত স্থানে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাত্র মাটিতে স্পর্শ করে উপবিষ্ট রইলেন। কেউ আবার দন্তের সাহায্যেই ভোজ্যবস্তুকে তুষ শূন্য করে ভোজন করতে লাগলেন, কেউ বা শিলার উপরেই ভোজ্য বস্তু কুটে নিয়ে ভক্ষণ করতে লাগলেন। কেউ আবার শাক পাতা খেয়েই

জীবন ধারণ করতে লাগলেন। কেউ স্নানপরায়ণ হয়ে কেউ বা রশ্মি মাত্র পান করে, কেউ বৃক্ষমূল আশ্রয় করে, কেউ বা শিলায় শুয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এই ভাবে তারা তপস্যার দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করে কালযাপন করতে লাগলেন।

তখন শরণাগতের দুঃখ-দূরকারী ভগবান বৃষধ্বজ হর ঠিক করলেন যে তাদের অনুগ্রহ করার জন্য জ্ঞান দান করবেন। দেবদেব পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়ে সেই সত্যযুগে হিমালয়ের চূড়ায় রমণীয় দেবদারু বনে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে তাঁর চক্ষু দুটি রক্ত পিঙ্গল বর্ণের, সমস্ত শরীর ভস্মে লিপ্ত; তিনি দিগম্বর, তাঁর বেশ বিকৃত আর হাতে রয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গার। কখনো তিনি ভয়ানক ভাবে হাসতে লাগলেন, কখনো বিস্মিত হয়ে গান করতে লাগলেন, কখনো শৃঙ্গার রসে আবিষ্ট হয়ে নাচতে লাগলেন, কখনো বার বার চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি ভিক্ষুর বেশে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ও বার বার অন্ন প্রভৃতি চাইতে লাগলেন। এই রকম মায়াময় রূপ ধরে গিরিকন্যা গৌরীকে পাশে নিয়ে দেব পিনাকী ঐ বনে উপস্থিত হলেন। এর আগে নারায়ণ যেমন রূপ ধরেছিলেন, গৌরীও সেই রকম রূপ ধরে দেবদারু বনে গিয়েছিলেন। দেবীর সঙ্গে দেব কপর্দীকে আসতে দেখে মুনিরা ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন ও নানা প্রকার বৈদিক মন্ত্র ও শুভ মাহেশ্বর স্তোত্র দ্বারা, কেউ বা আবার অথর্বশিরোমন্ত্র ও রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করে সন্তোষ উৎপাদন করতে লাগলেন। ঋষিরা বললেন, তুমি দেবাদিদেব, তোমাকে প্রণাম। তুমি মহাদেব, তোমাকে প্রণাম। তুমি ত্র্যম্বক, তোমাকে প্রণাম। তুমি দিগম্বর, তুমি মায়াবী, তুমি পিনাকী। প্রণামপরায়ণ হয়ে সকলেই তোমার কাছে নত হয়, কিন্তু প্রণাম করার জন্য তুমি কারো কাছে নত হও না। তোমাকে প্রণাম। তুমি অন্তকেরও ধ্বংসকারী, তুমি সকলের সংহারকর্তা, তোমাকে নমস্কার। নৃত্যশীল ও ভৈরবরূপী তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অর্ধনারীশ্বর, তুমি যোগী, তুমি গুরু। তোমাকে প্রণাম। তুমি শান্ত, সংযত ও তপস্বী হর। তোমাকে প্রণাম। তুমি বিভীষণ রুদ্র, তুমি ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, তোমাকে প্রণাম। তুমি বার বার জগৎকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হও, তোমাকে প্রণাম। হে শিতিকণ্ঠ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অঘোর মূর্তি হয়েও ঘোর মূর্তি, তুমি বামদেব, তোমাকে প্রণাম। তুমি কনকমালা ধারণ করে আছ, তুমি দেবীর প্রিয় কাজ করে থাকো। তোমাকে নমস্কার। তুমি গঙ্গাজলের ধারার আধার, তুমি শম্ভু, পরমেষ্ঠী। তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগাধিপতি, ভূতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তোমার শরীর ভস্মে লিপ্ত। তোমাকে নমস্কার। তুমি হব্যবাহক অগ্নিস্বরূপ, দংষ্ট্রী আর হব্যরেতা। তোমায় নমস্কার। তুমি ব্রহ্মার শির হরণ করেছিলে, তুমি কালরূপী, তোমায় প্রণাম। আমরা তোমার গতি-আগতি কিছুই জানি না। হে বিশ্বেশ্বর, হে মহাদেব, তুমি যে-ই হও না কেন, তোমায় নমস্কার। তুমি প্রমথনাথ, তুমি শুভ সম্পদ দান কর। তোমাকে প্রণাম। তোমার হাতে ধরা রয়েছে নরমুণ্ড, তুমিই আরাধ্যতম, তোমাকে প্রণাম। তুমি কনকপিঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বারি-লিঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বহ্নিলিঙ্গ, তুমিই সূর্যলিঙ্গ, তুমিই জ্ঞানলিঙ্গ। তোমাকে প্রণাম। ভুজঙ্গেরাই তোমার মালা, কর্ণিকার তোমার প্রিয়। তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীটে কুণ্ডলে সজ্জিত, তুমি কালেরও কাল। তোমাকে নমস্কার। হে বামদেব, হে দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বর, আমরা অজ্ঞান বশে যা করেছি তা ক্ষমা কর। তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ। হে শঙ্কর, তোমার আচরণ বিচিত্র, অত্যন্ত গোপনীয় ও দুর্বোধ্য। ব্রহ্মাদি

দেবগণও অতি কষ্টে তোমাকে জানতে পারেন। মানুষ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানবশে যা কিছু কর্ম করে থাকে, সে সবই ভগবানরূপে তুমি যোগ মায়ার দ্বারা করছ।

অভিনিবিষ্ট চিত্তে মুনিরা মহাদেবকে এই ভাবে স্তব করলেন, তারপর প্রণাম করে বললেন, আগে আপনার যে রূপ দেখেছি, সেই রূপ আবার দেখতে চাই। উমাসহচর চন্দ্রশেখর মহাদেব শঙ্কর মুনিদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নিজের পরম রূপ তাঁদের দেখালেন। সেই ব্রাহ্মণরা মহাদেবীর সঙ্গে পিনাকী গিরিশকে দেখে যথাপূর্ব অবস্থিত হয়ে হৃষ্ট মনে প্রণাম করলেন। তারপর ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, অত্রি, সুকেশ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্যপ আর মহাতপা সংবর্তক প্রমুখ মুনিরা আবার মহেশ্বরের স্তব করে প্রণামপূর্বক দেবদেবেশ্বরকে বললেন, প্রভু দেবদেবেশ্বর, আমরা কর্মযোগের পথে, না জ্ঞানযোগের পথে—কি ভাবে সর্বদা আপনার পূজা করব ? হে দেব, এখন কোন্ মার্গে ভগবানরূপ আপনার পূজা করতে হবে ? কি কি সেবা করা উচিত আর কি কি সেবা করা উচিত নয়, এই সব আমাদের বলুন। দেবদেব বললেন, মহর্ষিরা, অতি গভীর ও দুরবগাহ এই বিষয়টি আমি তোমাদের বলব। আগে ব্রহ্মাই প্রথমে তা বলেছিলেন। সাংখ্য ও যোগ—এই দু'প্রকারে পুরুষদের সাধন হয়ে থাকে বলে জানবে। কিন্তু যোগের সঙ্গে সাংখ্যের সাধন করলেই মুক্তি হয়ে থাকে। কেবল যোগ দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, কিন্তু কেবল জ্ঞান বা সাংখ্য মুক্তিপ্রদ। তোমরা বিমল তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করে মুক্তির কামনায় কেবল যোগ আশ্রয় করে বৃথা পরিশ্রম করেছ। হে ব্রাহ্মণগণ, কেবল কর্ম যে মানুষেরা অনুষ্ঠান করে, তাদের কর্ম যে মোহসম্ভূত—এইটি দেখাবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তাই কৈবল্যের সাধনভূত বিমল জ্ঞান তোমাদের জানা উচিত, সযত্নে গুরুর মুখে শোনা উচিত ও প্রত্যক্ষ করা উচিত। এক আত্মাই সর্বত্রগামী, প্রকৃতিশূন্য, জ্ঞানময়, আনন্দময়, নির্মল আর নিত্য—এ হল সাংখ্যের মত। এই পরম জ্ঞানকেই জীবন্মুক্তি বলে। এর পরিণামই বিদেহ কৈবল্য ও ব্রহ্মভাব। এই পরম জ্ঞান আশ্রয় করেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ মহাত্মা যতিরা সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বর রূপে অর্থাৎ আমার স্বরূপ বলে জানেন। এই সেই নিত্য, অবিদ্যাদোষ-রহিত, শুদ্ধ পরম জ্ঞানযোগ। ঐ জ্ঞানের বিষয় এই আমি—ভগবান, আর আমার মূর্তি এই পার্বতী। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, সিদ্ধির জন্য অনেক রকম উপায়ের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু যে জ্ঞানের বিষয় স্বয়ং আমি, সেটিই সমস্ত কিছুর চেয়ে উৎকৃষ্ট। যে সমস্ত শান্ত, জ্ঞানযোগরত মানুষ আমার শরণাপন্ন হয়, যে সব ভস্মলিপ্ত কলেবর যোগী আমাকেই হৃদয়ে সতত ধ্যান করেন আর যে সব নিষ্পাপ যতি সর্বদা আমাতেই ভক্তিপরায়ণ, তাদের সকলেরই ঘোর সংসার সাগর আমি অচিরে বিনষ্ট করে থাকি। আমি পূর্ব কালে শুভ পাশুপত ব্রতের সৃষ্টি করেছি। অতি গুহ্য ও বেদের সারভূত সূক্ষ্ম ঐ ব্রত বিমুক্তির কারণ। প্রশান্ত, সংযতমনা, ভস্মলিপ্ত দেহ, ব্রহ্মচর্যরত ও দিগম্বর হয়ে পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। অথবা জ্ঞানী সাধক কৌপীন বা একবস্ত্র ধারণ করে, মৌনী ও বেদাভ্যাসপরায়ণ হয়ে পশুপতি শিবের ধ্যান করবে। মুমুক্ষুরা ভস্মাচ্ছাদিত দেহে নিষ্কাম হয়ে এই পাশুপত যোগের সেবা করবেন। এ কথা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। বীতরাগ, ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত হয়ে আমাতেই চিত্ত অর্পণ করে, আমার শরণাপন্ন হয়ে বহু লোক এই পাশুপত যোগের বলে পাপশূন্য হয়ে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এই সংসারে বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক শাস্ত্র আছে। ঐ সব শাস্ত্র আমিই বলেছি। কিন্তু ঐ শাস্ত্রগুলি কেবল মোহ উৎপাদন করে। বাম, পাশুপত, সোম, লাকুল আর ভৈরব

—এই সব শাস্ত্র এবং বেদবিরুদ্ধ অন্য যা কিছু শাস্ত্র সে সবই সেবার অযোগ্য বলে কথিত হয়েছে। আমি বেদমূর্তি, অতএব বেদকে পরিত্যাগ করে যারা অন্য শাস্ত্রের তত্ত্ব অধিগত হয়েছে, তারা আমার স্বরূপ জানতে পারে না। এই মার্গ প্রতিষ্ঠা কর, মহেশ্বরের পূজা কর। তাহলেই যে অচিরে পরম জ্ঞানের উৎপত্তি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হে শ্রেষ্ঠ সাধুগণ, আমার প্রতি তোমাদের বিপুলা ভক্তি থাকুক। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, ধ্যান করা মাত্রই আমি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হব।

এই কথা বলে ভগবান শঙ্কর উমার সঙ্গে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। সেই মুনিরাও দারুবনে থেকে মহেশ্বরের অর্চনা করতে লাগলেন। ব্রহ্মচর্যনিরত, শান্ত ও সাংখ্যযোগপরায়ণ সেই মহাত্মা ব্রহ্মবাদী মুনিরা একত্র মিলিত হয়ে আত্মজ্ঞানবিষয়ক বহু বাদানুবাদ করেছিলেন। যেমন—এই জগতের মূল কি? উত্তর—আমাদের আত্মা। এই সমস্ত পদার্থের নিমিত্ত কারণ কে? উত্তর—ঈশ্বর। তারপর এই রকম ভাবে তারা পরস্পর বিচার ও নিদিধ্যাসন করতে থাকলে মহাদেবী পার্বতী মুনিদের সামনে আবির্ভূতা হলেন। তিনি কোটিসূর্যের মতো প্রদীপ্তা, অগ্নিশিখার মালায় সজ্জিতা। তিনি নিজের নির্মল দীপ্তিতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করতে লাগলেন। কিরণসমূহের মধ্যে সন্নিবিষ্টা অমেয়া সেই গিরিসুতাকে মুনিরা দেখতে পেলেন। তারা মহেশ্বর-পত্নীকে প্রণাম করলেন। মুনিরা বুঝতে পারলেন যে ইনিই এই জগতের মূল কারণ; পরমপুরুষের পত্নী আকাশ নাম্নী এই দেবীই আমাদের গতি ও আত্মা। তার পরে তারা সমস্ত জগতের আত্মাকে সেই দেবীর দেহে দর্শন করলেন। তারপর দেবী তাদের নিরীক্ষণ করতে থাকলে তাদের অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হল। এই অবসরে মুনিরা সমগ্র জগতের হেতু, কবি, বৃহৎ, পুরাণপুরুষ, দেবদেব, মহাদেব, মহেশ্বর রুদ্রকেও দেখতে পেলেন। দেবী গিরিসুতা আর দেব মহেশ্বরের দর্শন পেয়ে মুনিরা অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করলেন ও তাঁদের প্রণাম করলেন। সেই সময়ে ভগবানের অনুগ্রহে তাদের জন্ম-ধ্বংসের বীজস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা সেই জ্ঞানযোগে জানতে পারলেন যে—এই যে সর্বভূতময়ী, সর্বনিয়ন্ত্রী, ব্যোমনাম্নী, অনাদিসিদ্ধা মহেশ্বরী শক্তি যেন আকাশে বিরাজমানা বলে প্রতিভাত হচ্ছেন, ইনিই জগতের একমাত্র উৎপত্তি কারণ। প্রলয়ের শেষে দেবদেব মহান পরমেষ্ঠী পরম মঙ্গলময় অদ্বিতীয় মহেশ্বর রুদ্র এই দেবী প্রকৃতি থেকে মায়া সহযোগে পরমশক্তিনিষ্ঠ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। অদ্বিতীয় দেব রুদ্র সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থান করছেন। মায়া, কলাযুক্ত ও কলাশূন্য তিনিই এই দেবী-স্বরূপ। তাঁর থেকে কিছুই ভিন্ন নয়। এই রকম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে জীবন্মুক্তি পাওয়া যায়। তারপর দেবাদিদেব ভগবান মহেশ্বর দেবীর সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন। বনবাসী মহর্ষিরাও আবার সেই আদিদেব রুদ্রের আরাধনা করতে লাগলেন। দেবদেব মহেশ্বর দেবদারু বনে পূর্বে যে কর্ম করেছিলেন, যা আমি পুরাণে শুনেছি, তা তোমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবেই বললাম।

যে ব্যক্তি এই রুদ্রমাহাত্ম্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং যে ব্যক্তি শান্ত দ্বিজদের এই কথা শ্রবণ করান, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে দেবদারুবনপ্রবেশ নামে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, সমস্ত লোকে বিখ্যাতা, তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, দেবতা ও গন্ধর্বদের দ্বারা সেবিতা নর্মদা নামে এক পুণ্যতমা নদী আছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন বলেছিলেন, সেই ভাবেই সেই সর্বপাপনাশকারী নর্মদামাহাত্ম্য আপনাদের বলি, শুনুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহর্ষি, আমি আপনার অনুগ্রহে নানা প্রকার ধর্ম, প্রয়াগমাহাত্ম্য এবং বহু তীর্থের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনি বলেছেন—নর্মদা সমস্ত তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। অতএব হে সত্তম, এখন নর্মদার মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, নদীশ্রেষ্ঠা নর্মদা রুদ্রের দেহ থেকে নির্গত হয়েছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতকেই উদ্ধার করতে পারেন। আমি পুরাণে নর্মদা মাহাত্ম্যের কথা যেমন শুনেছি, এখন তাই বলছি, তুমি একমনে সেই পবিত্র আখ্যান শোন।

কনখল তীর্থে গঙ্গা অতি পবিত্রা, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী অতি পবিত্রা এবং গ্রাম বা অরণ্য সর্বত্রই নর্মদা পবিত্রা। সরস্বতীর জল মানুষকে তিন দিনে পবিত্র করে, যমুনার জল এক সপ্তাহে পবিত্র করে, গঙ্গাজল সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র করে। কিন্তু নর্মদার জল দেখলেই পবিত্র হওয়া যায়। কলিঙ্গদেশের পশ্চিমার্ধে আর অমরকণ্টক পর্বতে ত্রিভুবন পবিত্রা নর্মদা রয়েছেন। হে রাজেন্দ্র, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও তপোনিধি ঋষিরা ঐ স্থানে তপস্যা করে পরম সিদ্ধি পেয়েছেন। রাজন, নিয়ম অনুসরণ করে, জিতেন্দ্রিয় হয়ে নর্মদায় স্নান ও এক রাত্রি উপবাস করলে শতকুল উদ্ধার হয়। শ্রুতি আছে, নদীশ্রেষ্ঠা নর্মদা শত যোজনের চেয়ে একটু বেশি দীর্ঘ, দুই যোজন বিস্তৃত। ষাট কোটি ষাট হাজার তীর্থ ঐ অমরকণ্টক পর্বতের চারদিকে অবস্থিত। জিতক্রোধ, শুচি, ব্রহ্মচারী, সর্বপ্রকার হিংসার প্রতি পরাঙ্মুখ, সর্বজীবের হিতে রত ও শুদ্ধাচারী হয়ে নর্মদায় যারা প্রাণত্যাগ করে, হে নিষ্পাপ, তাদের কি পুণ্যফল হয় মন দিয়ে শোন। পাণ্ডব, সেই ব্যক্তি অপ্সরা আর দিব্যাঙ্গনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এক লক্ষ বছর স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করে এবং দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্যপুষ্পে শোভিত হয়ে দিব্যলোকে পণ্ডিতদের সঙ্গে ক্রীড়া করে এবং সুখ ভোগ করে। তারপর স্বর্গলোক থেকে চ্যুত হয়ে সে ধার্মিক রাজা হয় এবং নানা রত্নযুক্ত, মণিময় স্তম্ভে সজ্জিত, বৈদূর্য প্রভৃতি মণিতে খচিত, সুন্দর সুন্দর আলেখ্য আর বাহনে ভূষিত, শত দাসী সমন্বিত গৃহে অবস্থান করে। সেই ব্যক্তিকে সমস্ত স্ত্রীলোক কামনা করে, সে রাজরাজেশ্বর হয় এবং সমস্ত রকম ভোগ তার আয়ত্তে আসে। তার এক শত বছর আয়ু হয়।

ঐ তীর্থে অগ্নি বা জলে প্রবেশ করলে কিংবা অনশন ব্রত করলে, বায়ু যেমন আকাশে মিলিয়ে যায়, সেই রকম তারও এমন এক গতি লাভ হয় যে আর তাকে এখানে ফিরে আসতে হয় না। এ পর্বতের পশ্চিম দিকে ত্রিভুবন বিখ্যাত সর্বপাপ-নাশক এক হ্রদ আছে—তার নাম জলেশ্বর। সেখানে সন্ধ্যোপাসনা ও পিণ্ড প্রদান করলে পিতৃগণ দশ হাজার বছর ধরে তৃপ্ত থাকেন। নর্মদার দক্ষিণ কূলে অল্প দূরে সরল ও অর্জুন বৃক্ষে আচ্ছাদিত কপিলা নামে মহানদী আছে। ঐ মহাভাগা নদী পবিত্র ও ত্রিলোকে বিখ্যাত। যুধিষ্ঠির, সেখানে একশো কোটিরও বেশি তীর্থ অবস্থিত। ঐ তীর্থে কালক্রমে যে সমস্ত বৃক্ষের পতন ঘটে, তারাও নর্মদায় জলের স্পর্শ পেয়ে

পরম গতি লাভ করে। হে মহাভাগ, বিশল্যকরণী নামে যে আর একটি নদী আছে, তাতে স্নান করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ ক্লেশমুক্ত হয়। কপিলা ও বিশল্য নামে এই দুই নদীর মধ্যে উত্তম। এ কথা পূর্বকালে লোকের হিতকামনায় ঈশ্বর বলেছেন। রাজন, ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি প্রায়োপবেশন করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে রুদ্রলোকে গমন করে। সেখানে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আর যে সব ব্যক্তি তার উত্তর কূলে বাস করে, তারা তো বলতে গেলে রুদ্রলোকেই বাস করে। সরস্বতী, গঙ্গা ও নর্মদায় স্নান ও দান করলে সমান ফল হয়—এ কথা মহাদেব আমাকে বলেছেন। যে ব্যক্তি অমরকণ্টক পর্বতে প্রাণত্যাগ করে সে শতকোটি বর্ষেরও কিছু বেশি কাল রুদ্রলোকে বাস করে। ফেন আর ঊর্মিযুক্ত নর্মদার পবিত্র জল মাথায় দিলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। নর্মদা সর্বত্র পবিত্রা এবং ব্রহ্মহত্যার পাপও তিনি নাশ করেন। ঐ তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জালেশ্বর নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ সমস্ত পাপ নাশ করে। নিয়ম পালন করে ঐ তীর্থে গমন করলে সমস্ত কাম্য ফল লাভ করা যায়। চন্দ্রসূর্যের গ্রহণের সময়ে অমরকণ্টক পর্বতে গেলে অশ্বমেধের দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। পরম পবিত্র এই শ্রেষ্ঠ পর্বতে দেব ও গন্ধর্বেরা ব্যস করেন, এখানে রয়েছে বহু বৃক্ষ ও নানা প্রকার লতা, আর বিচিত্র পুষ্প একে শোভিত করছে। রাজন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আর বিদ্যাধরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেব মহেশ্বর দেবীর সঙ্গে ঐ পর্বতে অবস্থান করেন। যে মানুষ অমরকণ্টক পর্বতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে, সে পৌণ্ডরীক নামে যজ্ঞের ফল পায়। কাবেরী নামে যে পাপনাশিনী বিখ্যাতা নদী আছে, তাতে স্নান করে মহাদেব বৃষকেতনের অর্চনা করবে। কাবেরী ও নর্মদার সঙ্গমে স্নান করলে রুদ্রলোকে বাস হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থমাহাত্ম্যবিষয়ে মার্কণ্ডেয়যুধিষ্ঠির সংবাদে নর্মদামাহাত্ম্য নামে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় বলতে লাগলেন, নর্মদা নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সর্বপাপনাশিনী। মুনিরা আর স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর এই কথা পূর্বে বলেছেন। মুনিরা যাঁকে স্তব করেন সেই নর্মদা নাম্নী শ্রেষ্ঠ নদী সমস্ত লোকের হিতের জন্য রুদ্রের শরীর থেকে নির্গত হয়েছেন। ঐ নর্মদা সর্বদা সমস্ত পাপ হরণ করেন। সমস্ত দেবতা তাঁকে নমস্কার করেন আর গন্ধর্ব ও অপ্সরারা তাঁকে স্তব করেন। নর্মদার উত্তর কূলে ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে সমস্ত পাপনাশকারী ভদ্রেশ্বর নামে শুভদায়ক পুণ্যতীর্থ আছে। তাতে স্নান করলে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে সুখ অনুভব করে। রাজেন্দ্র, সেখান থেকে আম্রাতকেশ্বর নামে তীর্থে যাবেন। সেই তীর্থে স্নান করলে সহস্র গোদানের ফল হয়। তারপর নিয়ম পালন করে সংযতাহারী হয়ে অঙ্গারেশ্বর তীর্থে যাবে। এর ফলে আত্মার সর্ব পাপ থেকে বিশুদ্ধি হয় ও রুদ্রলোকে বাস হয়। রাজন, সেখান থেকে কেদার নামক পুণ্যতীর্থে যাবেন। তাতে স্নান ও তার জল পান করলে সমস্ত কাম্যফল লাভ হয়। মহারাজ, এরপর সর্বপাপনাশকারী নিষ্পলেশ তীর্থে যাবেন। সেখানে স্নান করলে রুদ্রলোকে বাস হয়। রাজেন্দ্র, সেখান থেকে বাণতীর্থ নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থে যাবেন। সেখানে প্রাণত্যাগ করলে

রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। তারপর পুষ্করিণী নামক তীর্থে গমন করবেন ও তাতে স্নান করবেন। তাতে স্নানমাত্র করলেই মানুষ ইন্দ্রের সঙ্গে একাসনে বাস করতে পারে। রাজেন্দ্র, তারপরে শূলভেদ নামে বিখ্যাত তীর্থে যাবেন। ঐ তীর্থে স্নান ও তার জল পান করলে সহস্র গোদানের ফল হয়। রাজেন্দ্র, তারপর শ্রেষ্ঠ বলিতীর্থে যাবেন। রাজন, মানুষ ঐ তীর্থে স্নান করলে রাজা হয়। তারপর যাবেন নর্মদার দক্ষিণ কূলে শক্রতীর্থে। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে এক রাত্রি উপবাস করে বিধিমতো স্নান করে নির্মল হয়ে মহাযোগী মহাদেবের আরাধনা করে, সে সহস্র গোদানের ফল পেয়ে বিষ্ণুলোকে যায়। তারপর মানুষের সর্বপাপহর ঋষিতীর্থে যেতে হয়। সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষ দেহাবসানে শিবলোকে যায়। সেখানেই আছে পরম সুন্দর নারদতীর্থ। তাতে স্নান করলে মানুষ সহস্র গোদানের ফল পায়। পূর্বকালে দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে তপস্যা করেছিলেন। তাতে দেব মহেশ্বর প্রীত হয়ে তাঁকে যোগ দান করেছিলেন। সেখানে ব্রহ্মার নির্মিত ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত শিবলিঙ্গ আছে। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষ ব্রহ্ম-লোকে বাস করে। তারপর ঋণতীর্থে যাবেন। ঋণতীর্থে গেলে মানুষ অবশ্যই ঋণ থেকে মুক্ত হয়। তারপর বটেশ্বর তীর্থে যেতে হয়। তাতে জন্ম সার্থক হয়। তারপর সমস্ত ব্যাধিনাশক ভীমেশ্বর তীর্থে যাবেন, সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র, তারপরে পিঙ্গলেশ্বর নামে উত্তম তীর্থে যাবেন। সেখানে অহোরাত্র উপবাস করলে তিন রাত্রি উপবাসের ফল হয়। রাজেন্দ্র, সেই তীর্থে যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, সেই ব্যক্তি ঐ কপিলা ও তার সন্ততিদের গায়ে যত লোম থাকে, তত বছর রুদ্রলোকে বাস করে। যে নরেশ, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, সে চন্দ্র ও সূর্য যত দিন বর্তমান থাকবেন, তত দিন অক্ষয় সুখ ভোগ করবে। যে সব মানুষ নর্মদার তটে বাস করে, অন্যান্য পুণ্যকারী লোকের মতো তারা মরণের পর স্বর্গ লাভ করে। তারপর দীপ্তেশ্বর নামে ব্যাস তীর্থ তপোবনে যাবেন। সেখানে মহানদী ব্যাসের কাছ থেকে ভয় পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন ও ব্যাসের হুঙ্কারে সেই স্থান থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করে, ব্যাস তার প্রতি প্রীত হন ও সেই ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। রাজেন্দ্র, এরপর ইক্ষুনদীর ত্রিলোকবিখ্যাত পবিত্র সঙ্গমে যাবেন। সেখানে রয়েছেন স্বয়ং শিব। রাজন, ঐ স্থানে স্নান করলে মানুষ গণপতির পদ পায়। তারপর সর্বপাপহর স্কন্দতীর্থে যেতে হয়। ঐ তীর্থে স্নান করলে আজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। সেখানে গন্ধর্বদের সঙ্গে দেবগণ মহাদেব পুত্র শক্তিধর শ্রেষ্ঠ প্রভু মহাত্মা কার্তিকেয়ের উপাসনা করেন। এরপর আঙ্গিরস তীর্থে যাবেন ও সেখানে স্নান করবেন। তাহলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে রুদ্রলোকে গমন করতে পারবেন। ঐ স্থানে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা তপস্যা দ্বারা বিশ্বেশ্বর দেবদেব বৃষধ্বজ শিবের আরাধনা করে উত্তম যোগ লাভ করেছিলেন। তারপর যাবেন সর্বপাপনাশক কুশতীর্থে। সেখানে স্নান করবেন। সেখানে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারপর সর্বপাপহর কোটি তীর্থে যাবেন। সেখানে স্নান করলে আজন্মকৃত পাপের ক্ষয় হয়। তারপর যাবেন চন্দ্রভাগা নদীতে। সেখানেও স্নান করবেন। সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষ চন্দ্রলোকে বাস করে। নর্মদার দক্ষিণ কূলে সঙ্গমেশ্বর নামে উত্তম তীর্থ আছে। তাতে স্নান করলে মানুষ যজ্ঞের ফল পায়। নর্মদার উত্তর কূলে পরম সুন্দর ঈশ্বরোক্ত আদিত্যায়তন নামে তীর্থ আছে। হে রাজেন্দ্র, এই রমণীয় তীর্থে স্নান আর সামর্থ মতো দান করলে তীর্থের

প্রভাবে সেই পুণ্যকার্যের অক্ষয় ফল হয়। যে সব ব্যক্তি দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও পাপী, তারা তার ফলস্বরূপ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যলোকে যায়। তারপর মাতৃতীর্থে যাবেন ও সেখানে স্নান করবেন। সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষ স্বর্গলোকে যায়। নর্মদার পশ্চিমে মরুদালয় নামে উত্তম তীর্থ আছে, সেখানেও যাবেন। রাজেন্দ্র, ঐ তীর্থে স্নান করে শুচি ও সমাহিত হয়ে যতিকে সামর্থ মতো কাঞ্চন দান করবেন, তাহলে পুষ্পকরথে বায়ুলোকে যেতে পারবেন। রাজেন্দ্র, তারপর যাবেন উত্তম অহল্যাতীর্থে। তাতে কেবল স্নান করলেই অপ্সরাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখ অনুভব করা যায়। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেব দিনে যে মানুষ সেখানে অহল্যার পূজা করে, সেই মানুষ যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সমস্ত লোকের অত্যন্ত প্রিয় হয়। সে দ্বিতীয় কামদেবের মতো শ্রীসমন্বিত ও স্ত্রীজাতির প্রিয় হয়ে থাকে। শক্রতীর্থ নামে শ্রেষ্ঠ নদীতে গিয়ে কেবল স্নান করলেই মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। তারপর সোমতীর্থে গিয়ে সেখানে স্নান করবেন। সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষের সমস্ত মুক্তি ঘটে। রাজেন্দ্র, চন্দ্রগ্রহণের সময়ে সেখানে স্নান করলে পাপক্ষয় হয়। রাজন, সোম-তীর্থ ত্রিভুবনে বিখ্যাত ও মহাফলজনক। যে ব্যক্তি সমাহিত হয়ে ঐ তীর্থে চান্দ্রায়ণ ব্রত করে, সে সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে চন্দ্রলোকে যায়। হে নরাধিপ, যে ব্যক্তি সোম-তীর্থে গিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে কিংবা জলে প্রবেশ করে, কিংবা অনশন ব্রত করে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। তারপর যেতে হবে স্তম্ভতীর্থে। সেখান স্নান করবেন। সেখানে কেবল স্নান করলেই মানুষ সোমলোকে বাস করে। রাজেন্দ্র, তারপর অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুতীর্থে গমন করবেন। সেটি বিষ্ণুর অতি শ্রেষ্ঠ স্থান আর যোধনীপুর নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানে বাসুদেব কোটি কোটি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই জন্য সেই স্থানে তীর্থ উৎপন্ন হয়েছে। ঐ তীর্থে গেলে মানুষ বিষ্ণুর তুল্য সৌন্দর্যবান হয় আর অহোরাত্র উপবাস করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হয়। নর্মদার দক্ষিণ কূলে কামতীর্থ নামে বিখ্যাত পরম রমণীয় তীর্থ আছে। সেখানে কামদেব মহাদেবের অর্চনা করেছিলেন। মানুষ সেই স্থানে উপবাস করে স্নান করলে কামদেবরূপে রুদ্রলোকে বাস করে। হে রাজেন্দ্র, তারপর যাবেন অমোঘ নামে বিখ্যাত অনুত্তম ব্রহ্মতীর্থে। সেখানে পিতৃলোকের তর্পণ করবেন এবং পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ করবেন। ঐ তীর্থের জলের মধ্যে গজরূপিণী শিলা আছে। বৈশাখ মাসে সমাহিত চিত্তে তাতে পিণ্ড-দান করবেন। দম্ভ ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে বিশুদ্ধ চিত্তে স্নান করলে যত দিন পর্যন্ত পৃথিবী থাকবে তত দিন পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকবেন। তারপর যাবেন সিদ্ধেশ্বর তীর্থে। মানুষঐ তীর্থে কেবল স্নান করলেই গণপতির পদ লাভ করতে পারে। রাজেন্দ্র, তারপর যে স্থানে জনার্দন লিঙ্গরূপে অবস্থিত, সেই স্থানে যাবেন। ঐ স্থানে ভক্তিপূর্বক স্নান করলে মানুষ বিষ্ণুলোকে বাস করে। সেই সেই স্থানে দেব নারায়ণ পবিত্রাত্মা মুনি-দের সেই পরম পদ লিঙ্গরূপে নিজ আত্মাকে দেখিয়েছিলেন। তারপর যাবেন সর্বপাপ-নাশক অঙ্কোল নামক তীর্থে। সেখানে স্নান, দান, ব্রাহ্মণভোজন ও পিণ্ডদান করলে পরলোকে অনন্ত ফল হয়। যে ব্যক্তি জল দ্বারা চরু পাক করে 'ত্রিম্বক' মন্ত্রে সেখানে চরু হোম করে এবং অঙ্কোলের মূলে বিধান অনুসারে পিণ্ডদান করে, তার পিতৃলোক তার দ্বারা উদ্ধার পান ও যত দিন পর্যন্ত চন্দ্র তারকা বিদ্যমান থাকে তত দিন পর্যন্ত পরি-তৃপ্ত থাকেন। রাজেন্দ্র, তারপর অতি শ্রেষ্ঠ তাপসেশ্বর তীর্থে গমন করবেন। রাজেন্দ্র,

ঐ তীর্থে স্নান করলে তপস্যার ফল লাভ হয়। তারপর সর্বপাপনাশক শুক্লতীর্থে যাবেন। যুধিষ্ঠির, নর্মদায় শুক্লতীর্থের সমান আর কোন তীর্থ নেই। শুক্লতীর্থের দর্শন, স্পর্শ, স্নান, দান, তপস্যা, জপ, হোম অথবা উপবাস করলে মহাফল লাভ হয়। দেব ও গন্ধর্বদের বাসস্থান শুক্লতীর্থ নামে বিখ্যাত সর্বপাপবিনাশন ঐ তীর্থক্ষেত্রের পরিমাণ এক যোজন। সেই তীর্থক্ষেত্রে স্থিত বৃক্ষের অগ্রভাগ দর্শন করলেও ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়। সেখানে ভগবান ভর্গ শঙ্কর দেবীর সঙ্গে সর্বদা অবস্থান করেন। হে সুব্রত, বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে মহেশ্বর নিজের শিবলোক থেকে বেরিয়ে এসে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। দেব, দানব ও গন্ধর্বেরা, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরেরা, প্রমথ, অপ্সরা আর শ্রেষ্ঠ নাগেরা ঐ তীর্থে অবস্থান করেন। যেমন রঙ করা কাপড় জল দিয়ে ধুলে সাদা হয়ে যায়, সেই রকম শুক্লতীর্থে গেলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ঐ তীর্থে স্নান, দান, তপস্যা আর শ্রাদ্ধ করলে অনন্ত ফল হয়। শুক্লতীর্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নেই, হবেও না। মানুষ প্রথম বয়সে পাপকর্ম করে শুক্লতীর্থে অহোরাত্র উপবাস করলে ঐ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে উপবাস করে দেব পরমেশ্বরকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাবে, সেই ব্যক্তি বংশের একবিংশতি পুরুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আলয়ে চ্যুত না হয়ে বর্তমান থাকবে। শুক্লতীর্থে যে গতি লাভ হয়, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ বা দানেও সে-রকম গতি লাভ হয় না। ঋষি আর সিদ্ধদের দ্বারা সেবিত শুক্লতীর্থকে মহাতীর্থ বলে জানবেন। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। অয়ন সংক্রান্তিতে, চতুর্দশীতে বা বিষুব সংক্রান্তিতে জিতাত্মা সমাহিত ও উপবাসযুক্ত হয়ে স্নান করে 'হরি ও শঙ্কর প্রীত হোন' এই কামনা করে সামর্থ মতো দান করতে হয়। তাহলে এই তীর্থের প্রভাবে সে সমস্তই অক্ষয় হয়। অনাথ, দুর্গত ব্রাহ্মণেরই হোক বা সহায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই হোক, যে ঐ তীর্থে বিবাহ দেয়, তার পুণ্যফলের কথা শুনুন, তার শরীরে যতগুলি লোম আছে, তার সন্তানদের শরীরে যতগুলি লোম আছে, বিবাহাদাতা তত হাজার বছর রুদ্রলোকে বাস করবে। রাজেন্দ্র, এরপর যাবেন উত্তম সমতীর্থে। যুধিষ্ঠির, মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে স্নান করে রাত্রে ভোজন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। হে নৃপ শ্রেষ্ঠ, তারপর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে যাবেন। উপবাস করে মানুষ এরণ্ডীসঙ্গমে স্নানপূর্বক একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পায়। ভক্তিভরে এরণ্ডীসঙ্গমে স্নান করে ও তার মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে আবার নর্মদা জলমিশ্রিত ঐ এরণ্ডীসঙ্গমে অবগাহন করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়। রাজেন্দ্র, তারপর কল্লোলকেশ্বর তীর্থে যাবেন। ঐ তীর্থে যে পুণ্যদিনে গঙ্গা অবতীর্ণ হন, তাতে আর সন্দেহ নেই। ঐ তীর্থে স্নান, তার জলপান এবং সেখানে শাস্ত্রমতে দান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। তারপর যাবেন নন্দিতীর্থে, সেখান স্নানও করবেন। তা যে করে তার প্রতি নন্দিশ্বর প্রসন্ন হন এবং সেই ব্যক্তি সোমলোকে বাস করে। নৃপশ্রেষ্ঠ, তারপর যাবেন অনরক নামে শুভ তীর্থে। রাজন, সেখানে স্নান করলে মানুষের আর নরকদর্শন হয় না। রাজেন্দ্র, ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি নিজের অস্থি নিক্ষেপ করে, সে ইহলোকে ধনভোগ করে আর রূপবান হয়। রাজেন্দ্র, তারপর উত্তম কপিলা তীর্থে যাবেন। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষ সহস্র গোদানের ফল পায়। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়লে বিশেষ করে চতুর্দশীতে মানুষ ঐ তীর্থে উপবাসপূর্বক ভক্তিভরে ঘৃত

প্রদীপ দান করে ঘৃত দ্বারা রুদ্রকে স্নান করাবে, ঘৃতযুক্ত বিল্বফল দান করবে ও ঘণ্টা ও আভরণযুক্তা কপিলা দান করবে। এর ফলরূপে ঐ ব্যক্তি সর্বপ্রকার আভরণ যুক্ত হয়, সমস্ত দেবতারা তাকে নমস্কার করেন আর তার শিবের তুল্য পরাক্রম হয়। এই প্রকার হয়ে সে সর্বদা শিবের মতো ক্রীড়া করে। মঙ্গলবারে, বিশেষত চতুর্থী তিথিতে সেখানে মহাদেবকে স্নান করিয়ে ব্রাহ্মণদের আহার্য দান করলে তার ফলরূপে মানুষ সর্বকামযুক্ত বিমানে সমস্ত প্রকার ভোগ-সমন্বিত হয়ে শক্রভবনে গিয়ে শক্রর সঙ্গে আনন্দ লাভ করে। তারপর স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে ধন ও ভোগ্যবস্তু লাভ করে। আর মঙ্গলবারে নবমী তিথিতে যে ব্যক্তি সেখানে সযত্নে মহাদেবকে স্নান করায় সে রূপবান ও সৌভাগ্যশালী হয়। রাজন, তারপর যাবেন গঙ্গেশ্বর নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে ঐ তীর্থে কেবল স্নান করলেই সেই মানুষের ব্রহ্মলোকে বাস হয় আর পিতৃলোকের তর্পণ করলে তিনটি ঋণ থেকে মুক্তি ঘটে। গঙ্গেশ্বরের কাছে গঙ্গাবদন নামে উত্তম তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে মানুষ কামনা নিয়ে হোক, নিষ্কাম হয়ে হোক, স্নান করলে আজন্ম কৃত পাপ থেকে মুক্তি পায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার পশ্চিমে অল্প দূরে দশাশ্বমেধিক নামে ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে। শুভ ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় এক রাত্রি উপবাস করে ঐ তীর্থে স্নান করে বৃষধ্বজ মহাদেবের পূজা করতে হয়। তাহলে কিঙ্কিণী জালের মালায় সজ্জিত সুবর্ণময় বিমানে রমণীয় রুদ্রপুরে গিয়ে রুদ্রের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা যায়। সমস্ত তিথিতেই ঐ তীর্থের যে কোন স্থানে স্নান ও পিতৃতর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে নর্মদাতীর্থমাহাত্ম্য নামে
উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় বলতে লাগলেন, রাজেন্দ্র, তারপর শ্রেষ্ঠ ভৃগুতীর্থে যাবেন। ঐ স্থানে পূর্বকালে ভৃগু, দেবদেব ভর্গ রুদ্রের আরাধনা করেছিলেন। ঐ দেবকে দর্শন করা মাত্র সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্র সমস্ত পাপ নাশ করে। সেখানে স্নান করলে মানুষ স্বর্গে যায়, সেখানে যাদের মৃত্যু হয়, তাদের আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেখানে এক জোড়া পাদুকা, বাহন, অন্ন, কাঞ্চন আর ভোজন—এই সব সামর্থ্য মতো দান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সমস্ত প্রকার দান, যজ্ঞ ও তপশ্চর্যা এ সব কিছুরই ক্ষয় হতে পারে, কিন্তু যুধিষ্ঠির, ভৃগুতীর্থে যে তপস্যা করা হয়, তার কখনই ক্ষয় হয় না। ভৃগুতীর্থে যে ব্যক্তি উগ্র তপস্যা করে তার প্রতি ত্রিপুরারি প্রসন্ন হন। যুধিষ্ঠির, বলা হয় ভৃগুতীর্থে মহেশ্বর সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। রাজেন্দ্র, এর পর যাবেন উত্তম গোতমেশ্বর তীর্থে। ঐ ক্ষেত্রে গোতম মুনি ত্রিশূলধারী মহাদেবের আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মানুষ উপবাসপরায়ণ হয়ে ঐ তীর্থে স্নান করলে কাঞ্চন বিমানে আরোহণ করে ব্রহ্মলোকে যায় ও সেখানে পূজা পায়। তারপর বৃষোৎসর্গ নামে তীর্থেও যাবেন। সেখানে গেলে মোক্ষপদ পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত মূঢ় মানুষেরা এই তীর্থের কথা জানে না। রাজন, নর্মদাস্থিত সর্বপাপনাশক ধৌতপাপ নামে তীর্থে যাবেন। বৃষরূপী ধর্ম সেখানে পাপ ধুয়ে ফেলেছিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষ ব্রহ্মহত্যা

পাপ থেকে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র, ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন আর শিবের মতো বলবান হয়। শিবের তুল্য বলশালী সেই ব্যক্তি অযুত কল্পেরও বেশী শিবলোকে বাস করে এই দীর্ঘকালের পর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্বক সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়। রাজেন্দ্র, এর পরে যাবেন অনুত্তম হংসতীর্থে। মানুষ ঐ তীর্থে স্নান করলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। রাজেন্দ্র, তারপর বিখ্যাত বরাহতীর্থে যাবেন। সেখানে জনার্দন সিদ্ধ হয়েছেন, সেই ক্ষেত্র বিষ্ণুলোক লাভের সহায়ক। রাজেন্দ্র, তারপর অনুত্তম চন্দ্রতীর্থে যাওয়া উচিত। বিশেষ ফল লাভের জন্য সেখানে পূর্ণিমায় স্নান করতে হয়। ঐ তীর্থে কেবল স্নান করলেই চন্দ্রলোকে বাস হয়। রাজেন্দ্র, তারপরে শ্রেষ্ঠ কন্যাতীর্থে যাবেন। সেই তীর্থে স্নান করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। শুক্ল-পক্ষের তৃতীয়ায় ঐ তীর্থে কেবল স্নান করলেই মানুষ পৃথিবীতে সম্রাট হয়। তারপর সর্বদেবনমস্কৃত দেবতীর্থে যাবেন। রাজেন্দ্র, ঐ তীর্থে স্নান করলে সমস্ত দেবতার সঙ্গে একত্র বাসের আনন্দ লাভ করা যায়। রাজেন্দ্র, তারপর যাবেন শ্রেষ্ঠ শিখিতীর্থে। ঐ তীর্থে যা কিছু দান করা যায়, তার কোটিগুণ ফল হয়। রাজেন্দ্র, তারপর যাবেন শুভ পিতামহতীর্থে। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সাবিত্রী তীর্থে গিয়ে যে ব্যক্তি সেখানেই প্রাণত্যাগ করে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ঐ স্থানেই আর একটি পরমসুন্দর মনোহর তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষ রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। রাজেন্দ্র, তারপরে যাবেন উত্তম মানস-তীর্থে। ঐ তীর্থে স্নান করলে রুদ্রলোকে সমাদৃত হওয়া যায়। রাজেন্দ্র, তারপর অত্যুত্তম কল্পতীর্থে যাবেন। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। তারপর দেবনমস্কৃত স্বর্গবিন্দু তীর্থে যাবেন। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে মানুষকে নরকদর্শন করতে হয় না। তারপর অপ্সরেশ নামক তীর্থে যাবেন ও সেখানে স্নান করবেন। তা করলে মানুষ স্বর্গলোকে ক্রীড়া করে আর অপ্সরাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। রাজেন্দ্র, তারপর অত্যুত্তম ভারভূতি তীর্থে যাবেন। রাজন, ঐ তীর্থে উপবাস করে শিবপূজা করলে রুদ্রলোকে বাস হয়। আর সেখানে মৃত্যু হলে পাওয়া যায় গণপতির পদ। কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি সেখানে দেবাধিপতি পার্বতীপতির পূজা করে, পণ্ডিতদের মতে তার অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ পুণ্য হয়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের মতো শুক্লবর্ণ বৃষভ দান করে সে বৃষবাহিত যানে রুদ্রলোকে যায়। এই তীর্থে গিয়ে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে রুদ্রলোকে যায়। হে নরাধিপ, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে জলপ্রবেশ করে, সে হংসযুক্ত যানে স্বর্গলোকে যায়। এরণ্ডী ও নর্মদার সঙ্গমরূপ তীর্থ ত্রিভুবন বিখ্যাত। ঐ তীর্থ মহাপুণ্যজনক ও সর্বপাপনাশক। রাজেন্দ্র, উপবাসপরায়ণ ও সর্বদা ব্রতপরায়ণ হয়ে ঐ তীর্থে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র, তারপর নর্মদা আর সাগরের সঙ্গমরূপ জমদগ্নি নামে বিখ্যাত তীর্থে যাবেন। ঐ স্থানে জনার্দন সিদ্ধ হয়েছিলেন। রাজন, সেই নর্মদা ও সাগরের সঙ্গমরূপ তীর্থে স্নান করলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের তিনগুণ ফল পায়। রাজেন্দ্র, তারপর বিমলেশ্বর নামে উত্তম তীর্থে গমন করবেন। রাজন, ঐ তীর্থে স্নান করলে রুদ্রলোকে বাস হয়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি উপবাস করে বিমলেশ্বর দর্শন করে, সে সাত জন্মের পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শিবধামে যায়। তারপর যাবেন উত্তম অলকা তীর্থে। ঐ তীর্থে প্রথমে নিয়ম পালন করে ও পরিমিতাহারী হয়ে থেকে

পরে অহোরাত্র উপবাস করলে তীর্থমাহাত্ম্য বলে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
পাণ্ডব, আপনার কাছে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান তীর্থগুলির কথা বললাম। তীর্থের সংখ্যা বিস্তৃত ভাবে বলা যায় না। এই শ্রেষ্ঠা নদী নর্মদা পবিত্রা, বিপুলা, ত্রিলোকে বিখ্যাতা ও মহাদেবপ্রিয়া। যুধিষ্ঠির, যে ব্যক্তি নর্মদাকে মনে মনেও স্মরণ করে সে শত চান্দ্রায়ণেরও বেশী ফল পায়, সে বিষয়ে সংশয় নেই। শ্রদ্ধারহিত এবং ঘোর নাস্তিক মানুষ ভয়ানক নরকে পতিত হয়। এ কথা ভগবান পরমেশ্বর বলেছেন, দেবদেব মহেশ্বর নর্মদাকে স্বয়ং নিত্য সেবা করে থাকেন, তাই এই নদী অতী পুণ্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপ-নাশিনী বলে জানবেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে নর্মদামাহাত্ম নামে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, ত্রিলোকবিখ্যাত এই শ্রেষ্ঠ নৈমিষতীর্থ মহাদেবের আরো প্রিয় এবং মহাপাতক নাশকারী। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, মহাদেবের দর্শনকামী ঋষিদের জন্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই স্থান নির্মাণ করেছেন ও এই স্থানে তপস্যা করেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ, মরীচি, অত্রি, বসিষ্ঠ, ক্রতু, ভৃগু আর অঙ্গিরার বংশে উদ্ভূত মহর্ষিরা পূর্বকালে সর্ববরদাতা বিশ্বকর্তা চতুর্মূর্তি চতুর্মুখ কমলযোনি অব্যয় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, দেব, আপনাকে নমস্কার। ভগবন, কী উপায়ে সেই দেবদেব অদ্বিতীয় ঈশানকে আমরা দেখতে পাবো বলুন। ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, তোমরা বাক্যে ও মনে দোষরহিত হয়ে মহাসত্র অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে তা অনুষ্ঠান করবে, সেই স্থানটির কথা আমি বলে দিচ্ছি। তারপর মনোময় চক্র মোচন করতে উদ্যত হয়ে তা স্পর্শ করে ঋষিদের বললেন, আমি এই চক্র ছুড়ে দিলাম—তোমরা এই চক্রকে অনুসরণ কর, দেরী কোরো না। যে স্থানে এই চক্রের নেমি পতিত হবে, তপস্যার জন্য সেই স্থানই প্রশস্ত। এই বলে ব্রহ্মা সেই চক্র ছেড়ে দিলেন। ঋষিরাও তার পিছনে পিছনে গেলেন। সেই দ্রুতগামী চক্রের নেমি যে স্থানে পড়েছিল, তাকেই নৈমিষ নাম দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্র পবিত্র ও সর্বত্র পূজিত। অসংখ্য সিদ্ধ আর চারণ এখানে বাস করেন, যক্ষ আর গন্ধর্বেরা একে সেবা করেন। এই উত্তম নৈমিষক্ষেত্র ভগবান শম্ভুর স্থান। এখানে দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, অসুর আর রাক্ষসেরা পূর্বকালে তপস্যা করে দেবদেবের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট বর লাভ করেছিলেন। ঐ দেশ আশ্রয় করে পূর্বোক্ত ষট্‌কুলোদ্ভব ঋষিরা সমাহিত ভাবে সত্র দ্বারা আরাধনা করে দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করেছিলেন। এই তীর্থে দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও যাগ প্রভৃতি যা কিছু করা যায়, তার এক একটি সপ্ত জন্মের পাপকে ক্ষয় করে। এই স্থানে পূর্বকালে সত্র উপাসনারত মহর্ষিদের কাছে সেই ভগবান ব্রহ্মভাবিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণটি বলেন। এখানেই বিশ্বদর্শীদের ভগবান মহাদেব প্রমথদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রুদ্রাণীর সঙ্গে আজও ক্রীড়া করেন। ব্রাহ্মণেরা এখানে নিয়ম পালন করে প্রাণত্যাগ করলে ব্রহ্মলোকে যান—সেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। জাপ্যেশ্বর নামে বিখ্যাত আর একটি উত্তম তীর্থ আছে। সেখানে গণশ্রেষ্ঠ নন্দী সর্বদা রুদ্রমন্ত্র জপ করেছিলেন। তাতে পিনাকী মহাদেব দেবীর সঙ্গে প্রীত হয়ে তাঁকে আত্ম-সারূপ্য ও অমরত্ব দান করেন। শিলাদ নামে প্রসিদ্ধ ধর্মাত্মা ও ধর্মবিদ এক ঋষি ছিলেন।

তিনি পুত্রের জন্য বৃষধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। সেই ঋষি তপস্যা করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল। তখন বিশ্বপালক মহাদেব প্রমথদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে উমার সঙ্গে এসে বললেন, আমি বর দিতে এসেছি। গিরিজাপতি বরেণ্য মহেশ্বরের কাছে ঋষি এই বর চাইলেন, আপনার মতো অযোনিসম্ভব ও মরণরহিত একটি পুত্র যেন পাই। দেবীর সঙ্গে ভগবান মহেশ্বর 'তাই পাবে' বলে সেই বিপ্রর্ষির সামনেই অন্তর্হিত হলেন। তখন শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ঋষি শিলাদ যাগ করার ইচ্ছায় নিজ ভূমি কর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি লাঙ্গল দিলে ভূমি দুই ভাগ করা মাত্র একটি সুন্দর পুত্র দেখতে পেলেন। সংবর্তক অগ্নির মতো প্রভাবশালী, রূপলাবণ্যযুক্ত ঐ কুমার নিজের তেজে চারদিক আলো করে যেন হাসছিলেন। কার্তিকেয়ের মতো অনিন্দিত রূপবান কুমার রূপে অবতীর্ণ নন্দী তখন মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর স্বরে শিলাদ ঋষিকে 'তাত, তাত' বলে বার বার ডাকতে লাগলেন। শিলাদ ঋষি সেই জাত পুত্রকে দেখে আলিঙ্গন করলেন ও ঐ স্থানে আশ্রমবাসী মুনিদের দেখালেন। তিনি যথাসময়ে সেই পুত্রের জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করলেন এবং উপনয়ন দিয়ে শাস্ত্রমতে নিজেই তাঁকে বেদ পড়াতে লাগলেন। বেদ অধ্যয়ন করে ভগবান নন্দীর এই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি উৎপন্ন হল যে প্রভু মহেশ্বরকে দেখে মৃত্যুকে জয় করতে হবে। সেই নন্দী পবিত্র সাগরতীরে গিয়ে একাগ্রচিত্তে মহেশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন আর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনবরত রুদ্রমন্ত্র জপ করে যেতে লাগলেন। নন্দীশ্বরের এক কোটি বার রুদ্রমন্ত্র জপ শেষ হলে ভক্তবৎসল শঙ্কর জগজ্জননী আর প্রমথ প্রভৃতির সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন ও বললেন, বর দিতে এসেছি। নন্দী মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর, আবার কোটি রুদ্র জপ যত দিন না শেষ করতে পারি, তত দিন যেন পরমায়ু থাকে—এই বর দিন। মহাদেব 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান করলেন। ভগবান নন্দীও তদ্‌গত চিত্তে আবার কোটি রুদ্রমন্ত্র জপ করতে প্রবৃত্ত হলেন। রুদ্র জপের দ্বিতীয় কোটি সংখ্যা পূর্ণ হলে ভূতগণ পরিবৃত বৃষধ্বজ এসে বললেন, আমি বর দিচ্ছি। তখন নন্দী বললেন, শঙ্কর, আমি আবার তৃতীয় কোটি রুদ্র জপ করতে চাই। বিশ্বাত্মাও 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন। এইভাবে তিন কোটি জপ শেষ হলে মহাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভূতগণের সঙ্গে এসে বললেন, 'আমি বর দিচ্ছি'। তখন নন্দী বললেন, ভগবান, তোমার প্রভাবে আবার এক কোটি জপ করব। মহাদেব বললেন, তোমাকে আর জপ করতে হবে না। তুমি মরণ ও জরারহিত, সমস্ত গণের অধিপতি, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, যোগীশ্বর, যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ, গণপতিদের প্রভু, সমস্ত লোকের অধিপতি, শ্রীসমন্বিত, সর্বজ্ঞ ও আমার সদৃশ হয়ে দেবীর পুত্ররূপে সর্বদা আমার কাছে থাক। করস্থিত আমলকের মতো আমার স্বরূপ জ্ঞান তোমার হোক। এইভাবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাক, তারপর পরমপদ পাবে।' মহাদেব শঙ্কর এই কথা বলে সমস্ত প্রমথদের ডেকে নন্দীশ্বরের উপযুক্ত অভিষেক করলেন। মহেশ্বর নিজে মরুদ্‌-গণের কন্যা সুযশার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এই জাপ্যেশ্বর তীর্থ ত্রিশূলী মহা-দেবের স্থান। এই তীর্থের যে কোন স্থানে মৃত্যু হলেই মানুষ রুদ্রলোকে যায়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে নৈমিষারণ্যে জাপ্যেশ্বরতীর্থের
মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, জাগেশ্বর তীর্থের কাছে সর্বপাপনাশক অতি পবিত্র পঞ্চনদ নামে আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। ঐ স্থানে ত্রিরাত্র উপবাস করে মহেশ্বরের পূজা করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে রুদ্রলোকে সম্মানিত হওয়া যায়। অমিততেজা শক্রের মহাভৈরব নামে বিখ্যাত মহাপাতকনাশক একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন পবিত্র বিতস্তা নামে শ্রেষ্ঠ নদী সমস্ত তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এই তীর্থ সমস্ত পাপ নাশ করে। অমিততেজা শম্ভুর মহাতপা নামে তীর্থ আছে। সেখানে দেবাধিপতি বিষ্ণু সুদর্শনচক্রের জন্য মহাদেবের পূজা করেছিলেন। ঐ তীর্থে পিণ্ডদান প্রভৃতি করলে পরলোকে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হয়। সেখানে নিয়ম অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলে মানুষ ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। মহাদেবের অতি পবিত্র বাসস্থান কায়াবরোহণও একটি তীর্থ। সেখানে মুনিরা মাহেশ্বর ধর্মের প্রচার করেছিলেন। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম এবং উপবাস করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সে রুদ্রলোকে যায়। কন্যাতীর্থ নামে আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলে মানুষ অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। অক্লিষ্টকর্মা জামদগ্ন্য রামের একটি পবিত্র তীর্থ রয়েছে। ঐ শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করলে সহস্র গোদানের ফল হয়। লোক-বিশ্রুত মহাকাল নামে বিখ্যাত একটি তীর্থ আছে। এই তীর্থে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলে গাণপত্য পদ লাভ হয়। অতি গোপনীয় নকুলীশ্বর নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে শ্রীমান ভগবান নকুলীশ্বর বাস করেন। মনোরম হিমালয় পর্বতের শিখরদেশে অতি সুন্দর গঙ্গাদ্বারে শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাদেব দেবীর সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করেন। ঐ স্থানে স্নান করে বৃষধ্বজ মহাদেবের পূজা করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় ও দেহত্যাগ করলে তাঁর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দেবদেব মহেশ্বরের বাসস্থান অতি পবিত্র পুণ্যতম ভীমেশ্বর নামে বিখ্যাত আর একটি রমণীয় তীর্থ আছে। এই তীর্থে গেলে মানুষ পাতক থেকে মুক্ত হয়। চণ্ডবেগা নদীর সঙ্গমস্থল পাপ নাশ করে। সেখানে স্নান ও তার জল পান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি হয়। বারাণসী নামে দিব্যধাম সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোটি কোটি অযুত অযুত তীর্থের চেয়েও তা বেশি ফলদায়ক। এই তীর্থকথনের প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে এর আগে আমি বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছি। এখানে ছাড়া অন্য তীর্থে যোগ দ্বারাও এক জন্মে মুক্তিলাভ হয় না। মানুষের পাপহর এই সব প্রধান প্রধান তীর্থের কথা বলা হল। ঐ সব স্থানে গিয়ে শতজন্মের পাপ ধুয়ে ফেলতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তীর্থসেবা করে, ইহলোকে বা পরলোকে সে তীর্থফল লাভ করতে পারে না। যাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এমন লোক, ক্লিষ্ট, যাযাবর আর গৃহী—এরা তীর্থসেবা করবে এবং অন্যেও এদের মতো হলে তীর্থসেবা করবে। অগ্নি সঙ্গে নিয়ে সপত্নীক হয়ে সযত্নে তীর্থে যেতে হয়। তাহলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয় ও যে রকম যে রকম বলা হয়েছে সেই রকম গতি লাভ হয়। তিনটি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে পুত্রদের জীবিকানির্বাহের উপায় ঠিক করে দিয়ে এবং পুত্রদের ওপর ভার্যার দায়িত্ব অর্পণ করে তীর্থসেবা করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে তীর্থমাহাত্ম্যের কথা বলা হল। যে ব্যক্তি এটি পাঠ করে বা শ্রবণ করে সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে তীর্থমাহাত্ম্য নামে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, মুনিরা নারায়ণের মুখনিঃসৃত এই পরমার্থতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র শ্রবণ করে কূর্মরূপধারী দেব প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, চাতুর্বর্ণ্য প্রভৃতি ধর্ম, মোক্ষবিজ্ঞান, লোকসৃষ্টির বিস্তার ও মন্বন্তর—এই সব বৃত্তান্ত আপনি সবিস্তারে বলেছেন, হে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, আপনি ভূতগণের যে রকম সৃষ্টিক্রম বলেছেন, হে দেবদেবেশ, এখন সেই রকম তাদের প্রলয়ের কথাও বলুন। সূত বললেন, কূর্মরূপধারী মহাযোগী ভগবান সেই মুনিদের কথা শুনে সর্বভূতের প্রলয়ের কথা বলতে শুরু করলেন ঃ

নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক—এই চার রকম প্রলয়ের কথা পুরাণশাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে এই সমস্ত ভূতের যে লয় দেখা যায়, তাকেই মুনিরা নিত্যপ্রলয় বলেছেন, কল্পশেষে ব্রহ্মার নিদ্রাগমনের জন্য ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনলোকের যে প্রলয় হয়ে থাকে, তাকে মনীষীরা নৈমিত্তিক প্রলয় বলেন। মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সৃষ্টির যে প্রলয় হয়, কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলেন। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার জন্য যোগীরা যখন পরমাত্মায় লয় পান, তখন হয় আত্যন্তিক প্রলয়—এ কথা কালচিন্তাপরায়ণ দ্বিজগণ বলেন। আত্যন্তিক প্রলয় আত্মজ্ঞান থেকে হয়—এ কথা বলা হয়েছে। এখন তোমাদের কাছে নৈমিত্তিক প্রলয়ের কথা সংক্ষেপে বলব।

চার হাজার যুগ কেটে গেলে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তখন প্রজাপতি সমস্ত প্রজাকে আত্মগত করতে চান। তারপর একশো বছর ধরে সমস্ত ভূতের ক্ষয়কারী, সমস্ত জীবের ভয় উৎপাদক ঘোর প্রবল অনাবৃষ্টি হয়। তারপর পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী দুর্বল, তাদেরই প্রথমে প্রলয় হয়ে থাকে ও তারা মাটিতে মিশে যায়। এর পরে সাতটি রশ্মিকে পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে সূর্য ওঠেন। বস্তুত তিনি ঐ সমস্ত রশ্মি দ্বারা জল পান করেন—সেই সময়ে তাঁর তেজ কেউই সহ্য করতে পারে না। এই ভাবে সূর্যের সাতটি কিরণ মহাসমুদ্রের জল পান করে থাকে। ঐ জলপান দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে সাতটি কিরণ সাতটি সূর্যের আকার পায়। তখন সেই সাত কিরণ চারদিকের জল শুষে নিয়ে বহ্নির মতো চারটি লোককে দগ্ধ করতে থাকে। সেই সাতটি সূর্য নিজ নিজ রশ্মি দ্বারা উর্ধ্ব ও অধোভাগে ব্যাপ্ত এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অত্যন্ত দীপ্ত হয়ে থাকে। তারা জল শোষণ করার ফলে প্রদীপ্ত ও বহু সহস্ররশ্মিযুক্ত হয়ে আকাশমণ্ডলকে আবৃত করে পৃথিবীকে দগ্ধ করতে থাকে। তারপর পর্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ নিয়ে পৃথিবী সেই সমস্ত সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে রসহীন হয়ে পড়ে। সর্বত্র ব্যাপ্ত ঐ প্রদীপ্ত সূর্য-রশ্মিসমূহ উর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্ব—সমস্তই আবৃত করে ফেলে। সূর্যের অগ্নির দ্বারা প্রসৃষ্ট এবং পরস্পর সংলগ্ন পদার্থসমূহ তখন এক হয়ে গিয়ে একটি মাত্র শিখায় পরিণত হয়। তারপর তা সর্বলোকনাশক মণ্ডলাকার অগ্নিতে পরিণত হয়ে তেজ দ্বারা এই চারটি লোককেই শীঘ্র দহন করতে থাকে। তারপর সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম নষ্ট হয়ে গেলে বৃক্ষ ও তৃণশূন্য হয়ে পৃথিবী কূর্মপৃষ্ঠের মতো প্রকাশ পেতে থাকে। সমস্ত জগৎ রশ্মির মালায় পূর্ণ হওয়ার জন্য অম্বরীষ অর্থাৎ ভাজবার খোলার মতো দেখায়। পরে সমস্ত জগৎ সেই অগ্নিশিখায় ভরে গিয়ে জ্বলতে থাকে। পাতাল আর মহাসমুদ্রে যে প্রাণীরা থাকে, তারাও তখন ঐ সূর্যের আগুনে প্রলীন হয়ে মাটিতে মিশে যায়।

তারপর সেই সব দ্বীপ, পর্বত, বর্ষ ও মহাসমুদ্রগুলিকেই সাত সূর্যের জ্বলন্ত আগুন ভস্মীভূত করে। সমুদ্র, নদী ও পাতালগুলি থেকে সমস্ত জল শুষে নিয়ে প্রদীপ্ত হয়ে সেই অগ্নি পৃথিবীকে আশ্রয় করে জ্বলতে থাকে। তারপর ঐ সংবর্তক নামে পর্বততুল্য মহাবহ্নি রুদ্রতেজে প্রদীপ্ত হয়ে সমস্ত লোক দাহ করে। সেই প্রলয়াগ্নি পৃথিবীকে দগ্ধ করে রসাতলকেও জ্বালিয়ে দেয়। তারপর পৃথিবীর অধোভাগ দগ্ধ করে তা ঊর্ধ্বদিকে আকাশ মণ্ডলকে দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সংবর্তক নামে মহাবহ্নির শিখা শতসহস্র ও অযুত যোজন উত্থিত হয়। ভগবান কালাগ্নিরুদ্রের প্রেরিত ঐ প্রদীপ্ত বহ্নি ঊর্ধ্বভাগে গন্ধর্ব, পিশাচ, যক্ষ, নাগ আর রাক্ষসদের দগ্ধ করতে থাকে। কালাগ্নি নিজে কালের রূপ ধরে ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক আর মহর্লোককে নিঃশেষে দগ্ধ করতে থাকেন। ঐ অগ্নির দ্বারা এই চারটি লোক সর্বদিকে ব্যাপ্ত হলে ঐ তেজের প্রভাবে ক্রমে সমস্ত জগৎ তখন উত্তপ্ত লোহগোলকের মতো একত্র মিলিত রূপে প্রতিভাত হয়। তারপর ঘোর সংবর্তক মেঘ-সমূহ সেই সময়ে বিদ্যুৎপুঞ্জে অলংকৃত হয়ে বিশাল হস্তীদের মতো গর্জন করতে করতে আকাশে আবির্ভূত হয়। ঐ মেঘসমূহের মধ্যে কতকগুলি নীল পদ্মের মতো শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের মতো শুভ্রবর্ণ, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলির বর্ণ গর্দভের মতো, কতকগুলির বর্ণ লাক্ষারসের মতো লোহিত, কতকগুলি শঙ্খ আর কুন্দের মতো অত্যন্ত শুভ্র, কতগুলি কাজলের স্তূপের মতো গাঢ় নীল। কতকগুলি মেঘের বর্ণ মনঃশিলার মতো। কতকগুলির বর্ণ কপোতের মতো, কতকগুলির বর্ণ রুদ্রাক্ষের, মতো, কতকগুলির বর্ণ আবার দুগ্ধের মতো। কতকগুলি মেঘ কর্বুর বর্ণের, কতকগুলি ভিন্নাঞ্জনের মতো বর্ণের, কতকগুলি আবার ইন্দ্রগোপ কীটের মতো, কতকগুলি হরিতালের মতো। কতকগুলি আবার ইন্দ্রের ধনুর মতো নানাবর্ণের। আকাশে এই রকম নানা রূপ নিয়ে মেঘ আবির্ভূত হয়। ঐ মেঘগুলির কিছু দেখতে পর্বতের মতো, কিছু গজমূলের মতো, কিছু প্রাসাদের সবচেয়ে উপরিস্থিত গৃহের মতো, কিছু আবার মৎস্যের মতো। নানা রূপ যুক্ত ভয়ঙ্কর সেই সব মেঘ ভীষণ গর্জন করতে করতে আকাশকে ব্যাপ্ত করে ফেলে। তারপর ভাস্কর থেকে উদ্ভূত গর্জনকারী সেই ঘোর মেঘগুলি সপ্ত সূর্যের অগ্নিকে শান্ত করে। মেঘেরা মহাশব্দে বারিবর্ষণ করে ঘোরতর অনিষ্টকর অগ্নিদের শান্তি বিধান করে, বিপুল সেই মেঘগুলি জল দ্বারা জগৎকে একেবারে পূর্ণ করে ফেললে জলে অগ্নির তেজ বিনষ্ট হয় ও অগ্নি তখন জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতিরিক্ত বর্ষণে অগ্নির বিনাশ হলে স্বয়ম্ভু প্রেরিত প্রলয়কালীন মেঘেরা বারিধারায় জগৎকে এমন ভাবে পূর্ণ করে যে উপছে পড়া জলে সমুদ্রের বেলাভূমি যেমন প্লাবিত হয়, সেইভাবেই ঐ বিপুলবর্ষণে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়ে যায়, তারপর পর্বত ও দ্বীপগুলির সঙ্গে পৃথিবী মেঘ আর জলরাশিতে সর্বত্র আচ্ছাদিত হয়ে যায়। প্রথমে সূর্যের রশ্মি দ্বারা শোষিত হয়ে জল মেঘমণ্ডলের মধ্যে থাকে, তারপর আবার ঐ জল ভূমিতে পতিত হয়। তার দ্বারাই সেই সময়ে সমুদ্রগুলি আবার পূর্ণ হয়। তারপর সমুদ্রসমূহ নিজেদের বেলাভূমিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে থাকে। তাতেই ক্রমে পর্বত ও সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হয়। স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট হলে ভগবান জগৎপতি যোগনিদ্রা আশ্রয় করে এই ঘোরতর অর্ণবে শয়ন করেন। চারহাজার যুগ ব্যাপ্ত করে যে সময়, তাকেই পণ্ডিতেরা কল্প বলেছেন। এখন বারাহ কল্প চলেছে। এরই বিস্তারের কথা আমি বললাম। কালবিদ মুনিরা পুরাণে বলেছেন যে কল্প অসংখ্য এবং সে-সবই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক। সাত্ত্বিক

কল্পে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বেশী, তামস কল্পে শিবমাহাত্ম্য বেশী আর রাজস কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যই বেশী। এই যে বারাহ কল্প চলছে এটি সাত্ত্বিক কল্প। আরো কতকগুলি সাত্ত্বিক কল্প আছে। সে সবেতেই বিষ্ণুমাহাত্ম্যই প্রধান। সেই সব কল্পে যোগীরা ধ্যান, তপস্যা ও জ্ঞান লাভ করে শিবের ও আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনা করে পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই জগৎ একটি মাত্র সমুদ্রে পরিণত হলে একমাত্র আমি মায়াময় তত্ত্ব অবলম্বন করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হই। ঐ নিদ্রার সময়ে মহাত্মা সাত মহর্ষি জনলোকে বিদ্যমান থেকে তপোবলে যোগনেত্রে আমাকে দেখেন। আমি পুরাণপুরুষ, ভূলোক ও ভুবর্লোকের উৎস, সর্বব্যাপী শ্রীসংযুক্ত, সহস্রচরণ, সহস্রচক্ষু ও সহস্রাকিরণ। আমিই মন্ত্র, অগ্নি, দক্ষিণা, গোগণ, কুশ, সমিধ, প্রোক্ষণী, স্রুব, সোম আর ঘৃত। আমিই সংবর্তক, মহান আত্মা, পবিত্র, পরম যশ, বেদ, বেদ্য, প্রভু, রক্ষিতা, গোপতি, ব্রাহ্মণ ও আদ্য। আমি অনন্ত, তারক, এবং যোগীও আমিই। আমি গতি, আবার গতিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমিই। আমি হংস, প্রাণ, কপিল, বিশ্বমূর্তি, সনাতন। ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, কাল, জগদ্বীজ, মোক্ষ, মাতা, পিতা, মহাদেব—এ সবই আমি। আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আদিত্যবর্ণ, ভুবনের রক্ষিতা ও যোগমূর্তি, পুরুষ নারায়ণ। যতিরা যোগনিষ্ঠ হলে তবেই আমাকে দেখতে পান। আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হলে তবেই তাঁরা আমার এই রকম তত্ত্ব জানতে পারেন।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে ভূপ্রলয়বর্ণন নামে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কূর্ম বললেন, এবার সংক্ষেপে প্রাকৃত প্রলয়ের কথা বলব, আমার কাছ থেকে সে-কথা শোন। ব্রহ্মার পরমায়ুর পূর্বার্ধ ও পরার্ধ কেটে গেলে সমস্ত লোকের লয়কারী কালাগ্নি সমগ্র জগৎকে ভস্মসাৎ করতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বর ক্রীড়া পরবশ হয়ে নিজের আত্মায় সমস্ত জীবাত্মাতে প্রবিষ্ট করে দেব, অসুর আর মানুষ-সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দহন করেন। ভগবান নীললোহিত মহাদেব সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ানক রূপ ধরে লোক সংহার করে থাকেন। তারপর ভগবান সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে তাকে নানা প্রকার রূপ দান করেন আর তার পর সূর্যরূপ ধারণ করে সমস্ত লোক দগ্ধ করেন। ভগবান সমস্ত বিশ্ব দগ্ধ করে দেবতাদের শরীরে সব কিছুর দগ্ধকারী ব্রহ্মশির নামে মহৎ অস্ত্র ক্ষেপণ করেন। তাতে সমস্ত দেবতা দগ্ধ হয়ে গেলে কেবল দেবী পার্বতী সাক্ষী রূপে শম্ভুর কাছে বর্তমান থাকেন—এই রকম শ্রুতি আছে। এ কথা বেদজ্ঞেরা বলেছেন। দেবতাদের মস্তকের অস্থি দিয়ে নির্মিত মাল্য ও ভূষণে সজ্জিত দেব মহেশ্বর আদিত্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী দ্বারা আকাশমণ্ডল পূর্ণ করে সহস্রনয়ন, সহস্রাকৃতি, সহস্রহস্ত, সহস্রচরণ, সহস্র-রশ্মি, মহাবাহু, দংষ্ট্রাকরালবদন, প্রদীপ্ত অনলের মতো চক্ষুযুক্ত, ত্রিশূলধারী ও ব্যাঘ্র-চর্মাম্বর হয়ে ঐশ্বর যোগ অবলম্বন করে যোগজ পরমানন্দ থেকে জাত অমৃত পান করে দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নিজে নৃত্য করতে থাকেন। দেবী তাঁর পতির পরম মঙ্গলময় নৃত্যের অমৃত পান করে যোগ অবলম্বনপূর্বক দেব ত্রিশূলীর দেহে প্রবেশ করেন। ভগবান পিনাকপাণি ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের দাহের শেষে স্বেচ্ছায় নৃত্য পরিত্যাগ করে নিজ ভাবে ফিরে আসেন। এই ভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পিনাকী প্রমুখ বিনষ্ট হলে পৃথিবী সমস্ত গুণের সঙ্গে জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়, জল নিজের গুণ নিয়ে অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হয়, অগ্নি

নিজের গুণের সঙ্গে বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়, বিশ্বের ভরণকারী বায়ু নিজের গুণ নিয়ে আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, আকাশ নিজ গুণের সঙ্গে ভূত প্রভৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-গুলি লয়প্রাপ্ত হল তৈজস অহংকারে, আর হে সত্তমগণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতারা বৈকারিক অহংকারে লীন হয়ে যান। হে সত্তমগণ, বৈকারিক, তৈজস আর ভূতাদি—এই তিন প্রকার অহংকার মহৎ তত্ত্বে লয় পায়। তিন প্রকার অহংকারের সঙ্গে মিশ্রিত অমিততেজা সর্বব্যাপী মহৎ তত্ত্বকে জগতের উৎপত্তি স্থান, অদ্বিতীয়, অব্যয়, অব্যক্ত প্রকৃতি সংহার করেন। পরমেশ্বর পঞ্চভূত আর ভূতাদি তত্ত্বসমূহের সংহার করে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর থেকে পৃথক করেন। অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষের এটিই সংহার বলে কথিত হয়। এর কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। নিজে থেকে এই লয় হয় না। সত্ত্ব, রজঃ আর তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলে। আর সেই মায়া তত্ত্বরূপ অচেতন প্রকৃতিই প্রধান ও জগতের উৎপত্তি স্থান বলে কথিত হয়ে থাকে। ত্রিকালব্যাপী, শুদ্ধ, চিন্ময় আত্মা পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ। এঁকেই সর্বসাক্ষী, মহান ও পিতামহ বলে মুনিরা কীর্তন করে থাকেন। এই রকম যে সংহারশক্তি, ইনিও নিত্যা মাহেশ্বরী শক্তি। প্রকৃতি থেকে শুরু করে সমস্ত স্থূল ভূত পদার্থকে মহেশ্বরই দগ্ধ করে থাকেন—এ রকম শ্রুতি আছে। তত্ত্বজ্ঞানী সমস্ত যোগীদের যে আত্যন্তিক প্রলয় তাও মহেশ্বরই বিধান করে থাকেন। ভগবান স্বাধীন রুদ্র এই ভাবেই সংহার করে থাকেন। সেই ভগবানের যে জগৎপালিকা মোহিনী শক্তি আছে, তাকেই নারায়ণ বলা হয়। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব ভগবান হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিতে আশ্রিত হয়ে সৎ ও অসৎ রূপ জগৎ প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি করে থাকেন। সর্বজ্ঞ, সর্বগত ও শান্ত পরমাত্মায় আশ্রিত এই তিন শক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর বলে খ্যাত। এরা ভোগ আর মুক্তি দুইই দান করে, এরা সর্ববন্ধস্বরূপ ও নিত্যানন্দভোগী। পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর—এঁরা সকলেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপ। সেই পরমাত্মাতে দিব্যশক্তি আরো অনেক আছে। এই সব শক্তি ইন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি দেবতা ভেদে নানাপ্রকার যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হয়ে থাকেন। মহেশ্বরের মাহাত্ম্যবশত এক একটি শক্তির আবার শত শত সহস্র সহস্র দেহভেদের কথা বলা হয়েছে। প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হলেও কিন্তু শক্তি এক রূপা ও নির্গুণা। দেব মহেশ্বর এই নির্গুণা অদ্বিতীয়া শক্তি আশ্রয় করে লীলাচ্ছলে বিবিধ দেহের উৎপাদন ও গ্রাস করে থাকেন। বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা সমস্ত যজ্ঞেই সর্বকামপ্রদ ভগবান রুদ্রকে অর্চনা করে থাকেন—এ রকম শ্রুতি আছে। বেদবাদীরা এ রকম বলে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতারূপ পরমাত্ম শক্তিকে সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। সনাতন পরমাত্মা শূলপাণি ভগবান মহেশ্বর এই সব শক্তি থেকে স্বতন্ত্র বলে কীর্তিত হয়েছেন। কেউ কেউ অগ্নিকে পরমাত্মা বলে থাকেন, কেউ নারায়ণকে, কেউ ইন্দ্রকে, কেউ প্রাণকে, কেউ বা ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলে থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, বরুণ প্রমুখ সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত ঋষি একই রুদ্রের ভেদ মাত্র বলে কথিত। সাধক যে যে রূপে পরমেশ্বরের পূজা করেন, ভগবান শিব সেই সেই রূপ ধরে ফল প্রদান করেন। তাই এর মধ্যে যে কোন রূপ আশ্রয় করেও শাশ্বত মহাদেবের আরাধনা করলে মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান ও সনাতন কৈলাসবাসী মহাদেবকেই সগুণ বা নির্গুণ ভাবে আরাধনা কর। আমি তোমাদের কাছে নির্গুণ যোগের কথা বলেছি। কিন্তু যারা স্বর্গ প্রভৃতি লোকে যেতে চায়, তারা সগুণ মহেশ্বরের উপাসনা করবে। সেক্ষেত্রে পিনাকীকে ত্রিনয়ন, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, স্বর্ণাভ ও সহস্র

সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত রূপে ধ্যান করবে। বেদবাদীদের মতে এই রকম শ্রুতি আছে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিরা, এই সবীজ যোগের কথা বললাম। যে ব্যক্তি এটি করতে পারবে না, সে মহেশ্বর, বিষ্ণু বা ব্রহ্মার অর্চনা করবে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, কেউ যদি তাও না পারে, তাহলে সে ভক্তি সহকারে বায়ু, অগ্নি আর ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা করবে। অতএব ব্রহ্মা প্রমুখ অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করে সনাতন বিরূপাক্ষের উপাসনা করবে। ভক্তি-যোগযুক্ত আর পবিত্র হয়ে নিজের কর্মে রত পুরুষ যে দেবতার আরাধনা করে, শিব সেই দেবতার রূপ ধারণ করে তার কাছে আসেন। এই যে সবীজ যোগের কথা বলা হল, তদ্গত চিত্তে বিধিমত এর অনুষ্ঠান করলে ঐশ্বর পদ লাভ হয়। অন্য যে দু' প্রকার শুদ্ধ ভাবনা তোমাদের কাছে উক্ত হয়েছে, তাতেও নির্বীজ আর সবীজ যোগের কথা বলা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞান নির্বীজ যোগ। এ কথা আগেই তোমাদের বলেছি। সবীজযোগ করতে হলে বিষ্ণু, রুদ্র আর বিরিঞ্চির উপাসনা করবে। অথবা বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সাধনা করবে। অথবা বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করে বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপরায়ণ হয়ে পরমপুরুষ সর্বব্যাপী চতুর্মূর্তিধর, অনাদি, অনন্ত, সনাতন, নারায়ণ, জগতের উৎপত্তি স্থান, আকাশস্বরূপ, পরমপদ, দেবদেব বাসুদেব হরির নিয়ত উপাসনা করবে। অন্তিম ব্রহ্ম চিন্তায় এই বিধির কথা বলা হয়েছে। এই আমি ভাবনাসংশ্রিত পরমজ্ঞানের কথা বললাম। এ কথা আমি পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনির কাছে বলেছিলাম। এই চেতন ও অচেতনরূপ জগৎ অব্যক্তাত্মক। ঐ অব্যক্তের ঈশ্বর পরব্রহ্ম। তাই জগৎ ব্রহ্মময়।

সূত বললেন, ভগবান জনার্দন এই পর্যন্ত বলে নীরব হলেন। তারপর মুনিরা ইন্দ্রের সঙ্গে রমাপতি বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন—

তুমি কূর্মরূপী পরমাত্মা বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই বিশ্বময় বাসুদেব নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই মাধব ও যজ্ঞেশ্বর, তোমাকে সর্বদা নমস্কার করি। তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ ও সহস্রহস্ত, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু, প্রণব উচ্চারণ করে তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মায়াতীত ও আনন্দময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি গুপ্তাত্মা, নির্গুণ, সত্তামাত্ররূপী, পুরাণপুরুষ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সাংখ্যরূপী, যোগরূপী, অদ্বিতীয়, ধর্মজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য, অংশরহিত, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি যোগতত্ত্ব, মহাযোগেশ্বর, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকলেরই কারণ। বেদের সাহায্যে তোমাকে জানা যায়, তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধ ও শুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্ত ও মুক্তির হেতুভূত, তোমাকে নমস্কার। তুমি মায়ী, বিধাতা, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও হৃষীকেশ, তোমার ঐ সমস্ত মূর্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে নমস্কার করি। তুমি কালরুদ্র ও কালরূপ। তুমি স্বর্গদাতা, মোক্ষ-দাতা, তোমার জ্ঞান কোথাও প্রতিহত হয় না। যোগের দ্বারা তুমি লভ্য, তুমি যোগী ও যোগদায়ী। তুমি দেবতাদের দুঃখহরণ, যোগাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। ভগবন, যা জানলে মুক্তিলাভ হয়, তোমার প্রসাদে সর্বসংসারনাশক সেই জ্ঞানের কথা আমরা জানলাম। নানা ধর্ম, বংশ, মন্বন্তর, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথাও শুনলাম। তুমি সমগ্র জগতের সাক্ষী, সর্বময়, অনন্তাত্মা, নারায়ণ, আমরা তোমার শরণ নিচ্ছি। আমাদের ত্রাণ কর।

সূত বললেন, হে বিপ্রগণ, ভোগ ও মোক্ষদায়ক এই সমগ্র কূর্মপুরাণ আপনাদের

কাছে বর্ণনা করা হল। কূর্মরূপী স্বয়ং গদাধর এই কূর্মপুরাণ বলেছেন। এই পুরাণে প্রথমে সমস্ত প্রাণীর মোহের জন্য বাসুদেব যে লক্ষ্মীর উৎপত্তি প্রযোজিত করেছিলেন সে-কথা বলা হয়েছে এবং প্রজাপতিদের সৃষ্টি, বর্ণধর্ম, বর্ণের জীবিকা, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাবিধি লক্ষণ বলা হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব, পৃথকত্ব, তাদের বৈশিষ্ট্য—এ সবই বর্ণিত হয়েছে। ভক্তের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানযোগ্য আচারের কথা বলা হয়েছে এবং বর্ণাশ্রমের লক্ষণ যথাক্রমে বলা হয়েছে। প্রথমে আদি সৃষ্টি, তারপর অণ্ডের মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি, সাতটি আচরণের কথা ও হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কালসংখ্যা, ঈশ্বর-মাহাত্ম্য, ব্রহ্মার জলে শয়ন, ভগবানের নাম নির্বচন, বরাহমূর্তি ধারণ করে পৃথিবীর উদ্ধারসাধন, প্রথমে মুখ্য প্রভৃতি সর্গ, তারপরে মুনিসর্গ, রুদ্রসর্গ, তাপস ঋষিসর্গ এবং তামসসর্গের আগে ধর্মের প্রজাসৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ এবং পরস্পরের দেহের মধ্যে প্রবেশ, পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ধীমান ব্রহ্মার মোহ ও মহেশ্বর দর্শন, বিষ্ণুর দ্বারা কীর্তিত মহেশ্বরের মাহাত্ম্য, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কৃত দেবদেবের স্তব, মহাদেবের প্রসাদ ও বরপ্রদান, বিষ্ণুর সঙ্গে শঙ্করের কথোপকথন, পিনাকীর বরদান ও অন্তর্ধান—এ সবই বর্ণিত হয়েছে। তারপর প্রথমে মধুকৈটভ বধ এবং পরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার অবতরণ কথিত হয়েছে। পদ্ম থেকে অবতরণ করার পরে ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর একীভাব, ব্রহ্মার বিমোহ এবং হরির কাছ থেকে বোধোদয়ের কথা বলা হয়েছে। দেবদেবের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার তপস্যা, তাঁর ললাটদেশ থেকে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাবের কথাও বলা হয়েছে। রুদ্রদের সৃষ্টি ও তাতে ব্রহ্মার প্রতিষেধ, তারপর ব্রহ্মার প্রতি দেবদেবের বরদান ও উপদেশ কথিত হয়েছে। দেব মহেশ্বরের অন্তর্ধান, অণ্ড থেকে জাত ব্রহ্মার তপস্যা ও দেবদেবের দর্শন, মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর রূপ, দেবীর সঙ্গে দেবদেব পিনাকীর বিভাগ ও দেবীর দক্ষকন্যারূপে উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিরা, দেবীর হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ও দেবীমাহাত্ম্য, মাতা ও পিতার দ্বারা দেবীর দিব্যরূপ দর্শন এবং বিশ্বরূপ দর্শন, পিতা হিমালয়ের দ্বারা দেবীর সহস্রনাম কথন, হিমালয়ের প্রতি দেবীর উপদেশ ও বরদান এতে বর্ণিত হয়েছে। তারপর ভৃগু প্রভৃতির প্রজাসৃষ্টি ও রাজবংশ বিস্তার, প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের জন্ম, দক্ষযজ্ঞ নাশ, তাতে দধীচ ও দক্ষের বিবাদ, আর তারপর মুনিদের শাপের কথাও বলা হয়েছে। তারপর দক্ষের গৃহে রুদ্রের আগমন ও প্রসন্নতা, পিনাকীর অন্তর্ধান এবং রক্ষণের জন্য দক্ষের প্রতি পিতামহের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। অনন্তর দক্ষের প্রজাসৃষ্টি, কশ্যপের প্রজাসৃষ্টি, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের নিধন, দেবদারু বনে বাসকারী মুনিদের প্রতি গৌতম ঋষির অভিশাপ—এ সব বলা হয়েছে। এর পর কালাগ্নিরুদ্রের দ্বারা অন্ধকের নিগ্রহ ও তাকে শ্রেষ্ঠ গাণপত্য পদে নিয়োগ কথিত হয়েছে। বিষ্ণুর দ্বারা প্রহ্লাদের নিগ্রহ, বামনের দ্বারা বলিবন্ধন, মহাদেবের দ্বারা বাণাসুরের নিগ্রহ ও তার প্রতি শিবের প্রসন্নতা বর্ণিত হয়েছে। তার পরে ঋষিবংশ বিস্তার, রাজবংশ বিস্তার, বসুদেব থেকে ভগবান বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় উৎপত্তি—এ সব কীর্তিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপমন্যুর দর্শন, তাঁর উপদেশে তপশ্চরণ, জগদম্বার সঙ্গে ত্রিলোচন মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ, তাঁদের কাছে বর লাভ, শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণের কৈলাসে গমন, কৈলাসে বাস, তারপর দ্বারবতী নিবাসীদের ভয়,

মহাবল শত্রুদের পরাজিত করে গরুড়ের দ্বারা দ্বারবতীর রক্ষণ—এ সব কথাও বলা হয়েছে। দ্বারকায় নারদের আগমন, গরুড়ের কৈলাসযাত্রা, কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন, তারপর মুনিদের আগমন, বাসুদেবের নৈত্যিক কর্ম ও শিবলিঙ্গের পূজা এবং মার্কেণ্ডয় মুনির প্রশ্ন—এ সব বর্ণিত হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, তারপর মার্কণ্ডেয়র প্রতি শ্রীকৃষ্ণের লিঙ্গার্চনের জন্য লিঙ্গী ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গ থেকে ভয় ও মোহ, লিঙ্গের সীমা জানবার জন্যে ব্রহ্মার উর্ধ্বগমন ও বিষ্ণুর নিম্নভাগে গমন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারা মহাদেবের স্তব ও তাঁদের প্রতি ভগবানের প্রসন্নতা এবং লিঙ্গের অন্তর্ধানের কথা বলা হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তারপর সাম্বের উৎপত্তি, অনিরুদ্ধের উৎপত্তি, কৃষ্ণর নিজ স্থানে গমনের ইচ্ছা, ঋষিদের দ্বারকায় আগমন, তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের অনুশাসন এবং মহাত্মাদের প্রতি বরদান কীর্তিত হয়েছে। কৃষ্ণের পরম স্থানে গমন, অর্জুনের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দর্শন, তাঁর দ্বারা কথিত সনাতন যুগধর্মগুলির কথা এবং পার্থের প্রতি ব্যাসের অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। তার পর বারাণসীতে পরাশরতনয় অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের গমন, বারাণসী মাহাত্ম্য ও তীর্থবর্ণনা, ব্যাসের তীর্থযাত্রা, দেবীদর্শন, দেবীর দ্বারা বারাণসী থেকে ব্যাসের বাসস্থানের উচ্ছেদ, ব্যাসের প্রতি দেবীর বরদান—এ সব কথাও বলা হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের কাছে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রয়াগমাহাত্ম্য বর্ণনা, সেখানে স্থিত পুণ্যক্ষেত্রের বর্ণনা, তীর্থফল বর্ণনা এবং মার্কণ্ডেয়র প্রস্থানের কথা বলা হয়েছে। তার পর ভুবনের স্বরূপ, গ্রহসন্নিবেশ, বর্ষ ও নদীর নির্ণয়, পর্বতসংস্থান, দেবতাদের বাসস্থান, দ্বীপসমূহের বিভাগ, শ্বেতদ্বীপের বর্ণনা, সেখানে অনন্তশয্যায় কেশবের শয়ন, ভগবানের মাহাত্ম্য, মনুদের অধিকার, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য—এ সবও বলা হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, বেদশাখা প্রণয়ন, বৈবস্বত মনুর অধিকারে আটাশটি যুগে আটাশজন ব্যাসের বৃত্তান্ত, অবেদ আর বেদের বিভাগ, যোগেশ্বরদের কথা ও তাদের শিষ্যদের বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। তারপর ঈশ্বরের নানা গোপনীয় গীতা কীর্তিত হয়েছে। হে দ্বিজগণ, তারপর বর্ণাশ্রমের আচার, প্রায়শ্চিত্তবিধি, সেই প্রসঙ্গে রুদ্রের কপালী হওয়ার বৃত্তান্ত ও তাঁর ভিক্ষাচরণ, পতিব্রতার কথা, তীর্থের নির্ণয় ও মহাদেবের দ্বারা মঙ্কণক মুনির নিগ্রহ কথিত হয়েছে। হে ব্রাহ্মণগণ, তারপর শম্ভুর দ্বারা কালের নিধনের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। শম্ভু ও বিষ্ণুর দেবদারু বনে প্রবেশ, অত্রি প্রমুখ ষট্‌কুলোদ্ভব ঋষিদের মহাদেব দর্শন ও নন্দীর প্রতি মহাদেবের বরদানের কথা বলা হয়েছে। তারপর নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয় ও সবীজ যোগের কথা যথাক্রমে বলা হয়েছে। কূর্মপুরাণের বিষয়বস্তু এই ভাবে সংক্ষেপে জেনে যে ব্যক্তি এটি পাঠ করে সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে।

এই কথা বলে ভগবান পুরুষোত্তম কূর্মরূপ ত্যাগ করে দেবী কমলাকে নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। সমস্ত দেবতা আর মুনিরা পুরুষোত্তম দেবকে প্রণাম করে অমৃত গ্রহণ-পূর্বক নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ দেবাদিদেব বিশ্বের উৎপত্তি-স্থান কূর্মরূপী ভগবান বিষ্ণু নিজে বলেছেন। যে ব্যক্তি নিয়মযুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে নিয়মিত এই পুরাণ ক্রমানুসারে পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে। এই পুরাণ লিপিবদ্ধ করে যে ব্যক্তি বৈশাখ বা কার্তিক মাসে বেদবিদ ব্রাহ্মণকে দান করে তার কী পুণ্য হয় শুনুন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত ও সমস্ত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত

হয়ে সেই মানুষ স্বর্গে মনোরম বিপুল সুখ অনুভব করে থাকে। তারপর স্বর্গভোগ শেষ হয়ে গেলে সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে ও পূর্বের সংস্কার বলে জ্ঞান লাভ করে। এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। আর যে সম্যক ভাবে এর অর্থ বিচার করতে পারে সে পরম পদ লাভ করে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, মহাপাতক-নাশী এই পবিত্র পুরাণ প্রতি পর্বদিনে ব্রাহ্মণদের পাঠ করা ও শ্রবণ করা উচিত। একদিকে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস এবং অন্যদিকে কেবল এই কূর্মপুরাণ রাখলে এই কূর্মপুরাণের দিকটিই বেশী ভারী হয়। ধর্মনৈপুণ্যকামী এবং জ্ঞাননৈপুণ্যকামী—এই দু' প্রকার ব্যক্তির পক্ষেই এই পুরাণ ছাড়া অন্য সাধন নেই। এই পুরাণে ভগবান নারায়ণ বিষ্ণুর কথা যে রকম ভাবে কীর্তন করা হয়েছে, অন্য কোন পুরাণে সে-রকম নেই। এই পৌরাণিকী ব্রাহ্মী সংহিতা সর্বপাপনাশিনী, কারণ এই সংহিতায় সেই পরমব্রহ্মের কথা যথার্থভাবে বলা হয়েছে। এই ব্রাহ্মী সংহিতা তীর্থের মধ্যে পরমতীর্থ, তপস্যার মধ্যে পরম তপস্যা, জ্ঞানের মধ্যে পরম জ্ঞান ও ব্রতের মধ্যে পরম ব্রত। শূদ্রের কাছে এই শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নয়। মোহগ্রস্ত হয়ে যে ব্যক্তি শূদ্রের কাছে এটি পাঠ করে, সে বহু নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধে বা দৈবকার্যে দ্বিজগণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের এই শাস্ত্র শ্রবণ করাবেন। যজ্ঞশেষেও এই সর্বদোষনাশক শাস্ত্র শ্রবণ করানো উচিত। বেদার্থের পরিপোষক এই শাস্ত্রকে, বিশেষ করে মুমুক্ষুদের পক্ষে অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং মনন করা উচিত। এই শাস্ত্র জেনে যে ব্যক্তি ভক্তিমান ব্রাহ্মণদের বিধান অনুসারে শ্রবণ করান, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধারহিত বা অধার্মিক পুরুষকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করায় সে পরলোকে নরকে যায়, তারপর পৃথিবীতে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করে। জগদযোনি সনাতন বিষ্ণু, হরি ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে নমস্কার করে এই পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। এ হল অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর আদেশ, পরাশর-তনয় মহাত্মা ব্যাসেরও এই আদেশ। ভগবান নারদ ঋষি নারায়ণের মুখে এই পুরাণ শ্রবণ করে গৌতমকে দান করেছিলেন। গৌতমের কাছ থেকে এটি পরাশর পেয়েছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, ভগবান পরাশর ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ প্রদায়ক এই পুরাণ গঙ্গাদ্বারে মুনিদের কাছে বলেছিলেন। আর এই সর্বপাপনাশক পুরাণ পূর্বকালে ব্রহ্মা নিজের পুত্র ধীমান সনক ও সনৎকুমারের কাছে বলেছিলেন। সনকের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ যোগবিদ ভগবান দেবল মুনি আর দেবল মুনির কাছ থেকে এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পঞ্চশিখ মুনি জেনেছিলেন। সনৎকুমারের কাছ থেকেই সত্যবতী পুত্র ভগবান বেদব্যাস মুনি এই সর্বার্থসংগ্রহরূপ পরমপুরাণ লাভ করেছিলেন। পরে বেদব্যাসের কাছে শ্রবণ করে আমি এই পাপনাশক পুরাণ আপনাদের কাছে কীর্তন করলাম। আপনারাও ধার্মিক ব্যক্তির কাছেই এই পুরাণ প্রকাশ করবেন। সেই নারায়ণাত্মা, শমগুণের আস্পদ, পরাশরনন্দন, সর্বজ্ঞ, মহর্ষি, গুরু বেদব্যাসকে প্রণাম করি। আর যাঁর থেকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, যাঁর মধ্যে সমস্ত জগৎ বিলীন হয়ে যায়, সেই কূর্মরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকেও নমস্কার করি।

শ্রীকূর্মমহাপুরাণের উপরিভাগে প্রতিসর্গাদিকথন নামে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উপরিভাগ সমাপ্ত হল।

এই সঙ্গে এই কূর্মপুরাণও সমাপ্ত হল।